হিন্দু-দর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন

শ্রীপরমানন্দ দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত

১৯২৮

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীপরমানন্দ দত্ত,

৪৯, আনন্দ পালিত রোড,

ইণ্টালি, কলিকাতা।

মডার্ণ আর্ট প্রেস,

১।২, দুর্গা পিতুড়ী লেন, কলিকাতা

শ্রীঅম্বিকাচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

পূর্ব্বোক্তি

১

দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই আমাদের মনোমধ্যে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে "দর্শন" বস্তুটি কি ? দর্শন-শাস্ত্র মানব জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধানের বিচারসঙ্গত প্রয়াস মাত্র। মানুষ আহার-বিহার করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই শান্তি পায় না। মানুষ জীবন-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াই তৃপ্তি পায় না। মানুষকে তার অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির প্রেরণাবলে জীবনের মূল্য যাচাই করিয়া লইতে হয়। সে কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কোথায় যাইবে, তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য কি, কিরূপে সেই লক্ষ্যে পৌছান যায়, এ সব প্রশ্ন প্রতি মানুষের জীবনে কোন না কোন শুভ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইবেই হইবে। মানুষ জীবনের জোয়ার-ভাটায়, নানা প্রকার বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, অবস্থা-চক্রের ঘূর্ণিপাকে বাধ্য হইয়া যেমন এই সব প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হইল, অমনি মানুষ দার্শনিক হইল। প্রতি মানুষেই এই হিসাবে দার্শনিক, তবে সাধারণ মানুষ এই সকল প্রশ্নের জটিলতা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য দূর করিয়া সুসঙ্গত ব্যাখা দিতে পারে না, নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের মধ্যে একত্বের সন্ধান পায় না, পাইলেও একের সহিত বহুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। যে মানুষের প্রাণে মানব-জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে ও সেগুলির সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জীবনভার দুর্ব্বহ করিয়া তোলে, সেই মানুষ আহার সকল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা ঐ সকল জটিল সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয় ও সকল প্রকার অসঙ্গতি দূর

করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানে উপনীত হয়। এই মানুষকে দার্শনিক বলে ও তাহার সমাধানই দর্শন। বিভিন্ন মানুষ তাহার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে জীবন-সমস্যার বিভিন্ন সমাধানে উপনীত হয়। তাই জগতে বিভিন্ন প্রকার দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির জাতীয় বিশিষ্টতা অনুসারে বিভিন্ন দশন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং এমন কি একই দেশে, একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন যুগে একই সমস্যার সমাধান যুগ-ভাবের ও যুগাদর্শের বৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। তাই জগতে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিক চিন্তার ধারা লক্ষিত হয়।

প্রতীচ্য জগতে দর্শনের সাধারণ গতি বহু হইতে একের দিকে; এবং প্রাচ্য-জগতে দর্শনের সাধারণ গতি এক হইতে বহুর দিকে। সুতরাং প্রতীচ্য-জগতে দর্শনের সাধারণ লক্ষণ, সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বয়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ, পারমার্থিক সত্তার দর্শন বা সাক্ষাৎকার। পারমার্থিক সত্তার সহিত মুখোমুখি চোখোচোখি দেখা না হইলে, পারমার্থিক সত্তার অপরোক্ষানুভূতি না হইলে তাহার দর্শন লাভ হইল না এবং দর্শনশাস্ত্রও সম্ভবপর হইল না। তাই ভারতের দার্শনিক বড়াই করেন যে, তাঁর প্রতি দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা কোন প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা ঋষি। ইহার মূলে যাহাই থাক্ না কেন, ভারতীয় দর্শনের চিন্তার ধারায় পারমার্থিক সত্তার "দর্শন" বা সাক্ষাৎকারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকারের আলোচিত বিষয় "হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন" সম্বন্ধে দুই একটী বিষয় আলোচনা করিব। দার্শনিক চিন্তার ধারায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য জগতে ভারতীয় দর্শনের স্থান সর্ব্বোচ্চ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে এবং ইহার অপলাপ করা চলে না। ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য

মোক্ষ ও মোক্ষ-সাধনের উপায় নির্দ্দেশ। মানুষের অনন্ত অতৃপ্ত বাসনার যেখানে চরম পরিতৃপ্তি হয় বা উচ্ছেদসাধন হয়, যেখানে জন্ম-মৃত্যু-সংসারের চিরনিবৃত্তি হইয়া যায়, সেই চরম লক্ষ্য কি, ও সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়ই বা কি, তাহা নির্দ্দেশ করাই ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য। এ সমস্যা, জীবনের চরম সমস্যা, এ সমস্যার সমাধান জীবন-মরণের ব্যাপার; এ সমস্যার সমাধান মাত্র, বুদ্ধিবৃত্তির অলস কৌতূহল নিবৃত্তি নহে বা নিরর্থক বাক্-বিতণ্ডা বা তর্ক বিতর্ক নহে। পাশ্চাত্য জগতে জীবনের এই চরম্ সমস্যা মানুষকে তেমন পাগল করিয়া তোলে না। তাই, সে দেশের দার্শনিক এই চরম সমস্যার সমাধানে সকল চিন্তাশক্তি ঢালিয়া দেন না। পাশ্চাত্য দর্শন বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল নিবৃত্তির ও মানুষের একত্ব শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের দিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য দর্শনের সাধারণ গতি বহু হইতে একের দিকে এবং ভারতীয় দর্শনের সাধারণ গতি এক হইতে বহুর দিকে। পাশ্চাত্য দর্শনের আরোহিণী গতি (inductive method); এবং ভারতীয় দর্শনের অবরোহিণী গতি (deductive method)। পাশ্চাত্য দর্শন প্রত্যক্ষীভূত বহু জ্ঞেয় বিষয় হইতে কতিপয় মূলতত্ত্বের সন্ধান করে ও এই সকল মূলতত্ত্বের মূলে এক বিরাট্ তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, যাহা দ্বারা আমাদের বহুমুখী প্রতীতির সকল বিষয়ই ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতীয় দর্শন প্রথমেই এক বা একাধিক মূলতত্ত্ব ধরিয়া তাহা দ্বারা জ্ঞেয় সকল বিষয়েরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। আমাদের নানা প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুভূতির ব্যাখ্যা সব দর্শনকেই করিতে হইবে, তবে প্রতীচ্য দর্শন ব্যষ্টির উপর জোর দেয়, ভারতীয় দর্শন সমষ্টির উপর জোর দেয়। প্রতীচ্য দর্শন বিশ্লেষণ মূলক (analytic); ভারতীয় দর্শন সমন্বয় মূলক (synthetic)। ভারতীয় দর্শন একেবারেই মূলতত্ত্বকে ধরিবার জন্য বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি,

বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি সকল বৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে এবং পরে বুদ্ধি বিচার দ্বারা তাহা প্রতিপাদনে চেষ্টা করে। প্রতীচ্য দর্শন এরূপ বুদ্ধিবিচারের অতীত, অপরোক্ষানুভূতির উপর আস্থা স্থাপনে অনিচ্ছুক; ইহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বুদ্ধি-বিচারের উপরই বেশী নির্ভর করে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ভারতীয় দর্শন অন্তর্ম্মুখীন, প্রতীচ্য দর্শন বহির্ম্মুখীন। প্রতীচ্য দর্শন ইন্দ্রিয়গোচর বহিঃপ্রকৃতির উপর বেশী জোর দেয়। ভারতীয় দর্শন বুদ্ধিগোচর অন্তর্জগতের উপর বেশী জোর দেয়। প্রতীচ্য দর্শন জড়শক্তি, জীবশক্তি বা খুব জোর মানসিক শক্তির দ্বারা জগতের সকল বিষয়ের সমাধান করিবার চেষ্টা করে। বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে, প্রতীচ্য দর্শন আত্মার অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, ও খুব জোর মনোময় কোষ ভেদ করিতে পারিয়াছে; বিজ্ঞানময় কোষের আভাস পায় নাই। ভারতীয় দর্শন অন্তর্জগতের উচ্চতম তত্ত্বগুলি লইয়াই ব্যস্ত, বহির্জগতের সমস্যা সমাধানে পরাঙ্মুখ। প্রতীচ্য দর্শন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ও বহিঃপ্রকৃতির উপর বেশী জোর দিয়া বিশেষ ভাবে ঐহিক জীবনেরই সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করে। ঐহিক জীবনই ইহার মুখ্য বিষয়, পারত্রিক জীবন ইহার গৌণ বিষয়। ভারতীয় দর্শনের মুখ্যবিষয় পারত্রিক জীবন; গৌণ বিষয় ঐহিক জীবন। জন্ম-মৃত্যু-সংসার নিবৃত্তির জন্যই ইহার জন্ম। আর ঐহিক জীবন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই প্রতীচ্য দর্শনের জন্ম। যাহাতে ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় তাহার জন্যই প্রতীচ্য দর্শনের প্রয়াস। ভারতীয় দর্শন ঐহিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের সেতুস্বরূপ, এই সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া ঐহিক জীবনের উপর অশ্রদ্ধাস্থাপন করে। এই কারণেই আজ ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পার্থক্য এইখানে যে, প্রাচ্য দার্শনিক সমস্ত জীবন দিয়া জীবনের সমস্যার সমাধান করেন

ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে সত্যের সাক্ষাৎলাভ করেন তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রতি কার্য্যে ঐ সত্যকে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন ও নিজে জলন্ত জীবন্ত সত্যস্বরূপ হইয়া, প্রাণে প্রাণে সেই সত্যের আগুণ জ্বালাইয়া দেন এবং নিজে সত্যের উন্মাদনায় পাগল হইয়া মানুষকে পাগল করিয়া তোলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিকগণ সাধারণতঃ এমন ভাবে সমস্ত জীবন দিয়া জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করেন না, বুদ্ধি বিচার দ্বারা যে সত্যে উপনীত হন, সে সত্য নিজ'জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারেন না। তাই সত্যকে নিজের করায়ত্ত করিতে না পারিয়া নিজের প্রাণের মধ্যে না পাইয়া, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সত্যের স্পন্দন অনুভব করিতে না পারিয়া, মানুষের প্রাণে সত্যের শিখা জ্বালাইতে পারেন না। ভারতাকাশে শঙ্কর, রামানুজ, প্রভৃতি মনীষিগণ উদিত হইয়া নূতন নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সত্যের নূতন নূতন মূর্ত্তির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, মানুষকে নূতন নূতন রসের আস্বাদন দিয়া পাগল করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে এমন মানুষ-পাগল-করা দার্শনিক প্রায়ই দেখা যায় না, কারণ সেখানে সত্যকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই।

ভারতের দর্শন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। ইহার চিন্তার গতি অবাধ নহে; ইহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, ইহার যথেচ্ছ গতি নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের দার্শনিক চিন্তার অবাধ গতি, অসঙ্কীর্ণ ভাব ও উদার সহিষ্ণুতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। চার্ব্বাক ইহসর্ব্বস্ব, প্রত্যক্ষ-নির্ভর ও অতীন্দ্রিয়-বিরোধী; চার্ব্বাক বেদে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর বা পরলোকে বিশ্বাস করে না, এমন কি প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমান-প্রমাণেও বিশ্বাস করে না; চার্ব্বাক পঞ্চভূতাত্মক দেহকেই আত্মা বলিয়া মানে ও দেহের পুষ্টি সাধনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে। বৌদ্ধ বেদে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, অবিনাশী ও অপরিণামী আত্মায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু চিরপরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর জগতে বিশ্বাস করে, কর্ম্ম

ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করে, ক্ষণভঙ্গুর আত্মার পুনর্জীবনে বিশ্বাস করে, ও দুঃখহানির উপায় সাধন দ্বারা নির্ব্বাণ লাভে বিশ্বাস করে। কোন কোন বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর বহির্জগতেও বিশ্বাস করে না, মাত্র চিরপরিবর্ত্তনশীল ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহে বিশ্বাস করে। আবার কোন কোন বৌদ্ধ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না, মাত্র শূন্যে বিশ্বাস করে। জৈন বেদে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু কর্ম্মের বিধানে বিশ্বাস করে, অনন্ত আত্মার অবিনাশিত্বে ও সর্ব্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করে, ও নিজের চেষ্টা দ্বারা কর্ম্মাবরণ ক্ষয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিতে বিশ্বাস করে। ভারতের আর সকল দর্শনশাস্ত্রই বেদে বিশ্বাস করে। তার মধ্যে সাংখ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, বা ঈশ্বরপ্রতিপাদনে বিশ্বাস করে না, জৈনের মত অনন্ত পুরুষে বিশ্বাস করে, এবং অনন্ত পুরুষের সান্নিধ্যে তাহার ভোগ ও মুক্তির জন্য ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও লয়ে বিশ্বাস করে। ন্যায়-বৈশেষিক অনন্ত আত্মায় ও এক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং ভগবৎ-সৃষ্ট জড় অণুপরমাণু-গঠিত বহির্জগতে বিশ্বাস করে। কোন কোন বৈদান্তিক আত্মা ও জগতের মূল কারণ পরমাত্মার উপর জোর দিয়া জীবাত্মা ও জগৎকে পারমার্থিক সত্তা হইতে দূর করিয়া ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে ফেলিয়া দেন ও সদা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া তোলেন। অথবা পরমাত্মার উপর জোর দিয়াও কোন কোন বেদান্তবাদী জীবাত্মা ও জগৎকে বজায় রাখিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয় করিয়াছেন, বৈচিত্র ও বহুত্বের মধ্যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্"কে (পরমেশ্বরকে) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় একটানা একঘেয়ে সুর শোনা যায় না; নানা তান-লয়-বদ্ধ বিচিত্র সুরই শোনা যায়, জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দিকের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, ভারতের দার্শনিক সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মাত্র কয়েকটি

নির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরিয়া চলিয়াছে, নূতন পন্থা কাটিয়া বাহির করিতে পারে না। ভারতের দার্শনিক হয় সাংখ্য না হয় ন্যায়-বৈশেষিক, না হয় কোন না কোন বেদান্ত দর্শনের অনুসরণ করিয়াই চলিবে। নূতন পন্থায় চলিয়া নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিবে না। সূত্র বা কারিকার উপর ভাষ্য, ভাষ্যের উপর টীকা, টীকার উপর টিপ্পনী এই ভাবেই ক্রমশঃ চলিয়াছে। নূতন কিছু হইল না, নূতন কিছু হইবে না। ইহা বাস্তবিক সত্য। ভারতের দার্শনিক পূর্ব্বের কোন মনীষিনির্দ্দিষ্ট চিন্তার ধারা বা পথ ধরিয়াই চলেন, তাঁহার দোহাই দিয়াই নিজের অনুভূত সত্য প্রচার করেন; পুরাতন দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নূতন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন ও নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যদি বলেন, একেবারে গোড়া হইতেই নূতন কোন কিছু বলেন না কেন, গতানুগতিকতার প্রয়োজন কি, তাহার উত্তরে এই বলি যে অতীতের ভাবসম্পদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা, অতীতের উপর বর্ত্তমান গড়িয়া তোলা প্রাচ্য মানবের স্বভাবসিদ্ধ, তাহার রক্তমাংসের সহিত জড়িত। এই হিসাবে ভারতের মানুষ হয়তো কোন দিনও আজকালকার ভাষায় মধ্যযুগের উচ্চস্তরে উঠিতে পারিবে না। তাহাকে চিরকালই অতীতের উপর ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জলে, মাটিতে, আকাশে, বাতাসে দার্শনিক চিন্তার ধারা আপনা হইতেই কয়েকটি বিশিষ্ট প্রণালীতে ধাবিত হয়। তাই এই ভারতীয় চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী ধরিয়া চলিতে পারে না। বেদান্তই ভারতের প্রাণ। বেদান্তের চরম সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করিয়া ভারতের দার্শনিক সহজে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, ও আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন, বহুর মধ্যে একের খেলা ও একের মধ্যে বহুর সমন্বয় এইরূপ চিন্তাই ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। সত্যের যে কোন দিকের উপরেই ভারতের দার্শনিক ঝোঁক দেন না কেন ভারতের এই বিশিষ্ট চিন্তাকে অতিক্রম করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিকের এক বিশেষত্ব এই যে, সত্যকে ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের সহিত বিশেষভাবে মিলাইয়া লইয়া তবে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। যে তত্ত্বের দ্বারা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের ব্যাখ্যা হয় না বা যে তত্ত্বের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না, তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পাশ্চাত্য দার্শনিক সহজে চান না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতাগুলিকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া এক অলৌকিক বা অপার্থিব সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না এবং ঐহিকজীবনের যে কোন সত্যকেই স্বতঃসিদ্ধ বা আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লয়েন না। যুক্তিবিচার প্রমাণ দ্বারা বেশ করিয়া ওজন করিয়া তবে সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এরূপ বিচার প্রমাণের উপর আস্থা থাকায় অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, নিজে প্রমাণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা না করিয়া ঋষিবাক্যের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা যায় না। নিজের উপর নির্ভর করিয়া, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, স্বীয় চেষ্টায় সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পাশ্চাত্য চিন্তার ধারায় এইরূপ আত্মনির্ভরতা, স্বাধীন চিন্তা ও প্রত্যক্ষমূলকতা বাস্তবিক প্রশংসার বিষয়।

আমি এক্ষণে বর্ত্তমান প্রতীচ্য দর্শনের একটু আভাস দিব। বর্ত্তমানে প্রতীচ্য দার্শনিক-জগতে এক মহাসংঘর্ষ উপস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মান দার্শনিক হেগেলের চিন্তা কিছুকালের জন্য ইউরোপের দার্শনিক চিন্তাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পণ্ডিত হেগেল চরম সত্তা ভগবানের (ঈশ্বরের) দ্বারা সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বহির্জগৎ ভগবানের বিকাশমাত্র এবং জীবাত্মাও তাঁহারই সসীম প্রকাশমাত্র এবং এই চরম সত্তা বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতব্য। হেগেল ভগবানকে সকল সত্তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করায় ও ভগবানকে সর্ব্বগ্রাসী করায় বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী মানব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী দার্শনিক বলিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আপ্তকাম ভগবানকে সকল সত্তার কেন্দ্রে বসাইলে জগতে নূতন সৃষ্টির স্থান কোথায়, মানুষের স্বাধীন চিন্তার অবসর কোথায়? মানুষ যদি ভগবানের হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা হয় তবে মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্ব কোথায়? ভগবান্ নিজে যদি সবই জানেন ও সবই করেন তবে জগৎটা তাঁহার মুঠির মধ্যে; জগতে নূতন সৃষ্টির স্থান নাই। আজকার এই গণতন্ত্রের দিনে ভগবানের একচ্ছত্র শাসন মানিবে কেন? ভগবানে আমার কি প্রয়োজন? ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, তাতে আমার কি আসে যায়? আর এক কথা। এতদিন বুদ্ধিকে বড় করিয়া আমাদের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায্য অধিকার দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, বুদ্ধির প্রভাব আমাদের জীবনের কতটুকু অংশের উপর? চির-পুরাতন বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তি দ্বারা কি সত্যের সন্ধান হয় না? এই বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধেও প্রতীচ্য জগতের বিভিন্ন-শ্রেণীর দার্শনিক আজ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ফ্রান্সের প্রথিতনামা মনীষী বার্গস (Bergson) বলিতেছেন, বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের মাত্র বহিরাবরণের জ্ঞান হয়, তাহার অন্তর্জীবনের জ্ঞান হয় না; বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে একত্ব স্থাপিত হয় না, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মরমের বাণী জানিতে পারে না, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়া যায় এবং এই পার্থক্য প্রকৃত জ্ঞানের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া এক অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষানুভূতি বা নির্ব্বিকল্প প্রজ্ঞার (intuition) স্তরে উঠিতে হইবে। ইহা দ্বারাই সত্তার প্রকৃত জ্ঞান হইবে।

আর এই প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে বার্গস (Bergson) বলিতেছেন, যে, জড় ও বুদ্ধির মূলে এক চিরপরিবর্ত্তনশীল জীবন-প্রবাহ (elan vital) আছে। এ জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নহে, কোন কিছুই শাশ্বত নহে। সবই গতিশীল,

পরিবর্ত্তনশীল, নূতনত্বময়, নূতন সৃষ্টি। এই জীবন-প্রবাহ প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, নূতন নূতন বস্তুর অভিব্যক্তি করিয়া চলিয়াছে। এই সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তি (Creative Evolution) এর সহিত অতীত বা ভবিষ্যতের কোন সম্বন্ধ নাই; অতীত বর্ত্তমানকে গড়িয়া তোলে না; বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করে না। সর্ব্বদাই নিত্য-নূতন সৃষ্টি হইতেছে, নিত্য নূতন অভিব্যক্তি হইতেছে। এই সৃষ্টি অভিব্যক্তির কোন আদি নাই, কোন অন্ত নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন প্রয়োজন নাই। ইহা এক উদ্দেশ্যহীন, কারণ-হীন সৃষ্টিছাড়া জীবন-প্রবাহের নিত্য-নূতন সৃষ্টি, নিত্য-নূতন লীলা। এই জীবন-প্রবাহ বাধা পাইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলেই তাহাকে জড় পদার্থ বলে। কিন্তু কেন এই জীবন-প্রবাহ বাধা পাইয়া জড় হইয়া যায়, বার্গসঁ তাহার কোন উত্তর দেন নাই। যদি ইহাই হয় এই চিরপরিবর্ত্তনশীল জীবন-প্রবাহকে বার্গসঁর ভগবান বলিতে পারেন। কিন্তু এই জীবন-প্রবাহ পূর্ণাবয়ব সত্তা নহে; ইহা সর্ব্বদাই নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, নব নব কলেবর ধারণ করিতেছে, নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে: এই লীলাত্মক সৃষ্টি-প্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা অনাদি অনন্ত; চলাই ইহার ধর্ম্ম; গতিই ইহার প্রাণ; পরিবর্ত্তনই ইহার প্রকৃতি। এই গতির মধ্যে স্থিতি নাই, অবিশ্রান্ত চলার কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নাই। ইহা এক সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি ব্যাপার। সুতরাং বার্গসঁ সর্ব্বগুণান্বিত সগুণ-ব্রহ্ম বা ভগবানে বিশ্বাস করেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তিতেও বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধি যখন জীবন-প্রবাহেরই সৃষ্টি তখন তাহা দ্বারা আর জীবন-প্রবাহকে ধরা যাইবে কিরূপে? জীবন-প্রবাহকে ধরিতে হইলে জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে হয়, জীবন-প্রবাহের প্রাণের ভিতর ঢুকিয়া তাহার সঙ্গে এক হইয়া যাইতে হয়। ইহা বুদ্ধির অগম্য প্রজ্ঞার বিষয়।

বার্গসঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্ (William James) ও উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদ (Intellectualism)

ও সর্ব্বগ্রাসী ঈশ্বরবাদ (absolution) এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এক নূতন দর্শন প্রচার করিয়াছেন। তাহার নাম ব্যবহারবাদ বা অর্থ ক্রিয়াবাদ (Pragmatia) ; তাঁহার মতে তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যাহা দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ চলিবে। যাহা কোন কাজে আসে না তাহা সত্য নহে। সত্যের মাপকাটি তাহার কার্য্যকারিত্ব। যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান ও আত্মার অমরত্ব কি সত্য? জেমস্ বলেন, যদিও তিনি ভগবানের অস্তিত্ব বা আত্মার অমরত্ব নিজের জীবনে উপলব্ধি করেন নাই বা তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন না তথাপি ইহাতে বিশ্বাস করেন ; কারণ এই দুই সত্যে বিশ্বাস করিলে জীবনটা বেশ ভাল ভাবে নির্ব্বাহ করা যায় ; বিশ্বাস না করিলে জীবনটা কেমন খাপছাড়া বোধ হয়, জীবনের স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি প্রতিহত হয়। বার্গসঁ বুদ্ধির অতীত নির্ব্বিকল্প প্রজ্ঞার (intuition) উপর ভর দিয়া সৃষ্টির মূলে এক জীবন-প্রবাহকে (elan vital) ধরিয়াছেন। জেমস্ ততদূর উঠিতে পারেন নাই। তিনি বুদ্ধির নিম্নস্তরে নির্ব্বিকল্প ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (Immediate perception) উপর ভর দিয়া বহুত্বময় জগৎকে (Pluralistic Universe) ধরিয়াছেন। এই বহুত্বপূর্ণ জগতে নানা পদার্থ আছে ; তাহারা ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ নহে ; তাহাদের মধ্যে আলগা ছাড়াছাড়ি সম্বন্ধ (External relation)। এই বহুত্বময় জগৎ মানুষের স্বাধীন চেষ্টা দ্বারাও পরিবর্ত্তিত হয়। জেমস্ তাঁহার বহুত্বময় জগতে ভগবানের স্থানও রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগবান মানুষের মত শান্ত সসীম ; তবে মানুষ অপেক্ষা বেশী শক্তিসম্পন্ন, বেশী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। মানুষ ও ভগবান পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ; তাঁহারা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এই জগতের অমঙ্গল ধ্বংস করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং সে হিসাবে জেমস্ ভগবান স্বীকার করেন বটে, কিন্তু ভগবানের একচ্ছত্র শাসন করেন না, তাঁহার অনন্তত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করেন না। তিনি ভগবানকে মানুষের মত সীমাবদ্ধ মনে করেন।

ইংলণ্ডের অধ্যাপক শিলারও (Schiller) ভগবানের অমরত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, আত্মাই চরম সত্তা। আত্মাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই জগৎ মানবাত্মা ও ভগবান উভয়ের সহযোগে গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই। ভগবান মানবাত্মাকে সৃষ্টি করেন নাই। মানবাত্মা ভগবানের চিরসঙ্গী; ভগবান অনন্ত আত্মার মধ্যে একটি আত্মা, বহুর মধ্যে একটি; ভগবান মানবাত্মার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

আজকাল অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকই এইরূপ সসীম ঈশ্বরবাদ পোষণ করেন। অধ্যাপক হাউইসন্ (Howison) বলেন, মানবাত্মা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তাহার আদি বা অন্ত নাই, ভগবান মানবাত্মার স্রষ্টা নহেন; ভগবান ও মানবাত্মা পরস্পরের চিরসঙ্গী। ভগবান মানবাত্মার স্রষ্টা না হইলেও তাহার চরম লক্ষ্য। ভগবানের পূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়া মানবাত্মা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

অধ্যাপক র‍্যাশড্যালের (Rashdal) মতে ভগবান ও চরম সত্তায় পার্থক্য আছে। ভগবান চরম সত্তা নহেন, কারণ ভগবান মানবাত্মা দ্বারা সীমাবদ্ধ; ভগবান ও মানবাত্মা এই দুই এর সমষ্টি চরমসত্তা; কিন্তু এই দুইএর সমষ্টি চৈতন্যময় জ্ঞানবিশিষ্ট নহে।

অধ্যাপক ওয়ার্ডও (Ward) এইরূপ মত প্রচার করিতেছেন, তাঁহার মতে মানবাত্মা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; মানবাত্মা স্বীয় স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা নিজের অদৃষ্ট গঠন করে। ভগবান মানবাত্মা দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁহার ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান নাই। কিরূপেই বা থাকিবে? ভবিষ্যৎ কেবল তাহার উপরই নির্ভর করে না; মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাও কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা গেল পাশ্চাত্য অনেক দার্শনিকই আজকাল ভগবানের অনন্তত্বে ও সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করেন না।

আবার কেহ কেহ মানবাত্মার সহযোগী এই সসীম ঈশ্বরেও বিশ্বাস করে না। যথা, ইংলণ্ডের খ্যাতনামা মনীষী বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) বলেন যে, এই জগৎ জড় অণু পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; ইহাতে ভগবানের

কোন স্থান নাই। এ. জগতে আশা ভরসার ·কোন কারণ নাই। নীতি ও ধর্ম্ম মনের ভ্রম মাত্র, ইহা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের ভগবানে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর পরপারে অমরত্ব লাভের কোন আশা নাই। মৃত্যুর সঙ্গেই জীবনের সকল আশা-ভরসার শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুই জীবনের চরম অবস্থা ভাবিয়া শান্ত-চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি প্রতীচ্য জগতে এইরূপ ঈশ্বরদ্রোহী ও পরলোকদ্বেষী দর্শনের প্রাদুর্ভাব হইলেও এখনও তথায় আদর্শবাদের (Idealism) অভাব হয় নাই। জার্ম্মানীতে কয়েকজন মনীষী বলেন যে, মানব-জীবনের কতিপয় চরম আদর্শ আছে যাহা অন্য কোন প্রতীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, যথা "সত্যম্" "শিবম্" ও "সুন্দরম্"। যাহা কার্য্যকরী অর্থাৎ যাহাতে কাজ চলে তাহাই সত্য নহে; যাহা মানব-সমাজের হিতকরী তাহাই শিব বা মঙ্গল নহে; যাহা তৃপ্তিপ্রদ তাহাই সুন্দর নহে। "সত্যম্" "শিবম্" ও "সুন্দরম্" মানুষের কোন প্রতীতির উপর নির্ভর করে না; এগুলি মানব-জীবনের চরম আদর্শ; ইহাদের সত্তা ব্যবহারিক বা অপেক্ষিক নহে; ইহাদের সত্তা পারমার্থিক। আমাদের বুদ্ধি বিষয়ক, নীতিবিষয়ক বা সৌন্দর্য্যবিষয়ক যে কোন আলোচনা করিতে গেলে ইহাদের পারমার্থিক সত্তা মানিতেই হইবে। রিকার্ট্ (Rickert) বলেন যে, এগুলি মানবাত্মার বাহিরে "আদর্শ" রূপেই বিদ্যমান; এই "আদর্শ"ই ক্রমে ক্রমে "সত্যে" পরিণত হইতেছে। "সত্যের" ছায়া "আদর্শ" নহে; "আদর্শের" কায়াই "সত্য"। আদর্শের স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপই সত্য। মুন্ষ্টারবার্গ (Munsterberg) বলেন যে, এই আদর্শগুলির অধিষ্ঠান এক বিরাট্ ইচ্ছাশক্তি (Superindividual will); এই ইচ্ছাশক্তি অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ ও চিরপরিবর্ত্তনশীল লীলার মূল কারণ। আমেরিকার অধ্যাপক রয়েস্ (Josiah Royce) মানব-জীবনের এই তিনটি চরম আদর্শের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ভগবানে

স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবানই "সত্যং শিবং সুন্দরম্"। মুন্‌ষ্টারবার্গের বিরাট ইচ্ছাশক্তিকে সাধারণ ভাষায় ভগবান বলা যায় না।

জার্ম্মানীর ঋষি রুডল্‌ফ অয়্‌কেন্ (Rudolf Eucken) এক উদার বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সাধনবাদ (Activism) প্রচার করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিচার বুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধনা বা গভীর আধ্যাত্মিক কর্ম্ম দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া যখন আমরা আত্মনির্ভর দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইব, তখন বিশ্বের কেন্দ্রে যে বিরাট্ শক্তি নিহিত আছে, তাহার সহিত আমার কোন পার্থক্য থাকিবে না। সেই শক্তির সহিত মিলিত হইয়া নিজ জীবনের সার্থকতা লাভ করিব ও আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টাতে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিব।

ইটালীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্রোচে (Croce) ও জেণ্টাইলও (Gentile) এক নূতন আদর্শবাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব, আপ্তকাম ভগবানে বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি আপ্তকাম হন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির কোন প্রয়োজন হয় না; যদি তাঁহার সকল ইচ্ছারই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগতে কোন সৃষ্টির স্থান থাকে না; সুতরাং তাঁহাদের মতে আত্মাই একমাত্র সত্তা; আত্মা ব্যতিরেকে কোন সত্তা নাই, আত্মাই সকল সত্তার স্রষ্টা। কর্ম্মই ইহার স্বরূপ; ইহার অবিশ্রান্ত কর্ম্মগতি ও সৃষ্টিই একমাত্র সত্য। আত্মার এই অবিরাম গতির কোন আদি নাই, অন্ত নাই, উৎপত্তি নাই, নিবৃত্তি নাই। ইহা প্রতিনিয়তই এক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে ও সে সমস্যার সমাধান করিতেছে। সে সমস্যার সমাধান হইবামাত্রই পুনরায় আর এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে ও পুনরায় তাহার সমাধান করিতেছে। এই নিত্য-নূতন সমস্যা-সমাধানের কোন কালে নিবৃত্ত নাই।

ইহা আত্মার সৃষ্টির অনাদি অনন্ত প্রবাহ। ইহার মূলে সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর নাই বা ইহার অন্তেও সর্ব্বগ্রাসী ভগবান নাই।

আধুনিক প্রতীচ্য জগতের দর্শনের ধারা তত্রত্য যুগ-মানবের প্রকৃতির অনুরূপ। আজকালকার মানুষ ঘটনার আবর্ত্তে প্রতিমুহূর্ত্তেই চলিতেছে, সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত, তাহার চলার মধ্যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই; কোথা হইতে চলা আরম্ভ করিয়াছে তাহার জ্ঞান নাই এবং কেন চলিতেছে তাহারাও কোন ঠিকানা নাই। তাহার চলাই প্রকৃতিগত; চলার আদি-মধ্য-অন্ত, কারণ বা উদ্দেশ্য খোঁজের কোন প্রয়োজন্ নাই। সেইরূপ বর্ত্তমান প্রতীচ্য-দর্শন কেবল অবিশ্রান্ত অব্যাহত গতির দর্শন, স্থিতির দর্শন নহে। বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগ। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ভগবানের একচ্ছত্র শাসনে বিশ্বাস করেন না বা একেবারেই ভগবানে বিশ্বাস করেন না; মাত্র মানুষের অব্যাহত স্বাধীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতায় বিশ্বাস করেন্। প্রতীচ্য জগতের দার্শনিক আজ চিরপূজ্যা বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধেও খড়্গহস্ত; তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির নিম্নস্তরে ইন্দ্রিয়-প্রতীতির উপর নির্ভর করিয়া কাজ-চলা দর্শন গড়িতে চান বা বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চস্তরে প্রজ্ঞা (intuition) নৈতিক অনুভূতি, সৌন্দর্য্যানুভূতি, প্রেম বা ভাবাবেশের উপর নির্ভর করিয়া দর্শনের ভিত্তি-স্থাপন করিতে চান। আজ প্রতীচ্য দার্শনিক সর্ব্বতোভাবে গতানু-গতিকতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বর্ত্তমান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন দর্শন গড়িয়া তুলিতেছেন। তবে সে দর্শনের স্থান বিশ্ব-দর্শনের ইতিহাসে কোথায় হইবে তাহা ভবিষ্যৎ যুগ বিচার করিবে।

মানুষের প্রাণ যখন নীরস হইয়া যায় তখন মানুষ প্রাণহীন নীরসজ্ঞানের শুষ্ক তর্ক বিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডা লইয়াই ব্যস্ত হয়। প্যালেষ্টাইনে (Palas-tine) যখন ফরীশীরা (Pharisees) জ্ঞানের নীরস বাক্-বিতণ্ডায় নিরত থাকিতেন সেই সময়ে ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত যীশু খ্রীষ্ট শুষ্ক-তর্কের

আগুণ প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া দিলেন। সেই প্রেমে সমগ্র প্যালেষ্টাইন ভূমি ডুবিয়া গেল। এই বিশ্বতোমুখী সার্ব্বজনীন উদার অনন্ত প্রেমেই বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালার দর্শন সেই দিন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে যে দিন বাঙ্গালী এই বিশ্বজনীন প্রেমের দর্শন বঙ্গ ভাষায় রচনা করিবে। জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বিত প্রেমের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দর্শনশাস্ত্র জগতে অদ্যাপি গড়িয়া উঠে নাই।

পাশ্চাত্য জগতে ইঙ্গিতে আভাসে কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন। জার্ম্মান দার্শনিক লোট্জে (Lotze) সকল সৃষ্টির মূলে এক অখণ্ড প্রেম-বস্তুকে (Creative love) ধরিয়াছেন ও সকল বস্তুই সেই প্রেম-শক্তির বিকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফরাসী দার্শনিক ব্লঁদেল্ (Blondel) বলেন যে, জগতের মূলে যে চরম সত্তা আছে তাহাকে জানিতে হইলে প্রেম ও আত্মদান প্রয়োজন; প্রেম ও আত্মদান না হইলে বোধশক্তির বিকাশ হয় না; প্রেমই জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়; প্রেমই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য মিলন সংঘটিত করে; অপ্রেম মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করে, মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সত্যকে জানিতে দেয় না। ফরাসী দার্শনিক সেক্রেতাঁ (Secretan) বলেন যে, জগতের মূলে এক চির-বিকাশশীল অনন্ত প্রেমবস্তু আছে; তাহা বিচার-বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিষয় নহে; তাহা প্রেম ও ভাবাবেশ দ্বারা জ্ঞাতব্য। আজকাল অনেকেই এইরূপ প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। তন্মধ্যে আমেরিকার অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস্ (Josiah Royce) এই প্রেমবাদকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্বের মূলে ভগবৎ-প্রেমকে ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান ও মানুষে প্রেমের সম্বন্ধ—ভগবান অনন্ত প্রেমিক; মানুষ তাঁহার প্রেমাস্পদ। মানুষ ভগবানের অনন্তত্বে অভিভূত হইয়া মনে করে আমি থাকি আর না থাকি তাহাতে ভগবানের আসে যায় কি? তাঁর তো অনন্ত সৃষ্টিতে অনন্ত মানব আছে। একটি গেলে

আরও অনন্তকোটী মানবের দ্বারা তাঁহার কাজ চলিবে। সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় আমি কখন্ উঠি, কখন্ ডুবে যাই তাতে অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের আসে যায় কি? রইস্ তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, শিশুর হাতের খেলার পুতুলটি ভেঙ্গে ফেলে যদি তুমি নূতন ভাল পুতুল দাও তবে শিশুটি কি নূতন পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ভাঙ্গা পুতুলের জন্য কাঁদে না? কেন কাঁদে? সে যে তাকে ভালবাসে! যাকে ভালবাসা যায় সে ভাল, কি মন্দ, তার বিচার থাকে না; সে যাহাই হউক আমাদের সেইটি না হলে চলে না, তাহার বিনিময়ে সমস্ত জগতের অতুল সম্পত্তি তুচ্ছ ধূলিকণা। তেমনি ভগবান কেন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি আমাকে ভালবাসেন ব'লে! আমাকে নিয়ে তাঁহার কি হবে? কেন, আমি যে তাঁর প্রেমাস্পদ; আমাকে না হ'লে তাঁহার চলে না; আমার জগতে এমন এক কাজ আছে যা অপর কাহারও দ্বারা হবে না, সে কাজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আমার দ্বারাই হবে, আর কাহারও দ্বারা নয়। রইসের এই প্রেমের বাণী কি খৃষ্টের প্রেমের বাণীর প্রতিধ্বনি নহে? ভগবান্, 'নিখিলরসামৃত' মূর্ত্তি তিনি তাঁহার সৃষ্টজীবকে ভালবাসেন বলিয়া অবতাররূপে এই ধরাধামে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার প্রেম উপলব্ধি করেন, তিনি আমার প্রেমাস্পদ এবং আমিও তাঁহার প্রেমাস্পদ; "তুমি আমার আমি তোমার" উভয়ের এই সম্বন্ধ, তিনি আমাকে চাহেন, আমি তাঁহাকে চাই। যতদিন আমি তাঁহার অনন্ত প্রেমের এক বিন্দুরও আস্বাদন না পাই, ততদিন আমি তাঁহার দিকে না চেয়ে সসীম বিষয়ে আনন্দের সন্ধানে ঘুরে মরি। তিনি আমাকে ভালবাসেন, তাই তিনি প্রজাহিতার্থে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন। আমার অনন্ত প্রেমিক আমার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে প্রেমের ঝুলি কাঁধে নিয়ে আমার পিছনে পিছনে ঘুরেন। নিঠুর আমি, বৃথা নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়া একবারও পিছন ফিরিয়া চাহি না ও আমার চিরপ্রেমিকের অনন্ত প্রেমের এক কণারও প্রতিদান দিই না।

ঐ দেখ, ভগবান মানুষের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে প্রতি মানুষের কাছে প্রেমের ভিখারী হয়ে বল্‌ছেন—"আমার কাছে এস আমি তোমাকে প্রেমের শান্তি সুধা দিব"। এই প্রেমই ভারতের হৃদয়ের সার বস্তু। এ প্রেম কর্ম্মহীন পঙ্গু নহে; এ প্রেম জ্ঞানহীন অন্ধ নহে। জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বিত বিশ্বপ্লাবী প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবাসী, আজ বিরাট্‌ সত্যের নবীন মধুর রূপ দর্শন করে তোমার হৃদয়ের কালিমা দূর কর ও সেই প্রেম-মন্ত্রে ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র জগতকে সঞ্জীবিত কর।

সেনেকা, এপিক্‌টেটাস্‌ প্রভৃতি রাষ্ট্রধর্ম্মের গুরুত্ব তেমন স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা বিশ্বপ্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেন। এই বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব ষ্টয়িক দর্শনের উজ্জ্বলতম রত্ন। প্লেটো ও আরিষ্টটল এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও স্বজাতির প্রতি অন্ধ প্রেম ও বিজাতির প্রতি অসঙ্গত বিদ্বেষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা গ্রীক ভিন্ন আর সকল জাতিকেই বর্ব্বর মনে করিতেন; ষ্টয়িকগণ সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করিতেন যে, সমগ্র মানব জাতি এক, স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষা বিশ্বমানব প্রীতিই শ্রেষ্ঠ। দার্শনিক পৌল তাঁহার পারমার্থিক বিদ্যায় প্রেম-তত্ত্বের বিচারে এক প্রসিদ্ধ ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন—যথা "প্রেমই শ্রেষ্ঠ।" পুনশ্চ, সাধু জন্‌ তাঁহার পত্রে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা বড়ই মধুর, তিনি বলেন "ঈশ্বর প্রেম, আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে থাকেন।" "যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদিগেতে থাকেন, এবং তাঁহার প্রেম আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়।" এই প্রেমময়ের মহাশক্তির উপাসনার ফলেই মানুষে মানুষে মিলন হইবে, সকল দ্বেষ-হিংসা ঘুচিয়া যাইবে, জগতে এক বিরাট্‌ ভ্রাতৃরাজ্য স্থাপিত হইবে। আজ মানুষকে বুঝিতে হইবে আমার অস্তিত্ব কোথায়। আমি ভগবানের সন্তান —মহাশক্তির সন্তান; আমি সসীম হইয়াও অসীম; আমি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকিতে পারি না, আমি সচ্চিদানন্দ প্রতিমূর্ত্তি; আমি

অনন্তপথের যাত্রী ; আমার অনন্ত স্বরূপকে ধরিতে হইবে ; সমগ্র বিশ্বে আমায় বিলাইয়া দিয়া, আমার বিরাট্ আমিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎ আমার গৃহ ; মানবজাতি আমার পরিবার ; সকল মানুষ আমার ভাই"। আজ মানুষকে বর্ণ, জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে এবং মানুষের এই প্রকৃত স্বরূপের উপর নূতন মানব সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মে এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং যাঁহারা প্রকৃত সেবক তাঁহারা উহাতেই অতুল আনন্দ অনুভব করেন। সত্য বটে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষে মানুষে বর্ণগত, জাতিগত, ধর্ম্মগত, অর্থগত, পার্থক্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে ও মানব সমাজে মহা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। আজ মানুষকে সকল অশান্তি দূর করিবার জন্য, সকল পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া মানুষে মানুষে মিলনের সুদৃঢ় ভিত্তি কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং চিরপুরাতন কাটাকাটি মারামারি, সংঘর্ষ সংগ্রামের আঁকাবাঁকা পথ পরিত্যাগ করিয়া গলাগলি ও কোলাকুলির সহজ সুপথ আবিষ্কার করিতে হইবে। আজ মানুষকে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া, যুগযুগান্তরের সঞ্চিত পর্ব্বত প্রমাণ অন্ধ সংস্কারের আবর্জ্জনা রাশি ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। আজ এক মহিয়ষী শক্তিতে মানুষের প্রাণকে উদ্বোধিত, উদ্ভাষিত, ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই শক্তির সাধনার জন্য খৃষ্টের সেই অমৃতময়ী প্রেমের বাণী স্মরণ করিতে হইবে, যে প্রেমের অনন্ত উচ্ছ্বাসে একদিন প্রতীচ্য জগৎ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। সমস্ত মানব-জীবনকে এক অখণ্ড বস্তু ধরিয়া তাহাকে চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মানুষকে আজ ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মজীবন, জাতীয় জীবন, ও অন্তর্জাতীয় জীবনের সকল বিচ্ছেদ দূর করিয়া এবং ভোগ ও ত্যাগ, সংসার ও সন্ন্যাস, গৃহ ও অরণ্যের সমন্বয় করিয়া এক অখণ্ড নবজীবন লাভ করিতে হইবে। আজ মানুষকে বিশ্বসংসারের সারবস্তু

প্রেমকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র বিশ্ব-মানবকে এক প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে হইবে।

আজ প্রাচ্য প্রতীচ্যের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে নানাভাবে মিলিত হইয়াছে। এ মিলন বিধাতার বিধান। প্রাচ্য জগতের পরলোকসর্ব্বস্বত্বায় ও অন্ধবিশ্বাসে আজ ঘোরতর পতন হইয়াছে। প্রাচ্য জগৎ আজ অভাবের তাড়নায়, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও পররাষ্ট্রের অত্যাচারে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়াছে ও প্রতীচ্য জগতের জড়শক্তি ও ভোগ-সাধনের অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেছে। ইহসর্ব্বস্ব প্রতীচ্য জগৎ আজ জড়শক্তির উন্মাদনায় প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাচ্য জগতের বুকে চাপিয়া রক্ত শোষণ করিতেছে ও নিজেদের মধ্যে দিন দিন সন্দেহ, দ্বেষ-হিংসার আগুণ জ্বালাইয়া কাটাকাটি মারামারি করিতেছে। আজ জগতে কোথাও শান্তি নাই। অশান্তি-দাবানলে সমস্ত পৃথিবী হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। অশান্তি-বিষ জগতের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জগৎকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রতীচ্য জগৎ আজ আর খৃষ্টের মধুর প্রেমের উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না—তাই এই অশান্তির দাবানল। এ অশান্তির আগুণ কিসে নিবিবে? উদার বিশ্বজনীন প্রেমে। খৃষ্ট প্রেমের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রেমের অমৃত কুণ্ড লইয়া আপামর নির্ব্বিশেষে প্রেমামৃত পান করাইয়া-ছিলেন। এমন প্রেমাবতার জগতে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার প্রেম-প্রবণ প্রাণ মানবের দুঃখ শোক দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিত। মানুষের শুষ্ক হৃদয় এই খৃষ্ট প্রেমের দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে; প্রেম-মন্ত্রে মনুষ্য-জগতের শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে, প্রেমের বন্যায় বিশ্বজগৎ ডুবাইয়া দিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এই প্রেমের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং এই প্রেমের উপর এক অন্তর্জাতীয় মহাসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জগতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে।

আজ সমগ্র জগতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর (Liberty, Equality, Fraternity) জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। গায়ের জোরে, তীক্ষ্ণ অসির ধারে, কামানের মুখে, বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা সব এক করিয়া দিতে চায়। কিন্তু পাশবিক শক্তি দ্বারা অপ্রেম দ্বারা, কি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব? মানুষে-মানুষে হৃদয়ের ঐক্য, অন্তরের মিলন না হইলে বাহিরের ঐক্য কয় দিন টিঁকিবে? মানুষের স্বার্থপর স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে এরূপ অসাধ্য-সাধন কিরূপে সম্ভব? মানুষকে আজ সকল অধিকার ভুলিয়া গিয়া সেবাব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য বিশ্বপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত বণিকের ধন, শ্রমিকের শ্রম, বিদ্বানের বিদ্যা, জ্ঞানীর জ্ঞান, সন্ন্যাসীর তপস্যা, মানুষের যথা-সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিতে হইবে। হৃদয়ের বৈষম্য দ্বারা জগতে সাম্য স্থাপন হইবে না, অপ্রেম দ্বারা মৈত্রী বা প্রেমের রাজ্য স্থাপন হইবে না, প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া স্বাতন্ত্র্য, স্বরাজ্য, স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিবে না। বিশ্বমানবের মধ্যে নিজের বিরাট্ আত্মাকে চিনিয়া লও, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন কর, ও তোমার দানবী-প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া সেই বিরাট্ আত্মার অধীনতা স্বীকার কর। তবে নিজে স্বাধীন হইয়া জগৎকে স্বাধীন করিতে পারিবে। খৃষ্টের প্রেম বৈজয়ন্তিকার নিম্নে বসিয়া বিশ্বজগতের সারবস্তু প্রেমকে হৃদয়ে বরণ কর ও প্রেমবিগলিত হইয়া বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রীর রাজ্য স্থাপন কর।

প্রতীচ্য জগতের জড়বাদ দ্বারা জগতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। বর্ত্তমান মানব-সমাজে এই মহা সমস্যার সমাধানের জন্য এসিয়ার শান্তিবাণী,—খৃষ্টের প্রেমামৃতবাণী শুনিতে হইবে। সে অমৃতবাণী এই, মানুষে-মানুষে ভেদ নাই, সকল মানুষের প্রাণে সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিরাজ করিতেছেন, প্রতি নর নারীই সেই সচ্চিদানন্দের প্রতিমূর্ত্তি, মানুষের প্রতি কর্ম্মই সাধনা, প্রতি জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, প্রতি প্রেমসম্বন্ধই ভগবৎ প্রেমের বিকাশ। এই প্রেমামৃত তত্ত্বের ভিতর

দিয়াই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহামিলন সংঘটিত হইবে। এই মহামিলনের ফলে জগতে এক নূতন দর্শনের উদ্ভব হইবে,—যাহাতে অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের, পারলৌকিক জীবনের সহিত ঐহিক জীবনের, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত অতীন্দ্রিয়ানুভূতির, পারমার্থিক সত্তার সহিত ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক সত্তার মোক্ষসাধনের সহিত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে এবং এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি মানব-জীবনের প্রতি জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমে, মানব-সমাজের প্রতি অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে ও প্রতি নর-নারীকে এই মহা প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ধরাকে অমর করিবে, পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে।

আমার লিখিত পূর্ব্বোক্তির এই অংশটী সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক ও "Comparative Studies in Vedantism" গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ; পি, এইচ, ডি, মহোদয় এবং হাজারিবাগ্ নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন বি, এ, বি, টি, মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া দিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীরমানাথ পালিত।

হাওড়া,
৪ঠা আষাঢ়,
১৩৩৫ সাল।

মুখ বন্ধ

এতদিন পরে ভগবৎ কৃপায় বহুল ঝঞ্ঝাট, ঘাত প্রতিঘাত, বিপদ আপদ, অতিক্রম করিয়া "হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন" নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইল। আমি দার্শনিক পণ্ডিত নহি, কিম্বা প্রথিতনামা পণ্ডিতের সমকক্ষ নহি, এবং দর্শন শাস্ত্রে যে বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি এমন কথা উচ্চারণ করিতে আমার হৃদ্‌কম্প হয়, তবে যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি কেবল ঈশ্বরেরই কৃপা মাত্র। এই পুস্তক অপর কোন পুস্তক বা পুস্তকাংশ অবলম্বনে লিখিত নহে, এবং এই পুস্তক-লেখককে কোন বিশেষ দার্শনিকের শিষ্যও বলা যাইতে পারে না; তবে বলা আবশ্যক যে বর্ত্তমান দার্শনিক সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে কেয়ার্ড ও দার্শনিক ধুরন্ধর মহামতি হেগেলিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত এই পুস্তক লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতি এবং এই সম্প্রদায়ের নেতাদিগের নিকট এই পুস্তক-লেখক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে যে যে অংশের সহিত এই সম্প্রদায়ের লেখকদিগের ব্যাখ্যার অল্পাধিক সাদৃশ্য স্মরণ হইয়াছে আমি কেবল নিম্নে তাঁহাদের পুস্তকের নাম মাত্র প্রকাশ করিয়াছি, বিশেষরূপে স্থান উদ্ধৃত করি নাই। এইরূপ অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থকারের পুস্তকও উল্লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান হইতে এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। যে যে পাঠক এই পুস্তকে ব্যাখ্যাত সত্য সমূহ আরো গভীরভাবে আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। আমি যখন মুর্শিদাবাদ জেলায় লণ্ডন মিশনারি সোসাইটী

অধীনে সুসমাচার প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম সেই সময় স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের একজন সুযোগ্য পুরাতন ছাত্রের সহিত আমার আলাপাদি হয়, তিনি নদীপুরে থাকিতেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল। সেন মহাশয় একদিন আমাকে বন্ধুর ন্যায় পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন যে "আপনার কিছু কিছু দর্শনশাস্ত্র পড়া ভাল।" আবার মধ্যে মধ্যে ভক্তিভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য পল্ বিশ্বাস মহাশয়ও আমাকে ঐরূপ পরামর্শ দিতেন। তিনি আবার কোন কোন সময়ে খ্রীষ্টীয়-দর্শনের কোন কোন অঙ্গ মৌখিক ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। দুঃখের বিষয় বিশ্বাস মহাশয় আমার এই অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমের ফল স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না; কুটীল কালের কি বক্র গতি! গ্রন্থখানি জন সাধারণ সমীপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আচার্য্য বিশ্বাস মহাশয় শান্তিতে শান্তি-নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

আমি আমার সকল কথাই একদিন সেন্ মহাশয়কে জানাই, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে ব্যাকরণ ও কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনের কতিপয় সূত্র (সংজ্ঞা) ও তৎসহ ব্যাখ্যা বিশেষ যত্নের সহিত পড়াইয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার নিকট ন্যূনাধিক চারি বৎসর কাল আমার অতিবাহিত হয়। সেই সময় হইতে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আমার একটা আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে ও পড়িবার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তৎকালে তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি নাই, কারণ চারি বৎসর গতে যখন আমার কার্য্যকাল শেষ হইল তখন পড়িবার সুবিধাও শেষ হইল; আমি উক্ত সোসাইটির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অন্নজলের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করি। এই কালের মধ্যে বড় বেশী মনোনিবেশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তথা হইতে সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া বৈষয়িক কার্য্যে পুনঃ প্রবেশ করিবার পর হইতে দর্শন শাস্ত্র সংক্রান্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষার নানাবিধ গবেষণা পূর্ণ উপদেশ, এবং গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত দার্শনিক পণ্ডিতদিগের কৃপায় আমার পাঠের পক্ষে

যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়াছিল। এইরূপে প্রায় এগার বৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের রচিত ব্যাখ্যা ও ইতিহাস আলোচনা করিতে অবসর ঘটে; এই কালে আমি বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য প্রিন্‌সিপ্যাল্ (Principal) পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয় এবং বিচক্ষণ দার্শনিক পণ্ডিত ও গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়, এই দুই জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগের নিকট ঋণী, এবং তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে একেবারে অসমর্থ। তত্ত্বভূষণ মহাশয় দর্শন শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় সুগম করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদ, Theism of the Upanishads, Krishna and *Gita*, গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য ও ব্যাখ্যার অনেক বিষয় যথাযথ গ্রহণ করিয়াছি এবং বেদান্তবাগীশোপাধিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিদ্যাভূষণ তত্ত্ববারিধি, এম, এ, মহাশয় প্রণীত 'ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি ও তাঁহা-দিগের ব্যাখ্যা আমি মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি এবং এই গ্রন্থের যে যে স্থলে অপরাপর গ্রন্থ হইতে বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সেই পৃষ্ঠার সংখ্যা ও গ্রন্থের নাম এস্থলে লিখিয়া দিলাম। পাঠক ইচ্ছা করিলে সেগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে সেগুলি আমার কৃত ব্যাখ্যা, বস্তুতঃ তাহা আমার ব্যাখ্যা নহে, আমি তাঁহাদিগের ঐ ব্যাখ্যা মূল্যবান ও যথার্থ বলিয়া আমার গ্রন্থে প্রমাণের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। এবং সেই সকল ব্যাখ্যার সহিত আমার কোন বিরোধ ঘটে নাই।

১ পৃষ্ঠা ফেলোসিপের লেক্‌চার পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত দেবশর্ম্মা। ৮১ পৃষ্ঠা সাংখ্যদর্শন মৃত উঃ চঃ বটব্যাল। ৯৫—১১৩, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, এবং ১৩২—১৩৫ পৃঃ ও ১৮০ পৃঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কৃত "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন।" ১৬৮ ও ১৭৩ পৃঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত

"ছান্দোগ্যোপনিষদ ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি, ও বেদান্ত গ্রন্থ রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত" ও ১৮৯ ও ১৯৭ পৃষ্ঠা পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত বেদান্ত গ্রন্থ, রাজা রাম মোহন রায়কর্ত্তৃক উদ্ভাষিত ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা (২য় সংস্করণ) ২৭০, ২৮৪ পৃঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ৩৩৪ পৃঃ ফুট নোট পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত পৃথিবীর ইতিহাস। ৩৬০, ৪১১, ৪১৬—৪২২ পৃঃ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম খণ্ডের দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ক ভূমিকা। ৪২৩—৪২৪ পৃঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী কৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন গ্রন্থ। গ্রন্থের কোন কোন স্থলে কোটেশন চিহ্ন বেশ পরিষ্কার উঠিয়াছে, কোন কোন স্থলে অস্পষ্ট হইয়াছে, আবার কোথাও বা একেবারেই উঠে নাই। ইহা কেবল আমার চক্ষুর ক্ষীণতা প্রযুক্ত ঘটিয়াছে। আশা করি পাঠক আমার এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

স্বর্গীয় রামচরণ বসু এম, এ, মহাশয় "হিন্দুদর্শন" নামক একখানি ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, এখন আর তাহার প্রচলন দেখা যায় না। বহু বৎসর গত হইল বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে "ভারতীয়ষড়দর্শন" নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ স্বর্গীয় আচার্য্য ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (Second Professor of Bishop's College) বঙ্গভাষায় লিখিয়া যান, সে আজ প্রায় ন্যূনাধিক ৬০।৭০ বৎসরের কথা; এবং স্বর্গীয় মহাত্মা আচার্য্য কেরি সাহেব কপিল প্রণীত সাঙ্খ্যসূত্র বিজ্ঞানেশ্বরাচার্য্য কৃত সাঙ্খ্য প্রবচন ভাষ্য সহিত মুদ্রিত করেন। দুঃখের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঐ দুইখানি গ্রন্থের একটিও পুনরুদ্ধার করিতে পারি নাই এবং অদ্যাপি আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই; কিংবা কাহারও নিকট হইতে সাহায্য স্বরূপে দেখিবার জন্য পাই নাই। আমাদিগের খ্রীষ্টীয় সাহিত্য-সভার সভ্যদিগের উচিত ছিল যে সেই সকল সদ্বস্তু যত্নের সহিত রক্ষা করা, কিন্তু তাঁহারা কেহই সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়া খ্রীষ্টীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে উহা

এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়। উক্ত সভার সভ্যেরাই বিশেষতঃ ঐ সভার সম্পাদক মহাশয়ের অমনোযোগীতায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে যেন আর ঐরূপ দুর্দ্দশা না হয় তজ্জন্য খ্রীষ্টীয়ান সমাজের সতর্ক হওয়া উচিত।

বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। (অবশ্য যে সকল ছাত্রগণ সংস্কৃত টোল বা কলেজ ক্লাশে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের কথা এস্থলে বলিতেছি না) হয়'ত তাঁহারা সমাজে চর্চ্চা করিবার কোন আবশ্যকতাই অনুভব করেন না; আবার অনেকস্থলে আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে উপদেশ বচনে আত্মার উন্নতিসূচক বাণী খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা উচ্চাঙ্গের কথা বলিলে সাধারণতঃ খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এইত আমাদের সমাজের অবস্থা। হিন্দু সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গভাষায় ও ইংরাজি ভাষায় দর্শনের অনেক সুপাঠ্য গ্রন্থাদি আছে, কিন্তু বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের অভাব নিবারণের জন্য এবং ভারতীয় দর্শনকে সহজ সুগম করিবার জন্য ও খ্রীষ্টীয় দর্শনের সহিত উহার কতখানি সামঞ্জস্য আছে এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিষয় ব্যাপারে মিল নাই ইত্যাদি বিষয়গুলি বঙ্গভাষায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় একটা অভাব দীর্ঘকাল হইতে আমি দেখিয়া আসিতেছি। সেই অভাব নিবারণের জন্য "হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শনের" সৃষ্টি হইয়াছে। আমি যে ইহাতে একেবারে দোষ শূন্য হইতে পারিয়াছি এরূপ কথা বলিতে আমার সাহসে কুলায় না। ভাষা যাহাতে গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট না হইয়া সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ হয় সে দিকেও চেষ্টার ক্রটি হয় নাই।

পাঠকবর্গের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করুন, ইহা কোন উপন্যাস নহে যে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সকলকে আদ্যোপান্ত দেখিতে হইবে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মাত্রেই প্রায় শুষ্ক, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি এ গ্রন্থদ্বয় তত নীরস নহে। অন্যের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ শাস্ত্রও যুক্তিসঙ্গত বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত ও

ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে বিশেষ বিরক্তি উপস্থিত না হইতে পারে। আমাদের অনেক সময়ই বৃথা চিন্তায় বা বিফল আমোদে অপব্যয়িত হইয়া যায়, একদিনের সেই সময়টুকু না হয় ইহাতেই ব্যয়িত করিলেন। দেশের মঙ্গল হউক, সাহিত্যের উন্নতি ও আদর বাড়ুক, অসাম্প্রদায়িক ভাব বিস্তৃত হউক, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হউক, ও সত্য চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হউক এই আমার প্রার্থনা। যদি এই প্রার্থনা ও উদ্দেশ্য সফল হয় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। পাঠকবর্গ যদি এইরূপ উপকার প্রাপ্ত হন তবে আমার শ্রম বিফল হইবে না, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহা কোন ইতিহাস কি উপন্যাস নহে; চিন্তাশীল পাঠক স্থির ও বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক নূতন ও সুন্দর সুন্দর বিষয় ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন এমন আশা করি। ভাগবতে "রাধার নাম" মাত্র নাই, উহা ভুলক্রমে ২৫ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ পংক্তিতে মুদ্রিত হইয়াছে।

মৎ প্রণীত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে যে স্থলে সুসমাচারের সহিত উপনিষদের ঋষিবাক্যের ঐক্য আছে আমি সেই সকল সূত্র অবিকল রাখিয়াছি ও সেই সকল শ্লোকের যথাযথ বঙ্গানুবাদও তৎসঙ্গে দিয়াছি; কোন খৃষ্টপন্থি পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি, এরূপ ঋষিবাক্য আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাগণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করেন তাঁহারা যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হন। আমাদের সমাজে উপযুক্ত ভাবে সাহিত্যের চর্চ্চা না থাকায় অনেকে হয়ত শব্দার্থ বিরূপ করিয়া ফেলিবেন, তাঁহাদিগের সহজ বোধের জন্য স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দার্থ লিখিয়া দিয়াছি, তদ্দ্বারা পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। আমি অনেক স্থলে "ভাববাদী" শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মবাদী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি এবং তাহার একটা ব্যাখ্যাও আছে, এবং "শিব" শব্দে শিবলিঙ্গ বুঝিলে চলিবে না, উহার অর্থ পরম, মঙ্গল, সুন্দর ও সৌন্দর্য্য, বুঝিতে

হইবে। এতদ্ব্যতীত পাঠকের বোধগম্যের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে আবশ্যক বোধে ও সাহায্য স্বরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ফুটনোট দেওয়া হইয়াছে।

এই কয়েকবৎসর হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা লেখকের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে "প্রচলিত মায়াবাদী অদ্বৈতবাদ যে বেদান্তের প্রকৃত মত নহে এবং এই মত যে ভ্রান্ত তাহা বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি"। অবশ্য বেদান্তের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং আমি তাহা করি নাই; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে "পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদের" বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তৎসহ দার্শনিকদিগের মত প্রকাশ করিয়াছি। এ দেশের খৃষ্টপন্থিগণ "পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদের" ধারণাই করিতে পারেন না এবং ভুল বুঝেন, আমি তাহাদিগের ভুল ধারণা সংশোধন করিয়া দিয়াছি। এবং মায়াবাদের দার্শনিক ভ্রম পরিষ্কাররূপে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত এবং অন্যদেশীয় গ্রন্থনিচয় অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া আর্য্য-ঋষি-মনীষা প্রসূত ও অন্যান্য শাস্ত্রস্থ রত্নরাজি খ্রীষ্টের শিক্ষার পার্শ্বে স্থাপন করিয়া দেখিলে সেগুলি অশ্রদ্ধেয় নহে, এবং সেইগুলির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম জগদালোক খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বিরোধী নহে। যাঁহারা উদার স্বভাবের লোক তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন। সত্য লইয়া মনুষ্যের মধ্যে কোন বাদ-বিসংবাদ হয় না, যাহা সত্য নহে, তাহা লইয়াই যত বিরোধ। ম্যাক্সমূলার, ওলডেন্‌বর্গ, রিস্‌ডেভিডস্‌, মনিয়ার-উইলিয়মস্‌, ডুসেন্‌, ম্যাক্‌ডনাল্ড, ও মিওর প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দকে প্রাচীন ধর্ম্মগুলির ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায়; তদ্রূপ আমিও প্রাচ্য আলোকে খ্রীষ্টধর্ম্মের নূতন মহিমা প্রকাশ, এবং হিন্দু ও খৃষ্টপন্থিদিগের বহুকাল সঞ্চিত পারস্পারিক বিদ্বেষ ও ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রয়াসী। আমরা খৃষ্টপন্থি হইলেও সাম্প্রদায়িক মতবাদ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ইহা দ্বারা আমরা উদারতার পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়াছি; যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা-

মাল্লাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া আমরা দুর্ব্বল ও অন্ধ হইয়াছি। ঐ সকল মতবাদের আবর্জ্জনা যত শীঘ্র হয় দগ্ধ করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করিতে হইবে।

এতদিন পরে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর চৈতন্যোদয় হইয়াছে, তাঁহাদেরও এবার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। যিরূশালেমের কাউন্সিল ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের শিক্ষকরূপে থাকিয়া কেবল তাঁহাদিগের কাছে ধর্ম্মের ডাক ডাকিয়াছি, এখন আর ধর্ম্মের কাহিনী বলিলে চলিবে না, কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম হইতে যে যে সদ্বস্তু পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি তাহার অংশ ভাগ আমাদিগকে লইতে হইবে। এত খাঁটি কথা। আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সি, আই, ই, মহোদয়, তাঁহার উদার হৃদয়ের ঐরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া সকল শ্রেণী লোকের নিকট হইতে ভক্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মবিচারে হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতার ভার পোষণ করেন নাই, বরং যাহা খাঁটি সত্য তাহাই তিনি সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রকাশ করিয়া সত্যের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল খৃষ্টপন্থী তাঁহার কৃত সূক্ষ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পায় নাই, এবং যাঁহারা তাঁহার কৃত গ্রন্থ ও লেখনীর মধ্যে উত্তমরূপে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, কেবল তাঁহারাই নানাদিক হইতে কোলাহল করেন। এখন আর ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করা নিরর্থক মাত্র।

সাধু ক্যাথারিন, সুশো, টিরিস, ম্যাডাম্ গাঁওন, ইভিলিন্ আণ্ডারহিল, ডিন্ইঞ্জে, কি স্পিনোজার শেষকথাগুলি শুধু পড়িলে চলিবে না, শুধু বুদ্ধির সাহায্যে ইহার মর্ম্মকথা মিলিবে না, হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগ ও ইন্দ্রিয় গ্রামের আকুল 'আলাপ ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে। যেখানে প্রেমের প্রথম প্রস্রবণ তোমাকে সেখানে ছুটিয়া যাইতে হইবে, তবেই তোমার ভক্তিমাখা জীবন সিদ্ধ হইবে, সেই ভাবোন্মাদনার প্রত্যেক

স্নায়ুনর্ত্তনটি অনুভব করিতে হইবে, এই ভাবোন্মাদকে খ্রীষ্ট বলিয়াছেন প্রেম.—ইহাই হইল গুণ গ্রাহিতা খ্রীষ্টীয় জীবন। প্রেম—মানুষের ভোগস্পৃহা যতটা মাধুর্য্য কল্পনা করিতে পারে তাহা অপেক্ষাও এই প্রেম মধুর। খৃষ্টপন্থি এইবার বুঝুক যে গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করিলে বিশ্ব প্রেমের পরিচয় সে কখনই দিতে পারিবে না। এই ৩৬৫ রকমের ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদই আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া উচ্চ জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে না, আমাদের জীবনগতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। মতবাদ লইয়া সংঘর্ষণ, রক্তপাত, ও মন কষাকসি আমাদের মধ্যে নিয়তই চলিতেছে। ভক্তের কাছে জাতিভেদ নাই, ভক্ত সাম্প্রদায়িক গণ্ডী চাহে না। ভক্তকে গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখিলে আমাদের ধর্ম্ম-যাজকগণ বড়ই বিরূপ হন, ও তজ্জন্য অন্য ব্যবস্থা করেন—তাই আমাদের হৃদয় এত দুর্ব্বল, আমরা এত নিস্তেজ জীবন যাপন করিতেছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িকতার কোন মূল্য নাই, উহার ভিত্তি কেবল কতিপয় মানুষের দ্বারা ও অর্থ সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। ঐ ভিত্তিগুলি আবার "Traditional Christian Doctrine" নামে বহুযুগ হইতে খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে নানা অবয়ব ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারতভূমে "The Gnostic Christology" এবং "Traditional Christian Doctrine" আর আদৌ চলিবে না। "Defects of Traditional Doctrine" দ্বারা আমাদের সমূহ ক্ষতি ও বিশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। উহা লইয়া কামড়া কামড়ি করিলে আর চলিবে না। ভারতের দৃষ্টিতে উহা ঘৃণার্হ, যাহা খাটি সত্য ও সর্ব্ববাদিসম্মত এখন কেবল তাহাই দেখাইতে হইবে। ইউরোপ খণ্ডে Liberal Protestant School সমূহ আর উহা মানিয়া লইতেছে না। আমরা এখনও পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছি না, তবে আর "মনুষ্য পুত্রকে" (খ্রীষ্টকে) চিনিব কি প্রকারে? এইত খ্রীষ্ট শিষ্যের দুর্দ্দশা! আমাদের যতকিছু দান সব উপভোগ কর,

পরকে আপন কর, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করাইয়া দাও, কারণ যাহা কিছু মিলনে সাহায্য করে তাহাই কল্যাণকর। আপন সুখ অপরের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ কর, পূর্ণজ্ঞানে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া যাও। যে জন গণ্ডী অতিক্রম করিতে শিখিয়াছে সেই কেবল ইহা দেখাইতে পারিবে। ভক্ত সাধকের কাছে, প্রেমিকের কাছে, অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তবস্তুই সত্যবস্তু এবং তাহা বৈশিষ্ট্য গুণসম্পন্ন কাল্পনিক নির্ব্বিশেষতত্ত্ব নয়; আমি ইহা প্রথম খণ্ডে শেষ অধ্যায়ের মধ্যে পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রভু ঠিক কথা বলিয়া গিয়াছেন "তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি; কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।" এই নির্ম্মল ও সিদ্ধপ্রেমের ভূমিতে দাঁড়াইয়া খৃষ্টপন্থীকে এক নূতন প্রেমের দর্শন গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা না হওযা পর্য্যন্ত জগৎ জয়ের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র; খৃষ্টোক্তি ঐ মধুর বাণীর মধ্যে কৌশল, কর্ত্তৃত্ব, আধিপত্য করা খাটিবে না। এবং খৃষ্ট ধর্ম্মকে রাজ-নীতির ছাঁচে ঢালিয়া নব নব ব্যাখ্যা দিলে সব নিষ্ফল হইবে এবং ভারত তাহা মানিবে না।

"The Mystic Way" গ্রন্থের লেখক আণ্ডারহিল ২০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে প্রেমের এই কথা বলিয়াছেন "I am God, says Love; for Love is God and God is Love. And this soul is God by condition of Love." (The Mirror of Simple Souls) পুনশ্চ ঐ গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠায় প্রেমতত্ত্বের আরও একটু পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—"Every moment the voice of Love is coming from left and right," says the

Suffi "'Tis Love and the lover that live to all eternity; set not thy heart on aught else; 'tis only borrowed." Jelaluddin, Divan (Nicholson's Trans., P. P. 33, 151.) "They come with their laws and their Codes to bind me fast," says the Indian mystic, echoing the Pauline Vindication of the supremacy of 'faith' over 'works,' "but I evade them ever; for I am only waiting for Love to give myself up at last into his hands" (Sir R. N. Tagore, Gitanjali, 17.) বহুযুগ অতীত হইল সাধু যোহন তাঁহার পত্রে ঠিক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন—"যে প্রেম করে সে ঈশ্বর হইতে জাত, এবং ঈশ্বরকে জানে। যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম"। সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া এইরূপ পবিত্র প্রেমপূর্ণ জীবন ভারতবাসী দেখিতে চাহে। "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবন রহস্যের মীমাংসার মধ্যে মহা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক ও বৌদ্ধ মনিষীবৃন্দ বহু গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবাত্মা যে পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়, সেই পরমাত্মার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জগতের সাধকবৃন্দ তাঁহাদিগের কঠোর সাধনামার্গের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবাত্মা যে পরমাত্মার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই পরমাত্মা মানবাত্মার প্রেমময় পিতা যিনি তাঁহার দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য স্নেহভরে প্রতি নিয়ত আহ্বান করিতেছেন, এবং যে মিলনের মহাসিন্ধুতে মানবাত্মা মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, সেই মিলন যে সত্ত্বার মিলন, তাহা নহে, কিন্তু তাহা মন ও হৃদয়ের মহামিলন।

খ্রীষ্টধর্ম্মে ইহাই মাধুর্য্যমূলক প্রেম, এই প্রেমে সাধক, সাধিকা ডুবিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দর্শনের প্রধান অঙ্গ প্রেম,—যাহাকে "সিদ্ধির যোগবন্ধন" বলে। যীশুখ্রীষ্টের নাম পূর্ণ প্রেম। এই সত্যের প্রতিরোধ করিতে যাওয়া আর ধর্ম্ম-

বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া ফেলা একই কথা। "মাঙ্গলিক সমাচারে" বর্ণিত খ্রীষ্টের এই মধুর বাণীর পার্শ্বে বৃহদারণ্যকোপনিষদের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টান্তটী লইয়া যাও, দেখিবে যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যাগমনে ইচ্ছুক হইয়া মৈত্রেয়ীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে চিত্ত আপনা হইতে ভগবৎ প্রেমরসে আপ্লুত হয়। ঋষি সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, যাঁহারা সেগুলি অবহেলা করেন তাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত নয় এবং বলিতে হইবে যে তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় নাই। ভারত ঐরূপ প্রেমের পরিচয় ও উদাহরণ দেখিতে চাহে।

সুখের বিষয়, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন এই মৃতপ্রায় সমাজ এখন কিছু কিছু জাগিতে সুরু করিয়াছে, এবং অনেক বিষয়ের আদর ও যত্ন করিতে শিখিয়াছে ইহা একটা শুভলক্ষণ বটে; যাঁহাদিগের বেশ আগ্রহ ও যত্ন আছে এবং লেখনী ধারণ করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা সমাজ হইতে কিম্বা খ্রীষ্টীয়-প্রচার সমিতি হইতে কোন প্রকার উৎসাহ বা সাহায্য পান না। ইহাতে আমাদের সমাজের অনেক সুন্দর বিষয় ম্লান ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যদি আমাদিগের সমাজপতিগণ খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় আসিয়া সাহিত্য ভাণ্ডারে স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কে আর আমাদিগের শিক্ষিত যুবকদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবেন? কে আর তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন? কে আর সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন? অনেক কারণে আমাদিগের সাহিত্যের অধোগতি ঘটিতেছে।

যাঁহাদিগের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি আছে এবং যাঁহারা ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন, এই গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ আশা করা যায়। ফলতঃ এই গ্রন্থ সংলগ্ন বিষয় সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই; অধিক কি স্থানে স্থানে ভাষার অপকৃষ্টতাও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু

এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, সকলেই দৃষ্টিমাত্রে ইহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইবেন। যেহেতু দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি দুরূহ ও সুকঠিন, অধ্যয়ন করিলেও উহাতে সকলের ব্যুৎপত্তি জন্মে না। তবে এইমাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই খণ্ডদ্বয় আদ্যন্ত পাঠ করিলে স্থূলরূপে দর্শন শাস্ত্রের অনেক তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। এমন কি আমাদের মধ্যে যাহারা অদার্শনিক আছেন তাঁহারা ইহার স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন; অনেকদিন ধরিয়া লিখিত বলিয়া স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, যথা—কেয়ার্ড ভ্রাতৃদ্বয় প্রণীত গ্রন্থ সমূহ, হেগল প্রণীত ধর্ম্মদর্শনের ইংরাজি অনুবাদ, A. M. Fairbairn প্রণীত The Philosophy of the Christian Religion, George Galloway কৃত The Philosophy of Religion, W. N. Clarke রচিত The Christian Doctrine of God, Pringle Pattison প্রণীত The Idea of God in the Light of Recent Philosophy, W. R. Matthews রচিত Studies in Christian Philosphy, H. R. Mackintosh প্রণীত The Person of Jesus Christ, S. N. Das Gupta রচিত A History of Indian Philosophy, J. S. Johnston কৃত The Philosophy of the Fourth Gospel, পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ প্রণীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, (তৃতীয় সংস্করণ), কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ও ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত পৃথিবীর ইতিহাস, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক কথাই এই পুস্তকদ্বয়ে সাহায্য স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থকারগণের নাম অবশ্য সব জায়গায় করা হয় নাই, তাহা সম্ভবও নহে।

এই সাহায্যের জন্য আমার কৃতজ্ঞতা বোধ যে কত গভীর তাহা আমি কথায় প্রকাশ করিতে পারিনা। আমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ঋণ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াও একথা বলিতে বাধ্য যে উপনিষদই অনেক বিষয় আমাকে সাহায্য প্রদান করিয়াছে। উপনিষদের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা অশ্রদ্ধা করা কোন অংশে আমাদিগের বিধেয় নহে। উদাহরণ স্বরূপে "বৃহদারণ্যক"। উপনিষদের কথা বলা যাইতে পারে। "ইহাতে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে, ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; এবং ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম আকার দেখিতে হইলে "ছান্দোগ্য" ও "বৃহদারণ্যক" অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক। পুনশ্চ খ্রীষ্ট তত্ত্ব প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মার্ক কথিত মাঙ্গলিক" ভূমিকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও প্রণিধান যোগ্য। "ভারতের ঋষিদের ভাব অন্য প্রকার, তাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির মূল সত্ত্বার সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ-সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন; যিহুদী ব্রহ্মবাদীগণ প্রীতিকে সহায়রূপ গ্রহণ এবং শাস্ত্রবাক্য যথাযথ পালন করিয়া যে সমুন্নত ভাবসম্পদ লাভ করিতেন তাহা অকুতোভয়ে জগতের নিকট প্রচার করিতে কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তাঁহারা কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা প্রাণপাত করিয়াও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেন। যাঁহারা বাইবেলের পুরাতন ধর্ম্ম-নিয়ম অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা এ বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। তাই বলিতেছিলাম, হোমাগ্নি-উজ্জ্বল তপোবনের সুগভীর বেদগান ভারতের বিরাট আকাশে অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইলেও সামাজিক পাপ ও সর্ব্ববিধ স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে যে বজ্রবাণী প্যালেষ্টাইন দেশের গগন বিদীর্ণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছিল তাহার তুলনা জগতের অন্য কোথাও অধিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ভারতের ও যিহুদা দেশের সাধক শ্রেণী

যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই মহিমা প্রচার করিতেন তাহা জ্ঞানীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। উপনিষদে দেখিতে পাই যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা পরিকীর্ত্তিত করিতেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলা হইত"। ব্রহ্মবাদী শব্দার্থে কোন অসংলগ্ন বিষয় নাই। আমাদের সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চা অধিক পরিমাণে না থাকায় প্রকৃত অর্থ অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। "দেব" অর্থে যিনি সর্ব্বোচ্চে আসীন, যিনি স্বর্গে থাকেন, অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝিতে হইবে। এরূপ প্রমাণ "কেনোপনিষদে" প্রথম শ্লোকে আছে। আমি কেবল ভাষার দিক হইতে সন্দেহ নিবারণের জন্য এস্থলে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়? ইহা লইয়া মানুষ অনেক ভাবিয়াছে, ভাবিয়া কূল পাইয়াছে কিনা দেখা যাউক। "আবার পাঠক ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে ইহাতে অনেক বিষয় আছে যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না"। উপনিষদকার প্রথমেই গাহিলেন—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"—তাঁহাকে পাইতে চাও, আদৌ তাঁহাকে জানা যাইতে পারে কিনা তাহাই সন্দেহ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন,—"তাঁহাকে ত জানা যায়ই না, কখনও জানা যাইতে পারে না; তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না"। কথা শুনিয়া পাঠকের মনে নিতান্তই ক্ষোভ হইবে, সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দকে, সেই অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য মনন্ত বাহুং শশি সূর্য্য নেত্রং তাঁহাকে পাইব না? যে যাহা বলুক, অজ্ঞেয়বাদীর মুখে ছাই পড়ুক, এ কথা বিশ্বাস কিছুতেই করিব না। অজ্ঞেয়বাদের সূত্রপাত ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়—ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত—"কো অদ্ধা বেদ ক ইব প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অবার্গ দেবা অস্ত বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা

দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ"। "কেই বা জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও জানিতে না পারেন।" ইহার প্রধান কারণ এই যে এই উপনিষদ একটি বৃহৎ "ব্রাহ্মণের" অন্তর্গত। "ব্রাহ্মণের" অন্তর্গত হওয়াতেই ইহাতে এমন অনেক বিষয় প্রবেশ করিয়াছে যাহার প্রকৃত স্থান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। প্রতিভা এবং অন্তদৃষ্টি সম্বন্ধে ঋষিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অতি গভীর চিন্তাশীল, তাঁহারা যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতেও সেই সকল বিষয়ের বিচার চলিতেছে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এই সকল চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বোধ হয় অনেক ঋষিই যাগযজ্ঞ লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে চিন্তা করিতে যাইয়াও তাঁহাদের চিন্তা যজ্ঞাঙ্গ এবং যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিষয়কলাপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনেকস্থলে তাঁহাদের কথা অবোধ্য। এমন কি আপাততঃ অর্থহীন, অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। (তত্ত্বভূষণ মহাশয় কৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদ মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য) দেশ প্রচলিত বেদান্ত মতের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থূল স্থূল বিষয়ে একটা ঐক্য আছে ইহা স্বীকার করা যায়, কিন্তু পূর্ণ ঐক্য অসম্ভব। খৃষ্ট সমাজের যে সকল ছাত্রমণ্ডলী পরমার্থ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, যাঁহারা সুসমাচার প্রচার করেন, ও শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন, এবং যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে সুসমাচারের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন ও উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থদ্বারা উভয়দিকের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে, তবে লিখিত

বিষয়ের অংশগুলি বিশেষ ধীরতার সহিত পরিপাক করিতে না পারিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে, কারণ এই গ্রন্থে বাইবেলের পদোল্লেখ ও ভাষ্যের তুলনা করা হইয়াছে। পাঠকালে সচিন্তমনে পাঠ করিলে সন্দেহ জনক অনেক দুরূহ বিষয় সহজ ও বোধগম্য হইবে এবং সুসমাচারের প্রতি অবিশ্বাসজনক মলিন ও অশ্রদ্ধার ভাব হৃদয় হইতে অচিরে অপসারিত হইবে এরূপ আশা আমি পোষণ করি। হিন্দুদর্শনের অনেক শাখা, প্রশাখা ও তৎসংক্রান্ত অনেক ব্যাখ্যা ও ইতিহাস ভারতের ক্রোড়ে বহুযুগ হইতে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা ভারতভূমির আর্য্য ঋষি-দিগের একটি গৌরবের বিষয় বটে। যদিও স্থল বিশেষে আমার সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের পার্থক্য ঘটিয়াছে কিন্তু বস্তুবিচারে তাঁহাদের মতগুলি যেন কেহ অবহেলা না করেন। প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরস্পর বিরোধ থাকিতে পারে না, আভ্যন্তর সত্যসমূহের সহিত বাহ্য সত্যের সমন্বয় আছে। "সকল দেশের সকল ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ ও আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিলে ভিতরে যে একটি স্থির বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই সকল ধর্ম্মের মূল। ইহাই পরমাত্মার দিকে জীবাত্মার, মানুষের দিকে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ সূত্র। ইহা মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব বোধের মত সহজাত। আর এই সম্বন্ধগুলির ভিতর দিয়াই পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগ বচনীয় করিবার ভাষা পাওয়া যায় এবং কালে কালে এই সম্বন্ধ বোধও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" এবং মানবাত্মার পরমাত্মার সহিত গভীর আভ্যন্তরীণ সংযোগ না হইলে বাহ্য অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যায়। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। গ্রন্থের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে দার্শনিক সাধু পৌলের ও প্রৈরেতিক মণ্ডলীর পিতৃগণের ও নিও-প্লেটোনিষ্টের কিছু কিছু ব্যাখ্যা স্মরণে রাখিলে উপকার হয়; সাধু পৌল তাঁহার কৃত পত্রাবলীতে সুসমাচারের জগৎ বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই ভাষ্যগুলির সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন; যাঁহারা

সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে প্রধাবিত হইবেন—তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থে প্রবেশ করা কিঞ্চিৎ দুরূহ হইবে। নিও-প্লেটোনিষ্টদিগের অনেক তাৎপর্য্য দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।

ইহার অনেকস্থলে দীর্ঘ বিচার হইয়াছে কারণ সে সকল স্থলে খ্রীষ্টীয় দর্শনের সাহায্যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং পর-মত-খণ্ডন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্দ্বারা জটিল ও দুর্ব্বোধ বিষয়গুলি সহজ ও বোধগম্য করিয়া দিয়াছি; ইহাতে কাহারও উপর দোষারোপ বা নিন্দা করা হয় নাই; পাঠক পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে কাহারও মনে বেদনা দান বা কাহাকেও অসঙ্গত বাক্য দ্বারা আক্রমণ করা হয় নাই। আবার কোন কোন বিষয়ের অঙ্গ সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে, এবং যে পরিচ্ছেদে যে যে বিষয় আছে, কেবল তাহারই কথা বলা হইয়াছে মাত্র। পাঠকবর্গ দেখিবেন, এই গ্রন্থে উপনিষদের দার্শনিক মত ও ধর্ম্মজগতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; বিষয়টী বড় কঠিন ও শ্রমসাধ্য; সাধু যোহন কৃত সুসমাচারের বিপ্রকীর্ণ ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলি এবং ভাষ্যের নানাস্থানের পরস্পর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-দর্শনের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে যাঁহারা দর্শনের সাহায্যে সুসমাচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন, আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য পাইবেন ও সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মানুষের চরিত্র গঠনে ও আত্মার পবিত্রতা ও উৎকর্ষতা সাধনে যে দার্শনিক মত যত প্রভাবশালী, তাহার মূল্যও তত অধিক, আমি বিশেষ যত্নসহকারে খ্রীষ্টীয় দর্শনের এই প্রভাব যে অতি পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য তাহা স্তরে স্তরে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। বিশেষ আমাদের সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণরূপে দ্বিতীয় খণ্ডে Logos Doctrine, সৃষ্টি কৌশলে স্রষ্টার পরিচয়, The Divine Love & Holiness, অমরত্ব, সাধনতত্ব, "স্বস্তিক" শব্দের বৈদিক ও আধুনিক অর্থ, জগৎ ও ব্রহ্ম, অজ্ঞেয়বাদের অসঙ্গতিদোষ, ব্রহ্ম ও তাঁহার

স্বরূপ, বিষয়-বিষয়ী, নির্ব্বাণতত্ত্ব, খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আধুনিক ভ্রান্ত মত, ও তৎসঙ্গে আমাদের উত্তর, প্রাচীনযুগে খ্রীষ্টীয়-দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি, অবস্থা, ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। খ্রীষ্টোক্তি দাবীদাওয়ার মূল্য, প্যান্থিজম্ মতের শিক্ষা সম্বন্ধে Dr. W. S. Urquhart ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন এম, এ, মহাশয়ের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদ ভাবে দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবেশিত করিয়া দেখাইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃত "অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থে (শঙ্কর মতের-বিস্তৃতব্যাখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত; ১৯২২ দ্রষ্টব্য) যে মত ও যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি এবং তাঁহার সহিত আমার কোন বিরোধ ঘটে নাই। এবং যে গুলির সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল সেগুলি বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়া অশ্রদ্ধার কারণ দূর করিতে সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি। আবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সি, আই, ই, মহোদয় "The Pantheistic Aspect of Christianity" লিখিয়া (The Calcutta Review, Nov. & Dec. 1924 & Jan. 1925 দ্রষ্টব্য) অনেক বিষয় সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কৃত উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা পাঠে কাহারও সহিত বিরোধ ঘটে নাই, এবং ঘটিবে না—ইহা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি। খৃষ্টপন্থী উহাতে প্রচুর সাহায্য পাইবেন। আশা বা বিশ্বাস করিতে পারি যে বঙ্গীয় সুধী সমাজে ও ধীমান পাঠকবর্গ মদীয় গ্রন্থদ্বয়কে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্নেহ ও আদর পাইলে আমার সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পাঠকবর্গ দেখিবেন প্রথম খণ্ডের ষোড়শাধ্যায়ে জন্মান্তর-বাদের দুইটি বিভিন্ন তর্ক পরস্পর পৃষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া আছে, উভয় তর্কই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কথায় পূর্ণ, ঐ তর্কের এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই, এবং কখনও যে হইবে এমন আশা করা যায় না। আমি অনুকূল ও প্রতিকূল দুই শ্রেণীর তর্কই যথাস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি,

এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা (বাঙ্গালা ও ইংরাজি) বিবৃত করিয়াছি, পাঠক সচিন্ত মনে সেই সমুদায় পাঠ করিবেন এবং যাহা গ্রহণ যোগ্য ও সত্য তাহাই দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া চলিবেন। তবে জন্মান্তরবাদের সপক্ষে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বড় প্রবল। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে জন্মান্তরের শিক্ষা প্রচলিত ছিল, এখন নানা প্রকার যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে উহা প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। মহামতি ম্যাক্সমূলার তাঁহার "Lectures on the Science of Religion" নামক গ্রন্থের ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠাতেও জন্মান্তরের কথা বিবৃত করিয়াছেন। আবার আচার্য্য W. Sanday, D. D. L. L. D, Litt. D. মহোদয় তাঁহার কৃত "The Life of Christ in Recent Research" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ১১১পৃঃ সাধু লুক সুসমাচারের ১ অঃ, ১৭ পদের সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছেন, যথা—"It was by His Divine pronouncement by a word, and only, by a word—that the Baptist became Elijah." কর্ম্মফল একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। নিও-প্লেটোনিষ্ট পণ্ডিতদিগের মধ্যে জন্মান্তরবাদ ছিল; খৃষ্টধর্ম্ম প্রবল আকার ধারণ করিলে পর, ঐ মতবাদকে চাপিয়া রাখে এবং ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; মণ্ডলীর ইতিহাসও ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। এবং অপরাপর অধ্যায়ে যে যে বিষয় আছে সে গুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া স্বমত স্থাপন ও রক্ষা করিয়া লিখিয়াছি। মদীয় গ্রন্থদ্বয়ের সমুদয় হস্তলিপি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে প্রিন্‌সিপাল্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, ও খ্রীষ্ট-তত্ত্ব-প্রচার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এম, এ, উভয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে হস্তলিপির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত প্রথম খণ্ডের মুদ্রিত অংশের প্রুফ্ ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্ব ভূষণ মহাশয়ের ঘরে লইয়া গিয়া পাঠ করিতাম, তিনিও আমাকে

অনেক বিষয় সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে আমি "পাশ্চাত্য মায়াবাদ ও Idealism" বিষয়টী লিখিয়া পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে সংশোধনের জন্য দেখিতে দিয়াছিলাম, তিনিও স্থানে স্থানে উহার দোষ পরিহার করিয়া দিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, আমার মনে হয় ঐ স্তবকে যেন কিছু অপূর্ণতা দোষ রহিয়া গিয়াছে, তবে তাহা পাঠকের পক্ষে অকল্যাণ-জনক নহে। "জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বিচার" এই বিষয়টী আমি একখানি বাঙ্গালা পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি উহা আমার লেখা নহে। বিখ্যাত রসায়ন—বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ্ গত নভেম্বর মাসের "পপুলার সায়ান্স মন্থলি" নামক কাগজে বিজ্ঞান "জীব সৃষ্টি করিতে সক্ষম" এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অথচ বিজ্ঞান শত চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত এই বীজে কি ভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। লাটিন্ ভাষায় "Omoni Cellula a Cellula" কথার অর্থে cell (of which the body is composed of) from a cell only—জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি, প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয়। স্যার অলিভার লজ্ পণ্ডিত হইতে পারেন, তাঁহার জ্ঞান গবেষণা প্রচুর; কিন্তু বিজ্ঞান জবী সৃষ্টি করিতে পারে এ কথার কোন মূল্য নাই। বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান কি মৃত্যুকে রোধ করিতে পারিয়াছে? না, এখানে মৃত্যুর কাছে বিজ্ঞান পরাজিত। বিজ্ঞান বলে জলের কোন গন্ধ নাই, উট্ কিন্তু বহু দূর হইতে জলের গন্ধ পায় এবং সেই দিকে দৌড়ায়, এখানে উটের কাছে বিজ্ঞান পরাজিত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এম, এ, (যিনি এক সময় কৃষ্ণনগর কলেজের "বিজ্ঞান শাস্ত্রের" অধ্যাপক ছিলেন, এখন গিরিডীতে বাস করিতেছেন) আমি তাঁহার নিকট কেয়ার্ড প্রণীত "The Fundamental Ideas of Christianity" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ লেক্‌চার "The Relation of God to the world, The Pantheistic view," লিখিয়া পাঠাই; তিনি উহার অনূদিত অংশের ভার গ্রহণ করিয়া আমার বড়ই উপকার করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। "সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ খণ্ডন", "ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডন",—উহা বিচক্ষণ দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্ব ভূষণ মহাশয়ের ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। লেখা'ত শেষ হইল, কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের উপায় কি? বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা পুস্তকের গৌরব নাই, ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমারও অর্থ নাই, সুতরাং নিরুপায় হইয়া এ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইত্যবসরে প্রিন্‌সিপাল্‌ মহাশয়ের এবং খ্রীষ্ট সমাজের পরম রত্ন রায় বাহাদুর ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ও বিশেষ বিশেষ সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে ইহার মুদ্রন কার্য্য সম্পন্ন হইল; আমি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষভাবে ঋণী আছি, তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার স্পর্দ্ধা আমার হইতেই পারে না; সে ঋণ অপরিশোধ্য। তবে এখনও মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের জন্য অর্থাভাব, কারণ দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইলে গ্রন্থখানি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর আমার এরূপ অবস্থা নহে যে, আমি একা এই ভার বহন করি। আশা করি আমাদের দেশের সাহিত্যানুরাগী সমাজপতিগণ এ কার্য্যের জন্য সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

এস্থলে একটি আবশ্যকীয় কথা আছে যাহা উল্লেখ না করিলে চলে না, তাহা এই—"বেদান্ত সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা। এতদ্দেশীয় বঙ্গদেশীয় অনেক লোকের "বেদান্ত" সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাঁহারা "বেদান্ত" শব্দে "উপনিষদ" না বুঝিয়া অপর কিছু বুঝেন। খৃষ্টপন্থিদিগের মধ্যেও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। আমি মনে করি এদেশে বেদ-চর্চ্চার হীনতাই বোধ হয় এই ধারণার কারণ। যাহা হউক এই ধারণার ভ্রান্ততা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। উপনিষদ স্বয়ং

আপনাকে "বেদান্ত" বলিয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা বলিতে পারি যে, মুণ্ডকোপনিষদে তৃতীয় মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ শ্লোক, এবং শ্বেতাশ্বতরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২২ শ্লোক দেখিলেই ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে এবং তর্কসম্রাট শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের সর্ব্বত্রেই "বেদান্ত" শব্দ উপনিষদর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে বেশ বুঝা গেল যে শারীরক-মীমাংসা শাস্ত্র স্বয়ং বেদান্ত নহে; তবে কিনা উহা বেদান্তের মীমাংসা গ্রন্থ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য এই মীমাংসা শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার, তাঁহার ভাষ্য স্বয়ং বেদান্ত নহে। বেদান্ত মীমাংসাও নহে, বেদান্ত মীমাংসার ব্যাখ্যা মাত্র। এস্থলে আমার নিবেদন এই কোন পাঠক, শঙ্কর বা অপর কোন বেদান্ত ব্যাখ্যাকার অথবা বেদান্ত মীমাংসা-ব্যাখ্যা-কারের উক্তিকে বেদান্ত বলিয়া মনে না করেন। একমাত্র উপনিষদই প্রকৃত বেদান্ত, উপনিষদ সম্বন্ধীয় কোন মীমাংসা বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ "বেদান্ত" পদবাচ্য নহে। তবে এরূপ গ্রন্থকে "বেদান্ত-দর্শন" বলা যাইতে পারে। কিন্তু বেদান্ত দর্শন শব্দটীরও অনেকস্থলে ভ্রান্ত অর্থ করা হয় সুতরাং এ বিষয়েও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা ও ব্যাখ্যা অসংখ্য, কিন্তু তন্মধ্যে শারীরক মীমাংসাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত, এই গ্রন্থের অন্যান্য নাম বেদান্তসূত্র অর্থাৎ বেদান্তমত ব্যাখ্যায়ক সূত্রগ্রন্থ; ব্রহ্মসূত্র, শারীরক সূত্র, অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় সূত্রগ্রন্থ, উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদের উত্তর ভাগস্বরূপ উপনিষদের মীমাংসা, উপনিষদীমীমাংসা, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ণ সূত্র ইত্যাদি। যাহা হউক এই গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ হইলেও ইহাই একমাত্র বেদান্ত দর্শন নামের পদবাচ্য নহে। বেদান্তমত ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থমাত্রই বেদান্তদর্শন নামের অধিকারী সুতরাং শঙ্কর প্রণীত উপনিষদ ভাষ্য, শারীরক সূত্র ভাষ্য, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকগণ প্রণীত বেদান্তসার, পঞ্চদশী, বেদান্ত পরিভাষা-যোগবশিষ্ট রামায়ণ, বিচার সাগর, প্রভৃতি বেদান্তমত ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থও বেদান্তদর্শনের অন্তর্গত; পুনশ্চ, মহাত্মা রামানুজ, মধ্ব, প্রভৃতি

যাঁহারা শঙ্কর হইতে ভিন্ন প্রণালীতে বেদান্তমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও বেদান্ত দর্শনের গ্রন্থ, তদনুসারে উপনিষদুক্ত মত ব্যাখ্যায়ক ইদানীন্তন গ্রন্থাদিও বেদান্ত দর্শন নামের অধিকারী নহে।" (অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

এস্থলে উপনিষদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার রচিত উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি ভূমিকার মধ্যে "উপনিষদের অর্থ"—ও "তাহার বিভাগ" সম্বন্ধে যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাও এস্থলে পাঠকের পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে মনে করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষদ্। কিন্তু কোন কোন উপনিষদ্, অন্ততঃ একটী, "ঈশা", সংহিতাতে সন্নিবিষ্ট আছে। "উপ" ও "নি" পূর্ব্বক সদ্ ধাতুতে ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে "উপনিষদ" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দের ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মত ভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে "সদ্" ধাতুর "বিনাশ" অর্থ গ্রহণ করিয়া, "যদ্দ্বারা অবিদ্যা ও বাসনা বিনষ্ট হয়" "উপনিদের" এই অর্থ করেন। "উপ" এই উপসর্গের "নিকট" অর্থ, "নি" এই উপসর্গের "বিশেষরূপে" অর্থ এবং "সদ্' ধাতুর "গমন" অর্থ গ্রহণ করিলে "উপনিষদ্" শব্দের এই অর্থ সিদ্ধ হয়—"যাহা গুরুর নিকট বিশেষরূপে গমন করিয়া শিক্ষা করা যায়"। ধাত্বর্থ যাহাই হউক, উপনিষদ্" শব্দে সাধারণতঃ গভীর ও গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎ প্রতিপাদক গ্রন্থকে বুঝায়। "চারি প্রকার উপনিষদ্ আছে—বৈদিক, আর্ষ, সাম্প্রদায়িক, ও কৃত্রিম। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অঙ্গীভূত উপনিষদ্ বৈদিক। ঈশা, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বৈদিক উপনিষদ্। বৈদিক উপনিষদের ভাবানুযায়ী এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত উপনিষদ আর্য্য। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি আর্ষ উপনিষদ। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি দেবোপাসক

সাম্প্রদায়িকগণের রচিত উপনিষদ, যাহাতে কোন দেবতা বা মহাপুরুষকে ব্রহ্মের অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্, যেমন জাবাল, নৃসিংহতাপনী ইত্যাদি। যাহাতে আর্য্য ধর্ম্ম-বহির্ভূত মত সমর্থিত হইয়াছে তাহাই কৃত্রিম উপনিষদ যেমন অল্লোপনিষদ। বৈদান্তিকগণের মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদবিরোধী, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে জগৎ মায়াময় নহে, ব্রহ্মস্বরূপেরই অঙ্গীভূত, ভেদ ও অভেদ দুইই সত্য, ভেদাভেদই প্রকৃততত্ত্ব, এবং মুক্তি জলে জল মিশিয়া যাওয়ার মত ব্রহ্মে লীন হওয়া নহে, ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধে ব্রহ্ম লোকে চিরবাস। তাঁহারা দেখিবেন কৌষীতকির প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় কেমন স্পষ্টরূপে তাঁহাদের মত সমর্থন করিতেছে"

আমাকে এস্থলে আর একটা কথা খুলিয়া বলিতে হইতেছে তাহা না বলিলে বিষয়টী তত সুস্পষ্ট হইবে না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মধ্যে যে সকল শ্লোক বা পদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোন অংশে আমাদিগের পরিত্যাজ্য নহে এবং কেহই সেগুলি দর্শন কিম্বা ধর্ম্মের দিক্ হইতে পরিম্লান করিতে পারিবে না। আমি এস্থলে কেবলমাত্র উদাহরণ স্বরূপ স্থান ও বিষয়ের অবস্থাগুলি উল্লেখ করিতেছি :—

"ঐশীশক্তি জগতের কারণ"	(শ্বেঃ উঃ	১ম অধ্যায়	১—৩ শ্লোক)	
"ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির কারণ"	(ঐ ঐ	ঐ	১০—১২ শ্লোক)	
"ব্রহ্মনিরাকার"	(ঐ ঐ	ঐ	১৯—২৩ শ্লোক)	
"ঈশ্বর শান্তিদাতা"	(ঐ ঐ	চতুর্থ অধ্যায়	১১—১৪ শ্লোক)	
"ঈশ্বর মুক্তিদাতা"	(ঐ ঐ	ঐ	১৫—১৮ শ্লোক)	
"ঈশ্বরের প্রতিমা নাই"	(ঐ ঐ	ঐ	১৯—২০ শ্লোক)	
"ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা"	(ঐ ঐ	৫ম অধ্যায়	১—৬ শ্লোক)	
"আত্মা সূক্ষ্ম ও অলিঙ্গ"	(ঐ ঐ	ঐ	৯—১০ শ্লোক)	
"ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব"	(ঐ ঐ	ষষ্ঠ অধ্যায়	১—৫ শ্লোক)	
"ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"	(ঐ ঐ	ঐ	১০—১৩ শ্লোক)	

আমার বলিবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঐ শ্লোকগুলি বাইবেলের শিক্ষার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বিষয় ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই ইহা বেশ বুঝা যায় এবং উহা বাইবেলের শিক্ষার বিরুদ্ধ নহে। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, পবিত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র, ও পরি-পূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। ইহা ত ধ্রুব সত্য; কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি এই ধর্ম্মবীজ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি যে গার্গ্য পুত্র চিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, তলবকার, পিপ্পলাদ, প্রভৃতি উপনিষদের ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিগণ ঈশ্বর-যোগ-লিপ্সায় চালিত হইয়া তাঁহাদিগের অন্তরাত্মায় যেরূপ গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিয়া ভারতের ক্রোড়ে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যে বিশ্ব-জনীন সত্য ও অটল ভিত্তিমূলের উপর সংগ্রথিত হইয়া আছে তাহা সত্যানুসন্ধীৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে এবং যিনি উহা অস্বীকার করেন তিনি সত্যের অপলাপ করেন। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, যীশু ভিন্ন বুঝি কেহ "ঈশ্বরকে পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতে শিক্ষা দেন নাই, বস্তুতঃ তাহা মনে করা সুসঙ্গত নহে। যীশুর শিক্ষা দিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ উহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এবং কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রমাণস্বরূপ একটি শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি যথা—"ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসী"—অর্থাৎ তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার, আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না"। তবে নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে আমাকে এ কথা বলিতে হইবে "যে ঋষিদের প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক তারতম্য আছে। যিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, তত-টুকুই বলিয়াছেন। সকলের চিন্তার সামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব। সেরূপ

সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা আমাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। ঋষি-গণ কোন বাহ্যিক প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া নিজ অভিজ্ঞতার উপরই দাঁড়াইয়াছিলেন।" "আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ যে পদ্ধতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এসব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই সমীচীন। উপনিষদ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজি প্রত্যক্ষ দর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, এবং কথাগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনা ও আভাষের দ্বারা সত্যের সন্ধান করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। অবশ্য পাপকে বর্জ্জন করিতেই হইবে, নতুবা কেহ ভগবানের দ্বার পর্য্যন্তও যাইতে পারিবে না; কিন্তু, তেমনিই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে হইবে; নতুবা আমরা পরমেশ্বরের সত্তায় প্রবেশ লাভ করিতে পারি না। সাত্ত্বিক (অর্থাৎ পবিত্র) প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে। নীতিধর্ম্মের অনুযায়ী কর্ম্ম আত্মশুদ্ধির কেবল একটা উপায় মাত্র। ইহার দ্বারা আমরা দিব্য প্রকৃতির দিকে উঠিতে পারি। যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য সত্তা, দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। ধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ।" যিহুদী জাতির উদার একেশ্বরবাদ ভারতীয় একেশ্বরবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী সে প্রশ্নের বিচার করি না, তবে একথা সাহসপূর্ব্বক বলিব যে যীশুর অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ উক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ইহা বেশ বুঝা যায়। কারণ খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের বহুপূর্ব্বে জগতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য ছিল এবং ৩।৪ হাজার বৎসর অতীত হইল ক্লেয়ানথেস্ (Kleanthes) যে প্রার্থনা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার এক আশ্চর্য্য গভীর মূল্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে প্রার্থনার গভীরতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। স্বয়ং প্রভু যীশু ঐ সত্যের কোন বিলোপ বা অপলাপ করেন নাই এবং উহাকে চিরস্থায়ী আকার প্রদান করিয়া গৌরবময় মঙ্গলবার্ত্তারূপে জন সমাজে উক্ত শিক্ষা

প্রচলিত করিলেন। আবার আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে ভগবৎগীতার মধ্যে সুসমাচারের অন্ততঃ ৩৬টী স্থানে বেশ মিল দেখা যায় এবং কোন পক্ষে সেগুলির সহিত বিরোধ নাই, কারণ সত্যের সঙ্গে কেহ বিবাদ করেন না। বিবেচকপাঠক মাত্রেই আমার এ উক্তির সমর্থন করিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি। গ্রন্থ যত বড় হইবে ভাবিয়াছিলাম হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বিগুণ। সুতরাং যাহারা এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রম ও আমার সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণও দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। প্রুফ সংশোধনের জন্য প্রধানতঃ অন্যের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে, সুতরাং মুদ্রাঙ্কনদোষ গুরুতর না হইলেও সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হয় নাই। মুদ্রাঙ্কনের সময়ে সুচারুরূপে পরিদর্শন করা হয় নাই, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। পুস্তকের শেষভাগে একটি শুদ্ধি সূচী প্রদত্ত হইল। আশা করি তাহাতে অন্ততঃ অধিকাংশ ভুলই সংশোধন করা হইয়াছে। মৎ প্রণীত "বুদ্ধের শিক্ষা ও যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা" নামক গ্রন্থ লেখা হইয়াছে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

৪৯, আনন্দ পালিত রোড,
ইণ্টালি—কলিকাতা।
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৫।

চির-সেবক
শ্রীপরমানন্দ দত্ত
গ্রন্থলেখক।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

হিন্দু দর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন

"ষড় দর্শনরূপ যে মহান মহীরুহ ভারতীয় সাহিত্য কাননের অনুপম শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছে, সূত্র সাহিত্যের যুগে সে এক অপরূপ সৃষ্টি। উহার একদিকে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক ষড়বেদাঙ্গ, অন্যদিকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানপ্রদ ষড়দর্শন।

দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে, দর্শন শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শন শাস্ত্র কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে "দর্শন" এই সংজ্ঞা বা নাম হইতে কতদূর সাহায্য পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দৃশ ধাতু লুট, যুট্ বা অনট্ প্রত্যয়ের যোগে দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শাস্ত্র বিশেষ যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় সমর্থিত হয় সচরাচর তাহাকেই দর্শন শাস্ত্র বলে। এতাবতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে দর্শন শব্দে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বা তাহার সাদৃশ্য লইয়া শাস্ত্র বিশেষ প্রযুক্ত অথবা শাস্ত্র বিশেষে রূঢ়। কেহ বা দর্শন শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চাক্ষুষজ্ঞান দৃশ ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ। এস্থলে, "তত্ত্বজ্ঞানই" স্বীকার করিতে হইবে; ইংরাজী "Philosophy" শব্দের ঐ অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং এস্থলে দৃশধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন তাহাই দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়। দর্শন শাস্ত্রের অপর দুইটি নাম আছে, যথা মননশাস্ত্র ও বিচারশাস্ত্র।"

এদেশের মুখ্য দর্শন ছয়টী অর্থাৎ (১) কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শন। (২) কনাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন। (৩) গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শন। (৪) পতঞ্জলি প্রণীত পাতঞ্জলি বা যোগশাস্ত্র। (৫) জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্ব

মীমাংসা। এবং (৬) বাদরায়ণ বা ব্যাস প্রণীত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। এই ছয়টী দর্শন, ষড়দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লেখক মাধবাচার্য্য তদীয় সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে ষড় দর্শনের অতিরিক্ত দশখানি দর্শনের নামোল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মতে দশখানি মাত্র দর্শন ষড় দর্শনের অতিরিক্ত হইতেছে। কি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব, তাহার উপকারিতা, ও আবশ্যকতাই বা কি, কেনই বা দর্শন শাস্ত্রের এত সমাদর? যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবেন, স্বভাবতঃই তাঁহাদের এই সকল পরিষ্কার-রূপে জানিবার অভিলাষ হইবে। প্রাণি মাত্রই কোন একটি প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; নিষ্প্রয়োজন প্রবৃত্তি আকাশ কুসুমের মত অলীক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এজন্য অগ্রে প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। দর্শন শাস্ত্র যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যও অবশ্যই তদনুরূপ উচ্চ হইবে। একজন দেশীয় লেখক বলিয়াছেন "There are many errors in the philosophy" কথাটা এক হিসাবে যে ধ্রুব সত্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। Dr. A. M. Fairbairn তাঁহার কৃত The Philosophy of the Christian Religion নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"without history the philosophy would move as in a dream... Kant's most famous dicta, the philosophy without the history is empty, the history without the philosophy is blind" এ কথা লইয়া বিচার করিব না; বিচার্য্য বিষয় এই যে, ভারতীয় দর্শন সমূহ নাকি অধ্যাত্মবাদে পূর্ণ এবং সকল অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়াছে, ইহা যদি যথার্থই সত্য হয়, তবে উহা মানিতে প্রস্তুত আছি; আর যদি ইহাতে নানাপ্রকারের ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উচ্চ স্থান হইতে উহাকে সরাইয়া দিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। এ দেশের একটা ধারণা আছে যে ভারতীয় দর্শন সকল আধ্যাত্মিক দর্শন।

মহর্ষিগণ অধিকাংশ দর্শনের প্রণেতা। তাঁহারা আধ্যাত্ম জগতে বিচরণশীল। তাঁহাদের প্রণীত দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যা বিশেষ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনরূপ বিশিষ্ট প্রয়োজন সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত। বাবিলন, মিশর এবং রোম নগর স্থাপনের ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ইট্রিউরিয়াদের মধ্যে একপ্রকার দর্শন শাস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহাদের দর্শনগুলি সে যুগে যে অবয়ব ধারণ করিয়াছিল তাহা লইয়া এ স্থলে তর্ক নহে।

প্রত্যেক দর্শনই সূত্রাকারে গ্রথিত। এই সূত্র সকল কখন প্রথম রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। Dr. K. M. Banerjee হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের কোন টীকাকার বা নূতন লেখক একটা রচনার কাল নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বৎসরের মধ্যেই লেখা হইয়াছিল। ইহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ষড়দর্শন এখন আমরা যে আকারে পাইয়াছি তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দর্শন আলোচনার ফল। তৎপূর্ব্বেও সম্ভবতঃ এই সকল দর্শন সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বিদ্যমান ছিল। তবে প্রত্যেক দর্শনই যে অল্প বিস্তর পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। এরূপ মত বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ এবং পণ্ডিত মোক্ষ মুলার তাঁহার The Six Systems of Indian Philosophy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ৯৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক দর্শনের ভিত্তি—দুঃখ বাদ। ভারতীয় সকল দর্শনকারেরই মতে সংসার দুঃখের আলয়। সংসারে যতটুকু সুখ আছে, তাহা যে শুধু ক্ষণস্থায়ী এমন নহে, তাহা দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র। সে সুখে জীব কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাই সে দুঃখ নাশের জন্য নানা উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তদ্দ্বারা সে সংসার দুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না; অথচ দুঃখ নাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত; দুঃখ হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেই দুঃখ হানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্যই

দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব দর্শনের আরম্ভ দুঃখ বাদে এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখ নাশে।

দর্শন শাস্ত্রের মতে পদার্থ তত্ত্বের জ্ঞানই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। দর্শন শাস্ত্রে তাই পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় পদার্থের স্বরূপতত্ত্ব অবগত করাইয়া চির সুখ লাভের অর্থাৎ মোক্ষের পথ নির্ণীত হইয়াছে। সেই হিসাবে হিন্দুদর্শনশাস্ত্র সমূহ জ্ঞান গবেষনার উৎস স্থানীয় বটে, তবে দর্শন শাস্ত্র সমূহের উদ্ভাবিত সুখ সাধনের উপায় পরম্পরার সহিত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের নৈকট্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্য দর্শ্বনে এবং মীমাংসা দশনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে। ন্যায় দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যের দুঃখ নিবৃত্তির সহিত ঈশ্বরের যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করেন নাই। পাতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের উপায় পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু সে উপায় মুখ্য উপায় বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই ঈশ্বরের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে ব্রহ্মাই সত্য, আর সকলই মিথ্যা, বেদান্ত বলেন, মুক্তির পর আত্মা চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন। উপনিষদে দেখিতে পাই পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; বেদান্তের মত তাহারই অনুসরণকারী। পণ্ডিতগণ ষড়দর্শনকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে সাংখ্য ও পূর্ব্ব মীমাংসা এক শ্রেণীর দশন। ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। পাতঞ্জল ও বেদান্ত এক শ্রেণীর দর্শন।

আমরা এক্ষণে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র সমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব এবং কে কিরূপ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা দেখিব। বিশেষ বিশেষ খ্যাতপন্ন দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি স্থল বিশেষে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং যেখানে শিক্ষার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা একেবারে

পরিত্যাগ করিয়া নিজে যাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহাই সরলভাবে সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়

মীমাংসা দর্শন।

বেদের দুই ভাগ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মীমাংসা দর্শনের উৎপত্তি। মীমাংসা দর্শনের ভিত্তি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্ব মীমাংসা সূত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মীমাংসা দর্শনের মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক; কিন্তু জ্ঞানবাদীরা আবার কর্ম্ম-কাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মের দ্বারা শ্রেয় লাভ অর্থাৎ মুক্তি হয় না, হইতে পারে না; "ন কর্ম্মনা ন প্রজয়াধনেন, ত্যাগে নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—অর্থাৎ "অমরত্ব লাভের উপায় কর্ম্ম নয়, সন্তান নয়, ধন নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়"। তাহারা আরো বলেন যে, কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে, ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব যাহারা যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়ো লাভের উপায় মনে করে তাহারা মোহান্ধ। জৈমিনি কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্মকেই মোক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তবে যজ্ঞের ক্রিয়া পদ্ধতি এবং মন্ত্রোচ্চারনাদি বিশুদ্ধ ভাবে সমাহিত না হইলে অভীষ্ট লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে—ইহাই জৈমিনির মীমাংসা। জৈমিনির এই কর্ম্মবাদ ও শব্দের নিত্যত্ব ও একত্ববাদ দ্বারা তাঁহার সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"—কিন্তু দর্শনের কোন স্থানে, আর কোন ধর্ম্মের কি ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। জৈমিনি এই পর্য্যন্ত ঈশ্বর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শেষ করিলেন, ইহার অতিরিক্ত

কোন কথা তিনি বলেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্যই তর্ক সম্রাট শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মীমাংসা দর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী, তাঁহারা বেদকে নিত্য অভ্রান্ত বলেন বটে; কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরের বাক্য তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ মীমাংসা দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই. জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা আছেন, একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, জীব নিজকর্ম্মানুসারেই ফলভোগ করে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বিহীনে শাস্ত্রই বা কি, আর বেদই বা কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায় দর্শন

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ও বিস্তৃতি

দার্শনিক আর্য্যগণ মধ্যে গৌতম ঋষি অতি প্রাচীন ; পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠকেরা অনেক সময় অনেক স্থলে গৌতমের নাম শুনিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক গৌতমের প্রসঙ্গ আছে, তিনি মহর্ষি জাবালীর গুরু। শতক্রতুর লাম্পট্য জন্য যাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তৃশাপে পাষাণময়ী হইয়াছিলেন, সেই অহল্যাপতি গৌতমের নামও পাঠকের অজ্ঞাত নহে। এক গৌতম ঋষি স্মৃতিশাস্ত্রের লেখক। বৌদ্ধগণের আরাধিত এক গৌতম ছিলেন, যাঁহার নামান্তর "গদমা"। ইহাদিগের মধ্যে ন্যায়সূত্র প্রণেতা কোন্ গৌতম তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন ; যাহা হউক, ন্যায়সূত্র প্রণেতা গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ। তজ্জন্য তাঁহার এই দর্শন শাস্ত্র অক্ষপাদ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে পাঁচটী অধ্যায় আছে। এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটী আহ্নিক এবং প্রত্যেক আহ্নিকে অনেক গুলি প্রকরণ আছে, সর্ব্বশুদ্ধ ৫২১টী সূত্র আছে।

মহর্ষি গৌতম এই ন্যায় দর্শনের সূত্ররূপ বীজ রোপন করেন; পরে সেই বীজ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের প্রযত্নে অঙ্কুরিত হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। এই ন্যায়দর্শন মহর্ষি গৌতমের অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল—ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবই করিব এবং ভারতবর্ষীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী এই ন্যায়দর্শনে বিশেষ দক্ষ। এমন কি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়স্থ লোকও এই বঙ্গভূমিতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত ভারতে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, কেবল মাত্র মিথিলাতে এক-খানি গ্রন্থ ছিল। তত্রত্য পণ্ডিতগণ সমীপে কোন যুবক পাঠার্থী হইলে তাহাকে গ্রন্থ দিতেন না, পাছে প্রবাসী শিষ্যবর্গ ন্যায়শাস্ত্র খানি লইয়া দেশে বহুল প্রচার করে, কিন্তু তাঁহাদিগের চতুরতা বঙ্গ-কুল-তিলক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির স্মরণশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছিল। কি সুখের বিষয় যে আমাদের বঙ্গদেশে এমন মহা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই মহাত্মা না জন্মিতেন কোন দিনই আমরা ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইতাম না। আবার যদি আমাদিগের ভারতবর্ষে মহর্ষি গৌতম না জন্মিতেন ও ন্যায়দর্শন না লিখিতেন, তবে অদ্যাপি ইউরোপীয়েরা ন্যায়দর্শন কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিতেন না।

ইহার শিক্ষা

ন্যায়দর্শন তিনভাগে বিভক্ত; (১) তর্কাংশ, (২) ন্যায়াংশ, এবং (৩) দর্শনাংশ। ন্যায়দর্শন আলোচনা করিলে গৌতমের অসাধারণ পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য; এবং ইহা কম আপত্তি জনক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাতন অবস্থায় এই মত সেশ্বর ছিল কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ন্যায়দর্শন তত্ত্বজ্ঞানের ষোড়শ পদার্থের অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহার তত্ত্বজ্ঞান হইলে ন্যায়মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা অপবর্গ লাভ হয়, তাহার মধ্যে কিন্তু ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নাই

এই ষোড়শ পদার্থের বিচারই সমগ্র ন্যায়দর্শন নিঃশেষিত হইয়াছে। এবং নৈয়ায়িকগণ প্রমাণের বিচারই প্রায় সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপনের জন্য অনেক তর্কযুক্তি অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। (এই স্থলে খ্রীষ্টীয় দর্শনের সহিত এক বিষম সংঘর্ষণ আছে, যাহা পরে প্রকাশ পাইবে)।

সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য এক মুখ্য কারণ আছে—ইহাই গৌতমের অভিপ্রায়। এই দর্শনে ঈশ্বর প্রতিপাদন এইরূপ করা হইয়াছে যথা—"ঈশ্বর কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শানাৎ" অর্থাৎ মনুষ্য কৃত কর্ম্মের সর্ব্বদা সাফল্য দেখা যায় না, সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ; কিন্তু পরক্ষণেই গৌতম আবার মীমাংসা করিতেছেন। "নপুরুষ কর্ম্মাভাবে ফল নিষ্পত্তেঃ" অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্ম ভিন্ন ফল নিষ্পত্তি হয় না। ফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন হইলে কখনও পুরুষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন, সৃষ্টির অন্য কারণ অবশ্যই আছে, সেই কারণই অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল, গৌতম আত্মার অনাদিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের "ঈশ্বর কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ" ও "তৎ কারিতত্বাদ্ অহেতুঃ" এই দুই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন "মানুষের কর্ম্মফল ভোগ যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকার ফল জন্মাইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ন্যায়দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। গৌতম সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বের আভাস যেমন অল্প মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি পরমাণুবাদও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌতম, এ জগতের রচয়িতা ঈশ্বর, কি ইহা পরমাণু সমষ্টির অভিঘাতে রাসায়ণিকযোগে উৎপন্ন, তাহা স্পষ্টতঃ লিখেন নাই। অতএব দেখা গেল যে, মূল ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। "ন্যায় দর্শনকার দুঃখনাশ ও মুক্তিলাভের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক

নাই। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায় দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর কিছু আসে যায় না। কারণ ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের (ঈশ্বর তাহাদের অন্তর্ভূক্ত নহে) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার এড়াইয়া অপবর্গ লাভ করিবে। ইহাই ন্যায় প্রদর্শিত মুক্তি পথ। এই জন্যই সমুদয় গীতা গ্রন্থে ন্যায়দর্শনের কোন প্রসঙ্গ ইঙ্গিত বা আভাস দৃষ্ট হয় না।" ইহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ও দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহাতে ঈশ্বরের নৈতিকগুণ, এবং তাঁহার শাসন, সৃজনশক্তি স্বীকৃত হয় নাই, ও সৎ শাসন শক্তি নাই, তিনি নামে মাত্র ঈশ্বর। গৌতম প্রণীত ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়াই ইউরোপীয় গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল্ ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। কথিত আছে মহান্ আলেকজাণ্ডার শর্ম্মানাচার্য্য ও কল্যাণশর্ম্ম নামে দুই জন ব্রাহ্মণকে স্বদেশে লইয়া যান, তাঁহারা গ্রীসে ন্যায়দর্শন প্রদান করিয়া অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করেন। অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িকদিগের যেরূপ মত আছে জীবাত্মা নিত্য, জীবাত্মা যখন যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন সেই দেহের ধ্বংস হইলে জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না। পীথাগোরসেরও সেই প্রকার মত ছিল ইসেনীগণ শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিত না কিন্তু আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করিত।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়

এই দর্শন প্রণেতার নাম কণাদ বা উলুক, এজন্য এই দর্শনকে কণাদ অথবা ঔলুক্য দর্শন কহে; ইহাতে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত "বিশেষ" নামক একটি পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এ নিমিত্ত ইহার নাম

বৈশেষিক দর্শন। কণাদ দর্শনকে ন্যায়দর্শনের শাখান্তরও বলা যাইতে পারে ; কারণ এই দর্শনে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে—বোধ হয় সেই জন্যই পণ্ডিত মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন—"Nyaya and Vaiseshika have been often treated as sister Philosophies," গৌতম ঐ পরমাণুবাদ মাত্র সঙ্কেতে শিখাইয়াছিলেন। বৈশেষিক সূত্রকার তাহার বাহুল্য বিস্তার করাতে "কণ-ভুক" উপাধী প্রাপ্ত হন, বাস্তবিক কণাদ তাঁহার নাম নহে। বৈশেষিক দর্শনের কাল নির্ণয়ের একটা ইতিহাস মোক্ষমূলার মহাশয় তাঁহার রচিত Indian Philosophy নামক গ্রন্থের ৪৩৮—৪৪০ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন ; এস্থলে আমি আর তাহা উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহাতে যে বেশী কিছু উপকার হইবে এমন নাও হইতে পারে।

ইহার শিক্ষা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক এক শ্রেণীর দর্শন। বৈশেষিক দর্শনেব ভিত্তি মহর্ষি কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক সূত্র। ইহা দশমাধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের তুইটি পরিচ্ছেদ, ইহাদিগকে আহ্নিক বলে। বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না, বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিকে বায়ুর বিচার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহা ভিন্ন বৈশেষিক সূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। কণাদ দর্শন যৎকালীন ন্যায়ের শাখান্তর তখন ঈশ্বরাস্তিত্ব কিম্বা জগদ্রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের কোন ক্ষমতা নাই ; ইহা স্পষ্টই জানা যাইতে পারে। গ্রন্থারম্ভে—১। "অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ২। যতোহভ্যুদয় নিঃ শ্রেয়স্ সিদ্ধঃ সধর্ম্মঃ। ৩। তদ্বচনাদাম্নায়—প্রামাণ্যং। এই তিন শ্লোক দ্বারা ধর্ম্মের মুল সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন ; তিনি তৎপরে আর কোথাও ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। বরঞ্চ সৃষ্টিকল্পে অদৃষ্ট সম্বলিত পরমাণুকে সর্ব্বে সর্ব্বা করিয়াছেন। পরমাণুতত্ত্ববাদ

মহর্ষিকণাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। ভারতবর্ষে অধুনা পরমাণু-তত্ত্বের তাদৃশ সমাদর না থাকিলেও ইউরোপের দার্শনিকগণ অনেকেই এই মতের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। গ্রীক দার্শনিক ডেমিক্রেটস্ ৪৪০ খ্রীঃ পূঃ গ্রীশদেশে এই পরমাণুতত্ত্ববাদ প্রচার করেন; ডেমিক্রেটস্ ভারতবর্ষে আসিয়া সন্ন্যাসিদিগের মুখে শুনিয়া কণাদের মত শিক্ষা করিয়া যান। তাঁহার পর এপিকিউরস এই পরমাণুতত্ত্ব বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়; পরিশেষে Dalton পরমাণুতত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ইউরোপের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়াছেন।

কণাদের মতে ভোগাভোগ এবং দেহান্তর গ্রহণ সমস্তই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। এ হিসাবে ঈশ্বরের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "নব্যনৈয়ায়িকদিগের রচিত বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহে মূল সূত্রোক্ত নব দ্রব্যের অন্যতম আত্মার বিচার স্থলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন। এবং আত্মা যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র তাহাও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে স্থলে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। পুনশ্চ, প্রশস্ত পাদাচার্য্য পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, "তচ্চ ঈশ্বর নোদানা-ভিব্যক্তাৎ ধর্ম্মদেব"—অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর প্রেরণাজনিত ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়," এইরূপ বলিয়াছেন। মূলসূত্রে কিন্তু "ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূত," এই মাত্র উপদেশ আছে। যদিও প্রশস্ত পাদাচার্য্য পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু মূল সূত্রে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না।" বৈশেষিক দর্শনের ইহাই শিক্ষা যে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কোন কার্য্যকারিতা বৈশেষিক দর্শন স্বীকার করেন নাই; পরন্তু অদৃষ্টকেই তিনি সকল সৃষ্টির মূলাধার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ অদৃষ্টবশে পরমাণুতে ক্রিয়া

পরমাণুর ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি, সুতরাং সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই। পরমাণু ও অদৃষ্টই সর্ব্বমূলাধার।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন আলোচনা করিয়া আমরা স্বভাবতঃ কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি না, উভয় দর্শনের শিক্ষানুসারে ঈশ্বরের প্রাধান্য ও কর্ত্তৃত্ব স্বীকারের যেন দরকারই নাই এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং পরমাণুর অনাদি সত্ত্বা যদি অস্বীকার কর তবে পৃথিবীর উৎপত্তির উপাদান কারণ কি হইতে পারে? ঈশ্বরের কার্য্য কি আমাদের জ্ঞানশক্তির অতীত নয়? কোন প্রকার গজকাঠি দিয়া কি ঈশ্বর শক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? এবং কোন্ যুক্তিবলে ঈশ্বরের শক্তিকে আবদ্ধ বলা যাইতে পারে? ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাঁহার অতুল শক্তির প্রভাবে ঘট কি চিরস্থায়ী হইতে পারে না? এবং ঈশ্বর শক্তির বাধা দিবার যুক্তি কি আছে?

যাহা হউক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বৈশেষিক দর্শন সমালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি; সুধীগণ আপন আপন চিন্তা ও জ্ঞানে বিচার করিয়া লইবেন। "এ কথা মানিতেই হয় যে, বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মূখ্য নহে, অতিশয় গৌণ বৈশেষিক দর্শনকার নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য যে প্রণালীর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর যাউন, বা থাকুন, জীবের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক কিম্বা না হউক, বৈশেষিকের তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সপ্ত পদার্থ (ঈশ্বর যাহার অন্তর্গত নহেন) ও তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকুক, বৈশেষিক সেই তত্ত্বজ্ঞানের বলে দুঃখের গণ্ডি ছাড়াইয়া মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিকের অনুমোদিত মুক্তি পথ।"

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, যে পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না সে পথের পথিক হইলে দুঃখের গণ্ডী ছাড়াইয়া সুখ লাভ করা একেবারে

অসম্ভব। ঈশ্বর স্বীকার করিব অথচ তাঁহার ঐশ্বরিক গুণনিচয়, কর্ত্তৃত্ব, কি আধিপত্য স্বীকার করিব না—এ আবার কেমন যুক্তি ?

চতুর্থ অধ্যায়

পাতঞ্জল বা যোগশাস্ত্র

এই দর্শনকারের জীবন বৃত্তান্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, পাতঞ্জলি মুণির প্রণীত বলিয়া পালঞ্জল শব্দে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ; যৎকালে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার দ্বারা মহর্ষি কপিল সমগ্র ব্রহ্মভূমে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তখন অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই ইহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহর্ষি পাতঞ্জলি যখন দেখিলেন, সমস্ত মানব ক্রিয়াকাণ্ড পারিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্য মতাবলম্বন করিতেছে এবং বেদ বিরোধী হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই এই দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন এবং নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রতিযোগী দর্শন বলিয়া সেশ্বর সাংখ্য নামে এই দর্শনের নামকরণ করেন। এই দর্শনে যোগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত থাকায় ইহার অপর নাম যোগশাস্ত্র। ইনি বেদের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। . কেবল বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এবং বেদ যখন মান্য তখন তদুপদেশে চলা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই মাত্র বলিয়াছেন।

এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার

পাতঞ্জল মুণি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈশ্বর সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ কারণেই কপিলদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনকে যথাক্রমে নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে। সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিলের মতে জীবাতিরিক্ত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, লোকাতীত পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকৃত

হয় নাই। ষড়দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ব কৌমুদিতে লিখিয়াছেন যে সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্ব দর্শনসংগ্রহে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কপিল মতে ঈশ্বর নাই। বস্তুতঃ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই কপিল সূত্র পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই। (১)

যাহা হউক আমরা এই স্থলে পতঞ্জল মুণির শিক্ষা যে কি তাহা দেখিব :—পাতঞ্জল দর্শনে এরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ"। ১।২৪।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজাং"। ১।২৫।

"স এস পূর্ব্বষামপি গুরুঃ কালেনান বচ্ছেদাৎ"। ১।২৬।

অর্থাৎ "অবিদ্যামূলক যে ক্লেশ, এবং কর্ম্মফল পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা সমূহ, তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর"। তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ"।

"তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু, কারণ তিনি কালের অতীত"। তাঁহার মতে ঈশ্বরে নিত্য কালই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে পতঞ্জলির মনোগত অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ, জীবাত্মাকেই বহন করিতে সক্ষম। পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি সকলের গুরু একজন পরমপুরুষ আছেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ যতজন দার্শনিক পণ্ডিত দর্শনে আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনিই সরলভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই দর্শনে সর্ব্বসমেত ১৯৫টী সূত্র আছে, এবং ইহা চারিপদে বিভক্ত। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে সমাধিপাদ,

(১) এই মতবাদ কিন্তু আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ। পাতঞ্জল দর্শনের একটি নাম সাংখ্যপ্রবচন, তাহার কারণ এই যে, পতঞ্জলি সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন; বস্তুতঃ পতঞ্জল দর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রসঙ্গ উঠাইয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জল দর্শনকে বিশেষিত করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "যোগ সিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ দিয়াছেন, "ঈশ্বর প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম, এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, কিম্বা মুখ্য উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" এই "বা"র উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর প্রণিধানই যোগ সিদ্ধির মুখ্য উপায়। তাহারা বলেন, পতঞ্জলি আর আর যে সকল উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারা গৌণ উপায় মাত্র, ইহাই চরম মুখ্য উপায়। এ মত সঙ্গত বোধ হয় না। "বা" শব্দের অর্থ বিকল্প; ইহাতে গৌণ-মুখ্যের কোন কথা নাই। অতএব, পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর—প্রণিধান অষ্টাঙ্গ-যোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এমতে যোগসিদ্ধির কোনও বিশেষ বাধা হয় না, কারণ, ঈশ্বর প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র; আর ইহাও বক্তব্য যে পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তের আধার নহে, কিন্তু ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ মাত্র। ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র। বস্তুতঃ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ উপদিষ্ট হয় নাই এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে তাহা অসম্পূর্ণ।" ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ কি সম্ভবপর হয়?

১৮
পরমা | ২

যোগের যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা

ইহাতে নিশ্বাস রোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল সূত্র আছে তাহা অতি বিশদরূপে স্ফুটিত হইয়াছে। যোগবলে যোগী আপনাকে এমত লঘু করিয়া ফেলিতে পারেন যে, অক্লেশে নভোমণ্ডলে পর্য্যটন করিয়া জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং নন্দনকানন বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি মানব বাঞ্ছনীয় স্থানও নাকি দর্শন করিতে সক্ষম হন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সৌরজগৎবেত্তা পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানবলে কহিয়াছেন যে, পৃথিবীর শক্তি দ্বারা আকাশের গুরুদ্রব্য ধরাতলে আকর্ষিত হয়; কিন্তু এই দর্শনে যোগের বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে, এই আকর্ষণ শক্তি যোগবলের নিকটেও পরাস্ত হয়। যোগী নাকি কায়াকাশের সম্বন্ধ সংযমন পূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারেন; সুতরাং নবাবিষ্কৃত ইউরোপের নূতন সভ্য শ্বেতাঙ্গগণের বিজ্ঞান প্রধান, "এয়ার-সিপ, ব্যোমযান" ও ইহার নিকটে পরাভূত হয়। যোগশাস্ত্রের "এই অনির্ব্বচনীয় সুমধুর ব্যাখ্যা দেখিয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"Reward of Rs. 1,000. A reward of the above sum is offered to any yogi who will, by yoga power, raise himself in the air 3 feet and remain suspended for ten minutes. The conditions are that it must be done in the open air and by daylight. There must be no rod connecting him with the ground nor any balloon above his head." J. Murdoch, L. L. D. Madras, October 1896. Yoga Sastra; The Joga Sutros of Patonjoli Examined with a notice of Swami Vivekanandas' Yoga Philosophy Page 38," পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিলে অবশ্যই ইহাই সিদ্ধান্ত

এবং

কুম্ভক ও প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা জীবাত্মাকে শরীর হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন

করা যাইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় পূর্ব্বতন আর্য্যগণ এইরূপ যোগসাধন করিয়াই দীর্ঘজীবী ও সবল শরীর হইতেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাংখ্য দর্শন

লেখকের পরিচয়

এই দর্শনকারের নাম মহর্ষি কপিল। কিন্তু কপিল নামে অনেক মহর্ষি ছিলেন, তন্মধ্যে সাংখ্য প্রণেতা কে, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে ব্রহ্মার পুত্র কপিলের প্রসঙ্গ আছে। তিনিও সাংখ্য শাস্ত্র রচক বলিয়া বিখ্যাত। আবার কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার আছেন, এবং সেই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা এমন বর্ণনাও আছে। রামায়ণে ঐ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে সগর রাজার ষষ্ঠিসহস্র পুত্র তাঁহারই কোপানলে ভস্মীভূত হয়। যথা :—

"বিভর্ত্তি যো জগৎ কৃৎস্নং, যস্তোৎপর্ত্তিন বিদ্যতে।
তে নাশ্ব বাসুদেবেন কপিলে নাপ বাহিতঃ।
পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোয়ং দৃষ্ট স্তেনেতি মেমতিঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশোহমিত তেজসা।" বঙ্গীয় রামায়ণ।

ভাগবতে লিখিত আছে মহর্ষি কপিল, মুনিবর কর্দ্দমের ঔরষে তদীয় পত্নী দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু বেদব্যাস বলেন, যিনি স্বয়ং পাপ শূন্য হইয়াও কাম্য কর্ম্মরূপে পাপের প্রবর্ত্তন করেন এবং তজ্জন্য যাহাকে যতিগণ পরমর্ষি কপিল নামে নির্দ্দেশ করেন, তাহারও নাম কপিল; ইনি সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক। মহাভারতের অন্য একস্থানে কপিলের উল্লেখ আছে, যাঁহার নিকট সূর্য্যরশ্মি গো-জঠরে প্রবেশপূর্ব্বক ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিবসংহিতাতেও এক কপিলের বর্ণনা আছে, যিনি যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ

বৌদ্ধদিগের ইতিহাসেও কপিল মুনির প্রসঙ্গ আছে। তাঁহারা বলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে ইক্ষ্বাকু বিরোধক নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তিনি প্রথমা মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানকে রাজ্যদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায়, প্রথম পক্ষের কুমারগণকে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিত রাজকুমারেরা সহোদরা পাঁচটী ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া কপিল মুনির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হন। ঐ কপিল মুনি, তাৎকালিক বোধিসত্ব ছিলেন এবং পরে গৌতম বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কপিলের আদেশানুসারে রাজকুমারেরা অগ্রজা ভগ্নীকে পরিবর্জ্জন করিয়া অনুজা চতুষ্টয়াকে চারি ভ্রাতা বিবাহ করেন এবং ঐ স্থানের নাম কপিলাবস্তু নগর রাখেন। বহুকাল পরে ঐ নগরে তাঁহাদের বংশে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ শাক্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, যিনি শেষ মর্ত্ত বুদ্ধ।

আমি পণ্ডিতদিগের অনেক টীকা টীপ্পনী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি দেখিয়া সাংখ্য-শাস্ত্র রচক কপিলের ঐরূপ নানা পরিচয় প্রদান করিলাম; তন্মধ্যে সাংখ্য-সূত্র লেখক কে তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। লেখক যিনিই হউন না কেন, সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল—এই মতই প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার শিষ্য আসুরি; আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য; ইনি সাংখ্য দর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সব গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত দেখা যায়। অধুনা সাংখ্যশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তত্ত্বসমাসই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেহ কেহ ইহাকেই কপিল প্রণীত মূল সাংখ্য দর্শন বিবেচনা করেন। ইনি স্পষ্টতঃ প্রকৃতিবাদী, তজ্জন্য তাঁহার প্রণীত দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিবাদী হইয়াও বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২০ হইতে ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত অবিদ্যাবাদ খণ্ডন; ১৫০ হইতে ১৫১ সূত্রে একাত্মাবাদ খণ্ডন; ২৫ সূত্রে লিখিত

আছে,—"ন বয়ং ষট্ পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ" আবার ২৭ সূত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষনিকত্ববাদ খণ্ডনও আছে। উক্ত অধ্যায়ের ৯২—৯৪ সূত্রকে তামস সূত্র কহে, কেননা ঐ সূত্রদ্বয়ে বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মার অত্যন্তাভাব যথা :—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরা ভাবন্নে তৎসিদ্ধঃ উভয়থাপ্যসৎ করত্বং।" কপিলের মতে প্রবৃত্তি পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারে না, একারণ পুরুষের কর্তৃত্ব নাই, তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র। প্রবৃত্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য অসম্ভব, অতএব প্রবৃত্তি পরবশ না হইলে পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইতে পারে না। কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা সাংসারিক ত্রিতাপের মোচন সম্ভাব্য, সেই বিজ্ঞান লাভের তিনটী উপায়—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, এবং শব্দ; তাঁহার মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থ জিজ্ঞাস্য। আদি পদার্থ প্রকৃতি, অন্ত পদার্থ পুরুষ; প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য; তদ্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতি পদার্থ যথা—মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি। বোধ হয় মহর্ষি কপিলের মত গ্রহণ করিয়া মৎস্য পুরাণে প্রকৃতির সৃষ্টি ক্রিয়া ও গুণরাশি লিখিত হইয়াছে। আবার মহানির্ব্বাণ তন্ত্রখানাও সাংখ্যের শিক্ষাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কপিল সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে ভাবে অস্বীকার করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উপদেশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ বা মুক্তের অন্যতর হইবেন। যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাদি প্রবৃত্তি রহিত, সুতরাং কার্য্যক্ষম, যদি তাঁহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পারেন না। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে ঈশ্বরবাচক শব্দ আছে তাহা কেবল চাটুক্তি মাত্র। অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি অন্য দেবতার উপাসনা মাত্র। "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা

উপাসা সিদ্ধস্ত বা সিদ্ধময্য ব্রহ্মা বিষ্ণুহরা দেবে বানিত্যেশ্বর স্বাভিমানাদি মতোপি গৌণ নিত্যত্বাদি মত্বান্নিত্যত্বা হ্যুপাসাপরা"। সাংখ্যকারিকা। এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরের অভাবে বেদ কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে কপিল মীমাংসা করিয়াছেন যে বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়াতে আয়ূর্ব্বেদের ন্যায় প্রমাণ। মহর্ষি কপিল বলেন যে, বিজ্ঞানই অপবর্গের অর্থাৎ মুক্তির অমোঘ উপায়; কিন্তু রাগ দ্বেষাদি চিত্ত বিকার বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক তন্নিমিত্ত ধ্যান অবলম্বন করিয়া রাগ দ্বেষের দমন এবং মনের শান্তি ও বিজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তিনি ধ্যানের অর্থ করিয়াছেন যে, ধ্যান চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ ধ্যায়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, দমন ও জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা এবং বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে। যথাঃ—"রাগো-পহতির্ধ্যানং, জ্ঞান প্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগ-শ্চিত্তস্য তদুপঘাত হেতুর্ধ্যানং বৃত্তি নিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ধ্যেয়াতিরিক্ত-বৃত্তি-নিরোধ-রূপেণ সম্প্রজ্ঞাত যোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তি-জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতি। ধারণাসন স্বকর্ম্মনা তৎসিদ্ধিঃ। নিরোধ-শ্ছর্দ্দি-বিধারণাভ্যাং। স্থিরমুখ-মামনং। স্বকর্ম্মস্বাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানং। বৈরাগ্যাদভ্যামাচ্চ।" সাংখ্য কারিকা। সংসার এবং সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অসার এবং মিথ্যা; মহর্ষি কপিলের এই সার কথা, বাস্তবিক কথাও যথার্থ তাহার সন্দেহ নাই; এবং এই কয়েকটী কথার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, সাংখ্য দর্শনই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলভিত্তি। কপিল নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও নিরীশ্বর, কপিল সংসার দুঃখে কাতর, বুদ্ধদেবও কাতর। কপিল বলেন—দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা, বুদ্ধদেবেরও ঠিক এই মত। ফলতঃ বৌদ্ধদিগের ক্ষনিকত্ববাদ সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন। কেবল সাংখ্যকার কপিলই যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এমত নহে, লোকায়তমত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতিও তাঁহার পূর্ব্বতন তাহার সন্দেহ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে

লিখিত আছে—"বৃহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মস্তকে পদাঘাত করেন, তাহাতে গায়ত্রীর মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু গায়ত্রী অমর, তজ্জন্য প্রত্যেক খণ্ড মস্তিষ্ক কণা হইতে এক একটী বষট্‌কার দেবের উৎপত্তি হয়।" "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচর।"—তখন তাঁহা কর্ত্তৃক যে সর্ব্ব প্রথমে এই ব্রহ্ম ভূমিতে নাস্তিক্য মত প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিকেই প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন।— "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোহর্থ নির্ণয়। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"।

সাংখ্য দর্শন মধ্যে যে সকল সূত্রে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সূত্রগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সাংখ্যসূত্র ১ ; ৯২—৯৪। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"
"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতর ভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ"
"উভয়থা-প্যসৎ করত্বম্".

ঐ ৫ ; ১০—১১। "প্রমাণা ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ"
"অহঙ্কার কত্র ধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ"

ঐ ৬ ; ৬৪— "নেশ্বরাধীনা প্রমাণা ভাবাৎ।"

"অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। আর জগৎ সৃষ্টির প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে? যদি তাঁহাকে বদ্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়; কিন্তু বদ্ধ হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। অতএব এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আর যদি তাঁহাকে মুক্ত বল, তবে ত তিনি পরিপূর্ণ আপ্তকাম হইলেন; তাঁহার কোনই প্রয়োজন—কিছুরই অপেক্ষা থাকিতে পারে না। তিনি কেন সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? যদি বল পরদুঃখ প্রহরণের জন্যই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি যদি করুণাময় তবে দুঃখের সৃষ্টি করিলেন কেন? জীবকৃত কর্ম্মের বৈচিত্র

অনুসারে বিচিত্র প্রাণি সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন—এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ কর্ম্ম ত অচেতন, চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম্ম কিরূপে ফল জন্মাইতে পারে?" "Max-Muller, Indian Philosophy—Page 397—এইকথা লেখা আছে—"Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God, He simply says—and in that respect he dose not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that Existence, but neither does he offer any such proofs for denying it," আমি এস্থলে ঐঅংশটুকু অনুদিত করিলাম না, পাঠকবর্গ আপন আপন বিবেচনানুসারে বিচার করিয়া লইবেন।

এই সকল দুর্ব্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া জগতের কি এত উপকার করিয়াছেন? এ সকল যুক্তি তাঁহাদের নিকট কিরূপে সমীচীন বোধ হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। পুনশ্চ, তত্ত্বসমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের কোন কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের যে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, সাংখ্যেরা তাহা স্বীকার করেন না; সেই জন্যই সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকারে পণ্ডিত মাধবাচার্য্য সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"এতদর্থে নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাং মতমুপণ্যস্তম্"। পুনশ্চ, প্রচলিত সাংখ্যমতে যখন ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত, তখন অবশ্য সাংখ্যেরা এস্থলে "পুরুষ" অর্থে ঈশ্বর বুঝেন না, জীব বুঝেন। অতএব মূলতত্ত্ব বিকৃত হইয়া সাংখ্যমত এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, জীব ও প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়। তাহাই যদি হইল, তবে প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম-বাদের কি গতি হইবে? দ্বিতীয় কথা, সাংখ্যমতে যখন পুরুষবহু, এবং প্রত্যেক পুরুষই সর্ব্বব্যাপী, তখন যতদিন না সমস্ত পুরুষের মুক্তি সিদ্ধ হইবে, ততদিন প্রকৃতির পরিণাম কিছুতেই

নিবৃত্ত হইতে পারে না। অথচ, সাংখ্যেরা বলিতেছেন যে, কোন এক জীব বিবেক জ্ঞানলাভ করিলে প্রকৃতির পরিণাম নিবৃত্ত হয়। তখনও তো প্রকৃতির সহিত কোন না কোন পুরুষের সংযোগ থাকে। তথাপি এরূপ হয় কেন? সাংখ্যেরা হয় তো বলিবেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীর সম্বন্ধে যে প্রকৃতির পরিণাম নিরুদ্ধ হয়, তাহা সমষ্টি প্রকৃতি নহে, ব্যাষ্টি প্রকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতির যে ভগ্নাংশ সেই তত্ত্বজ্ঞানীর লিঙ্গশরীর-রূপে প্রবিভক্ত ছিল, তাহারই পরিণাম নিরুদ্ধ হয়; কিন্তু অখণ্ড প্রকৃতির পূর্ব্বাপর যে পরিণাম প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা অক্ষুন্ন থাকে। জ্ঞানীর মোক্ষ প্রসঙ্গে যদি প্রকৃতির এইরূপ সংকীর্ণ অর্থ ধরা যায়, তবে যে স্থলে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে সৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, সে স্থলেও ঐরূপ সংকীর্ণ অর্থ কেন না গৃহীত হইবে? সাংখ্যেরা এই সংযোগকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে সন্নিধিমাত্রে উপকারী অয়স্কান্ত মণিতুল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অয়স্কান্তমণি যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লৌহের সংস্রবে না আসিয়াও লৌহকে গতিশীল করে, সেইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও সন্নিধিমাত্রেই প্রকৃতিকে পরিণামশীল করেন। সাংখ্যদিগের অয়স্কান্তমণির দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। কারণ সাংখ্যমতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার। অয়স্কান্তমণি কি তাই? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিয়াছি যে, অয়স্কান্তমণি ক্রিয়াশীল চৌম্বক শক্তির কেন্দ্রস্থল। সুতরাং এস্থলে সাংখ্যের উক্ত দৃষ্টান্ত আদৌ যুক্তি সঙ্গত নহে।

আমরা এক্ষণে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

"ফলনিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, তাহা কর্ম্ম দ্বারা হয়, আবশ্যক কর্ম্মদ্বারা। ঈশ্বরের যদি কার্য্যশক্তি থাকে তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে; কিন্তু অভিপ্রায় তাৎপর্য্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন। সাংসারিক ঈশ্বর অজ্ঞানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র। রাগ-বিরহে সৃষ্টি সম্ভবে না, কিন্তু রাগ থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হানি হয়। রাগের অর্থ উৎকট ইচ্ছা, ঈশ্বরে যদি উৎকট ইচ্ছা সম্ভবে তবে তিনি আমাদের ন্যায়

বিষয়াসক্ত হইলেন। তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বল, তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইবে। অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই। অনুমান প্রমাণও সম্ভবে না, কেননা সম্বন্ধাভাব এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রকৃতিই সিদ্ধ হয়।" এই সাংখ্যদর্শন কোন সময়ে রচিত হয় তাহার প্রমাণাভাব। কেবল সূত্র সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বর কৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"এতৎ পবিত্রমগ্রং মুণিরাসুরয়েহনুকম্পয়া প্রদদৌ, আসুরিরূপি পঞ্চশিখায়, তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রং। অর্থাৎ 'ঋষি দয়া করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র প্রথমে আসুরিকে দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে, পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।' মহাভারতে লিখিত আছে, মিথিলাধিপতি জনকের নিকট কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ উপস্থিত হইয়া সাংখ্যযোগ বিষয়ক অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহাত্মা আসুরীর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য।

সাংখ্যদর্শন হইতে অন্য বিষয়ের উৎপত্তি ও তাহার প্রমাণ

সাংখ্য-দর্শন-কার কপিল এইরূপে আপন মত বিবৃত করিয়া স্পষ্টরূপে জগৎকে দেখাইয়াছেন। এই সাংখ্যদর্শনের "প্রকৃতি এবং পুরুষবাদ" লইয়াই পুরাণ রচকেরা স্ব স্ব পুরাণে দেব-দেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা "প্রকৃতিকে জগন্মাতা" ও "পুরুষকে জগৎ পিতা" স্থির করিলেন। কেননা শিব পুরাণ রচক স্পষ্টতঃ "পুরুষকে উদাসীন" বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থবিদঃ প্রভো"
"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবৃর্ত্তিনীম্"।
"তদ্দর্শিনমুদাসীনত্বামেব পুরুষং বিদুঃ"।

এইরূপে প্রকৃতি এবং পুরুষকে মাতাপিতা কল্পনা করিয়া জগতের স্রষ্টা স্রষ্ট্রী পদে অভিষিক্ত করিলেন। শৈবেরা মহাদেবকে জগৎকর্ত্তা পুরুষ

ও পার্ব্বতীকে জগৎকর্ত্রী প্রকৃতি সাজাইলেন। আবার অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই উদাসীন পুরুষকে কৃষ্ণ ও গোপকন্যা রাধিকাকে প্রকৃতি সাজাইয়া ভারত রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। শৈবগণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকার বিশেষ কৌশলে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি উহাতে দর্শনের পরিসীমা, কাব্যের উচ্চতর প্রাণ একাধারে সম্মিলিত থাকায় রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন মতে ঐ প্রণয় অপবিত্র না হইয়া আরও প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করে, কেননা সাংখ্যদর্শন মতে জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে আসক্ত। কিন্তু যৎকালে ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ তখনই জীবের মুক্তি। ইহা অতীব প্রগাঢ় বিষয়, সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানপথাতীত। আমার মনে হয়, সেই জন্যই ভাগবতকার দর্শন ও কাব্য একত্র মিলাইয়া "পুরুষকে" স্বীয় কাব্য মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ" ও "প্রকৃতিকে" "রাধা" সাজাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের আসক্তি এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ যে জীবের মুক্তি তাহা বাল্যলীলায় দেখাইলেন, সাংখ্যদর্শন মতে ইহাদিগের মিলনই দুঃখের মূল, তাই কবি অপবিত্র করিয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলা দেখাইলেন। পুরাণ রচকেরা প্রায়ই ঈশ্বরকে অবতার কল্পনা করিয়া মৎস্য, কূর্ম্মাদি, প্রভৃতি দশ অবতার লিখিয়া গিয়াছেন এবং এক-এক অবতারে এক একটীর বিশেষ কারণ দেখাইয়াছেন। যৎকালে প্রলয়-পয়োধি-জলে সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত ছিল। তখন বেদ উদ্ধার নিমিত্ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতার পরি-কল্পিত হইয়াছে, যাহা হউক মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে—

"গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমানস্ত ত্রয়ংব্রহ্মা বিজিজ্ঞিরে
একাদেবাস্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।"

গুণের ক্ষোভ কেবল সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের ক্ষোভমাত্র আর তাহা হইতেই ত্রিদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ গুণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংসক্তাবস্থা। বিচ্ছেদ হওয়াতেই সৃষ্টিকামনা এবং তাহা হইতেই

পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইয়াছে। পরে "সাধকাণাং হিতার্থায় ব্রহ্মণে রূপকল্পনা"—এই বচন রচনা করিয়া ভারত রঙ্গভূমিতে দেব-লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন। এই সাংখ্যদর্শনকার প্রমাণাভাবে যদিও স্পষ্টতঃ ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দিগ্ধ, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কপিলের মহিমা অনেক সেশ্বর-বাদিরাও মুক্তকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন। "তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ"। শ্বেতাশ্বর উপনিষদ।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্য বিশারদ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটীকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশ আদি পঞ্চভূত, ও মন এই ষোড়ষটি ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পদার্থে লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেরূপ ক্রমশঃ সাগরে সমুৎপন্ন হইয়া সাগরেই বিলীন হইয়া যায়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেরূপ দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টি সময়ে বিবিধরূপ ও প্রলয় সময়ে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এস্থলে একটী বিষয় স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে, পুরুষের সন্নিধি ভিন্ন যদি প্রকৃতির পরিণাম সিদ্ধ না হয়, তবে সাংখ্যেরা প্রলয়কালে (যখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন সংযোগই থাকে না) সে সময়ে প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ পরিণাম কিরূপে সিদ্ধ করিবেন? হয়, উক্ত পরিণাম কাল্পনিকমাত্র, আর না হয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ পরিণামের প্রকৃত কারণ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু ন্যায়দর্শনোক্ত আত্মার সহিত তুলনায় বিচার করিলে সাংখ্যদর্শনোক্ত আত্মা যে অনেক নিকৃষ্ট এ বিষয়ে

কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীবাত্মা ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তন্নিবন্ধন তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন, ইহা বলিবই বলিব। পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতি তত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন এ প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক ও চতুর্ব্বিংশতি তত্বাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের মতে যখন ঈশ্বরাভাব তখন বেদের প্রামাণ্য কোথায় থাকে ?

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মত

সাংখ্য শাস্ত্র নিরিশ্বর শাস্ত্র। ইহা আমি তত্বসমাস, কারিকায় ও প্রবচনসূত্র হইতে দেখাইয়াছি। পাতঞ্জল দর্শন হইতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) সাংখ্য দর্শনকে পৃথক করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর বলা হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন যে, সূত্রকার "অভ্যুপগমবাদ" অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। পণ্ডিত মোক্ষমূলারও কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন। Indian Philosophy, page 865. পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু একথা মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে সাংখ্য যথার্থই নিরীশ্বরবাদী। পণ্ডিত মাধবাচার্য্যও "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে" বাচস্পতি মিশ্রের মতের অনুমোদন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার স্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন—২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত দেখা যায়। গীতার ১৪।১ শ্লোকের ভাষ্যে তাঁহারা লিখিয়াছেন.—"স চ ক্ষেত্রে ক্ষত্রজ্ঞয় সংযোগা নিরীশ্বর সাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্রেণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছৈবেব"। "তত্র নিরীশ্বর সাংখ্য মত নিরাকারনেন

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগম্য ঈশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্"। ইহা হইতেছে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে—সে সংযোগ ঈশ্বর পরতন্ত্র। ইহা মধুসূদনের ব্যাখ্যা। Dr. K. M. Banerjee তাঁহার কৃত The Relation Between Christianity & Hinduism নামক গ্রন্থের এক স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—"সে কালের পণ্ডিতেরা যে সকল দর্শনশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন সেই সকলের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব যে কত বড়, তাহা দেখিতে পাইবে। আবার কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলেন; নানামতের যে সকল দর্শন শাস্ত্র দেখ, ও সকল এ সংসারের কুলোকের মন গড়া কথা। সমাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ সকল রচনা করিয়াছে। আবার আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নানা দার্শনিক মতের স্থাপনকর্ত্তাদের পরস্পর বড়ই অমিল। একজন আর একজনকে অতি ঘোরতর আক্রমণ করেন। সাংখ্যকার কপিল বেদান্তের উক্ত সকলকে "বালক বা পাগলের উক্তি" (বালোন্মত্তাদি সমত্বং) বলেন। মিমাংসক বা মিমাংসাকার বলেন যে' "বেদান্তে বৌদ্ধ মত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধং) আর বৈদান্তিককে বলা হইয়াছে, "তুমি ত লজ্জাহীন এবং স্পষ্ট নাস্তিক চূড়ামণি" (লজ্জাভয়োভয়ত্যাগসাস্তিকস্য প্রভুর্ভবান)। আবার বৈদান্তিকেরা বৈশেষিক বা পরমানুবাদীকে "দানা খেকো" (কনভুক্ঃ) বলিয়া বিদ্রূপ করেন, আর ন্যায় ও মিমাংসা নিরীশ্বরবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। শঙ্করাচার্য্য কনাদকৃত বৈশেষিক মত বা পরমানুবাদের বিষয় বলেন যে উহাতে ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে তিনি মীমাংসকের প্রমুখাৎ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর কর্ম্মের ফলদান করিয়া থাকেন, এ কথা মঙ্গল নহে, কারণ একটি নিত্য কারণ হইতে নানাপ্রকারে ক্রিয়ার উৎপাদন হইতে পারে না" ঈশ্বরস্ত ফলং দাদাতোত্যনু পপন্নং অধিচিত্রস্য কারণম্য বিচিত্র কার্য্যানুপপত্তে)। আর একজন পণ্ডিত মিমাংসকের

প্রমুখাৎ বলেন "পৃথিবীর সৃষ্টি স্থিতি পালনকর্ত্তা ঈশ্বর নাই" (দেবো ন কশ্চিদ্ভুবনস্য কর্ত্তা ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপি চ কশ্চিদাস্তে। আমার মনে হয় এই সকল বিভিন্ন শিক্ষা ও মত দেখিয়া পদ্মপুরাণে মহাদেব দর্শন শাস্ত্রগুলিকে তামস বলে ভ্রান্তশিক্ষা বলিয়াছেন। Dr. K. M Banerjee কৃত Dialogues on Hindu Philosophy. P. 37. টীকা দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত J. Murdoch কপিলের সম্বন্ধে এইমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন—"Its Atheism.——It is true that Sutra 93 Iswraseddih (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ) The existence of Iswara is a think unproved," seems only agnostic ; but the possibility of His existence is denied in the next sutra. If free and unbound, He cannot be either, and there fore cannot exist."—Quoted by Dr Mullens, Hindu Philosophy p.p. 181, 182.

সাংখ্যমতে মুক্তিপথ

"সাংখ্য শাস্ত্রে কৈবল্য লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরত নাই-ই ; যদিই বা থাকিতেন, তাহা হইলেও সাংখ্য দর্শনের উদ্ভাবিত প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত জীবের কোনওরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হইত না ; কারণ সে মতে সাংখ্য দর্শনোক্ত পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভুত নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্য লাভ করিবে। ইহাই সাংখ্য প্রদর্শিত মুক্তিপথ। বলা বাহুল্য, গীতার অনুমোদিত পথ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে পর্য্যটন করিতে হয়। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাংখ্য দর্শন ও গীতা ব্যাখ্যায় ঐ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। পুনশ্চ, এ সম্বন্ধে Max Muller এইরূপ লিখিয়াছেন,—"There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but there is none for

God, whether as the Creator or as the ruler of all things, there is no direct denial of such a being, no out-spoken atheism in that sense, but there is simply no place left for Him in the system of the world, as elaborated by the old Philosopher—Indian Philosophy, Atheism of Kapila —Page 397."

অপর পক্ষের উত্তর

নানা কারণে সাংখ্যকারকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী কহেন। অপর পক্ষের দল উত্তরে বলেন—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন; যদি তিনি ঈশ্বর স্বীকার না করিতেন তাহা হইলে "ঈশ্বরাভাবাৎ" ইত্যাকার কোন সূত্র রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র রচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়—তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর আছেন। সাংখ্য সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৬—৫৭ সূত্রে "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধি সিদ্ধাঃ এবং "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" এই দুই বাক্য আছে দেখিয়া ও কেহ কেহ সাংখ্যকারকে আস্তিক বলিয়া মান্য করেন। বিজ্ঞানভিক্ষু নানারূপ তর্ক বিতর্ক দ্বারা এই তত্ত্বই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ সূত্রের সম্বন্ধে প্রতিপক্ষগণের আপত্তি দেখিতে পাই—তাহারা বলেন, "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা, এবং স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" প্রভৃতি বাক্য ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না, কারণ উহা মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কপিল "জন্য-ঈশ্বর" স্বীকার করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার কৃত "ধর্ম্ম বিজ্ঞান" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, কপিলের ধারণা এই যে, সগুণ বা ব্যক্তি ভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিই যখন এই সকল বিভিন্নরূপ সৃজন করিতে সমর্থ, তখন ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে কপিল এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন, তিনি বলেন—

আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, আর এরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্ত্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। কপিল ঈশ্বর সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আসিয়া নিরব হইয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত আর কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। পুনশ্চ, "নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাসপদত্বাৎ' ৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু দেখাইয়াছেন সাংখ্যেরা "নিত্য ঈশ্বরের" প্রত্যাখ্যান করিয়া "জন্য ঈশ্বর" স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে জীব পূর্ব্বকল্পে প্রকৃতি-লয় প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্ত্তী কল্পে সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকর্ত্তা আদি পুরুষ রূপে আবিভূ ত হন। এইরূপ "জন্য ঈশ্বর" কপিল প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ অকিঞ্চিৎকরভাবে "জন্য ঈশ্বর" স্বীকার করা, আর না করা একই কথা। কারণ কপিলের মতে জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিলে এইরূপ দাড়ায় যে আপনি, আমি, এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারেন।" কপিলের মত এবং শঙ্করের অদ্বৈত মত উভয়ই একপ্রকার। আমরা এইরূপ "জন্য ঈশ্বর" হইতে শত হস্ত দূরে থাকিতে চাহি। এস্থলে খ্রীষ্টীয় দর্শন আসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—"সাংখ্যের ঈশ্বর নাই"— এই কথা মানিয়া লইলে আমাদিগকে সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এবং জগতের কোন প্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। বেদান্তও খ্রীষ্টীয়-দর্শনের ঐ উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, সুতরাং "সাংখ্যের ঈশ্বর নাই" অথবা "জন্য ঈশ্বর" বলা অশ্রদ্ধেয় ও যুক্তিহীন।

কপিল, আত্মাকে "নিগুর্ণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয়" পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ; কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন যে, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান, ও আনন্দের স্বরূপ। আমরা যত প্রকারে জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠতর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের

যত দূর পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়। আর তিনি অনন্ত সত্তাবান। বেদান্তের এ উক্তির সহিত খ্রীষ্টীয় দর্শনের ধর্ম্ম প্রকরণে কোন বিরোধ নাই. তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই যে একমাত্র জীবং ও সত্য ঈশ্বর আছেন, তিনি নিত্য স্থায়ী। অশরীর, অখণ্ড, অবিকার, তিনি অসীম শক্তি ও জ্ঞান ও ভদ্রতা বিশিষ্ট এবং দৃশ্যাদৃশ্য সমুদায়ের স্রষ্টা ও পাতা। যাহারা সাংখ্যের মত পোষণ করেন তাঁহারা যদি একবার দার্শনিক সাধু পৌলের এই সংজ্ঞার বিষয়টী গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে খ্রীষ্টীয় দর্শন কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়কে উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়াছে। সংজ্ঞাটী এই যথা—"ঈশ্বরের অনাদ্যনন্ত পরাক্রম ও স্বভাব" (রোমীয় পত্র ১; ২০) ইংরাজিতে যাহাকে (Eternal Power and Godhead বলে) সৃষ্টি কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া এবং পরিমেয় জীবাদি সমস্তই অন্য কাহার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া, কোন অপরিমেয় ও স্বতন্ত্র পুরুষ অবশ্যই আছেন; তবে তিনি কপিলের "জন্য ঈশ্বর" নহেন। যেহেতু জীবাদি পদার্থ মাত্রেই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিদ্যমান আছে, এবং তাহারা সততই আপন আপন কার্য্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে; কিন্তু তাহারা যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিদ্যমান আছে এবং যাহা সাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা তাহারা নিজে বুঝেনা; অতএব তাহারা অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বব্যাপী ও পরম বিজ্ঞপুরুষেরদ্বারা পরিচালিত হইয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ফলতঃ ইহা এতই সুস্পষ্ট যে সকল জাতিই এ তত্ত্বটি স্বীকার করিয়াছে; অতএব সাংখ্যের ঈশ্বর নাই" এ কথা দার্শনিক সাধু পৌলের শিক্ষার আমলে দাঁড়াইতেই পারেনা এবং এইখানেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। আর ঈশ্বর যে কেবল প্রকৃতির কার্য্যেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, ভবিষ্যদ্বাণী ও আলৌকিক কর্ম্ম দ্বারাও বারম্বার আপনার ঈশ্বরত্বও প্রকাশ করিয়াছেন; এই সকল কারণে, খ্রীষ্টীয় দর্শনের এই তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি প্রকাশ,

ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার, এবং স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে যে. দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কোন না কোন ঈশ্বর আছেন—ইহা স্বীকার করিলে কোন গোলই থাকেনা। আবার যদি কোন স্বতন্ত্র. আদি পুরুষ থাকেন, তাহা হইলে অন্যান্য সকলেই তাহার উপর অবশ্যই নির্ভর করে, সুতরাং তিনি ভিন্ন অন্য কেহই ঈশ্বর হইতে পারেনা। অধিকন্তু যখন ঐশ্বরিক গুণরাজির দুই জন আধারে থাকিতে পারেনা, এবং জগতের সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মবদ্ধ কর্ত্তৃত্বে প্রতীয়মান হইতেছে যে এক অদ্বিতীয় প্রভু আছেন, তখন স্বীকার করা হয় যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আর ঈশ্বরত্বের এই একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্বের প্রকৃতি এরূপ যে ইহার কোন ক্রমেই সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পাবে না। খ্রীষ্টীয় দর্শন এইরূপ ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে যাহার সকল অংশই অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয় এবং পূর্ণ সৎ প্রমাণে দণ্ডায়মাণ আছে। সাংখ্যের সাধারণ ভাব এই ঈশ্বর যদি থাকেন তবে অনুমান প্রমাণে তাহা আদৌ গ্রাহ্য নহে—এ কথারও উত্তর আছে; একাল পর্য্যন্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন জন্য অনুমান প্রমাণই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহলোকে শিষ্টের পুরস্কার এবং দুষ্টের দমন হয় না, ইহলোকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছে। যেমন ঘট, পটাদির কর্ত্তা আছে, তেমন এই বিশাল জগতেরও একজন নিশ্চয় কর্ত্তা থাকিবে, অতএব ঈশ্বর আছেন। এই প্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং ঈশ্বরত্ব নির্ণয় করাই রীতি। যে প্রমাণকে দোষযুক্ত প্রমাণ করা যায় না, তাহাকে কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করা যায়?

সাংখ্য এবং হার্ব্বাট স্পেন্সারের মধ্যে সৌসাদৃশ্য

সাংখ্য ও হার্ব্বাট স্পেন্সারের মধ্যে কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ সাংখ্যের যাহা প্রকৃতি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ম্যাটার (Matter, Element, Ether, Protyle) প্রভৃতি তাহারই নামান্তর মাত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। হার্ব্বাট স্পেন্সারও বলেন Matter কখনও উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। অপিচ

প্রকৃতির বিকৃতিই যে সৃষ্টির কারণ হার্ব্বাট স্পেন্সার তাহাও স্বীকার করিয়া বলেন "ম্যাটারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, সেই পরিবর্ত্তনই সৃষ্টি বিশেষ"। এ হিসাবে ডারুইনের বিবর্ত্তবাদ এবং সাংখ্যর প্রকৃতির বিকৃতি অভিন্ন বলিয়াও মনে হয়।

স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন সকল পদার্থের উপর "প্রোটাইল্" অবস্থিত, তাহাই জগতের প্রধান উপাদান, অন্যান্য পদার্থের সহিত তাহার ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে হিসাবে "প্রোটাইল" আদি পদার্থ এবং প্রকৃতি ভিন্ন তাহাকে অন্য কিছু বলিয়া মনে করা যায় না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ—বহুদিন হইতে এলিমেণ্ট (Element) বা ভূত সমষ্টির সমবায়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের হিসাবে সেই ভূত সংখ্যা কখনও ৬৫, কখনও ৬৬, কখনও ৭০ কখনও বা তাহার কম বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর-বাদ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের কি মত দেখা যায় ?

মহর্ষি কপিল যে কোন্ সময় সাংখ্য দর্শন ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন। ঐতিহাসিকের মতে বৈদিক যুগের পরে সূত্রযুগ। এই সূত্রযুগেই সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঐতিহাসিকদের নির্দ্দিষ্ট মতে বলিতে হইবে যে, সাংখ্যদর্শন খৃষ্ট শতাব্দীর * অন্যূন ৭০০ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মহাভারতে সাংখ্যমতের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। মহাভারত

* The period of the growth of the philosophic literatures of India begins from about 500 B. C. (about the time of the Buddha) and practically ends in the later half of the 17th Century though even now some minor publications are seen to come out. (See page 67, A History of

সূত্রযুগের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ইহাও ঐতিহাসিকদের মত। মহাভারতে সাংখ্যের উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু বেদান্তদর্শনের উল্লেখ কোন স্থলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। মহাভারত প্রণেতা মহর্ষি বেদ-ব্যাস বেদান্তদর্শনের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, অথচ তাঁহারই রচিত মহাভারতে বেদান্ত-দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, মহর্ষি বেদ-ব্যাস মহাভারত রচনার অনেক পরে বেদান্তদর্শন লিখিয়াছিলেন, অথবা বেদান্তদর্শন প্রণেতা ব্যাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বেদান্তদর্শন-রচয়িতা ব্যাসের নামের পূর্ব্বে বাদরায়ণ বলিয়া একটী বিশেষণ পদ আছে। এই ব্যাপারটীও বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা ব্যাসকে মহাভারতের প্রণেতা ব্যাস হইতে পৃথক করিয়াছে। দ্বৈপায়ন ব্যাস ও বাদরায়ণ ব্যাস দুই জন পৃথক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব।

সাংখ্যদর্শন দার্শনিক জগতের অতি প্রাচীন ও আদি গ্রন্থ ইহা স্বীকার করা যায়। অন্যান্য দর্শনগুলি সাংখ্যদর্শনেরই ক্রমোন্নতি বলিলেই চলে। মহাভারতের সময় সাংখ্যদর্শনের বহুল প্রচার হইয়াছিল, সাংখ্যসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মহাভারতের অনেক স্থলে বিশেষতঃ গীতা অংশে যে "সাংখ্য" কথাটির ব্যবহার হইয়াছে উহা সম্প্রদায়বাচক। সাংখ্যের পরেই মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র বা পাতঞ্জল দর্শন। এই দর্শনখানি সাংখ্যদর্শনের অনুবর্ত্তী সাংখ্যেরই ক্রমবিকাশ। মহাভারতে যোগেরও বিষয় আছে। যোগশাস্ত্রও তখন ভারতে বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। "সাংখ্যৈঃ" এই কথাটি যেমন মহাভারতে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি "যোগৈঃ" কথাটিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি তখন দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল।

Indian philosophy, by S N. Das Gupta, M. A. Ph. D.) গ্রন্থকর্ত্তার এই উক্তি সত্য বলিয়া আমার মনে হয়। ইহার সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। যাহারা দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন তাহারা দাস গুপ্ত মহাশয়ের উক্ত কথার অনুমোদন করিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা আমরা দেখিতে পাই সে গুলিও ঐ সাংখ্যদর্শন হইতে বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যকার ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু তিনি যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সেই সকল সত্য হইতেই ঈশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য জগতে এই দর্শনের গূঢ় রহস্যগুলি লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যখন এই তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ইহা হইতে যে অচীরে শুভ ফল ফলিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই সাংখ্যদর্শনের গূঢ়তত্ত্বগুলি এতই গভীর ও এতই দুরূহ যে বহু আলোচিত হইয়াও ইহা প্রাঞ্জলাকারে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ভারতে প্রাচীন ঋষিগণ ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য পুরাণাদিতে রূপকাকারে এই তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়াছেন। কালক্রমে তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ঐ রূপকগুলি প্রকৃত বস্তুর মতন হইয়া গিয়াছে। এবং সাধারণ পাঠক তাহার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান না করিয়া রূপকার্থ গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। পুরাণের পরবর্ত্তী টিপ্পনীকারগণের হাতে পড়িয়া উহার আর এক অবস্থা ঘটিয়াছে। টিপ্পনীকারগণের সময় ভারতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। যাহা কিছু বিদ্যা, তখন সমস্তই ন্যায়মূলক ছিল। ন্যায়ের রঙে রঞ্জিত করিতে পারিলেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা হইত। ন্যায়ের ছাঁচে ফেলিয়া ন্যায়ের ভাষায় যাহা কিছু লিখিত হইত, বিদ্বংসমাজে তখন তাহারই অধিক আদর ছিল। ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলেই তর্কের আবশ্যক হইত। তর্ক উঠিত—অযথা তর্কও উঠিত,—আসল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কমিয়া গিয়া অবান্তর কথা লইয়া অনেক তর্ক হইত। ইহার ভিতরে যে গূঢ়তত্ত্বগুলি নিহিত আছে তাহার প্রতি আর বড় লক্ষ্য থাকে নাই। সূত্রগুলির অভিধা বা শাব্দিক অর্থ লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল।

প্রমা ও প্রমেয়

দার্শনিক ভাষায় প্রমা ও প্রমেয় দুইটি কথা আছে। দ্বিতীয়টীর অর্থ গূঢ় ও প্রকৃত মর্ম, প্রথমটির অর্থ প্রমাণ বা তর্ক। টিপ্পনীকারদের লিখিত গ্রন্থগুলিকে ঐ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। উপরে যে ন্যায়ের তর্কের কথা বলা হইল প্রমা গ্রন্থগুলি ঐ ন্যায় অবলম্বনে লিখিত। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। পণ্ডিত-স্থলে ঐ গুলিরই আদর। প্রমেয় গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। ঐ জাতীয় গ্রন্থের আলোচনা সাধক অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছু কিছু আছে। ফল কথা কালক্রমে টিপ্পনীকারদের হাতে পড়িয়া দর্শনের বস্তুচিন্তা চলিয়া গিয়া বস্তুবিচার বাড়িয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় এখন সাংখ্যদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত আছে। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা সাংখ্যের অবস্থা আরও মন্দ, এই জন্য মহর্ষি কপিলের সূত্রগুলি পর্য্যন্তও লোপ হইয়া গিয়াছে; শিষ্য পরম্পরা-রচিত সূত্র বা কারিকাগুলি মাত্র পাওয়া যায়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীন কুমার মজুমদার, এম, এ; পি, এইচ, ডি, মহোদয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি বলেন :—

সাংখ্য দর্শন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে? সর্ব্ব প্রথমে আমাদের এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ, আপামর-সাধারণের ধারণা এইরূপ যে সাংখ্য নিরীশ্বর (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না), এবং ইহা যে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিশিষ্ট প্রমাণ দেয় না তাহা নয়, ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করে। এই ধারণাটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংখ্যের কতকগুলি সূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই সূত্রগুলির অর্থের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া কেবল উপর হইতে দেখিলে মনে হয় যে, বাস্তবিকই যেন সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিতেছে; এবং এই ধারণা আরও দৃঢ়ীকৃত হয় যখন আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র সাংখ্যদর্শনে কোনও

কোনও বিষয়ই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। আমরা এখন দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, সাংখ্য সম্বন্ধে এই নিরীশ্বর ধারণাটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; ইহা ঐ সাংখ্যসূত্রগুলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত—নতুবা সাংখ্যদর্শন বেদান্তদর্শনের ন্যায়ই সেশ্বর।

যে সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের নিরীশ্বর ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে সেগুলি এই :—

(ক)—১। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

২। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরা ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

৩। উভয়থাপ্য সৎ করত্বম্।

৪। মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।

৫। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ।

৬। বিশেষ কার্য্যেধ্বপি জীবানাম।

৭। সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ।

৮। অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিত-ত্বাল্লোবহদধিষ্ঠাতৃত্বম্।

(সাংখ্য প্রবচন-সূত্রম্, প্রথম অধ্যায়, সূঃ ৯২—৯৯)

(খ)—৯। নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তি কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। *

* (৯) কারণ বৃটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে তাহা সফল হয় একথা অযুক্ত। কর্ম্ম নিজ স্বভাবে ফল প্রদান করে। (১০) ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা (অনুমান) করিতে গেলে তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। (যেমন লৌকিক প্রভু নিজ উপকারার্থ কার্য্য করেন তেমনি, জগৎ কর্ত্তাও নিজ উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে। (১১) ঈশ্বরের উপকার ইহা স্বীকার করিলে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন। অর্থাৎ তিনিও রাগাদির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী, ও সুখ দুঃখভোগী। (১২) সংসার সত্ত্বেও যদি ঈশ্বর সংজ্ঞা দাও, তবে তাহা নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর। (১৩) রাগ থাকা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি

১০। স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।

১১। লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।

১২। পারিভাষিকো বা।

১৩। তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ।

১৪। প্রধানশক্তি যোগা চেচৎ সঙ্গাপত্তিঃ।

১৫। সত্তামাত্রা চ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্।

১৬। প্রমাণাভাবাপন্ন তৎসিদ্ধিঃ।

১৭। সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্।

১৮। শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য।

(সাংখ্য প্রবচন সূত্রম্, প্রথম সূঃ,—৫ম অধ্যায়, সূঃ ২—১২)।

এখন একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ এই সূত্রগুলি অথবা ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলিও সাংখ্য সম্বন্ধে নিরীশ্বর ধারণার পরিপোষকতা করে কি বিপরীত মতেরই পরিপোষকতা করে।

(ক)—১। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অসিদ্ধি (অপ্রমাণ) হেতু"। অথবা আরও বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়—"প্রত্যক্ষ প্রমাণ

নিত্য মুক্ত নহেন। (১৪) প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্ব, এরূপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা ভঙ্গ হইবে।

(১৫) প্রকৃতির সন্নিধান থাকায় ঈশ্বরত্ব, এরূপ বলিতে গেলে সকল আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি হইবে।

(১৬) প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ।

(১৭) সম্বন্ধের অর্থাৎ ব্যাপ্তির অভাব থাকায় ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না।

(১৮) শ্রুতি প্রমাণে প্রকৃতি কার্য্যতা (প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব) প্রমিত হয়।

সাংখ্য প্রবচন সূত্র হইতে আরও পদের উল্লেখ করা যাইতে পারিত কিন্তু বাহুল্যভয়ে সেই সকল সূত্র পরিত্যক্ত হইল। সেগুলিও নিত্য ঈশ্বরের নিষেধক। নিত্য ঈশ্বর নাই কিন্তু জন্য ঈশ্বর আছেন, ইহাই যে কপিলের অভিমত, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

দ্বারা যদি ঈশ্বর প্রমাণিত নাই হন, তাহা হইলে উহাতে কোনও দোষ হয় না। যেহেতু, ঈশ্বর প্রমাণের (প্রত্যক্ষ প্রমাণের) বিষয়ীভূত নহেন। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না অথবা অন্ততঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ হয় না, তাঁহারা এই সূত্রটীর উপরেই অধিক জোর দেন; সুতরাং, এই সূত্রটীকেই উপরি উক্ত সব সূত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ বিজ্ঞান-ভিক্ষু এই সূত্রটীর এইরূপ অর্থ করেন। "ঈশ্বরে প্রমাণাভাবায় দোষ ইত্যনুবর্ত্ততে" অর্থাৎ "ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ইহাতে কোনও দোষ নাই. ৯০ সূত্র হইতে শেষের এই দুইটী কথা আসিয়া বর্ত্তমান সূত্রের অর্থকে সম্পূর্ণ করিয়াছে"। তিনি আরও বলেন যে— "অয়ং চেশ্বর প্রতিষেধ এক দেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈ বেতি প্রাগেব প্রতি-পাদিতম্। অন্যথা হীশ্বরাভাবাদিত্যে বোচ্যেত" অর্থাৎ "পূর্ব্বেই প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে ঈশ্বরের এই নাস্তিত্ব কেবলমাত্র একদল লোকের মতেরই অনুযায়ী। তাঁহারা বিপক্ষদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। কারণ, যদি তাহা না হইত তাহা হইলে এই সূত্রটীর আকার এইরূপ হইত—"ঈশ্বরাভাবাৎ" অর্থাৎ "ঈশ্বরের নাস্তিত্ব হেতু" (এবং যেরূপ এখানে আছে যে ঈশ্বরের প্রমাণের নাস্তিত্ব হেতু এরূপ হইত না"।

অনিরুদ্ধ ভট্টও ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি বলেন "যদীশ্বরসিদ্ধৌ প্রমাণমস্তি, তদা তৎপ্রত্যক্ষচিন্তা উপপদ্যতে। তদেব তু নাস্তি, অর্থাৎ "যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষীকরণের চিন্তা যথার্থই উদিত হয়। কিন্তু তাহাই ত নাই"। সুতরাং এই দুই জন ভাষ্যকারেরই মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন না। অতএব উভয়েরই মতে যদিও উপরি উক্ত সূত্রটী দৃঢ়রূপে নাস্তিকতার (Atheism) সমর্থন করে না তথাপি ইহা অন্ততঃ অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) সমর্থন করে। কিন্তু

বাস্তবিক ইহাই কৌতুহলের বিষয় যে এই সূত্রটী ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ অস্বীকার করে তাহা ইহাদের কেহই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না।

সাংখ্য তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, তাহার মধ্যে আপ্তবচন একটি এবং ইহা এই বলিতেছে যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান সিদ্ধ নয়, তাহা আপ্তবচন সিদ্ধ। (সাংখ্য কারিকার ষষ্ঠ শ্লোক দেখ)। ইহা সুবিদিত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রুতিসিদ্ধ; সুতরাং সাংখ্য যখন বলিতেছেন যে, ঈশ্বরাস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই, তখন ইহা নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রমাণের কথা বলিতেছে। সেই প্রমাণটী কি? আমরা যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে উপরিউক্ত সূত্রটীর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধটী (Context) অনুধাবন করি, তাহা হইলে আমারা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধহইবার নয়, কেবল মাত্র ইহাই দেখাইবার জন্য সূত্রটী আসিয়াছে বা উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজেই বলিতেছেন যে-"ননু তথাপীশ্বর প্রত্যক্ষেহব্যাপ্তিঃ তস্য নিত্যত্বেন সন্নিকর্ষা জন্যত্বাৎ", অর্থাৎ "কিন্তু, তথাপি (পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ বলিতে পারেন) এই লক্ষণটী যোগী প্রভৃতিদের ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; কারণ, অন্ততঃ নিত্য হওয়াতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষের দ্বারা উদ্ভূত নহে—পূর্ব্বাপক্ষের এই অভিযোগের উত্তর স্বরূপই উক্ত সূত্রটী এখানে আসিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সাধারণতঃ প্রমাণের অস্বীকার করা হইতেছে তাহা নহে, তবে তাঁহার সম্বন্ধে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণই অস্বীকৃত হইতেছে; এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত বলিয়া তাঁহাকে আমরা আমাদের এই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা। সুতরাং উপরি উক্ত সূত্রটীর যথার্থ অর্থ হইবে—"ঈশ্বরস্য অসিদ্ধেঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবাৎ," অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাবের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না

থাকা হেতু”। যদিও বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার নিজের ভ্রান্ত অর্থের পরিণাম এড়াইবার জন্য বলিয়াছেন যে, এই সূত্র ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের নাস্তিত্বই স্বীকার করিতেছে তথাপি এই দুইটী বাক্যার্থ কার্য্যতঃ একই, অথবা আমি যেরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ নাস্তিকতার সমর্থন না হইলে ও অজ্ঞেয়বাদের সমর্থন হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষুর অর্থ যে ভ্রান্ত তাহা অন্য দুইটী সূত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেই আরও পরিষ্কাররূপে দেখান যাইতে পারে। সে সূত্র দুইটী এই—

(১) “তৎ সন্নিধানাদধিষ্টাতৃত্বং, মণিবৎ” অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণির ন্যায় প্রকৃতির সাভিপ্রায় সৃষ্টিকার্য্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য হেতুই সংঘটিত হয়, এবং (২) “অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলি তত্বাল্লোহবদ ধিষ্ঠাতৃত্বং” অর্থাৎ “লৌহের পক্ষে যেরূপ অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। ঈশ্বরের দ্বারা সচেতন হয় বলিয়া বস্তুর এই সৃষ্টিসক্তি অন্তঃকরণেরই”।

“তৎ” কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি ?

এই দুইটী সূত্রেই আমরা “তৎ” এই কথাটী দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত অর্থ কি? অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই বলেন যে, ইহা দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ সসীম জীবাত্মাকেই বুঝা যায়। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ঈশ্বরকেই বুঝায়, জীবাত্মাকে আদৌ বুঝায় না। সূত্রকার ৯৩ সূত্রে প্রথম ঈশ্বরের বিষয় বলেন, এবং পরবর্ত্তী অন্য সূত্র গুলিও ঐ একই বিষয়ের হইবে, কারণ ইহার কোনটীতেও জীবাত্মার বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা যদি উপরি উক্ত সূত্রগুলির প্রত্যেকটীকে অপর বাকী সূত্রগুলির সঙ্গে পাঠ করি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে ৯৬ ও ৯৮ সূত্রে যে “তৎ” কথাটী আছে তাহা ৯৩ সূত্রের “তৎ” কথাটীর ন্যায় অবশ্য সেই ঈশ্বরকেই বুঝাইবে, যাহা ৯২ সূত্রেও আছে।

(২) "মুক্ত বদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ," অর্থাৎ "এই জগতে মুক্ত অথবা বদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অপর কোনও প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ নাই; অতএব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে" বিজ্ঞান ভিক্ষু ইহার অর্থ ভিন্নরূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঈশ্বর দুঃখের দ্বারা বদ্ধও হইতে পারে না এবং তাহা হইতে মুক্তও হইতে পারেন না, অথবা তিনি অন্য কোনও প্রকার ধর্ম্মী হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। অনুরুদ্ধভট্টও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা "ঈশ্বর অন্য কোনওরূপ ধর্ম্মী হইতে পারেন না—ইহার দ্বারা কি বুঝেন? ঈশ্বর কি নিত্যমুক্ত নন, এবং সুতরাং ভিন্নধর্ম্মী? ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্নধর্ম্মী কোনও জিনিস থাকিতে পারে না; কারণ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ (জীবাত্মা) হয় বদ্ধ অথবা মুক্ত। সুতরাং উপরি উক্ত সূত্র এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় গোচর প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে এবং কেবলমাত্র এই অর্থই পূর্ব্ব সূত্রের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং এই সূত্রটী আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটীকেই সমর্থন করিতেছে।

(৩) "উভয়থাপ্য সৎকরত্বম্," অর্থাৎ "বিশেষ লিঙ্গযুক্ত প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ মাত্রই যখন মুক্ত অথবা বদ্ধ জীবসংজ্ঞাভুক্ত, তখন কাজেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন"। এই সূত্রটীর অর্থ আর পূর্ব্ব সূত্রের অর্থ একই। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে "অসৎকরত্বম" এর অর্থ "অক্ষমত্ব" অর্থাৎ কোনও জিনিস উৎপন্ন করিতে অক্ষমতা। কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন যে, কিরূপে হইতে পারে। ইহার অর্থ হওয়া উচিত "অসিদ্ধত্বম" অর্থাৎ "প্রমাণাভাব" এবং কেবল এই অর্থই পূর্ব্বসূত্রের অর্থের সহিত সামাঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। এখানে সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনওরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ইহার অর্থ পূর্ব্ব সূত্রের অর্থের

সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং হঠাৎ অপর একটী নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করিবে। অনিরুদ্ধভট্টও বলেন যে এই সূত্রটীও পূর্ব্ব সূত্রটীর ন্যায় একই বিষয় বুঝাইতেছে।

(৪) "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাস্য সিদ্ধস্য বা" অর্থাৎ "(ঈশ্বর বিষয়ক শাস্ত্র বাক্য সকল) হয় মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাবাচক অথবা সিদ্ধপুরুষদের উপাসনা পর, (বিজ্ঞানভিক্ষু); পক্ষান্তরে হয় মুক্তবৎ পুরুষদের অথবা যোগদ্বারা সিদ্ধ পুরুষদের প্রশংসা সূচক"। এই সূত্রটী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপই প্রযুক্ত হইয়াছে; শ্রুতি-স্মৃতি ও পুরাণের বহু জায়গায় এরূপ গল্প সকল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে বলা হইয়াছে যে ভক্ত ও যোগীরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া প্রশংসা বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য অবতীর্ণ মূর্ত্তির উপাসনাও হইয়াছে। ঈশ্বর যদি প্রকৃতই প্রত্যক্ষের বিষয় না হন, তাহা হইলে এ সব কি করিয়া সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে ইহা বুঝায় না যে ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই, কিন্তু শুদ্ধ ঈশ্বর বলিতে এখানে বুঝাইতেছে মুক্ত পুরুষদের অথবা যাঁহারা যোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা সিদ্ধিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বরস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং উপরি উক্ত সূত্রটী ঐ সকল কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পাবে না—এই মতের কোনও বিরুদ্ধাচরণ করে না। পরন্তু এখানে এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরি উক্ত সূত্রটী শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির যে সকল স্থানে প্রকৃত ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে সেই সকল স্থানের সত্যতা অস্বীকার করিতেছে না। অপর সূত্রগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল, উদাহরণ স্বরূপে যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাই পাঠকের বিচারের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। এই কথা মনে রাখিলেই হইবে যে "সাংখ্য"

দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের এই নিধির পুনরুদ্ধার যথা সম্ভব নিতান্ত আবশ্যক। চিন্তাশীল মনীষীগণ—যদি এই বিষয় মনোযোগ করেন তবে কতকটা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই দর্শনের আবিষ্কৃত সত্যগুলি যদি প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় তবে ইহা জড় বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক জগতে এক অভিনব-যুগ অবতারণা করিবে।

সাংখ্য দর্শনের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা

(১) সাংখ্যমতে পুরুষ (আত্মা) সর্ব্বগুণ বিহীন ও নিষ্ক্রীয়। জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, ও দুঃখ ইহার কিছুই নাই. তবে কি জন্য পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্য সাংখ্য দর্শনের এত আগ্রহ ও প্রয়াস?

(২) যদি সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা পুরুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, অপর সম্বন্ধ দ্বারা জ্ঞান প্রভৃতি লাভ অসম্ভব কেন?

(৩) নৈয়ায়িকের মতে গুণজন্য দুঃখ ভোগ ঘটিয়া থাকে, যদি এইমত স্থির হয়, তবে সমবায় দ্বারা আত্মার (পুরুষের,) দুঃখ ভোগ হইবে না কেন? নৈয়ায়িক মতের সহিত সাংখ্যমতের এ সম্বন্ধে উৎকর্ষা প্রকর্ষ বিবেচনা করা উচিত নয় কি?

(৪) "সুখ বোধ" হইতে "বোধ" পরিত্যাগ করিলে সুখের কোন সত্বা উপলব্ধি হয় কি? কাহার দ্বারা এই প্রভেদ বোধগম্য হইতে পারে?

(৫) আত্মা (পুরুষ) কোন্ গুণের দ্বারা বোধ লাভ করিতে পারে? এবং বাস্তবিক পুরুষকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে কি না?

(৬) সাংখ্য দর্শন, পুরুষকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত এত ব্যস্ত কেন? প্রকৃতির সহিত পুরুষের যখন কোন প্রকৃত সম্বন্ধ নাই, তখন কেবল অধ্যাসের জন্য, পুরুষকে এত দোষযুক্ত করিবার প্রয়োজন কি?

(৭) মানব মাত্রেই মরণাধীন, কিন্তু যদি আমি (মানব) মৃত্যু ভয়ে বলি, আমি মানব নই, তবে কি আমি মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইব?

(৮) সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বনির্ম্মিতার (সৃষ্টি কর্ত্তার) প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তবে, প্রকৃতির উল্লেখে এত অসিদ্ধ হয় কি প্রকারে? প্রকৃতি কি

কোন বিশেষ কার্য্য করিতে ব্যবস্থা করিতে পারে? এবং তাহা করিলেই কি কোন উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা? এবং যদি সচেতন কর্ত্তার দ্বারা বেদ কথিত না হইয়া থাকে, তবে বিধি নিষেধের ব্যবস্থা বেদ কি প্রকারে করিতে পারে? এবং সদসৎ কার্য্যের ফল সম্বন্ধেই বেদ কি প্রকারে মত প্রকাশ করিতে পারে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেদান্ত দর্শন

গ্রন্থকার পরিচয়

এই দর্শনকারের নাম বাদরায়ণ বা বেদব্যাস, এদেশের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, ইনিই পরাশর তনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। [১] পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে বাদরায়ণ ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পাশ্চাত্যের এ যুক্তি তত আদরের বলিয়া আমাদের মনে হয় না, কিন্তু বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণকে বেদব্যাস মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইনি উপরিচর রাজার দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বেদের বিভাগ করেন বলিয়া ইহাঁর অপর নাম বেদব্যাস হয়। এই মহর্ষি মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, উপপুরাণ ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। আমরা ইহাঁর প্রণীত দর্শনের মত সমালোচনা করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। তবে এক ব্যক্তি দ্বারা যে ঐ সকল গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে, ইহাতে ভারি সন্দেহ আছে।

(১) আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে "বেদব্যাস" সম্বন্ধে বিভিন্ন বিচার পরিলক্ষিত হয়, অন্য স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে।

"বেদের দুই ভাগ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্ম্ম-কাণ্ড, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড; কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড; এই জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা বেদান্ত। পূর্ব্ব মীমাংসা যেমন কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরোধ ভঞ্জন ও সামঞ্জস্য বিধানে নিয়োজিত, সেইরূপ বেদান্ত দর্শন জ্ঞানকাণ্ড বেদের (বেদান্তের) সমন্বয় সাধনে ও অবিরোধ স্থাপনে ব্যাপৃত। সেইজন্য এদর্শনের অপর নাম হইয়াছে "উত্তর মীমাংসা"। ব্রহ্মই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য সেই জন্য ইহাকে "ব্রহ্মসূত্র"ও বলা যায়। বেদান্ত দর্শনে সর্ব্বসমেত ৫৫৬টী সূত্র আছে; ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম চারি অধ্যায়ের সাধারণ বিষয় সমন্বয় অর্থাৎ স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্য সমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবিরোধ অর্থাৎ অন্যান্য দার্শনিক মতের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্ত মতে অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের সাধন অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের (সগুণ ও নির্গুণের) লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়েরফল, অর্থাৎ জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রান্তি এবং সগুণ নির্গুণ উপাসনার ফলের তারতম্য বিবেচিত হইয়াছে।

বেদের অন্তর্ভাগ বলিয়া উপনিষদ সমূহই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ এই কথা উক্ত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উপনিষদ গ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ তথ্যগুলির সহিত বেদান্ত দর্শনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, এত আর কিছুরই সহিত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দর্শন প্রাচীন ও আধুনিক কালের চিন্তাশীল হিন্দুদিগের চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের আক্রমণ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। সেই শঙ্করাচার্য্যই বেদান্ত দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরু। বেদান্ত দর্শনের বহুবিধ ভাষ্য প্রচলিত আছে, আমি সেগুলি এস্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এক্ষণে বেদান্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত, "বেদান্ত" শব্দের অর্থ বেদের

শেষ। এই সংজ্ঞাটী যুক্তি সঙ্গত নহে; কারণ বেদান্তের মত স্পষ্টই "উপনিষদ ও তদানুষঙ্গিক শারীরিক সূত্র প্রভৃতি পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে"।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকদার্শনিক আরিষ্টটল ১ প্রণীত দর্শনশাস্ত্রে বস্তু বা ব্যক্তি সকলের অপ্রকৃত কল্পনার পরিবর্তে প্রকৃত সত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিক প্লেটোর প্রচারিত দর্শনশাস্ত্রে বস্তু বা ব্যক্তি সমূহ অপ্রকৃত কল্পিত হইয়াছে। অতএব তুলনায় বুঝিতে হইলে আরিষ্টটলের দর্শনের সহিত ন্যায়দর্শনের যতটা মিল, প্লেটো দর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের সেইরূপ অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়—এইরূপ মত পণ্ডিত প্রবর Monier Williams তাঁহার স্বকৃত Hinduism নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার এই মত ভুল নহে, বরং অনেকেই ঐ কথার অনুমোদন করেন; এবং ব্যাখ্যার সহিত উল্লেখও করিয়া থাকেন। বেদান্তের মত অতি সরল, আর এইটীই উহার বিশেষত্ব। ছান্দোগ্য উপনিষদের মূল তথ্যটীই বেদান্ত দর্শন কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। সে মূল তথ্য এই যথা—"একমেবো দ্বিতীয়ং"—এক ভিন্ন আর দুই নাই—অর্থাৎ ব্রহ্মাই (ঈশ্বর) একমাত্র প্রকৃত সত্ত্বা, জগৎ মিথ্যা, আত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদান্ত দর্শনের মতে সকলই ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম। এই মত আবার দুই ভাগে বিভক্ত—পরিণামবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ এটি পরিণামবাদ। জগৎরূপে ব্রহ্ম ব্যাপৃত এই বিবর্ত্তবাদ।

সারকথা একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদয় মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি। এই সকল বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাদরায়ণের প্রথম সূত্রে—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—ব্রহ্ম পদার্থকে জানিবার অভিলাষ এবং উক্ত অধ্যায়ের ২য় সূত্রে "জন্মাদস্য যতঃ"—এই পদের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব

(১) আমার গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে গ্রীকদার্শনিক "আরিষ্টটলের ব্রহ্মবাদে" তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আরিষ্টটলের ঈশ্বর স্বীকার অতি গভীর ও চিত্তাকর্ষ।

এস্থলে আমরা বেদান্ত মতের কতকটা ইঙ্গিত বেশ বুঝিতে পারিলাম। মোট কথা ব্রহ্ম পদার্থই সকলের উপাস্য।

জগতের উৎপত্তি হেতু

বেদান্ত দর্শনের মতে জগতের উৎপত্তি হেতু অন্যরূপ, ন্যায়দর্শন বলেন, নিত্য পরমাণু সমূহের সমষ্টি হইতেই জগতের উদ্ভব। সাংখ্য দর্শন সাক্ষ্য প্রদান করেন যে সৃষ্টির কারণ—আদি জননী শক্তি। উহাই প্রকৃতি। প্রকৃতি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করেন না, আত্মা সমূহের সহিত একযোগ হইলেই প্রকৃতির কার্য্য হয়। কোন মতে, ঐ আত্মা নিচয় একটী পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনের মতে বিশ্বাত্মা হইতে স্বতন্ত্র কোন আত্মা নাই; এই জন্যই এই মতকে "অদ্বৈত" মত বলে। ফলতঃ নিত্য সত্ত্বার বিকাশ মায়ার আবরণে আবরিত হইয়া এই প্রত্যক্ষীভূত জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। [১]

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম কে?

ইহা বেদান্ত দর্শন এইরূপে মীমাংসা করিয়াছেন যথা—"অস্য জগতো নাম রূপাভ্যাং ব্যাকৃত স্যানেক কর্ত্তৃভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতি নিয়ত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়া ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্য রচনা রূপস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ"—অর্থাৎ, নাম রূপদ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তৃভোক্তৃ সংযুক্ত প্রতিনিয়ত দেশকাল নিমিত্ত ও ক্রিয়াকালের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনারূপ এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম।

---

(১) একদা এক ঋষি দর্শন ও পুরাণ রচয়িতা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহারা জগৎগড়া পণ্ডিত। ঈশ্বর জগৎ, নির্ম্মাণ করুন বা না করুন ইহারা করেন"। কথাটা উপেক্ষণীয় নহে। সত্য সত্যই, দেখা যায়, যিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তখন জগৎ গড়িয়াছেন। বস্তুত এ রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে।

আবার ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বেদান্ত সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য, আর সকলই অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। জরা, মরণ, ও সুখ দুঃখাদি সকলই অবিদ্যাজনিত। বোধ হয় সমস্তই মায়াদ্বারা রচিত, ও জগৎ প্রপঞ্চে পরিপূরিত। "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ; স্ব মায়ায়া রচিতং বিশ্বম্"। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারেন কি না তাহা সাংখ্য সূত্রের ২০ হইতে ২৪ সূত্রে সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদান্তিকদিগের মধ্যে দুইটী প্রসিদ্ধবাদ আছে, একটী পরিণামবাদ অপরটী বিবর্ত্তবাদ। ২। পরিণামবাদীরা বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সকলই ব্রহ্ম। বিবর্ত্তবাদীরা জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করেন। প্রথম বাদে পূজ্য পূজকের ভেদ নষ্ট, দ্বিতীয় বাদে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি অবস্তু হওয়াতে ইহাই সিদ্ধ যে, ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্য বিদ্যোন্মোদতরঙ্গিনী এইরূপ কটাক্ষ করিয়া বৈদান্তিক ও নাস্তিকের উপাখ্যান অবলম্বন করতঃ ভৎসনা করিয়াছেন, যথা,—"নাস্তিক—জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতংচেৎ কিংকল্পতেব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ। আকার শূন্যেন গতঃ ক্রিয়েন কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তি লোকে"।

শ্রুতিতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম"—অর্থাৎ যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়,ও যাহাতে স্থিতি করে এবং অবশেষে যাঁহাতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। পুনশ্চ ভগবদগীতাতেও এই উক্তি দেখা যায়, যথা—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতস্থ চাত্মনি"।

(২) বেদান্তভাষ্যে "বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায়"। অর্থাৎ ব্রহ্ম ইচ্ছানুসারে এই জগৎ আপনার স্বরূপ হইতে বাহির করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রকৃতির কোন বিকৃতি ঘটে নাই। তিনিই সুতরাং জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। শঙ্কর যে বলিয়াছেন, "জগৎ মায়াবীজ প্রভব তাহা মিথ্যা উৎপাদিত হইয়াছে।" (ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধন ২৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

রামানুজ স্বামী ও জগৎ এবং ব্রহ্ম এক, এই উপদেশ পরিহার করিয়া কেবল—প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়, ইহাই মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যথা —"যদ্রূপ, নানা জাতীয় বৃক্ষের নানাবিধ পুষ্পরস মিলিত হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে ত্রিদোষময় হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব সকল প্রলয়াবস্থায় ভগবানে বিলীনভাবে থাকিলেও সৃষ্টিকালে পৃথক হইয়া উৎপন্ন হয়। নদী ও সমুদ্রে ভেদ দেখা যায়, নদী সকল শুদ্ধ জলময় কিন্তু সমুদ্র লবণ জলে পরিপূর্ণ; তেমনি বিলক্ষণ গুণ নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দৃষ্ট হয়, নদী সকল চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইলে যেমন কোনও ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না, অথচ তাহাতে লবণ ও শুদ্ধ জলের বস্তুতঃ ভেদ থাকে, তেমনি জীব ও ঈশ্বর আপাততঃ একাকারে প্রতীয়মান হইলেও তাহাদের প্রকৃত ইতর বিশেষ ভাব থাকে। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে তাহা পৃথক করা অপরের অসাধ্য হইলেও হংসগণ জল বিভাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তেমনি লোক সকল লয় কালে সর্ব্বেশ্বরে বিলীন থাকে কিন্তু ভক্তেরা গুরুপদেশানুসারে তাহার ভেদ করিতে সত্বরেই সমর্থ হন। নির্ম্মলান্তঃকরণ সাধু ব্যক্তিগণ বলেন যখন আমরা উভয় বস্তুকেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন দুগ্ধে দুগ্ধ ও জলে জল মিশ্রিত করিলেই যে কেবল দুগ্ধ ও জল অভিন্ন হইয়া যায় তাহা হইতে পারে না; অতএব জীব সকল ধ্যান যোগ প্রভাবে পরম পুরুষে বিলীন হইলেও একতা পাইতে পারে না। রামানুজ এই প্রকারে অদ্বৈতবাদের বাধা দেখাইয়া দ্বৈতবাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, যথা, অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতি প্রবৃত্তো ভব। সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তজ ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরে। ফলতঃ এরূপ অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার রূপান্তর মাত্র. নহে কি? পুনশ্চ,—ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩ অধ্যায়ের ১৪ পদে এই বাক্য পাওয়া যায় —যথা, "সোঽহং এবং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—কয়জনে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারে? অনেকে বেদান্তসূত্রকে অদ্বৈতবাদের আদি কারণ

বলেন, শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের পক্ষপাতী, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া এরূপ করিয়াছেন, নচেৎ বেদান্তকে কেন অদ্বৈতবাদ বলিবেন? শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও অনেক অসংলগ্ন কথা বলিয়াছেন; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ M.A. Ph. D. মহাশয়ের কৃত "ব্রহ্মসূত্র—এবং জীবাত্মা" নামক গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে দেখিলেই মনে হয় যে তিনি শঙ্করাচর্য্যের পদানুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতমত স্থাপনে বহুল সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্যের দিকে তত মনোযোগ করেন নাই। আমরা কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যে দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই। অবশ্য তাহাতে শঙ্করের দোষ স্খালিত হইতেছে না। "এই ভুল যে শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন তাহা নহে; অদ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক; শঙ্করের পূর্ব্বেও অদ্বৈতমত সুপ্রচলিত ছিল; তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের যে কারিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অদ্বৈতমতের পরিণত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ভাষ্যে তিনি আত্মমত সমর্থনের জন্য উপবর্ষকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপবর্ষের ও পূর্ব্ববর্ত্তী যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে এবং সূত-সংহিতায় অদ্বৈতমতের সুস্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে" পণ্ডিত মোক্ষমুলার তৎকৃত—Indian Philosophy গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—"Sankara's is one only of the many traditionally interpretations of the Sustras which prevailed at different times in different parts of India and in different schools." পণ্ডিত মোক্ষমুলারও যথার্থ কথাই বলিয়াছেন —ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মতের বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের অনুমোদন করিবেন তাহা আর বিচিত্র

কি ?—কারণ এস্থলে আমরা দেখিলাম যে তাঁহার পূর্ব্বেও ঐ বিষয়ে ভাষ্যকারেরা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—এবং শঙ্করাচার্য্যও সেই ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্বৈতবাদকে নানারূপ বিচিত্রজনক মালমসলা দিয়া আরও বিচিত্রভাবে সাজাইয়াছেন। অদ্বৈতমত বিশদ করিবার জন্য অদ্বৈত মতাবলম্বিগণ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহুবিধ প্রকরণ-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন।

পুনশ্চ, বেদান্ত সূত্রগুলি শ্রুতির অনুগত, অথচ সে শ্রুতি এই কথা বলিতেছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষঃ পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি"। শ্বেতাশ্বরো-পনিষৎ ৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক। অর্থাৎ দুইটি সুন্দর পক্ষী প্রণয়ে মিলিত হইয়া সখ্যভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, একজন সুস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন, অপরটি নিরাহারে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন। এই দুইটি পক্ষীর ফলাশীটি জীবাত্মা, এবং নিরাহারিটি পরমাত্মা; আমরা অদ্বৈতমতাবলম্বিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি; এ বচনটি কি অদ্বৈতবাদের? উত্তরে বলিতে হইবে কখনই নয়, বরঞ্চ উহা দ্বৈতবাদের চরমোৎকর্ষ। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি কি পাওয়া যায়—"ভেদব্যপদেশাচ্চ, ভেদব্যপদেশাচ্চঅন্যঃ, অনবস্থিতে রসম্ভবাচ্চ নেতরঃ বিশেষণ ভেদব্যপ দেশা ভ্যাং চ নেতরৌ।" এই সূত্রগুলির দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ কথিত হইতেছে, না অভিনত্ব সমর্থিত হইয়াছে? "গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মা নৌ হি তদ্দর্শনাৎ" —ঋগ্বেদের এই সূত্র কি "দ্বাসুপর্ণা...... চাকশীতি" মন্ত্রটির অনুবাদ বিশেষ নহে? এই গুহা কি মানব দেহ নহে ও তৎপ্রবিষ্ট আত্মা দুইটির একটি পরমাত্মা ও অন্যটি জীবাত্মা—এইরূপ অবরোধ করাইতেছে না? ফলতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, সৃষ্ট ও স্রষ্টা অভিন্ন, চাকর ও মনিব একই—এরূপ ধারণা বড়ই ভিত্তিশূন্য ও যুক্তি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। "ব্রহ্মসূত্রের" মধ্যে জীব ও ব্রহ্ম এক বলিয়া কোন সূত্র নাই।

শঙ্করাচার্য্য উদ্দেশ্য ভুলিয়াই যে অদ্বৈতবাদ স্থাপনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলিবই বলিব।

"পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষার (অদ্বৈতবাদের) আদৌ সমর্থন করেন নাই; পূর্ণপ্রজ্ঞ, আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যের মতানুসারে নিজ দর্শন সংকলন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ শারীরিক মীমাংসার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর যে ভেদ আছে তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতির, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই এরূপ তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু "তস্য ত্বং" (অর্থাৎ তাঁহার তুমি) এই ষষ্ঠী সমাস দ্বারা উহাতে "জীব, ঈশ্বরের সেবক" এই অর্থই বুঝাইবে। আর এরূপ যোজনা দ্বারা এমত অর্থও বুঝাইতে পারে যে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এই মতে দুই তত্ত্ব, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদগুণের আশ্রয় স্বরূপ বিষ্ণুই স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইরূপ সেব্যসেবক ভাবাবলম্বী ঈশ্বর জীবের পরস্পর ভেদও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পরলোকে কিছুমাত্র সুখ লাভ হয় না; প্রত্যুত ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হয়। যদি ভৃত্য পদবীস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা "আমি রাজা"—এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করেন, আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যোতন পূর্ব্বক নৃপতির গুণোৎকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির সমুৎকীর্ত্তনরূপ তেজ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বলেন—অদ্বৈত

মতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছুই নয়। ঐ সূত্র সকলের মধ্যে কয়েকটি সূত্রের যথাশ্রুত তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইতেছে; যথা—"অথাতো ব্রহ্মাজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ "অথ শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ; আর "অতঃ" এই শব্দের হেতু অর্থ, ইহাগরুড়-পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহার প্রসন্নতা হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ঐ সূত্রের ফলিতার্থ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ এই যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য-নির্দ্দোষ অশেষমদ গুণাশ্রয় সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিব আনন্দতীর্থ কৃত ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত আদৌ টিকে না। আনন্দতীর্থ শঙ্করাচার্য্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া * দিয়াছেন। পুনশ্চ, রাজা রামমোহন রায়ের মতে জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তিনি অভাব হইতে তাহা সৃষ্টি করেন নাই, পরন্তু অচেতন জড় হইতেও তাহা উৎপন্ন হয় নাই অর্থাৎ ঈশ্বর জীবাত্মার উপাদান করেন। তিনি আরও বলেন, চৈতন্যাত্মক জীবের অধিষ্ঠান চৈতন্যকে (ঈশ্বরকে) স্বীকার করা যুক্তি সিদ্ধ হয়, কি অভাবকে, অথবা জড়াত্মক জগৎকে তাহার কারণ মানা যুক্তি সিদ্ধ হয়? যদি বলেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন করেন তবে নানাদোষ ইহাতে উপস্থিত হয়; তাহার এক এই যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ পদার্থ নহেন, প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান সিদ্ধ হয়েন যদি প্রত্যক্ষ মূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি মানা যায়, তবে ঈশ্বরের সত্তাতে কোন প্রমাণ

* কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ পুস্তক দ্রষ্টব্য।

থাকে না,—আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার শক্তি অপ্রমাণ হইবে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা, এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়। (বাং ব্রাহ্মণে সেবধি ১ম—সংখ্যা ৪৬৩ পৃষ্ঠা) এ মতে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ শিক্ষাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করা হয় নাই কি? ব্রহ্ম মীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে লিখিত আছে,—ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ। "যেমন অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, তেমনি নিঃশ্রেয়সের হেতু বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও হইয়া থাকে। যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া থাকে তাঁহার নাম ব্রহ্ম।

উপাদান কারণ কি নিমিত্ত কারণ?

ব্রহ্মকে সামান্য কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু তিনি উপাদান কারণ কি নিমিত্ত তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই। ঘট ও কুণ্ডলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যেমন উপাদান কারণ, জগতের প্রতি তিনিও কি তেমনি উপাদান কারণ, অথবা কুলাল ও স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণ? কোন্ কারণ তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন; যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিযুক্তি এবং অনুভব দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তখন ব্রহ্মকে নিমিত্ত কারণ ভিন্ন আর কোন কারণই বলা যাইতে পারে না। কেননা তিনি আদৌ অভিধ্যানপূর্ব্বক প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ শ্রুতি তাৎপর্য্যে তিনি অভিধ্যানপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত কারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আর লোক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে যে, ঘটাদির নিমিত্ত কারণ স্বরূপ কুলালাদিরা অভিধ্যানপূর্ব্বকই সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তদনুসারে তাহারা যাহা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়। এক একটি ক্রিয়ার নিষ্পত্তির প্রতি অনেকগুলি কর্ত্তা আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই লৌকিক যুক্তি আদি কর্ত্তাতে বর্ত্তাইলেও বস্তুতঃ কোন

হানি হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছে, তখন তাঁহার নিমিত্ত কারণ হইবার ব্যাঘাত কি? পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণরূপে গণ্য হওয়া অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্য এতদুভয়ের এক রূপতা হওয়াই অনুভব সিদ্ধ ও সম্ভব। বিবেচনা করিয়া দেখ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ দেখা যাইতেছে, তেমনি ইহার উপাদান কারণও সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ হইলেই শোভা পায়। ব্রহ্মতো তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নহেন, তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পাপ, শান্ত, নিরবদ্য এবং নিরঞ্জন বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন; অতএব স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, স্মৃতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মোতর কোনও পদার্থ এই জগতের উপাদান কারণ হইবে। যদি বল, শ্রুতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ আছে, তাহার উত্তর—কারণ। কিন্তু শ্রুতি নিমিত্ত কারণ পর; বরং আমরা এই বলিয়া মীমাংসা করিতে চাই যে, ব্রহ্মাই নিমিত্ত কারণ এবং ব্রহ্মই উপাদান কারণ, নচেৎ শ্রুতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েতেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। শ্রুতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্পষ্টাভিধানেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিষ্ঠাতৃবিহীন বলিয়া নিমিত্ত কারণ এবং তাঁহার আর স্বতন্ত্র প্রকৃতি নাই বলিয়া উপাদান কারণ।

বেদান্ত মতে মায়াবাদ দ্বারা যাহাই কেন প্রতিপন্ন হউক না, আত্মা যে নিত্যমুক্ত তাহার সন্দেহ নাই—। ভগবদ্গীতায় আত্মা জীব শরীরস্থ হইয়াও কিরূপে নির্লিপ্ত তাহা সাংখ্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। গীতায়—"প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মণি", এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—"অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্ত সর্ব্ব বস্তুষু, কিংতস্য বন্ধনং।" "অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি" "সর্ব্বতঃ পাণি পাদহস্তং সর্ব্বতোহক্ষি শিরোমুখং।" যাহা হউক, এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈতবাদের শাসন ত্যাগ করিলে কেবল যুক্ত্যানুযায়ী মায়াবাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মহাত্মা শাক্যসিংহও

শ্রুতি হইতে এই মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিক পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবাদের ঘোর প্রতিবাদী, যথা—"বেদার্থ বন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকং। ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ কারণম্।" মায়াবাদ সমচ্ছাত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমেবচ।" পদ্মপুরাণ।

"রামানুজস্বামী বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুগম করিবার জন্য বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, গন্থত্রয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর উপজীব্য রহিয়াছে, এ সম্পর্কে রামানুজের নামে প্রচলিত বেদান্ত-তত্ত্ব-সার গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। তবে রামানুজ যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক এমন কথা মানিবার কারণ নাই, কারণ,—তিনি স্বয়ংই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়ছেন, এবং তাঁহার "শ্রীভাষ্য" যে বোধায়নের প্রাচীন ভাষ্যের অনুসরণ তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। রামানুজের পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে বোধায়ণ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী ও যমুনাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিবরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ এখন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। তবে যমুনাচার্য্যকৃত "সিদ্ধিত্রয়" কিছুদিন পূর্ব্বে মুদ্রিত হওয়াতে আশা হয় যে, কালে হয়ত অন্যান্য গ্রন্থেরও উদ্ধার সাধন হইতে পারে। এইরূপে আচার্য্য পরম্পরাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রবাহিত ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইলেও বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুপ্রাচীন।"

রামানুজস্বামীর শিক্ষা

রামানুজস্বামীও জীব ও ব্রহ্ম এক, এই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"যেমন জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিদ্যা অবিদ্যা, দ্বন্দ্বভাবে পৃষ্ঠে লগ্ন হইয়া শাস্ত্র সম্মত আছে, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যমূলক মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" অর্থাৎ পরমানন্দে পরিপূর্ণ অমৃতসিন্ধু এবং "ত্বৎ" অর্থাৎ সংসার ভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। অতএব সেই ভিন্ন দুই পদার্থের কখনই একতা হইতে পারে না। বস্তুগত্যা উভয়ের পরস্পর ভেদ ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্ম জগতের অর্চ্চনীয়, তুমি তাঁহার উপাসক দাস। মায়াবাদীদিগের মতে কারণাভাবে ব্রহ্মকে কোনরূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। জগতের কর্ত্তা এবং এই জগৎ যে তাঁহা কতৃক ইহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। কোথায় সেই হলদত্র কুদ্দালধারী মানবগণ, আর কোথায় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদের পরিসীমা নাই। অহো! আমরা যৎপরোনাস্তি অধীন, শ্রমভরে খিদ্যমান, কিন্তু তিনি ভ্রূভঙ্গি করিবামাত্র এই সকল করিতে সমর্থ হন। এবম্বিধ প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের একতার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা কখনও সুখী কখনও দুঃখিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই পরমাত্মা পূর্ণ আনন্দময়। পরমাত্মা নিত্য, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, উপাধিশূন্য ও শুদ্ধসত্য; এবং এই জগতের একমাত্র সাক্ষী; কিন্তু জীব (মনুষ্য) সে প্রকার নহে। রে মূর্খ! যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন হইয়া তিনিই আমি, একথা কোন সাহসে বলিস্? মদোন্মত্ত দিগ্‌গজ কি কখন মশকের উদরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? কতিপয় বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ ও কুতর্কসাগরে নিমগ্ন, কুমার্গগামী, মিথ্যাকল্পনাতৎপর, ভ্রান্তনর, দিগ্বিজয়ীর ন্যায় নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ যথাতথা বলিয়া বেড়ায়, আমিই ব্রহ্ম এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ ব্রহ্মময়। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নিত্য পরমেশ্বরের গুণরাশি সত্বে সেই পরমেশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া নৈর্গুণ্যবাদ প্রচার করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্য্য।" এস্থলে দেখিলেন যে রামানুজস্বামী অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে কেমন কঠোর ভাষা

ব্যবহার করিয়াছেন। হাঁ, তিনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, কারণ অদ্বৈতবাদ সকল প্রকার ধর্ম্মভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, তাঁহাকে প্রেম, ভক্তি ও সম্মান ও আরাধনা করাই সত্য ধর্ম্ম। আমি ঈশ্বর হইলে কাহার সেবা করিব? আপনার পূজা আপনি করিয়া ফল কি? অদ্বৈতবাদীরা যখন দেবপূজা করে, তখন জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানতঃ মিথ্যার পোষকতা করে, আর কপটাচরণে লাগিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ বহুদেববাদের উন্নতি না করিয়া বরং তাহা আরও মন্দ ও কুৎসিৎ করিয়া তুলিয়াছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন,—যেই জীব, সেই ব্রহ্ম, তখন তাহাতে ভক্তির স্থান আদৌ নাই। কারণ ভক্ত ও ভজনীয় স্বতন্ত্র না হইলে ভক্তির উন্মেষ হইবে কিরূপে?

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয় বস্তু। আর যাহা সকলই অবস্তু। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে ইহা আসিল কোথা হইতে? এ জগৎ মিথ্যা কিরূপে ধারণা করি? এবং জীব যদি ব্রহ্ম হয় তবে তাহার সংসার দুঃখ কেন? কিসের জন্য সে সংসার সাগরের তরঙ্গ আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়? কেনই বা সে সংসার অনলের দাবদহনে সন্তপ্ত হয়? এবং জগৎ যখন মায়ামাত্র কাল্পনিক, অসত্য, অদ্বৈতমতে সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না; কারণ যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা ব্যথা হইবে কিরূপে? অতএব জগতের সৃষ্টি অনেকটা "রাহোঃ শিরঃ"—শিরোহীন রাহুশির—এই ধরণের কথা। এই ভাবিয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলার যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—"The fact being that strictly speaking there is with the Vedantists no matter at all in our sense of the word. Creation in our sense can not exist for

the Vedantists. The effect is always supposed to be latent in the cause. Hence Brahman is every thing and nothing exists besides Brahmans—Indian Philosophy.

বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদমতে জগৎ এবং ব্রহ্ম এক হইলে পাপপুণ্যের পূজ্য-পূজকের ভেদ নষ্ট হয়। এই মত পরবর্ত্তী উপনিষদেও দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন। যথা—"যত্রহি দ্বৈতমেবভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং বিজানতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং শৃণুয়া ত্তৎ কেন কথমভিবদে ত্তৎ কেন মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।" উপনিষদের এই বচনে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, যৎকালে দ্বৈতমত অনুভূত হয়, তখনই একজন অপর জনকে দেখিতে পায়, অপরকে আঘ্রাণ করিতে পায়, অন্যের কথা শুনিতে পায়, অন্য জনকে প্রণাম করে, অন্য জনকে সম্মান করে ও জানে; কিন্তু যদি সকলই আত্মময় হইয়া উঠে তবে কে কাহার বাক্য শ্রবণ, আঘ্রাণ, অভিবাদন ও কে কাহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে? সুতরাং ব্যাসের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বচন দ্বারা পূজা পদ্ধতির মূলে আঘাত করা হয়, কেবল ইহাই নয়; যদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তাহা হইলে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, সচ্চরিত্রতা, সাধ্বীভাব এসকল পৃথিবী হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তিরোহিত হইবে।

উপনিষদের আর একটি সূত্র এই—"সকল মিদমহঞ্চ ব্রহ্ম ভূতং যদি-সাৎ। ত্বমহং খলু তদাস্যাদাবয়োরৈক্যমেব। ধনজনসুতদারা মামকানা স্তদাস্ম্যমম তবয় ভবেয়ুর্ণাবয়ো রস্তিভেদ।

(শূন্য) নির্ণীত মদ্বৈত মতং ত্বয়া চেৎ বৌদ্ধৈস্তদা কো বিহিতোহ পরাধ।" ফলতঃ অদ্বৈতবাদ মতে পরব্রহ্মনির্গুণ, ক্রোধময় প্রভৃতিরূপে গণ্য হইয়া আমাদিগের ন্যায় ব্যবহার জীবি হইয়া দাঁড়ান। আমরা সর্ব্ববিৎ জগৎ প্রসবিতাকে নমস্কার করিয়া এমন দূষণীয় মত হইতে

শত হস্ত দূরে অবস্থান করিতে প্রস্তুত, কেননা তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন—"সবা অয়মাত্মা কামময়োহকামোময়ঃ, ক্রোধময়ো ক্রোধ-ময়োঃ হ ধর্ম্মময়োহ ধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।

এই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ যে বেদব্যাস স্থাপন করেন তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্তের অবিদ্যা এবং সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এক। তবে প্রভেদ এই যে, বেদান্ত দর্শনকার বলেন, ঈশ্বর আত্মশক্তি মায়াসহকারে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও সংহার করেন; খৃষ্টীয় দর্শনে মায়াবাদের কোন স্থান নাই বরং বাইবেলে একথা আছে যথা—"নিশ্চয়ই যাকোবের মায়াশক্তি নাই।"

সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণাক্রান্ত মায়া জড়, তাঁহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব আছে, বরঞ্চ পুরুষেরই কোনও ক্ষমতা নাই; তিনি উদাসীন সাক্ষীমাত্র। বেদান্তদর্শন মতে বেদব্রহ্মকার্য্য ও তুরীর ব্রহ্ম চৈতন্য অনাবৃত এবং নির্গুণ, তাঁহার স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোন পদার্থ না থাকায়, তিনি অদ্বিতীয়। বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রহ্মকার্য্য, কিন্তু যখন সেই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন নির্গুণের বেদ প্রচার আর বন্ধ্যার সন্তান প্রসব উভয়ই সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। বেদান্ত দর্শন সমগ্র ভারতের পণ্ডিতবর্গের নিকট আদরণীয় হইতে পারে নাই, কেননা অদ্বৈতবাদ মতে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইতে পারে না, অথচ পৌত্তলিক মতও অতি প্রাচীন। যাঁহার সজাতীয় কি বিজাতীয় সমতুল্য বস্তু নাই, তাঁহার আবার প্রতিমূর্ত্তি কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দু শাস্ত্রেই প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষা আছে, উদাহরণ স্বরূপে সংক্ষেপে এস্থলে কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—"মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।

ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে" (১) অর্থাৎ যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমাকে

ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা কেবল আপনাদিগকে শারীরিক দুঃখের অধীন করে, কখন মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং হিত্বাহর্চ্চাং ভগতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ"। অর্থাৎ সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান আত্মা-স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিমাদি পূজা করে সে কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করে।

"কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্ত স্যাত্মনি দেবতা"—অর্থাৎ কাষ্ঠ লোষ্ট্রতে দেববুদ্ধি মূর্খেরাই করে আর জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরমাত্মাতে দেববুদ্ধি করেন। আর একজন সাধক (২) তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) রূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ও কিরূপভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন তাহা পাঠকবর্গ দেখুন ঃ—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং স্তুত্যা-নির্ব্বচনীয়তাখিল গুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তেদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্"— অর্থাৎ রূপবিবর্জ্জিত তুমি, তোমাতে রূপের আরোপ করি, গুণাতীত, তুমি স্তবে তোমার গুণবদ্ধ করি, সর্ব্বব্যাপী তুমি, তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার বিকলতা সম্পাদন-বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।

নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু যাঁহার আদৌ আকার নাই, তাঁহাকে কল্পিত আকার বিশিষ্ট করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করিয়া' ইনিই আমাদের ঈশ্বর, এমত জ্ঞান করা কি অধিকতর কঠিন নহে! অধিকন্তু অপরাপর দেশের লোকেরা যখন নিরাকার ঈশ্বরের সেবা করিতে পারিতেছে, এদেশের লোকেরা পারিবে না কেন? হিন্দুর কি বুদ্ধি কম? আমি

(১) মহা নির্ব্বাণ।
(২) ব্যাসদেবের নিজোক্তি।

এস্থলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে—যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নয় যে আমি তাহাদিগকে জড়োপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া দোষকীর্ত্তন করিতেছি, তবে কি না খৃষ্টীয় দর্শন কল্পিত আকারের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না এইখানেই মারাত্মক প্রভেদ দেখা যায়। প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং লোগসের (Logos) নরদেহ ধারণ—এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। খৃষ্টীয় দর্শনের ইতিহাস মধ্যে দেখা যায় যে, "It has been truly said that the "Book of Daniel" is the first philosophy of history" এইটির দিকে যদি হিন্দুগণ দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। খৃষ্টীয় দর্শনের সর্ব্বপ্রধান পূর্ব্বাচার্য্য টারটুলিয়ান এবং বর্ত্তমানে খৃষ্টীয় শতাব্দীর লেখক চূড়ামণি থ্যাকারও বিদ্বেষভাব দূর করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রকৃতি-বাদ হইতে দ্বৈত-মত প্রচলিত হইয়াছে।

যাঁহারা সাংখ্যসূত্রের প্রকৃতিবাদ দেখিয়া মহর্ষি কপিলকে নাস্তিকের শিরোমণি বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিবেন, ঐ প্রকৃতিবাদ হইতেই দ্বৈতমত প্রচলিত হইয়াছে। শূন্য পদার্থের চিন্তা করা, আর বায়ুতে মুষ্ট্যাঘাত করা উভয়েই সমান। বেদান্ত-দর্শন মতে যে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করা সংসারী লোকের অসাধ্য ; বোধ হয় ঋষিদিগের মধ্যেও অতি বিরল। ভারতীয়দিগের যেরূপ ধর্ম্মগত প্রাণ তাহাতে যে তাহারা ধর্ম্মহীন হইয়া অবস্থান করিবে এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্প, তাই কতিপয় ঋষি সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষের ছায়া লইয়া দেব-দেবীর আরাধনা পদ্ধতি প্রচলিত করেন। মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদ এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিবাদ ভারতীয়দিগের বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য তাহার সন্দেহ নাই। তবে কিনা প্রকৃতিবাদীগণ প্রকৃতির একদিক

দেখিয়া শেষ করিয়াছেন। তাহারা অপরদিক আদৌ দেখেন নাই, এইখানে প্রকৃতিবাদীদিগের একটা দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়; এস্থলে খ্রীষ্টীয়দর্শন আসিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছে যে প্রকৃতির একদিক দেখিলে চলিবে না, উহার অপর দিকও দেখিতে হইবে। অপর দিক দেখিলেই বলিব "যে তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা" নিহিত আছে। সুতরাং "ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে"। বরং দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে ঈশ্বরের বিবিধ কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিয়া মনুষ্য তাঁহার ধন্যবাদ, গুণানুবাদ ও প্রশংসা করিবে ইহাই কি সার্ব্বজনীন শিক্ষা নহে? খৃষ্টীয়দর্শনের এই গভীর শিক্ষার সংস্পর্শে আসিলে একটি ভ্রান্ত ধারণা আপনা হইতে বিদূরিত হয় তাহা প্রথমোক্ত কথার প্রমাণে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। "তাঁহাতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা আছে।" এই বাক্যগুলি খ্রীষ্টীয়দর্শনের একটি বিশেষ সংজ্ঞা, একজন খ্যাতপন্ন লেখক ইহার যেরূপ মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি এবং দেখিবেন যে কিরূপ ভাবে—খ্রীষ্টীয়দর্শন ভ্রান্তশিক্ষা দূর করিতেছে। এবং এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা যদি এদেশের হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিচার করেন তাহা হইলে প্রচুর ফল ফলিবে। "That is, in His All-embracing power, Providence, and Governance, we are not to think of the Deity after a materialistic fashion, as a subtle essence or substance universally diffused through space, like wind or ether. This is the mistake of Pantheism. But we are to think of Him as an Almighty Person, omnipresent and omniscient, so that nothing lies beyond His knowledge and Controlling Might."

প্রকৃতির অপর দিকে যে ঈশ্বরের মহতী শক্তি আশ্চর্য্যরূপে নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া কার্য্য করিতেছে তাহা পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন? যাঁহারা কেবল প্রকৃতিবাদী তাহাদের এই বিষয়টি মনে রাখিলে ভাল হয় না কি? যাঁহারা প্রকৃতিবাদী বলিয়া সাংখ্যদর্শনকে নাস্তিক্য দর্শন বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে বিচার এ স্থলে নহে। যদি তাঁহারা যথার্থই ভ্রান্ত নামে সাংখ্যকে আখ্যাত করেন তাহা হইলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলিব যে খ্রীষ্টীয় দর্শনের ঐ পথটি লক্ষ্য করিয়া চলিলে আর কোন ভয়ের কি ভ্রান্তির কারণ থাকিবে না। আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি যে এ দেশের লোকেরা এখনও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় বিচারে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই; যাহারা পারিয়াছেন তাহারা সত্যের অপলাপ করেন না।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলেও চিরন্তন ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের মতে বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ দ্বৈতবাদী। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনেও দ্বৈতবাদ আদৃত হইয়াছে। দ্বৈতবাদে জীবাত্মা সকল পরস্পর ভিন্ন, ঈশ্বর এক, সুতরাং জীবাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ইহা বলাই বাহুল্য। ন্যায়দর্শন সাধারণতঃ দ্বৈতবাদী হইলেও নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্যের মত অন্যরূপ। তাঁহার মতে ন্যায়দর্শনের মত—"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতন্"—দ্বৈতও নহে অদ্বৈতও নহে। উদয়নাচার্য্যের মতে আত্মা দ্বৈতা দ্বৈত বিকল্পাতীত। ন্যায়সূত্র প্রণেতা গৌতম দ্বৈতাদ্বৈত বিষয়ে কোনরূপ বিচারের অবতারণা করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উদয়নাচার্য্য উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। (১) উভয় মতের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু বর্ত্তমানেই

(১) পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন ফেলোশিপের লেক্চার দ্রষ্টব্য।

রামানুজ স্বামীরই শিক্ষা সাধারণতঃ লোকে গ্রাহ্য করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের হীরকতুল্য অদ্বৈত মত খাটে কি? রামানুজাচার্য্যের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বেদান্ত-তত্ত্বসারকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"নৈবং পর" ইতি যথাভূতো জীবস্তথাভূতো ন পরঃ, যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান অন্যথা ভূতস্তথা প্রভাস্থানীয়তদংশাৎ জীবাদ, অংশী পরোপ্যর্থান্তরঃ ভূতঃ। "নৈবং পরঃ" ইহাদ্বারা বলা হইল যে, জীব যেরূপ পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। যেমন প্রভা ও প্রভাবানের প্রভেদ। প্রভাস্থানীয় জীব অংশ এবং পরমাত্মা অংশী, সুতরাং ভিন্ন তত্ত্ব।

বেদান্ত দর্শনে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পাঁচটি কোষের বিচার এবং অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন পক্ষেও অনেক তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। যদিও বেদান্ত দর্শনে অবিদ্যা বা মায়া প্রভৃতি বাদ রহিয়াছে, তথাপি শ্লাঘার বিষয় এই যে পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য এই বেদান্ত দর্শনের বিচারে পরাভূত করিয়াই বৌদ্ধদিগকে ভারত হইতে বিদূরিত করেন; বৌদ্ধেরা শঙ্করের জটিল তর্কজালে আবদ্ধ হইয়া জালবদ্ধ মীনের ন্যায় ক্ষমতাহীন হইয়া দেশত্যাগী হন। ইঁহারই প্রগাঢ় চিন্তার ফলস্বরূপ ভারতে পুনরায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য ও বেদব্যাস একমতাবলম্বীর জন্য ব্রহ্মমীমাংসা সম্বন্ধে অনেক সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বেদান্ত দর্শন মহর্ষি বেদব্যাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্থল।

বেদান্ত দর্শনের সারধর্ম্মই যখন জগৎ মিথ্যা, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি, এখন এই মত যে উদারভাবে মানব হৃদয়ে স্থান পাইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বোধ হয় তজ্জন্যই তার্কিক উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"জগন্মৃষৈ বেতি ভবন্মতঃ চেৎ
কিং কল্পতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।"

বেদান্ত দর্শনের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা। *

(১) বিশ্বনির্ম্মাতা ঈশ্বর ব্যতীত শ্রেষ্ঠতর শক্তির অস্তিত্ব কি প্রকারে যুক্তিতর্ক কৌশলে প্রমাণ করা যাইতে পারে? সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতিগুণ ঈশ্বরের প্রতি আরোপ বা প্রয়োগ করিলে তাঁহাতে কি প্রকার অপূর্ণতা দোষ প্রযুক্ত হয়, তাহাও বৈদান্তিকগণকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

(২) ব্রহ্ম যদি সর্ব্বগুণ বিরহিত হন, তবে কি যুক্তি বলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা মনে করা যাইতে পারে?

(৩) কেন ঈশ্বরকে আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে এবং জগত ও ব্রহ্মকে এক মনে করা যাইবে? এবং আনকাড়ন্দুভির পুত্র হইতে অজ্ঞাতসারে জগতের উৎপত্তি সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে?

(৪) জগৎ অসার ইহা স্বীকার করিলে আর কোন গোলই থাকে না; কিন্তু "জগৎ মায়াময়" বেদান্তের এই মত প্রথমেই সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম জগতের আশ্রয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কি প্রকারে গুণবিরহীত হইয়াও মায়াময় জগতের সহিত এক হইতে পারে, তাহাও বিচার্য্য বিষয় হইবার যোগ্য। আমরা বলি জগৎ একভাবে মায়াময় বটে, কেননা ঐহিক সুখ প্রকৃত সুখ নহে, কিন্তু ইহা হইলেও জগৎ উপেক্ষণীয় নহে কেননা এই জগতে কৃত কর্ম্মানুসারে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ ও দুঃখ স্থিরীকৃত হইবে।

(৫) পদার্থ সকলের জ্ঞাতাকে তুমি অজ্ঞেয় বল কেন? জ্ঞেয় বা জ্ঞানপূর্ণ বল না কেন?

(৬) জ্ঞাতাকে অন্তরিন্দ্রিয় বল কেন? এবং ইহাকে তেজঃ বল না কেন? এবং এই "তেজঃ" শব্দের তুমি কি অর্থ কর? এই তেজঃ কি, তুমি বা আমি হইতে ভিন্ন পদার্থ অথবা ইহা একই বস্তু?

---

* Hindu Philosophy—Popularly explained by Ram Chandra Bose, M. A. and A Rational Refutation of the Hindu Philosophical Systems, by Revd. N. Nilkanta Sastri goreh. দ্রষ্টব্য।

(৭) বৈদান্তিকগণ অজ্ঞানকে এই মিথ্যাজগতের কল্পনাকারী বলিয়াও যখন আত্মাকে ভ্রান্তি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন তখন তাহারা কেমন করিয়া অজ্ঞানের কল্পনাকে ভ্রান্তির কল্পনার সহিত সমান বলিতে পারেন?

(৮) এই জগত কি সত্য হইতে পারে? অদ্বৈতবাদের বিলোপ ও দ্বৈতবাদের দ্বারা তাহার কি পরাভব হয়?

(৯) এই জগতের মূল কারণ "প্রকৃতি" যদি ভ্রান্তির তুল্য হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা কি প্রকারে তাহাকে দূর করা যাইতে পারে?

(১০) অজ্ঞানের সহিত অজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধ কি প্রকৃত? অথবা ইহা কল্পনা প্রসূত মাত্র।

(১১) কোন লোকের উক্তি অনুসারে কি প্রস্তরখণ্ড হীরকরূপে পরিণত হইতে পারে?

(১২) কোন পদার্থের প্রতিরোধ থাকিলে, যদি জ্ঞান অসম্ভব হয়, তবে পদার্থের জ্ঞাতা না থাকিলে কি প্রকারে জ্ঞানের সম্ভাবনা হইতে পারে? যদি এইরূপ হইতে পারে, তবে প্রাচীর ও গৃহের ছাদ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের প্রকার ভেদ বলা যায় না কি?

(১৩) যে প্রকার অজ্ঞানের বর্ণনা আছে, ঐ প্রকার অজ্ঞান কি প্রকৃত পক্ষে কেহ জানে? যদি এরূপ কেহ না থাকে, তবে অজ্ঞ আত্মা আমরা কোথায় পাইব?

(১৪) যে প্রমাণকে দোষযুক্ত প্রমাণ করা যায় না, তাহাকে কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করা যায়? প্রকৃতির নিত্য পদার্থ সকলকে কে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছে? সর্ব্বকালীন লোকেই কি তাহাদের সত্যের প্রমাণ প্রদান করে নাই? যদি তুমি কোন পদার্থের প্রকৃত অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, তবে অন্য কোন পদার্থের ঐরূপ জ্ঞান কি তাহা হইতে বিভিন্ন? তোমার কখন এরূপ বোধ হয় কি? যে সকল পদার্থের

অস্তিত্ব তুমি প্রকৃত পক্ষে অনুভব করিতেছ, তাহারা কি একই ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে না ?

(১৫) কি প্রকারে তোমার আনুষ্ঠানিক বিধি (practical) সপ্রমাণ করা যাইবে ? প্রকৃত অস্তিত্বের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন আছে কি ? কেহ যদি স্বপ্নে অশ্বারোহণ করিয়া থাকে, তবে ঐ অশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

(১৬) ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তাঁহার অতুল শক্তির প্রভাবে ঘট কি চিরস্থায়ী হইতে পারে না ? কিসে তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছাশক্তির প্রতিরোধ হইতে পারে ? ঈশ্বর-শক্তির বাধা দিবার যুক্তি কি আছে ?

(১৭) হিন্দুদিগের পুস্তকে কি এরূপ বিষয় লিপিবদ্ধ নাই যে "যাহাকে অনুগ্রহ করি অল্পে অল্পে তাহার ধন আমি গ্রহণ করিতে পারি ?"

(১৮) অজ্ঞানই সকল কার্য্যের কারণ এই মত কিরূপে সাব্যস্থ হইতে পারে ? সত্যবোধ ও অসত্যবোধ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিরূপে হইবে ?

(১৯) ব্যাধ যেমন পক্ষীকে জাল বদ্ধ করিয়া আমোদ অনুভব করে, ঈশ্বর কি পাপ পুণ্যের বিধি সেই রূপেই করিয়া রাখিয়াছেন ? তিনি কি যথেচ্ছভাবে স্থির করিয়াছেন কতকগুলি কার্য্য ভাল, এবং কতকগুলি কার্য্য মন্দ, এবং আত্মা কখন এক প্রকার ফাঁদে আবদ্ধ, আবার অন্য সময় অপর ফাঁদে আবদ্ধ হইবে ?

(২০) "আমি শরীর নই," এই মত ও পাপের মুক্তি এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি আছে ? "আমি শরীর নই" এইটা জ্ঞান হইলেই সকল যুক্তি লোপ হইয়া থাকে, যদি প্রাক্তক ও প্রারব্ধ কর্ম্ম লোপ হওয়ার সম্ভব, তবে ভাবী কর্ম্মও লোপ হইবে না কেন ?

(২১) ঈশ্বর অত্মাকে জ্ঞানপূর্ণ বা সচেতন করিয়াছেন, কে আবার তাহাকে অজ্ঞান বা অচেতন করিবে ?

(২২) নিদ্রিতাবস্থায় (স্বপ্নে) যে নদী দেখা যায়, কোন মনুষ্য কি জাগ্রতাবস্থায় তাহাতে অবগাহন করিতে পারে?

(২৩) অজ্ঞান কিছুই নয়, এই ধারণা কি মন সহজে পোষণ করিতে পারে? প্রকৃতিই যদি পদার্থের প্রভেদ করিয়া থাকে, তবে জানিবার জন্য কি মতভেদ সম্ভাবনা আছে?

(২৪) ব্রহ্ম যদি আদর্শনীয় হন, তবে দর্শনের পদার্থ হইবে কি প্রকারে, এবং জগতের সহিত তাহার ভ্রমই বা সম্ভবে কি প্রকারে? এবং জগত যদি মায়াময় বা ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র হয় তবে ব্রহ্মের সহিত এক হইবে কি প্রকারে?

(২৫) মায়া যদি নিত্যা, চিরস্থায়ীনী হয়, তবে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, নাই বা থাকিবে না, এই মতের সামঞ্জস্য রক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে? এবং ব্রহ্ম নিত্যই শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত এই মতবাদ কি প্রকারে থাকিতে পারে?

(২৬) বেদান্ত মতে জগতের স্থূল কারণ কি? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আর একটী কথা স্বতঃই উপস্থিত হয়। বৈদান্তি-কেরা যখন সৃষ্টিকে মিথ্যা বা অধ্যাস বলিয়া থাকেন, তখন সৃষ্টির স্থূল কারণ কি এ প্রশ্ন আদৌ উত্থিত হইতে পারে না।

(২৭) যখন অন্তরিন্দ্রিয় (বা মন?) দ্বারা আমরা কুম্ভের বা অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারি তখন মনকে আলঙ্কারিক ভাবে ইন্দ্রিয় স্বরূপ বলা হইয়াছে কি?

(২৮) বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম স্বয়ং নির্গুণ সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মের কোন বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে এখন প্রশ্ন এই; এই বিষয় জ্ঞানের জ্ঞাতা কে? ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বিষয় জ্ঞান থাকিলে এক-জন জ্ঞাতার প্রয়োজন। এবং জ্ঞাতাই সে অন্তরিন্দ্রিয় বা মন, এবং এই অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারাই আমাদের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে। আমরা ইহা

দ্বারাই এইটী কুম্ভ, এইটী যাম ইত্যাদি বিষয়জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি ; যাহাদ্বারা এই বিষয়জ্ঞান উপলব্ধি হইতেছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতা তাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বা মন বল বা অন্য যে কোন উপাধি প্রদান কর না কেন। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের উপলব্ধির জন্য অন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় কি না? এই এই অন্তরিন্দ্রিয় বা মন, আপন জ্ঞানে আপনিই প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য বৃত্তির প্রয়োজন কি?

(২৯) বৈদান্তিকেরা বলেন যে, অন্তরিন্দ্রিয় বা মন স্বয়ং অধ্যাস বা অজ্ঞানতা হেতু বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ; সুতরাং যে বস্তুর বা বৃত্তির বিষয় জ্ঞান আছে উক্ত বস্তু বা বৃত্তি স্বয়ং জ্ঞান সম্পন্ন একথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। যদি এবম্বিধ যুক্তি সত্য হয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় বা মন দ্বারা যদি আমাদের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে একথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মনই স্বয়ং জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পড়ে ; তাহাতে অজ্ঞানতা বা অধ্যাস দোষ বর্ত্তে না, কেবল বৃত্তিন্দ্রিয় আখ্যা দেওয়াতে কি মনকে অজ্ঞান বলা যাইতে পারে? এবং যদি ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিকেই মনের বিশেষ বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে—"আমি ইচ্ছা করি" বা "আমি ভীত হই" বা "আমার এই বিষয় জ্ঞান হইতেছে," ইত্যাদি আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

(৩০) বৈদান্তিককে নির্ভয়ে একথা বলা যাইতে পারে যে মায়াবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও মায়াতিরিক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বা পৃথক করিয়া বৈদান্তিক মোহজ্ঞানে আপনি পতিত হইতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এই মায়াবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই বা কে? আর এই মায়াতিরিক্ত শুদ্ধ উপাধি শূন্য নির্গুণ ব্রহ্মই বা কে?

(৩১) আত্মা ও ব্রহ্মাকে প্রতিবিম্ব বা প্রতিবিম্বিত বস্তুর আধার স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। যদি আত্মাকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে আত্মা বা ব্রহ্মার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এবং

আত্মাকেই বা কিরূপে মোহ বা অধ্যাসের বশবর্ত্তী বলা যাইতে পারে? যদি তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করা যায় যে আত্মাকে যখন প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলা যায়, তখন আত্মা ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু; তাহা হইলে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায় থাকে? এবং আত্মাকে প্রতিবিম্বের ন্যায় দ্রষ্টা স্বরূপই বা কিরূপে বলা যায়?

(৩২) যদি বৈদান্তিকেরা অধ্যাসকে ভ্রান্তি বা ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতেন অর্থাৎ মানসিক বৃত্তির একটা অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা হইলে তাহাকে সৃষ্টির উৎপাদিকা শক্তি বলিয়া বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে এই অধ্যাস বা মায়া কিরূপে মনের জনয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যায়?

(৩৩) বৈদান্তিকেরা অধ্যাসকে কিরূপে মিথ্যা বলেন? যদি অধ্যাস বা মায়ার স্বতন্ত্র সত্তাই না বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে এই সৃষ্টি যাহাকে তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া থাকেন তাহারই বা সত্তা কিরূপে সম্ভব হয়?

(৩৪) বৈদান্তিকের নিকট প্রশ্ন এই, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত যাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাকে তাহারা কিরূপে মিথ্যা বলেন? এবং কিরূপেই বা তাহারা অন্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়া থাকেন?

(৩৫) এখন কথা এই যে, আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তাহার সহিত এই অধ্যাসের সাদৃশ্য কোথায়? যদি এই অধ্যাস বা মোহকে বেদান্ত মতে মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস কিরূপে স্বয়ং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতে পারে?

বৈদান্তিক মতে অধ্যাস যে মিথ্যা তাহার কারণ অধ্যাস অসৎ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং অধ্যাসকে যখন অসৎ বলা হইল—তখন কিরূপে এই অধ্যাস স্বয়ং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতে পারে? যদি মিথ্যা বা অসৎ বস্তুকে আমরা সৎ স্বরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও আত্মা সৎস্বরূপ হইলেও

মিথ্যা বা অসৎ হইয়া পড়ে নাকি? এবং কিরূপই বা এই মিথ্যা বা কাল্পনিক জগতের অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে?

(৩৬) আমরা সর্প ও কুম্ভের অস্তিত্বের বিভিন্নতা বুঝিতে পারি কি না? অর্থাৎ এই উভয় বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আমাদের নিকট সৎভাবে প্রকটিত হয় কি না? যখন আমাদের সর্পে রজ্জু ভ্রম হয়, তখন কি আমরা কোন বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করি না? যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তখন প্রকৃত প্রস্তাবে সর্পের সত্তা বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কুম্ভটী আমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে ও যাহার বাস্তব সত্তা আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি তাহাকে অধ্যাস কি করিয়া বলিব?

(৩৭) এক্ষণে বিবেচনা কর যে ভ্রম বা মোহকে, মোহ বলিয়া অবগতির জন্য কি কি লক্ষণ থাকা আবশ্যক? তোমার নিজের মনের ভাবদ্বারা তুমি কোন বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করিতে পার কি না? এবং কোন বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়েই বা তোমার মনের ধারণা হয় কেন?

(৩৮) বৈদান্তিকের নিকট প্রশ্ন এই, কোন কার্য্য সৎ কি অসৎ? বৈদান্তিকেরা বলিবেন যে, বাহ্য দৃষ্টিতে বা ব্যবহারিক জ্ঞানে ইহা সৎ বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু অব্যবহারিক অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান চক্ষে ইহা অসৎ। তাহার কারণ বৈদান্তিক বলেন যে, এই কার্য্য অধ্যাস হইতে উৎপন্ন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই অধ্যাসের অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে অধ্যাস রূপ জ্ঞানদ্বারা আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। অথবা অধ্যাস রূপ কোন বস্তু হইতে ইহা উৎপন্ন, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উদ্ভব হইয়া থাকে?

(৩৯) কার্য্যকে ও বস্তুকে সৎ বলিতে আপত্তি কি? কোন বস্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান চক্ষে সৎ বা সেই বস্তু ব্যবহারিক জ্ঞানে সৎ এই দ্বিবিধ প্রকারের সৎ (এর) বিভিন্নতা করিয়া ফল কি? দুইটী বস্তুর স্বকীয় গুণ প্রকৃতির বা স্বভাব হেতু বিভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা, অদ্বৈতবাদ কখন

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ দাঁড়ায় কোথায় ?

(৪০) যদি অধ্যাসের অর্থ ভ্রম বা মোহ না হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হওয়ার অর্থ কি ? বৈদান্তিক যদি বলেন যে, ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিভিন্নতা বা পার্থক্য তাহার নিকট উপলব্ধি হয় না, তখন "কুম্ভ অস্তি" বা "সর্প অস্তি" এইরূপ প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা তিনি "অস্তি" এই বাক্য দ্বারা স্বীকার করিতেছেন। তখনই ত্রিবিধ বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ? এবং আত্মা এরূপ উন্নত অবস্থায় প্রস্তুত হইলেই বা তাহার সুখের আশা কোথায় ? এবং ঈশ্বরকে মহত্তোমহীয়ান একথা বলার অর্থ কি ?

(৪১) আত্মা কিরূপে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় ? পরমাত্মার সহিত উহার কি সম্বন্ধ ?

(৪২) যখন অধ্যাসকে মিথ্যা বলিতে যাইয়া বৈদান্তিক অধ্যাসকে কল্পনা হইতে প্রসূত বলিয়া থাকেন, তখন এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে যাহা অসৎ বা মিথ্যা বা যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা দ্বারা কখন কল্পনার কোন কার্য্য হইতে পারে না। তদুত্তরে বৈদান্তিক বলেন যে, এই অধ্যাস বাহ্য দৃষ্টিতে বা ব্যবহারিক জ্ঞানে আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিকট তাহা প্রকৃতই অসৎ; কিন্তু এবম্বিধ অযৌক্তিক বাক্যের কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ? আমি বেদান্ত দর্শনের ও ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখিয়া যাহা নিষ্কাষণ করিতে পারিয়াছি এবং তৎসঙ্গে খ্রীষ্টীয় দর্শনের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি দেখিয়া বেদান্তের সম্বন্ধে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিল তাহা মোটামুটি ভাবে বাহির করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। পাঠকবর্গ যেন গম্ভীরভাবে বেদান্তদর্শনের জিজ্ঞাসা তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

বিচার করেন; তাহা হইলে প্রচুর উপকার সাধিত হইবে ইহা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা উচিত ও আবশ্যক, একথা বলিলে কেহ কুপিত হইবেন না। বিশ্বাসবান ব্যক্তি মাত্রেই উহা একটী প্রধান বিষয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিক-গণ কে কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছেন এবং কে কোন্ কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এ দেশে বহুকাল হইতে নানা দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহাতে ধীমান দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণও দৃঢ়তার সহিত ঐ পথেই বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা কোন দিন গন্তব্যস্থানে পহুঁছিতে পারিবেন কি না, আমার সন্দেহ হয়, কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ ইহা নহে। দার্শনিকের সম্বল তর্ক; তর্কের ফল—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, কলহ। কিন্তু তর্কের দ্বারা কখনও সত্যনির্ণয় হয় না, তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আমি তার্কিক নহি, সুতরাং তর্ক আমার ভাল লাগে না; তবে কি না যাহা সর্ব্ববাদী খাঁটি সত্য তাহা স্বীকার করিতে ও মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি, ভরসা করি, একথায় কেহ আপত্তি উত্থাপন করিবেন না।

ধর্ম্ম ও দর্শন

'ধৃ' ধাতু হইতে ধর্ম্ম পদ উৎপন্ন হইয়াছে,—যাহার অর্থ ধরা। ধর্ম্ম কি? মনুষ্যকে সত্য আশা দিয়া যাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব আশা শূন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে

দর্শন শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দৃশ্ ধাতু ও ল্যুট্, যুট বা অনট্ প্রত্যয়েব যোগে দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতু পাঠে ইক্ষ্ ধাতু দর্শনার্থে পঠিত সুতরাং ধাতুপাঠের সাহায্যে দৃশ্ ধাতু এবং ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ অবগত হইবার প্রত্যাশা বিফল হয়, কেননা, ধাতুপাঠ অনুসাবে দৃশ্ ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ এবং ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন। এইত গেল ধাতুপাঠের অবস্থা। এখন উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া দৃশ্ ধাতুর অর্থ স্থির করা যাউক:—প্রাকৃত ভাষায় দৃশ্ ধাতুর স্থানে "পেকখ" আদেশ হয়। বিদ্যাপতির "পেখনু" এবং বাঙ্গালা-ভাষার "দেখ" শব্দ প্রাকৃত "পেক্খ" শব্দের অপভ্রংশমাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষস্থল সচরাচর "দেখ" বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃত-ভষাতেও চাক্ষুস জ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ দৃশ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে চাক্ষুস জ্ঞানই দৃশ্ ধাতুর মুখ্য অর্থ। ইহা নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করেন। কিন্তু উপনিষদে অনেকস্থলে আত্মসাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্ ধাতু এবং ঈক্ষ্ ধাতু প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার বেদে আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষজ্ঞানস্বরূপ না হইলেও আত্মসাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় আত্মসাক্ষাৎকারও দৃশ্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মোটামুটি আসল কথা এই—চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্রে এ কথা বলাও যা, আর যে শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন তাহাকে অনায়াসে দর্শন শাস্ত্র বলা যাইতে পারে এ কথা বলাও তাই। এইত গেল, ভারতীয় টিকাকারদিগের ব্যাখ্যা। (১)

সাধারণ বিশ্বাস, শিক্ষা ও মতবাদ

"ধর্ম্ম ও ঈশ্বর" এই দুই-ই সর্ব্বজাতির প্রধান বিষয়। আমার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহলোকে ধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে

(১) হিন্দুদর্শন ফেলোশিপের লেক্চার।

সদগতি হয়, এবং অধর্ম্ম আচরণ করিলে পরলোকে অধোগতি হইবে। এই তত্ত্ব ধর্ম্মের বিষয়। এই বিশ্ব সংসার একজন সচ্চিদানন্দময় বিধাতা পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এবং পরিলক্ষিত হইতেছে, এই তত্ত্বও ধর্ম্মের বিষয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব দর্শন-শাস্ত্র সম্মত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। দর্শন শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক অনুমানের উপরে সংগঠিত। যাঁহারা অস্মদেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল পত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা মানব-বুদ্ধিগম্য সত্যসকলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক শ্রেণী "দৃষ্ট—" অপর শ্রেণী "অদৃষ্ট"। খ্রীষ্টীয় দর্শন যে অর্থে "দৃশ্য" ও "অদৃশ্য" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এস্থলে উহাও ঠিক সেই অর্থে বুঝিতে হইবে। যে সকল সত্য অদৃশ্য তাহা ধর্ম্মের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্র কেবল "দৃষ্ট" সত্য লইয়াই ব্যাপৃত। ইউরোপের নাস্তিক্যবাদ ও দর্শন মূলক অনুমান বিপথ গমনের সুদৃষ্টান্ত ও বিশ্বাসের পথকে ম্লান করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে; সুখের বিষয় এই যে পণ্ডিত Robert Flint তাহার স্বরচিত Anti theistic theories নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে যে সকল উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গল জনক ও যথার্থ গ্রহণ যোগ্য।

পরিদর্শন

এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় দর্শনে "পরিদর্শন" নামে একটী পৃথক সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত লোগসের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহা কেবল খ্রীষ্টীয় দর্শনে ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা মন্দিরে পাওয়া যায়, তাহার সহিত হিন্দুদর্শনের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না—তবে আত্মসাক্ষাৎকার অর্থে পরিদর্শন নহে ইহা সত্য। সে সম্বন্ধ যোহন ১; ১ ও ১৮ পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পরিদর্শনের সাক্ষ্য এই—"আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছি।" "কেহ যে পিতাকে দেখিয়াছে তাহা নয়, যিনি ঈশ্বর

হইতে আসিয়াছেন—কেবল তিনিই পিতাকে দেখিয়াছেন।" আর এই "নিত্যশব্দ" বা "শব্দ-ব্রহ্মই—" "লোগস বা বাক্য—" যদি দ্বিজদাস দত্ত-মহাশয়ের এই কথা প্রকৃত পক্ষে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় বলিব যে "ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথম জাত, কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক সকলই তাঁহার দ্বারা, ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। কারণ (ঈশ্বরের) এই হিত সঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই (খ্রীষ্টেতে) বাস করে।" আমাদিগের লব্ধ প্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবরাশির বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যথা—খ্রীষ্ট "সর্ব্বযুগের পূর্ব্বে আপন পিতা হইতে জনিত, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর, দীপ্তি হইতে দীপ্তি, সত্য ঈশ্বর হইতে সত্য ঈশ্বর, পিতার সহিত এক বস্তু, যাহা দ্বারা সকল সৃষ্ট।" অতএব বুঝা যায় যিনি পূর্ণভাবে পিতার সকল অবস্থা দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার দর্শনই পরিদর্শন বা সম্যক দর্শন; এই বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও সৎ, স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য এবং অতিরিক্ত সম্বন্ধের সহিত বিজড়িত ও ভ্রমপ্রমাদ শূন্য। * ভারত সর্ব্বদাই উত্তম ও সত্যের অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে—ইহা বেশ বুঝা যায়, তবে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য চক্ষুদুইটী মুদ্রিত করিয়া রাখেন কেন? "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি" বিশ্বাস করা কঠিন এমন কোন কিছু বলিবার অগ্রেই যীশুখ্রীষ্ট ঐ কথা বলিতেন—সুতরাং এই পরিদর্শনের বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ

* The philosophy of Religion—by Geoge Galloway, D. Phil. D. D. গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় the philosophy of Religion in Relation to (1) Philosophy and (2) Theology নিবন্ধের সারাংশ মাত্র।

দেখা যায় কি? আমরা দেখিতেছি যে দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয়. একটী পরিষ্কার সীমাচিহ্নে চিহ্নিত। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অলৌকিক অদৃষ্টতত্ত্ব যাহা কি না দর্শন শাস্ত্রের সীমার সম্পূর্ণ বহির্ভূত তাহাকে দর্শন শাস্ত্রের 'অন্তর্ভূত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি? তাহাতে এই ফল হয় যে, সত্যের আবিষ্কার না হইয়া আত্মা সংশয়ের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে বলিতে পারি যে আপ্তবচন বা প্রত্যাদেশ ইহা দর্শন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নহে—উহা ধর্ম্মের ও ইতিহাসের প্রমাণ। "আবার যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী সাংখ্য তাঁহারা বলেন, বেদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বেদ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শিক্ষা দেয়, আমরা কেবল ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়েরই আলোচনা করি; কিন্তু কোন কোন সাংখ্য পণ্ডিত আপনাদের মতকে বেদ সম্মত ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন।" ফল কথা এই—ধর্ম্ম যদি দর্শনের সীমায় পদার্পণ করেন, সে তাহার অনধিকার চর্চ্চা এবং দর্শনও যদি ধর্ম্মের সীমায় যাইতে চাহেন, তাহাও তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। ঈশ্বর, ধর্ম্ম, এবং দর্শনের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলে এই কথাটি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে—নচেৎ বিশ্বাস দুর্ব্বল হইবে, ও চিন্তার উপর একটা ম্লান স্তর পড়িবে। দর্শন এবং দর্শন মূলক অনুমানই দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি, কিন্তু ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও বিশ্বাস, এই তিনটী উহা হইতে পৃথক রাখা ভাল। কেন যে পৃথক রাখা ভাল তাহা এই স্থলে উদাহরণ দ্বারা, দেখাইতেছি;—ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনই সর্ব্বপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; পণ্ডিত সমাজে যে সকল মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা ঋগ্বেদ ও কপিল দর্শন পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমি উভয় স্থলগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিয়া যাহা যাহা পাইয়াছি তাহা যথাযথ প্রকাশ করিতেছি আশা করি সুধী পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার সত্যাসত্য বিচার করিতে পারিবেন, ইহা যে কেবল আমার নিজের মত তাহা নয়, পরলোকগত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ও সাংখ্য দর্শনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

পুনশ্চ পণ্ডিত গ্যাল্‌ওয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাও অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে তিনি বলেন—"What was true in Theology might be false in Philosophy and what was true in Philosophy might be false in Theology".

ঋগ্বেদ	কপিল
(১) ঋগ্বেদের সময় ঈশ্বরে পণ্ডিতদের অটল বিশ্বাস ছিল।	কপিলের সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে পণ্ডিতদের ঘোরতর সন্দেহ এমন কি অবিশ্বাস।
(২) ঋগ্বেদের সময়ে লোকের ঐহিক উন্নতি সাধনে অসাধারণ উৎসাহ ও প্রযত্ন। রাজ্য, ধন সমৃদ্ধি, বীরপুত্র, ইহাই লোকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিত।	কপিলের সময়ে ঐহিক সুখে পণ্ডিতদের ঘোরতর বিরাগ।
(৩) ঋগ্বেদের সময়ে লোকে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবার কামনা করিত, স্বর্গ কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান বলিয়া মনে করিত এবং যাগযজ্ঞকে স্বর্গলাভের উপায় মনে করিত।	কপিলের সময়ে পণ্ডিতেরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। স্বর্গেও দুঃখ আছে বলিয়া মনে করিতেন। অতএব যাগযজ্ঞে বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বর্গ ছাড়িয়া এই সময়ে তাঁহারা মুক্তির কামনা করিতেন।
(৪) ঋগ্বেদের সময়ে ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য, কেবল এই দুই আশ্রম দেখা যায়।	কপিলের সময়ে বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু আশ্রমেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।
(৫) ব্রাহ্মণসমাজের অবস্থা এই সময়ে সকল বিষয়েই ভাল।	কপিলের সময়ে ব্রাহ্মণদের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা হীন হইয়া আসিতেছিল।
(৬) ঋগ্বেদের সময় কবিতার সমাদর ছিল।	কপিলের সময় কবিতা হেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবিতার পরিবর্ত্তে তর্ক শাস্ত্রের অনুশীলন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তার্কিকেরা এই সময়ে যাগযজ্ঞ ও বেদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতেছিলেন।

আমি আরও উদাহরণ প্রয়োগ করিতে পারিতাম কিন্তু অনাবশ্যক বোধে এস্থলে পরিত্যাগ করিলাম। এবার একটু ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করি। সেদিকেও Theology ও Philosophyর একটা পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত A. M, Fairbairn তাঁহার স্বরচিত The Place of Christ in Modern Theology নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের "Ancient Philosophy and Theology" স্তবকে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

"Theology in the universe construed through the idea of God ; Philosophy is the universe construed through the idea of man, but man as mind. Theology is as necessary to faith as philosophy to reason. If a man asks, why and what am I and my universe ? The result is a philosophy ; If a man or society asks, what does the truth we believe mean ? The result is a Theology. Each is a science of being, but highest constructive principle of the science is in the one case the thought or consciousness of the thinker ; in the other, it is his highest and most necessary idea. The standpoint is in philosophy subjective, a particular reason is made determinative of the universal. The means by which truth is to be discovered and explicated the standponit in theology is objective, a universal intelligence is made the explanation of the intelligible world with all its intellects and all their mysteries. This distinction shows.

at once their difference and their relation. They differ because Theology starts with an idea which philosophy has to discover and define ; but they are related because, while all the problems of Theology do not emerge in philosophy, all those of philosophy emerge in Theology, though in a different order and from a changed point of view." P. 62.

দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যে একটা পরিষ্কার সীমা চিহ্নে চিহ্নিত তাহা মোটামুটি হিসাবে বেশ বুঝা গেল। এই বিষয়টী পণ্ডিত Edward Caird তাঁহার স্বরচিত The Evolution of Theology in the Greek Philosophers, নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ে দেখাইয়াছেন। আবার Dr. W. Adams Brown তাঁহার কৃত "The Essence of Christianity" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্ম্মের উজ্জ্বলপ্রভাব দেখাইয়া অবিশ্বাসী ও অজ্ঞেয়বাদীদিগের রোগ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এদেশে যাঁহারা তাহাদিগের পদানুসরণ করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মকে যে সকল নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্রূপাত্মক ভাবে দেখেন বা ভুল ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের ঐ সৎগ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করা ভাল; আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি আর কিছু হউক বা নাই হউক তাঁহাদের দুর্ব্বল যুক্তি ও দুষ্ট ধারণা গুলি অচিরে খসিয়া পড়িবে।

অষ্টম অধ্যায়।

ঋষিদিগের ঈশ্বরজ্ঞান ও বেদ ইত্যাদি।

"সাম-বেদে জল, অগ্নি ও জড়পূজার অর্চ্চনার কথা বিদ্যমান, ইহাতে জ্ঞান বিজ্ঞান ঘটিত কথা নাই, পক্ষান্তরে ঋগ্বেদে যেমন প্রকৃতি পূজা, বিজ্ঞান, সভ্যতা ভব্যতা আছে, তদ্রূপ ঈশ্বরের সত্বার ও অনুভূতি বিদ্যমান,

এবং অথর্ব্ব বেদে ব্রহ্মশব্দ বিদ্যমান"। এই কথাটুকু মন্দার মালায় পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন আরও একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—"সামবেদ নাকি জগতের আদি গ্রন্থ, ঋগ্বেদের প্রথমার্দ্ধও সেই—আদিম যুগে বিরচিত। তাই উহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব পর্য্যন্ত হয় নাই, নর পূজারও প্রসঙ্গ দেখা যায় না, আছে অগ্নি জল, ও সূর্য্যের আরাধনা। পক্ষান্তরে বেদে মূর্ত্তি বা প্রতিমা শব্দ আদবেই নাই—আছে জড়পূজা, ও ঈশ্বরের সত্তার অনুভব এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, ও শিব প্রভৃতি বীরগণের পূজা।" (মন্দার মালা—৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ফাল্গুণ—১৩২৩ ও ১৩২৪ শালের কার্ত্তিক সংখ্যায় পাওয়া যায়)।

ঐ কথাগুলিতে "ঈশ্বর আছেন" ইহা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে না এবং আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে মঙ্গলজনক কি তৃপ্তিজনক প্রতিজ্ঞা বা সূত্র নহে। তবে উহা ছাড়িয়া দিলেও আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানালোক পাওয়া যায় এবং তাহার প্রমাণ আছে; কিন্তু আধুনিক শাস্ত্র সকল উত্তরোত্তর ঘোরতর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং অবশেষে অশুচিতা ও ঈশ্বরবিষয়ক অজ্ঞানতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহারও প্রমাণ আছে।

ঋষি বাক্য।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষি তলবকার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যথা:—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।" অর্থাৎ—"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে।" মোট কথা এই যে, আমরা ঈশ্বরকে পূর্ণভাবে জানিতে পারি না বটে, কিন্তু একেবারে যে জানিতে পারিব না তাহাও নহে। এতদ্ভিন্ন গার্গি, যাজ্ঞবল্ক্যও ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে উচ্চ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু হার্বার্ট স্পেনসারের ন্যায় ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় ("Unknowable") রূপে ব্যাখ্যা দেন নাই। আবার গীতার লেখক

পদ্মনাভ ঋষি পঞ্চম শতাব্দীতে বেশ সুন্দর কথা বলিয়াছেন, গীতার মতে "ভগবানের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই এবং প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ত্ব নহে, কিন্তু ঈশ্বরই চরম তত্ত্ব।" এ কথায় কোন বিরোধ নাই, ইহা স্বীকার করিতে আমরাও প্রস্তুত আছি। ঈশ্বর যে সর্ব্ব-শক্তিমান, হোমর, পিথাগোরস, ভার্জ্জিল প্রভৃতি অতি প্রাচীন পৌত্ত-লিক গ্রন্থকারগণ যেমন স্বীকার করিয়াছেন এদেশেও ব্যাখ্যাকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন তাহাতে বড় বেশী নূতনত্ব দেখা যায় না ; তবে কি না প্রথম শতাব্দীতে মথির খ্রীষ্টীয় সুসমাচার প্রাচীন ভারতে এক সময় স্থান পাইয়াছিল এবং তাহারই শিক্ষার ফলে ক্রমেই হউক বা ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যেই হউক বা অপর কোন প্রচার দ্বারায় হউক না কেন, উহা যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায় এবং ইতি-হাসও ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সুসমাচারের অনেক কথা গীতার সহিত মিল দেখা যায়।

ঈশ্বর জ্ঞান লইয়া চির বিরোধ।

আস্তিক, নিত্য পদার্থ আছে বলেন ; সাংখ্য নিত্য বস্তু অনেক বলেন। বেদান্ত নিত্য বস্তু এক বলেন। নাস্তিক, নিত্য পদার্থ নাই যেমন বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায় ; এইত গেল এক গাঢ় বিরোধ। হিন্দুদার্শনিক-গণ নিঃসন্দেহ এবং অতি সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তাশীল ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার অনেকেই ঈশ্বর জ্ঞান লইয়াই চিরবিরোধ ঘটাইয়া গিয়াছেন ; এবং ঐশ্বরিক ও মানবীয় প্রকৃতি ও মনুষ্যের চরমগতি ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে তাঁহারা যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা নিষ্ফল হইয়াছে।

আজও যেমন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিরোধী সম্প্রদায় সকল দেখিতে পাই সে কালের ঋষিমুনিদিগেরও মধ্যে সেইরূপ বিরোধী সম্প্রদায় সকল বর্ত্তমান ছিল দেখি। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার অস্তিত্বে, এবং পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন ; অপর সম্প্রদায় এই সকল

আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের নেতা বৈদিক ঋষি ও মনু প্রভৃতি ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা চার্ব্বাক এবং সম্ভবতঃ বৃহস্পতিও ছিলেন। চার্ব্বাক, বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তিনি ৯ এক স্থানে স্বমত সমর্থন করিতে গিয়া বৃহস্পতির বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, বৃহস্পতি সুরগুরু হইয়াও অসুরদিগকে ভুলাইবার জন্যই নাস্তিকতার প্রচার করিয়াছিলেন।

কন্‌ফুসি ও শাক্যসিংহ।

চীন দেশে কন্‌ফুসি এবং ভারতে শাক্যমুনি মনুষ্যজীবনের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর নিয়ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা কেহই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই প্রদান করেন নাই, বোধ হয় ইহাঁরা উভয়েই মনে করিয়াছিলেন. ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান মনুষ্যবুদ্ধির অতীত।” মহম্মদের একটি প্রধান মত এই যে, “ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই সনাতন ঈশ্বর; তিনি জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণও করেন না এবং তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই।” কোরাণ।

যিহূদী জাতির বিশ্বাস ও ধারণা কি প্রকার?

ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক ঋষিদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; এক্ষণে যিহূদী জাতির কথাবুঝা যাউক। যিহূদী জাতি একটি পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ জাতি। ইহাদের জাতীয় ইতিহাস. ধর্ম্ম নীতি, আচার-ব্যবহার অতি মনোহর পাঠ্য, অনেক মহাপুরুষ অনেক সাধুব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহন করিয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সকল মহাপুরুষগণ এক এক জন জাতীয় স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন; উদাহরণ স্বরূপে ব্রহ্মবাদী মুশা, দানিয়েল ও অব্রাহামকে বলা যাইতে পারে। প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে যিহূদীগণই ঈশ্বর সম্বন্ধে

জ্ঞানের উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। আমার এই কথা বলায় কেহ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন সত্য; কিন্তু পরমার্থতত্ব খাঁটিভাবে তৌল করিলে কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না বরং ঐ কথারই সমর্থন করিতে হইবে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব অন্ততঃ ৪০০ অব্দে যিহূদীগণের কয়েকখানি পুস্তক ছিল; সে সকল পুস্তক বর্ত্তমান সময়েও পঠিত হয়। আমরা সেই সকল পুস্তক অধ্যয়নপূর্ব্বক তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি; সেই সমুদয় পুস্তকে আমরা কি দেখিতে পাই? যিহূদীদের সাহিত্যের মধ্যে ঈশ্বর, মনুষ্য ও জগৎ সম্বন্ধে এমন সকল ধারণা পাওয়া যায়, যাহা তৎকালীন সাহিত্যের আর কোন স্থানে উজ্জ্বলাকারে পাওয়া যায় না। সে কালের লোকে প্রতিমাপূজক ছিল, বহু দেবার্চ্চনা করিত, কেবল এই জাতি (ইস্রায়েল) একেশ্বরে বিশ্বাস করিত, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত শক্তি, ব্যবস্থা, ও ধর্ম্মশীলতার একমাত্র নিদান। সেকালের অন্য কোন জাতির এই বিশ্বাস সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই এবং ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় প্যালেষ্টাইন দেশীয় একটি অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য জাতি যে ধারণা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার তুলনায় জগতের অন্যান্য জাতিগণের ধারণা সকল অতি সামান্য ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হয়; এতদ্বিষয়ে ইস্রায়েল অন্য সমস্ত জাতিকে সহজে পরাভব করিয়াছিল। যিহূদীগণ যে, দার্শনিক জগতে বা সাহিত্য সমাজে যারপর নাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা নহে। তাহাদিগকে বরং প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক বা কার্য্যকারী জাতি বলা চলে। আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যান্য দার্শনিক জাতিদের নয়—এই সামান্য কার্য্যকারী জাতিরই কাছে "একেশ্বরবাদ" সপ্রকাশ হইল। তাহারাই সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরের একত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা বিস্তারিত প্রভাবের ফলে একেশ্বরবাদ জগন্নিবাসীদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন ঋষিরা, আকাশ

হইতে বারি, সূর্য্য হইতে তেজ প্রভৃতি পাইয়া আকাশ পিতার পূজা করিতেন সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর যে ব্যক্তিভাবে আমাদের পিতা তাঁহারা যীশুর এই শিক্ষার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই; কোরাণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন সত্য—কিন্তু, ঈশ্বরকে কখনও পিতা বলেন নাই। তবে এ কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য আছি যে অথর্ব্ববেদে ঈশ্বরকে "পিতা" বলা হইয়াছে। এবং তাহার প্রমাণও বিদ্যমান আছে।

যিহূদীগণ একেশ্বরে বিশ্বাস করিত, তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাতা। তাহাদের এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঈশ্বর ন্যায়বান, পবিত্র ধর্ম্মশীল ও সত্যপ্রিয়, অধিকন্তু তিনি আপন প্রজাদের প্রতি প্রেম ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি চঞ্চলচিত্ত নহেন, বরঞ্চ তাঁহার প্রেম ও দয়া অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি স্বীয় প্রণালী অনুসারে অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। ঈশ্বর এজগতের নির্ম্মাতা, বিধাতা, শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা ও ত্রাতা। যিহূদীদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের সর্ব্ব-শক্তিমত্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধি যেমন, ধর্ম্মশীলতা, ন্যায়পরতা ও প্রেম তেমনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

মানব সম্বন্ধে যিহূদী ও অন্যান্য জাতির ধারণা।

এই ধারণার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যিহূদীগণ মানব জাতির ঐক্যে বিশ্বাস করিত, সেই বিশ্বাস তাহাদের শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়। মনুষ্য যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আদরণীয় ইহাও তাহারা বিশ্বাস করিত। মানব সম্বন্ধে যে ধারণাগুলি তাহাদের শাস্ত্রে (পুরাতন নিয়ম) পাওয়া যায়, সেগুলির অন্য একটি বিশেষত্ব আছে, যিহূদীদের বিবেচনায় মনুষ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সে ঈশ্বরকে জানিতে এবং তাঁহার পূজা ও পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ। ফলতঃ ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা ঈশ্বর আপনার নিমিত্ত মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পাপই মানবের অধোগতির কারণ

দুঃখের বিষয়, মনুষ্য ঐশ্বরিক অভিপ্রায় পূর্ণ না করিয়া পাপী হইয়াছে। তজ্জন্য মানবকুলকে যে কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। যিহূদীদের শাস্ত্রানুসারে মানব সমাজের মধ্যে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট পাওয়া যায়, তাহার একটি মাত্র কারণ পাপ। পাপের বিদ্যমানতা ও প্রাদুর্ভাবহেতু সেকালের সভ্য জাতিদের সভ্যতা অন্তর্হিত হইয়াছিল; পাপই মানবের অধোগতির কারণ হইয়া আসিতেছে। এতদ্বিষয়ে যিহূদী শাস্ত্রের শিক্ষা সুস্পষ্ট; মানব মাত্রেরই ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে; মনুষ্য নিরুপায়, ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, উপস্থিত আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দূরে থাকুক, সে কোন মতে পবিত্র জীবন যাপন করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন না হইলে এবং তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না রাখিলে, মানব জীবন কোনমতে সার্থক বা কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অতএব আমাদের ব্যাখ্যানুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ঈশ্বর, মনুষ্য এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যদের মধ্যস্থিত সম্পর্কের বিষয়ে যিহূদীগণ অসামান্য ধারণাসমূহ পোষণ করিত। সেকালের অন্য কোনও জাতি সেই প্রকার ধারণা পোষণ করিত না, বরং এতদ্বিষয়ে যিহূদী ও অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে পরবর্ত্তী যুগের মানব সমাজের মধ্যে যে জাতিগণ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের কাছে উল্লিখিত ধারণাগুলি বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। যিহূদীগণ কি আপনাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের গুণে উক্ত ধারণা বিশিষ্ট হইয়াছিল? তাহা বোধ হয় না। ঈশ্বর তাহাদের কাছে আত্ম প্রকাশ—আপন ইচ্ছা স্পষ্ট করিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন

বলিয়াই, তাহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের বিষয়ে উল্লিখিত উৎকৃষ্ট ধারণা বিশিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরের আত্ম—প্রকাশের ফলেই যিহূদীগণ যথার্থ ধারণা বিশিষ্ট হইয়াছিল।

গৃশে দর্শন শাস্ত্র প্রচার

প্লেটো ও আরিষ্টটল।

সাহিত্যে, কবিত্বে ও শিল্পে গ্রীকেরা চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি জ্ঞানবলে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হয় নাই। কেহ কেহ অধুনা এই কথা বলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ রোমকদের ব্যবস্থা ও গ্রীকদের দর্শন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এ কথা স্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ ও গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। মনুষ্যদের বাঞ্ছনীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যেমন, এই বিশ্বের প্রকৃতি ও ব্যবস্থার বিষয়ে তেমনই খ্রীষ্টীয় শিক্ষক ও গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতদের ধারণার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। বিশেষতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ানদের ভাব ও সেকালের দার্শনিক পণ্ডিতদের ধারণার মধ্যে কোন প্রকার মিল বা সামঞ্জস্য নাই। সেকালের গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে পারেন নাই তাহা প্লেটোর সাক্ষ্যেই বেশ উপলব্ধি হয়। প্লেটোর কল্পিত আখ্যায়িকাবলীতে "বিশ্বের পিতা ও রচক" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁনি মিথ্যা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ও মনোহর কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কি জন্য প্লেটো (গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) ঈশ্বরকে সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পিতা বলেন। প্লুটার্ক (৫০—১২০ অব্দ) এই প্রশ্নের উত্তর করেন—"দেব ও মানবগণের পিতা অচেতন ও বিবেকহীন পদার্থ সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা।" প্লেটো আরও

বলেন জগৎ সৃষ্টিতে যে কার্য্যপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির খেয়ালানুযায়ী পরাক্রম প্রকাশ মাত্র নহে, বরং তাহাতে একটি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অভিব্যক্ত হয়। সৃষ্টি কার্য্য ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব নাই; অতএব সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎকে সৃষ্টি করিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিতেছেন; তিনি আপন অস্তিত্ব গঠন করিতেছেন। সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে, তাঁহার অস্তিত্ব নাই—প্রকৃত অর্থও নাই। এতদপেক্ষা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রসংশনীয় ধারণা প্লেটোর গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। প্লেটো, অধিকন্তু জড় জগৎকে মূলতঃ মন্দ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার শিক্ষানুসারে আত্মা ও জড় পদার্থ সকল পরস্পর পৃথক, কাজেই ঈশ্বর ও জড় জগতের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্লেটো পাঁচটি প্রধান গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—সাহস, মিতাচার, ন্যায়, জ্ঞান এবং পবিত্রতা।

আরিষ্টটল আবার ঈশ্বরকে যেন জগতের নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষানুসারে ঈশ্বর জগতের নিকট হইতে পৃথক থাকিয়া কেবল আপনার বিষয় ধ্যান করেন। তিনি প্রকৃতি হইতে এমন ভাবে উন্নত আছেন যে, সাংসারিক বিষয় সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আরিষ্টটল ঈশ্বরকে সমস্ত গতির অচল চালক বলিয়াছেন, কিন্তু জড়-জগৎ ও তাহার অচল চালকের মধ্যবর্ত্তী সম্পর্ক যে কি প্রকার, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন নাই।

আরিষ্টটলের নৈতিক গুণের তালিকার মধ্যে দানশীলতা, আত্মচিন্তা, এবং ইন্দ্রিয় দমন, প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় গুণের উল্লেখ নাই। তিনি ধর্ম্ম হইতে নীতিকে পৃথক করিয়াছেন, আর এই জন্য পবিত্রতা গুণটি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আরিষ্টটল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমতাবাদী ছিলেন। সংজ্ঞানে আসিবার নিমিত্ত তিনি ত্রিবিধ উপদেশ দিয়াছেন:—

(১) যে অতিরেক ভাব মধ্যম ভাবের বিরোধী তাহা হইতে যতদূর পার দূরে যাইবে। (২) যে বিষয়টির প্রতি মন নিতান্ত ধাবিত, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। (৩) আমোদের মোহে ভুলিও না। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা যে ঠিক সামঞ্জস্যময় মধ্যভাবে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতে পারিব এমন আশা করা যাইতে পারে না। এরূপ মধ্যম ভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন নিয়ম ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এবিষয় আমাদের জ্ঞান এবং নীতিই সুন্দর পথ প্রদর্শক। ইঁহার মতে সামাজিকতার শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে সাধনই পরম পুরুষার্থ ; উপস্থিত অবস্থার সংস্কার দ্বারা তাহাতেই যথাসাধ্য সৎভাবের স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য। প্লেটোর মতে মনীষা, শ্রদ্ধা, এবং আকাঙ্ক্ষা, এই তিনটি বৃত্তি মনুষ্যকে ন্যায় পথে চালনা করিবার প্রধান পরিচালক।

(১) আকাঙ্ক্ষা হইতে সকল প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হয়। (২) মনীষা তাহার সদসৎ নিরূপণ করিয়া থাকে। এবং (৩) শ্রদ্ধায় সেই সদসৎভাবের মধ্যে সৎভাবকে স্থাপনার্থে মনীষাশক্তির সহায়তা করে এবং এই তিনের সম্মিলনে "ন্যায়রূপী" আর একটি চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়।

দার্শনিক সাধু পৌলের তিনটি উত্তর।

সাধু পৌলের উত্তর তিনটি বুঝিয়া লইবার পূর্ব্বে রোমীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ পদ হইতে—৩২ পদ এবং ১ করিন্থিয় প্রথম অধ্যায়ের ১৮—২২ পদ ও ২৪ এবং ২৭ পদের তুলনা করা ভাল। বিশেষ হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ যদি যথার্থই বুঝিবার জন্য চেষ্টা যত্ন করেন তাহা হইলে সমূহ ফল পাইবেন ইহা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি।

(১) মানুষের পাপ এরূপ যে, পাপী তাহার বিদ্রোহাবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছে ও তাহা চাপিয়া রাখি-

য়াছে কেননা সৃষ্টির কার্য্য দেখিয়া তাহা সর্ব্বকালেই সৃষ্টজীবের (মনুষ্যের) সংবেদে উদিত হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাকৃত ও দোষাবহ অজ্ঞানতা হইতেই পৌত্তলিকতার অভ্যুদয় হইয়াছে। আর এই পৌত্তলিকতার দণ্ডস্বরূপে ঈশ্বর পৌত্তলিকগণকে অতি জঘন্য পাপ ও অশুচিতায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) রোমীয় ১১; ৩৩—৩৬ পদ দ্রষ্টব্য। এই তর্কের উপসংহার কালে (ইহাতে ঈশ্বরের কার্য্যের নিগূঢ়তার বিষয়, অর্থাৎ তাঁহার বিচার নিষ্পত্তি যে তাঁহার দয়ার বিপরীত নহে, বরং সকলই যে তাঁহার গৌরব সাধক তাহা দেখান হইয়াছে) ফলতঃ যাহার কার্য্য অননুসন্ধেয় ও প্রজ্ঞা অগাধ এবং যিনি আপনার সৃষ্ট জীবগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও নিজেই আপনার সমস্ত কার্য্যের চরম কারণ, সাধু পৌল তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন।

(৩) ঈশ্বরের কোন চিত্র কিম্বা মূর্ত্তি গঠন করিবার অধিকার আমাদের নাই, কারণ আমরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট, আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের অতি নিকটে আছেন, সুতরাং সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণের, কি ধ্যানের, কি সেবার জন্য ঈশ্বরের স্বরূপকে, মৃত্তিকা, প্রস্তর কিম্বা অন্য কোন উপাদানে গঠিত করিয়া ভজনা করা পাপ ও ঘৃণার বিষয়। যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কি আমাদের হস্তদ্বারা কখনও পুনঃনির্ম্মিত হইতে পারেন? আমরা যখন এমন সুন্দর শিক্ষা পাইতেছি তখন নিশ্চয়ই ন-খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণকে বলিব— ‘Why then have most of the great reformers in India, such asRam Mohon Roy and Dayananda Saraswati denounced image worship as degrading and reactionary” ? আবার বৈদিক প্রার্থনায় একটি সুন্দর উক্তি দেখা যায়—“আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে জীবনে লইয়া যাও।”

সক্রেটিশ্।

সুপ্রনিশ্কুসের পুত্র সক্রেটিশ্—ইনি গ্রীক পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এইমাত্র জানি যে কিছুই জানি না।" সক্রেটিশের প্রধান শিক্ষা,—মানবীয় আত্মার অবিনাশিত্ব, কিন্তু তৎকালে অনেক গ্রীকই তাহা বড় একটা বুঝিত না। তাঁহার উক্তি—"আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে'ত উহা বিশ্বাস করায় নিশ্চয়ই পরম লাভ। আর যদি মৃত্যুর পর উহা মিথ্যাই প্রমাণিত হয় তাহা হইলেও আত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাস করায় অলাভ দেখা যায় না, যেহেতু কেবল ঐ বিশ্বাস জন্য আর আর লোক অপেক্ষা আমি যতটা নির্ভিকভাবে শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিতেছি, অন্য প্রকারে জীবন অতিবাহিত হইলে কখনই ততটা ঘটিত না।" সক্রেটিশের প্রার্থনা এই ঃ—"হে পরমেশ্বর! তোমার নিকট এই আমার সকাতর প্রার্থনা যে, আমরা যাজ্ঞা করি বা না করি, তথাপি তুমি আমাদিগকে ভাল হইলেও সেরূপ পদার্থ সকল কখনও প্রদান করিও না যাহা অশুভকর ও অসৎ পথে মতি লইয়া যায়। অপিচ বিদ্যাকল্পদ্রুমের মধ্যে পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সক্রেটিশের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও বিচার করিয়া দেখা ভাল। ইহাতে ঈশ্বর ও তাঁহার অস্তিত্বের কথাই পাওয়া যায়, সক্রেটিশ এথেন্স, পোটিডিয়া, অম্ফিপোলিস ও ডেনিয়ম স্থানের লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যথা—"এমত কুমতি আমার অন্তঃকরণের অন্তর্গত নহে। আমি আমার অপবাদকদের অপেক্ষা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দৃঢ়রূপে মান্য করি। তাহাতে আমার এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, যে আমি আপনাকে তাঁহার এবং তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তোমরা আপনাদের ও আমার বিষয়ে যেমন বিহিত বুঝিবা তদ্রূপ যেন বিচার নিষ্পত্তি কর।"

জীবাত্মা।

জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, মৃত্যুর পরে আত্মা যে জীবিত থাকিবে ইহা Aristotle এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিতেন না, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই সক্রেটিশ্ স্বীয় সুহৃদবর্গের নিকট বলিয়াছিলেন "ভরসা করি আমি মহাত্মাদিগের নিকট যাইতেছি, কিন্তু এ বিষয় নিশ্চয় কিছু বলিতে সাহস হয় না।" তিনি আরও সন্দিহান হইয়া বলিয়াছিলেন—"এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, তোমরা রহিলে কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কে সুখী, ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই জানে না।" ইঁহার অনুচর প্লেটো ও তাঁহার শিষ্য ভিন্ন আর কেহ জীবাত্মার অবিনশত্ব প্রচার করিতেন না।

পিথাগোরস্।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, "The third school of Philosophy was the Pythagorean," পিথাগোরস্ সেমস্ উপদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ৫৭০ অব্দে; যে দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত। তাঁহার মত—"অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িকদিগের যেরূপ মত আছে, জীবাত্মা নিত্য, জীবাত্মা যখন যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন সেই দেহের ধ্বংস হইলে জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না। পিথাগোরসেরও সেইপ্রকার মত ছিল।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে "সর্ব্বাত্মবাদ" শব্দের ব্যাখ্যা কি? বেদান্ত ও উপনিষদের সাক্ষ্য কি? এবং পাশ্চাত্য ক্যাণ্ট, প্লেটো, রয়েস্, গ্রীন্, কেয়ার্ড ও স্পেনসারের এই সম্বন্ধে কি মত দেখা যায়?

কঠোপনিষৎ ১।৩।১২—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ”—অর্থাৎ এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন। ইহারই নাম হইতেছে “সর্ব্বাত্মবাদ”—। এই কথা বড় গভীর। এবং অনেকেই ধারণাই করিতে পারে না, গভীর ধ্যানপরায়ণ ও সূক্ষ্মদর্শী না হইলে উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া অনেকে অগ্রাহ্য করেন। এই বিষয়টিকে অবজ্ঞা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত চিন্তা করা ভাল।—

সর্ব্বাত্মবাদের ভাষ্য।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ্ দার্শনিক ইম্মানুয়েল ক্যাণ্টের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিষয়িণী আলোচনা প্রকাশিত হইবার পর দার্শনিক আলোচনার গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ নিরূপণ অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতার উপকরণের (matter) সঙ্গে তাঁহার প্রকরণের (form) সম্বন্ধ নির্ণয়ই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং এক অর্থে এখন জ্ঞানবিষয়ক প্রায় সকল মতই অধ্যাত্মবাদে পরিণত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত আপন আপন মত অধ্যাত্মবাদ বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। কেননা, অধ্যাত্মবাদ শব্দটি এত বিভিন্ন রকমের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যে যাঁহারা আপনাদিগকে অধ্যাত্মবাদী বলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও এক সাধারণ বিষয়ে মতের ঐক্য ধরিয়া লইলে ভ্রান্তিজালে জড়িত হইতে হইবে। এমনও ঘটিয়াছে, যাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, তাঁহাদের মতকে এক মনে করিয়া নানা গোলমালে পতিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বিভিন্ন অর্থে অধ্যাত্মবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা করিলে যেমন একদিকে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্ট ধরা পড়িবে, অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদের জ্ঞানতত্ত্ব বিচারের পথও পরিষ্কৃত হইবে।

প্লেটো।

বোধ হয় গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোই প্রথম কথাটিকে দার্শনিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে প্রজ্ঞান (Idea) প্রধানতঃ বস্তু-জগতের অন্তর্গত (Objective)—বস্তু ও বস্তুর প্রজ্ঞান একই পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র প্রজ্ঞান আছে, তাহাই প্রকৃত সত্তা, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের বস্তুর জ্ঞান জন্মে—আমাদের জ্ঞানে যে বস্তুর আবির্ভাব, আমাদের মনে যে বস্তুর ধারণা, ইহা গৌণ মাত্র। কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত মতই দর্শন-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। ইংরেজ দার্শনিক লক্ ও বার্কলির মতে, যদিও উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্তের পার্থক্য যথেষ্টই আছে—প্রজ্ঞান একটি মনের অবস্থা। বস্তুর অস্তিত্ব বস্তু-সম্বন্ধে মনের ধারণা হইতে স্বতন্ত্র নহে—এই মত দার্শনিক চিন্তাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে, যে সাধারণতঃ অধ্যাত্মবাদ বলিতে আমরা সেই দার্শনিক মতটই বুঝি যাহাতে বস্তু অর্থে আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিণামই (Modification) বুঝি—তদতি-রিক্ত কিছুই মানি না। সুতরাং বহির্জ্জগৎ বলিতে—যদি কিছু থাকে তবে তাহা অনুমানমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, যদি কোন কোন দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ কথাটার প্লেটোর ভাব যোগ করিয়া ব্যবহার না করিতেন। এই জন্যই দার্শনিক আলো-চনায় সময়ে সময়ে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

ক্যাণ্ট।

জার্ম্মাণীতে যে অধ্যাত্মবাদ বিকশিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে এই গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যাণ্ট্ প্রধানতঃ বলিয়াছেন, ব্যষ্টি-জগৎ আত্মার সমষ্টিকরণ-শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে এই বুঝা যায়, যে জগৎ ও আত্মা দুইটি স্বাধীন সত্তা, পরস্পর-সম্বন্ধ। আত্মা

স্বীয় সমন্বয়শক্তিতে ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু তিনি (ক্যাণ্ট্) ইহাও বলিতেছেন—এই যে বস্তু-জগৎ যাহা আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দেখিতেছি এবং যে আত্মায় সে প্রকাশিত হইতেছে, সেই আত্মার বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এই যে আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ বহির্জ্জগৎ ইহার জ্ঞানাতীত স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; অথচ এই বহির্জ্জগতের সঙ্গে একটি খাঁটি বস্তু-জগতের (Things-in-themselves) অতিমাত্র বিভিন্নতা কল্পনা করিতে যাইয়া তিনি মানুষকে আপনার জ্ঞানের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করতঃ বার্কলিরই মত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বস্তু-সম্পর্ক বিরহিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বার্কলির মতাবলম্বী নহেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অবোধ্য তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যে যুক্তিতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা এই,—আত্মজ্ঞানের সঙ্গে বিষয়জ্ঞান অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই আমাদের আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়। আত্মা ও বিষয় জগৎ এই উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, একত্বও আছে। জগতের সঙ্গে ভেদ স্থাপন করিয়া, কিন্তু একান্ত ভেদে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয় বলিয়া, উহার সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেই আত্মা আপনাকে জানে। সুতরাং আত্মজ্ঞানও যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, জগৎজ্ঞানও তেমনই। একটিকে অনুমান লব্ধ বলিলে অন্যটিও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়, যে আমরা আমাদের আত্মস্থিত প্রজ্ঞানগুলিকে প্রথমত প্রজ্ঞানরূপেই জানি, পরে তাহা হইতে জগৎ অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানক্রিয়াকে উল্টা করিয়া দেখা হয় এবং জ্ঞানের সম্বন্ধযুক্ত উপাদানদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয়। যদিও একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, করিলে জ্ঞানের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধেই অজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে, যে বিষয়জ্ঞান মাত্রেরই সঙ্গে আত্ম-জ্ঞান জড়িত রহিয়াছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব—এক পত্রের দুই

পৃষ্ঠার ন্যায় ইহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। তথাপি এ কথাও সত্য, যে আদিতঃ আমাদের জ্ঞান বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয়—বিষয় জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার অর্থের অবধারণার চেষ্টার দ্বারাই আমরা জ্ঞানের প্রথম সোপানে পদার্পণ করি; পরে আত্মচিন্তা আসে, ও আত্মজ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়।

কঠ ২।১।১ "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাই মানুষ বিষয়কে দেখে, আত্মাকে দেখে না—এই কথা আমাদের জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে একটি ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অনেক বিবাদ মিটিয়া যায়। জ্ঞানের বিকাশে প্রথমে আসে—বিষয়জ্ঞানের দিক্, পরে আত্মজ্ঞানের দিক্। কিন্তু অনেকের দৃষ্টি বিষয়ের মধ্যে এমনই আবদ্ধ হইয়া যায়, যে তাঁহারা বিষয়-জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র করিয়া ফেলেন—এবং আত্ম-জ্ঞানকে অনুমান মাত্র মনে করেন। ইহা স্থূল দৃষ্টির সাধারণ ভ্রান্তি। কেননা, চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয় আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবেই। তাই ঋষি বলিয়াছেন, যদিও প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়েই আবদ্ধ থাকে, বিষয়ের আবরণ মুক্ত চিন্তাশীলের চক্ষু আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবেই দর্শন করে—"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ"। আত্মার একত্বের উপরই বিষয়-জগৎ নির্ভর করে—ইহাই এ দেশের বেদান্ত স্বীকার করে। এবং ইহাই বেদান্ত কথিত—"সর্ব্বাত্মভাব" শব্দের অর্থ। কিন্তু আত্মজ্ঞান যে এক অখণ্ড বস্তু ইহা সকল পণ্ডিত স্বীকার করেন না।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট।

ইহার মতে জ্ঞান অর্থই বিষয়জ্ঞান। আত্মজ্ঞান একটি অনুমান মাত্র। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে কোমৎ ও জেম্‌স্ এই মতাবলম্বী।

মুরারী মিশ্র ও নৈয়ায়িকগণ।

মুরারী মিশ্রের মার্গাবলম্বী মীমাংসকগণ আত্মজ্ঞানকে অনুমান বলেন না। তাঁহারা বলেন, জ্ঞানের আবির্ভাব বিষয়-জ্ঞানই আত্মজ্ঞান, কিন্তু বিষয়জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া পরে আবির্ভূত হয়—পরে আসে বটে, কিন্তু অনুমান নয়, উহাও প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকগণও প্রায় ঐ কথাই বলেন। সুতরাং ইঁহাদের সকলের মতেই আত্মজ্ঞান ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব। জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে এমন সময় আছে যখন আত্মজ্ঞান জন্মে নাই।

মার্কিণ পণ্ডিত রয়েস্।

মার্কিণ পণ্ডিত রয়েস্ যদিও বলিয়াছেন, যে আত্মজ্ঞান সময়ে সময়ে অব্যক্ত (Implicit) থাকে, কিন্তু তিনি বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত রয়েস্ খাঁটি কথা বলিয়াছেন।

মীমাংসক প্রভাকর, এবং পাশ্চত্য গ্রীন ও কেয়ার্ড।

অন্যদিকে, মীমাংসক প্রভাকরের মতে জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান। ধরিতে গেলে ইহা বেদান্তেরই মত। পাশ্চাত্য গ্রীন্, কেয়ার্ড প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদীগণ এই মতাবলম্বী। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই—এই মত যে সত্য তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মজ্ঞানরূপ সূত্র বর্ত্তমান না থাকে, তবে খণ্ডসকলকে একত্র করিয়া জগৎরূপ সমষ্টিজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। আমাদের বিষয়জ্ঞান অন্যোন্যবিশ্লিষ্ট একটা খণ্ডজ্ঞান নহে, উহা বহুখণ্ডের সমষ্টি। আত্মজ্ঞানই সেই সূত্র যাহা বিভিন্নকালে—বিভিন্নস্থানে সংগৃহীত—খণ্ডসকলকে একীভূত করিয়া এক অখণ্ড জগতে পরিণত করে। যে খণ্ড এখন "ক" এর "আমি' রূপসূত্রে আবদ্ধ হইল না, তাহা পরে তাহার বিষয়-জগৎরূপে—প্রতিভাত হইতে পারে না। এক খণ্ডজ্ঞান যদি কেবল

বিষয়জ্ঞানই হয়, তবে তাহার উপর 'ক' এর "আমি,' 'খ' এর "আমি,' 'গ'এর "আমি' কাহারও দাবী নাই, অথবা সকলেরই সমান দাবী।

সেটা বিশেষ ভাবে কাহারও জন্য জ্ঞানের অঙ্গীভূত হইল না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জগৎজ্ঞান তত্তৎ আত্মজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, যে আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জগতের বিষয়ী। বিষয়জগৎ এক ও অখণ্ড। আমরা যে যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়গণকে পরিপুষ্ট করিয়া এই এক ও অখণ্ড জগৎকে আয়ত্ত করিতেছি, সেই সেই পরিমাণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ের অধিকারী হইতেছি। যেহেতু, আমাদের জ্ঞানের উন্নতি নূতন নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করা নয়, কিন্তু একই সাধারণ বিষয়ের বেশী বেশী গ্রহণ করা। যাহাকে বলি বাহ্যজগৎ, তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যে হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হয় তাহাও জগৎ ছাড়া কিছু নয়, জগতেরই অংশ। যাহা হউক, যখনই কোনও একটা বিষয়-জ্ঞান হইল তখনই তাহা কোনও "আমি" রূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া বিষয়রূপে প্রকাশ পাইল। সুতরাং যাঁহারা বিষয়-জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা বিষয়জ্ঞানকেই ভিত্তিহীন করেন। এই যে আত্মজ্ঞানবিরহিত—তথা কথিত বিষয়জ্ঞান, তাহা পণ্ডিতগণের আত্মপ্রতারণার ফল মাত্র।* ইহার পরিণাম জড়বাদ। বাস্তবিক জ্ঞানের এই দুই উপাদানকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাতেও বিচ্ছিন্ন করা চলে না। জ্ঞানগত জীবনেই হউক, আর কর্ম্মগত জীবনেই হউক, আমাদের অভিজ্ঞতার এমন অতি ক্ষুদ্রতম অংশও কল্পিত হইতে পারে না, যেখানে এই দুই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। সুতরাং যাঁহারা বলিবেন আত্মা ছাড়া জগৎ আছে তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা বলিবেন জগৎ ছাড়া আত্মা আছে, তাঁহারাও তেমনই ভ্রান্ত। কেননা,

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এবং তৎসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় রচিত "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন" নামক গ্রন্থের "সর্ব্বাত্মবাদ" নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমাদের আত্মজ্ঞান কেবল জগৎজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হইতে পারে। আত্মাকে ভোক্তা ও জগৎকে ভোগ্য, বিষয় বিষয়ীর এই পার্থক্য কল্পনা করিলে ভ্রান্তি আসিবেই। বিষয়ের দিক্ হইতে বিষয়ীর যে স্থান, বিষয়ীর দিক্ হইতে বিষয়েরও ঠিক সেই স্থান—উভয়ের মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্যায় কল্পনা বস্তুতত্ত্বের দিক্ হইতে নিতান্তই ভ্রান্তি-মূলক। সুতরাং বিষয় জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিলে আত্মজ্ঞানও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ইহার পরিণাম বৌদ্ধ শূন্যবাদ। আবার যাঁহারা আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকার গর্ত্তের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

স্পেন্সার ও তন্মতাবলম্বিগণ।

স্পেন্সার ও তন্মতাবলম্বিগণ বলেন, যে ব্যাবহারতঃ (Phenomenally) জড় ও আত্মা উভয়ই সত্য, কিন্তু পারমার্থিকভাবে ইহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং দুই স্বতন্ত্র এবং বিপরীত দিক্ হইতে জগতের দিকে দৃষ্টি করা চলে। উভয়ে স্ব স্ব দিক্ হইতে পূর্ণরূপে জগৎকে গ্রাস করিতে চায়। হয় জগৎ অন্ধশক্তি সকলের সমষ্টি, না হয় মানসিক ভাবসমূহের একত্রাবস্থিতি। কিন্তু বিপদ এই, দুইটির একটীকেও পরিত্যাগ করা চলে না। যদি জড়বাদী হই, বলি আত্মা জড়ের পরিণাম; আর যদি আত্মবাদী হই, বলিব জড় আত্মার গুণ। একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যটি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। অথচ প্রথম হইতেই একান্ত ভেদ কল্পনা করিলে উভয়কে গ্রথিত করিবার সূত্রও হারাইয়া যায়। হারাইয়া যায় বলিয়াই উভয়ের সমন্বয় অসম্ভব হইয়া উঠে। যদিও স্পেন্সার দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে এক নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া জ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু বুদ্ধির দোষে তাহা বুদ্ধির অগম্য' স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং একদিক্ ছাড়িয়া আর একদিক্ যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনই সে সূত্রও তাঁহার মতে ধরা

ছোঁয়া দেওয়ার অতীত যাহা দ্বারা উভয়কে গ্রথিত করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম বস্তুকে (ঈশ্বরকে) নাকি ভাবিতে গেলেই তিনি অব্রহ্ম হইয়া যান। এমন "ব্যথাত সলিলে ডুবে মরা" দর্শন শাস্ত্র দ্বিতীয়টী নাই। চৌধুরী মহাশয় স্পেনসারের খুঁটি-নুটি বাহির করিয়া ঠিক কথাই বলিয়াছেন,—আমিও তাঁহার ঐ মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে আমার সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই।

তাই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্পেন্‌সার বলিয়াছেন—"কি বিপদ! জড়ের ব্যাখ্যা কেবল আত্মার সাহায্যেই হয়, এবং জড় ছাড়িয়াও আত্মার ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আত্মার ব্যাখ্যা শেষ করিতে না করিতে—ধাক্কা খাইয়া জড়ে যাইয়া পড়ি, জড়ের ব্যাখ্যা শেষ করিতে না করিতে—আত্মাকে আশ্রয় করি। হায়রে মানুষের ভাগ্য"! দোষ মানুষের নয়, বুদ্ধির। অখণ্ড বস্তুকে গায়ের জোরে খণ্ড করিয়া শেষে বুদ্ধির প্রাণ লইয়া টানাটানি। আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতায় জড় ও আত্মা এক হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে গায়ের জোরে ভিন্ন কল্পনা করিয়া এখন সম্বন্ধ খুঁজিয়া অস্থির—সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া নদীর দুইপারের যোগ দেখাইতে যাইয়া গলদ্ ঘর্ম্ম হইতে হইবে বই কি! এদেশের ব্যাখ্যাকারদিগের অভিজ্ঞতায় জড় ও আত্মার একত্ব দেখে, স্পেন্‌সার দর্শনে তাহার ব্যাখ্যা নাই। তাঁহার মতে জড় ও আত্মা একান্তই ভিন্ন। বহুত্বপূর্ণ এই ব্যাবহারিক জগৎই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, আমাদের জ্ঞান সুতরাং বহুত্বপূর্ণ, এখানে একত্ব নাই। অথচ একত্বের জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানই হয় না। সুতরাং একটা একত্ব আছেই, সেটা পারমার্থিক; কিন্তু তাহা জ্ঞানের বিষয় নয়। একদিকে বস্তু সম্পর্কবিরহিত একত্ব, অন্যদিকে একত্ববিহীন বহু। কেন না, এক পারমার্থিক, কাজেই অজ্ঞেয়। বহু ব্যাবহারিক, একমাত্র তাহাই জ্ঞানের বিষয়,—কেননা পরস্পরের সম্বন্ধেই জ্ঞান এবং জ্ঞানমাত্রই সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং এক ও বহু দুই বিভিন্ন কোটিতে অবস্থিত, অথচ এক অন্যের অপেক্ষা

করিতেছে। বোধহয়, এক সঙ্গে এত অসঙ্গতি আর কোন দর্শনে নাই। এক পারমার্থিকও অজ্ঞেয়, বহু ব্যাবহারিক ও অজ্ঞেয়। কিন্তু এই ব্যাবহারিক জগতের প্রত্যেক জ্ঞানখণ্ড ঐ অখণ্ড পারমার্থিক তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যে দৈনিক অভিজ্ঞতা ইহা তো ব্যাবহারিক, কিন্তু ইহাও জ্ঞান—অথচ ইহার মধ্যে যে একত্ব আছে তাহা প্রত্যক্ষ। এই পারমার্থিক একত্ব ও অভিজ্ঞতা বহুত্ব, ইহারা একান্ত স্বতন্ত্র দুই কোটি। এই যে স্ববিরোধ, ইহাকে স্পেন্‌সার মিলাইয়াছেন, এইরূপে—একত্ব যে আছে তাহা নিশ্চয়, তা না থাকিলে চলেই না, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষ। তবে সেটা কি রকম জ্ঞান—তা সহজেই বুঝা যায়—সেটা কি না—অর্থাৎ জানি না।

সাংখ্য দর্শন ও স্পেন্‌সার।

ভারতের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও এই বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন—তিনি আবার যে সে নন, স্বয়ং কপিল মুনি—একুশ অবতারের একজন। তিনি মস্ত জহুরি কি না, তাই "আত্মারামের—অস্থির" এক আঘাতে জগৎটাকে একদম পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর মহাবিভ্রাট। জগতের তো ব্যাখ্যা চাই—পুরুষ প্রকৃতির মিলন ছাড়া তো জগৎ হয় না। তারা কিন্তু চক্রবাক মিথুনের ন্যায় এক অলঙ্ঘনীয় নদীর দুই পারে। সুতরাং সৃষ্টি হয় দৈবাৎ উভয়ের মিলনে। স্পেন্‌সার দর্শনের মূলে এক বিরাট্ "জানি না", আর সাংখ্যদর্শনের মূলে এই "বিকট দৈবাৎ"।

জড়ের ধাক্কা আত্মায় যাইয়া পড়া, আর আত্মার ধাক্কা জড়ে যাইয়া পড়া। এ কথার উত্তর ও প্রতিকার কোথায়?

ইহার কি কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা কিম্বা প্রতিকার নাই? আছে। দর্শনের দিক হইতে বলা যায় এই যে এক ও বহু, ইহা বস্তু সম্পর্কবিহীন

এক বা সম্বন্ধশূন্য বহু নহে। পণ্ডিতেরা এক অখণ্ডবস্তুকে খণ্ড করিয়া, আপনাদের কল্পনায় খণ্ডকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা দিয়া দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শতবাদ লইয়া লক্ষ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এক ও বহু—একই বস্তুর দুই দিক। জগৎ বাস্তব পদার্থ—ইহাকে কোন বস্তু সম্পর্কবিহীন নির্গুণ সত্তার দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গেলে—যেমন স্পেন্সার বা শঙ্কর (পাঠকগণ মাপ করিবেন—এই দুই নাম একত্র হইতে পারে না, তবে এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এরূপ করিলাম) করিয়াছেন—তাহাতে ভ্রান্তি হইবেই। পরমার্থিক ও ব্যাবহারিক, নির্গুণ ও সগুণসত্তা যদি দুই স্বতন্ত্র কোটিতে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে এক অন্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধেই আবদ্ধ হইতে পারে না, এক অন্যকে ব্যাখ্যা করিতেই পারে না যতক্ষণ না তৃতীয় "কিছু" উভয়কে আপনার মধ্যে একত্র করিয়া দেয়।

কিরূপে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এই বিবাদের মীমাংসা করিতেছেন, তাহা একবার বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। অধ্যাত্মবাদ এক ও বহু আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে একান্ত পার্থক্য বা বিরোধ স্বীকার করেন না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যখন দুইএরই স্থান রহিয়াছে তখন দুইই সত্য। ভিন্ন বলিয়াই এক, এক বলিয়াই ভিন্ন। ভেদ না থাকিলে যেমন একত্ব অর্থহীন, তেমনই একত্ব না থাকিলে ভেদ—অবোধ্য। ইহা না বুঝিয়াই স্পেন্সার প্রভৃতি ভেদ ও একত্বের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য কল্পনা করতঃ একটিকে নিতান্ত ব্যাবহারিক অন্যটিকে নিতান্ত পারমার্থিক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এদেশে নির্গুণ—সগুণের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। সম্বন্ধ না থাকিলে যে ভেদ জ্ঞান হয় না, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। একমণ ও একমাইলের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, কে ভাল কে মন্দ, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না এই জন্য, যে উভয়কে তুলনা করিবার মাপকাঠি নাই অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একত্ব নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র বালুকণার সঙ্গে ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্যের পরিমাণগত পার্থক্য

যতই বেশী হউক না কেন, উভয়ের ভেদ বুঝিতে পারি, কেননা, উভয়ের মধ্যে একত্ব আছে—সম্বন্ধ আছে—একস্থানে উভয়েই এক—এমন কিছু আছে যাহা উভয়কে এক করিয়াছে। যদি বল ক ও খ পরিমাণে ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবে ক ও খ এক অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত। যে সেতু নদীর দুই পারকে একত্র করে, সে-ই যে আবার দুই পারের ভিন্নতাও সম্পাদন করিতেছে। সম্বন্ধ ছাড়া ভেদ নাই। সুতরাং যাঁহাকে বলি ব্যাবহারিক জগৎ তাহারই মধ্যে পারমার্থিক একত্ব রহিয়াছে। ব্যাবহারিক জগতে ভেদ দেখিয়া যদি তাহার কারণ খুঁজিতে যাইয়া পারমার্থিক জগতে, নির্গুণকে ছাড়িয়া যদি সগুণ অবোধ্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সগুণ ও নির্গুণ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে—এই উভয়ের মিলনে যে বস্তু সেই সমগ্র বস্তুটিই ব্রহ্মবস্তু। এই সমগ্র তত্ত্বটি লইয়াই অধ্যাত্মবাদ আপনার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, ইঁহাকে লইয়াই বিচার করিয়াছে, এবং ইঁহারই মধ্যে অধ্যাত্মবাদের গতি নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং জড় ও আত্মার মধ্যে, বহুত্ব ও একত্বের মধ্যে, যত বড় ভেদই কল্পনা করা যাক্ না কেন, কিছুরই মধ্যে ইহা বিভীষিকা দেখিতে পায় না। ইহার কাছে কিছুরই মধ্যে একান্ত বিরোধ নাই, সম্বন্ধবিহীন ভেদ নাই। যত কেন বিভিন্নতা থাকুক না, সকলে পরিণামে অনন্ত ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়াছে। ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবস্তু; কাজেই, জ্ঞানজগতের বাহিরে কোন অজ্ঞেয় জগৎ নাই। সুতরাং জগতের ব্যাখ্যায় "জানি না" বা "দৈবাৎ" প্রভৃতি দৈত্যদানবের ও আশ্রয় লইতে হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই আশ্রয়। এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নহে। কিন্তু এই জ্ঞানবস্তুতে মানবচিন্তা হঠাৎ আসিয়া উপনীত হয় নাই। এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদ, আত্মা ও জড়—ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, একত্বও আছে—এই জ্ঞান প্রথম হইতেই মানবচিন্তার মধ্যে ছিল না। সাধারণ মানুষ চিন্তাবিহীন অবস্থায় জড় ও আত্মা একই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল; ভেদবিহীন

সম্বন্ধ ও সম্বন্ধবিহীন ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশু জড় ও আত্মার ভেদ জানে না; সে আছাড় খাইয়া উঠিয়া মাটিতে পদাঘাত করে, প্রতিশোধ লইবার জন্য। জ্ঞানের এই নিম্নতম সোপানে মানুষ বহুও স্বীকার করে, একও স্বীকার করে, কিন্তু উভয়কে একত্র করিতে না পারিলে যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিল তাহা সে বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের এই অবস্থায় সহজভাবেই ভেদবিহীন সম্বন্ধ ও সম্বন্ধবিহীন ভেদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র কি তাহার জ্ঞান হয় না; এই যোগ-সূত্রের প্রয়োজনীয়তা আসে যখন উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়, ইহাই জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। যখন এই জ্ঞান হয়, যে এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদ দুই স্বতন্ত্র বস্তু—তখন একটিকে স্বীকার করিলে অন্যটিকে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে উভয়কে এক কোটিতে গ্রহণ করা যায় না; যদি এক সত্য হয়, তবে "নেতি" "নেতি" করিয়া বহুকে পরিত্যাগ করতঃ একে উপ-নীত হইতে হইবে। বহুত্ববাদী বলিবেন, ঐ যে একের কথা বল, ও কিছু নয়, থাকিলেও সে অজ্ঞেয়, উহা লইয়া মাথা ঘামান নিতান্ত পণ্ডশ্রম; একত্ববাদী বলিবেন, বহু লইয়া থাকা সে তো বিনাশের পথ, (কঠ, ২।১।১০)। বস্তুতঃ একান্ত একত্ববাদ বা একান্ত বহুত্ববাদ বা জড়বাদ—উভয়েই বিনাশের পথে লইয়া যায়। বহুত্ববাদী জড়ে আবদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানবিহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার কাছে আত্মা, জড়ের সমষ্টি বা সূক্ষ্ম জড়ে পরিণত হয়। সুতরাং জ্ঞানের দিকে তিনি যেমন জড়বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতত্ত্বের ধার ধারেন না, তেমনই কর্ম্মের দিকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সুখবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষকে পশুর পদবীতে অবনত করিয়া দেন। অন্যদিকে আবার, জ্ঞানের দিকে আত্মবাদী যেমন বহুত্বপূর্ণ বিষয়জগতের মধ্যে বিকার ও পরিবর্ত্তন দেখিয়া দেশকালের অতীত আত্মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে শূন্যবাদ বা বিনাশবাদে উপনীত হন, তেমনই কর্ম্মের দিকে সংসারের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন

হইয়া পড়েন। পাখায় বাতাসের আঘাত লাগে বলিয়া পাখী যদি বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাত স্থানে উড়িতে যায় তবে তাহার যে দশা হয়, বহুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষে একত্বের অন্বেষণকারীর দশা তাহা অপেক্ষা কম শোচনীয় নহে।

যে সমস্ত বিষয়ের সংস্পর্শে প্রকৃত সুখ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া "সুখ" "সুখ" করিয়া ছুটিলে কখনও সুখ হয় না।

ঋষি বাক্যের সাক্ষ্য ও উপনিষদ্।

আমরা এইবার একবার উপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করি। ঈশোপনিষদ ১২।- "যাহারা কেবল অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাহারা তদপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে"।

ঐ—৭। "যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদায় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্ম প্রত্যয় জন্মে, তখন এরূপ একত্বদর্শী ব্যক্তির মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না)।

ঐ—৫। "তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন, তিনি এই সমুদায়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদায়ের বাহিরেও আছেন"।

এই ঋষি বাক্যের সার্থকতা—কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে—যিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে এক করিতেছেন তিনি এক এক করিয়া সকলের অতীত না হইয়া পারেন না। যিনি সূত্ররূপে ক ও খ'এর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়কে এক করিতেছেন, তিনি ক'এরও বাহিরে, খ'এরও বাহিরে। ইতঃপূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে যে ক ও খ'এর ভেদজ্ঞান পাইতে হইলেই উভয়ের সম্বন্ধজ্ঞাপক অভেদ সূত্রের জ্ঞান চাই, নতুবা ভেদজ্ঞান অর্থহীন হইবে। কাজেই

জ্ঞানোন্নতি-মার্গে এই ভেদ সোপানে বসিয়া থাকা চলে না। হয় পূর্ব্বের অভেদজ্ঞানে চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা ভেদের মধ্যে অভেদতত্ত্বকে আবিষ্কার করিতে হইবে। কেননা, একটু সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে জ্ঞানের মধ্যে এক হইতে বহুকে, সম্বন্ধ হইতে ভেদকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একান্ত ভেদ ভেদই নয়—যে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়, উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে ভেদজ্ঞানই সম্ভব নয় এবং সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেই গেলেই—এমন সূত্র চাই যাহা উভয়ের পক্ষে এক। এই সম্বন্ধযুক্ত ভেদই একমাত্র ভেদ।

এক বা সমগ্রের অর্থ।

দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় ইহার বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়, তাহা এই যে ইহা আপনাকে বহু খণ্ডে ছড়াইয়া দিয়া সূত্ররূপে বহুকে এক করিয়াছে এবং বহুখণ্ড বা অংশের অর্থই এই যে উহারা একের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া সমগ্রে পরিণত হইয়াছে। অংশ মানেই সমগ্রের খণ্ড—সুতরাং সমগ্র বহুখণ্ডে বিভক্ত না হইলে অংশ হয় না। কাজেই একদিকে যেমন একের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই, তেমনই পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন হওয়া চাই— ইহারই নাম বহু। এক বলিলে যেমন এক ও বহু বুঝাইবে, তেমনই বহু বলিলে বহু ও এক বুঝাইবে। অংশ বলিলেই সমগ্র বুঝায়, সমগ্র বলিলেই অংশ বুঝায় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভেদ ছাড়া অংশের কোন অর্থই নাই। ইহা বুঝিলেই এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদের বিবাদ মিটিল। কেননা, এককে ছাড়িয়া বহু, বহুকে ছাড়িয়া এক, ভেদকে ছাড়িয়া সম্বন্ধ, সম্বন্ধকে ছাড়িয়া ভেদ কল্পনা মাত্র, ইহাদের বস্তুগত কোন অস্তিত্ব নাই।

এই যে ভেদগর্ভ অদ্বৈত ইহাই প্রকৃত বস্তু। সকল ভেদকে

আত্মস্থ করিয়া রহিয়াছে যে অদ্বৈত, অথবা অদ্বৈত কর্ত্তৃক সমন্বিত হইতেছে যে ভেদ—ইহাদের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বিচাব বিতর্কের বাহিরে। আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিবার চেষ্টাও যা, ইহাদের অস্তিত্ব সন্দেহ করাও তা। কেননা, ভেদ ও একত্ব কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য নয়, কিন্তু চিন্তারত জ্ঞানের পক্ষে অনতিক্রমনীয় মূলসূত্র। কোন এক অংশকে জানিতে হইলে অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ জানা চাই, কিন্তু সমগ্রের আলোক ছাড়া সে জ্ঞান হয় না। সমগ্রেরই উপরে আমরা পদভর ন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হইতে পারি, কোন অংশের উপরে নহে। যতক্ষণ এই সমগ্রের জ্ঞান পরিস্ফুট না হয় ততক্ষণ কি আত্মজ্ঞান কি বিষয়জ্ঞান কিছুই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান বিষয়জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, বিষয়জ্ঞান আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং উভয়ের জ্ঞান—ধর্ম্ম জগতের ভাষায়—ব্রহ্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই ব্যাখ্যায় দেখিলাম, সমগ্রকে ছাড়িয়া অংশ অর্থহীন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে জীব ও জগৎ মিথ্যা। ইহা হইতেছে বেদান্তের মত।

সমগ্রের দুইদিক্—বিষয় ও বিষয়ী। এই বহুত্ব পূর্ণের অংশে সমষ্টি বিষয়ের দিক্, আর এই বহুত্বকে যিনি একত্ব দিতেছেন তিনি বিষয়ীর দিক। এই বিষয়—বিষয়ী সমন্বিত সমগ্রই ব্রহ্ম। আর এই সমগ্রই যখন ব্রহ্ম তখন বিষয়ও এক ছাড়া দুই নহে, বিষয়ীও এক ছাড়া দুই নহে, এবং উভয়ে মিলিয়া মূল এক বস্তু। সুতরাং ব্যক্তিগত জ্ঞানে আমরা যে বহু বিষয় ও বিষয়ীর কথা বলি তাহা সত্যকার পদার্থ হইলে ঐ মূলে বিষয়—বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। স্বতন্ত্র বলিলেই মিথ্যা, মায়া হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনকে যদি সত্য পদার্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তবে তাহা ব্রহ্ম পদার্থই—ব্রহ্মের অনুপ্রকাশ মাত্র।

* অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের চিন্তার মধ্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন এবং বিষয়—বিষয়ীর ভেদের মূলে থাকিয়া তাহাদিগকে সমন্বিত করিতেছেন—তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই যেমন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রধান কাজ, তেমনই এই ব্রহ্মবস্তু আত্মারূপে অন্তর্য্যামীরূপে আমার জীবনে প্রকাশিত থাকিয়া কিরূপে সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আমাকে নিয়মিত করিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় করিয়া দেওয়াতেই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহাই অধ্যাত্ম-বাদের শিক্ষা। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৫ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে—"যাঁহাতে দ্যুলোক, ভূলোক, ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণসহ মন ধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মবস্তুকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর। অমৃতত্ব লাভের এই একমাত্র উপায়"।

এই জ্ঞান ভাব ইচ্ছা সমন্বিত সত্যশিব মঙ্গল সুন্দর স্বরূপ আত্মবস্তুই ত্রিজগতের মূল কারণ। বস্তু দুই নয়, এক। উপাদান ও নিমিত্ত কারণ

* বেদান্তবাগীশোপাধিক অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিদ্যাভূষণ তত্ত্ববারিধি, এম, এ, প্রণীত ধর্ম্মেরতত্ত্ব ও সাধন গ্রন্থে „ভ্রান্ত অদ্বৈত-তত্ত্ব অনিষ্টের জনক" নিবন্ধে যাহা বলিয়াছেন—তাহা ধ্রুব সত্য, আমি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—"প্রচলিত ধর্ম্মগুলি দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভের জন্য যখনই প্রকৃত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা মানব অন্তরে জাগ্রত হয়, প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে এই ব্যাকুলতার তোড়ে পড়িয়া মানুষ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে যে জগতে কত দুর্নীতি আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যদিকে, ব্রহ্ম লাভ করিতে যাইয়া প্রকৃত—ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে উহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমূলে উৎপাটিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা প্রথমে মর্কট বৈরাগ্যের মরুভূমিতে দগ্ধ হন; পরে প্রতিক্রিয়ায় আবার দুর্নীতির সাগরে ডুবিয়া মরাই তাহাদের সার হয়। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ লীলার বস্তুতান্ত্রিক (Realistic) হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়গণকে তৃপ্তি দিবার জন্য "সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া সর্ব্ব অঙ্গের রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—। তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ।"

এই আত্মবস্তু নিজের শক্তিতেই অন্তর্নিহিত আদর্শকে দেশকালরূপ "কাঠামো"র মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শক্তিশক্তি মতয়োর ভেদত্বাৎ। আত্মার মধ্যে যে মঙ্গলরূপ আছে, তাহার আকৃতি গ্রহণ করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সৃষ্টিক্রিয়া। এই সৃষ্টিক্রিয়ার প্রকৃতিই এই, যে উহা একদিনে হঠাৎ নিষ্পন্ন হইয়া যাইতে পারে না। স্রষ্টাও সৃষ্টি একই বস্তুর দুই দিক্, একটী শেষ হইলে অন্যটিও শেষ হইয়া যায়। দেশ কালের মধ্য দিয়া এই সৃষ্টি অনন্তকাল চলিবেই। এবং যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, এবং ঘটিবে, সকলেরই অভিপ্রায় ঐ আত্ম-বস্তুতেই নিহিত রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে স্ব-ইচ্ছা সম্ভূত শক্তির প্রয়োগে স্বীয় অভিপ্রায় সাধন করে। মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির তাহাই সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ যাহার সাহায্যে সে প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করতঃ আপনার শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সহজেই ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহারও অভীষ্ট মঙ্গলই। এই মঙ্গল অভিপ্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক কার্য্য করিতেছে। মানুষের অনুভূতির পশ্চাতে থাকিয়া এই মঙ্গল ইচ্ছা তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে ; ইহা কোন মানুষের মন গড়া নহে। এই মঙ্গলভাবই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য বস্তু। সুতরাং জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আছে, এই জগৎ ব্যাপারের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গরূপেই আছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা থাকিবেই। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যখন অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তখন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহ-কালেই হউক পরকালেই হউক, তাহার বিনাশ নাই, (তাই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৯ শ্লোকে বলে—"সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে"—অর্থাৎ সেই জীব কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মরূপে বিজ্ঞেয়। অথচ সে আনন্ত্য প্রাপ্তির উপযুক্ত)। সুতরাং সে অনন্ত জীবনের

অধিকারী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে আত্মবস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত মানব যখন সেই বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত; তখন অনন্ত জীবনই তার আপন জীবন। যম নচিকেতার "যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" (কঠ ১।১।২০) (নাচিকেতা বলিলেন, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এইযে এক সন্দেহ আছে,—কেহ বলেন "আছে" কেহ কেহ বলেন "নাই") এই প্রশ্নের উত্তরে কথাটার স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। যেন গোঁজামিলই দিয়াছেন। এই গোঁজামিল-স্বরূপ উত্তর কঠোপনিষদের অন্যান্য শ্লোকেও আছে। ইহাই হইতেছে ভারতীয় দর্শনের "সর্ব্বাত্মবাদ"—বিষয়ের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আংশিক রূপে পূর্ব্বে উত্তর দেওয়া হইয়াছে—সুতরাং এস্থলে অন্য উত্তর প্রদানের প্রয়োজন নাই—দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যার সর্ব্বাত্মবাদ বিষয়টা কি তাহাই কেবল এস্থলে পাঠকের জন্য প্রদর্শিত হইল। হেগেল দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাত্মবাদের ঐরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক এই সংজ্ঞাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করিবেন যথা—"তাহাতেই আমাদের জীবন, গতি, ও সত্তা" নিহিত আছে। আর খ্রীষ্টীয় দর্শনে ও ধর্ম্মব্যাখ্যার মধ্যে পূর্ণ অনন্তজীবন লাভ যে সংজ্ঞায় সাক্ষ্যদান করে তাহা এই—"আইস আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও"। পুনশ্চ খ্রীষ্টীয় দর্শনের সাহায্যে আমরা একথা বলিতে পারি যে এই জীবন যে কেবল স্বাভাবিক, অর্থাৎ শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ, তাহা নহে, কেননা নষ্টাত্মাদেরও ইহা আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক; আর ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগেই আধ্যাত্মিক জীবনের মূল এবং খ্রীষ্টও সেইরূপ বলেন "যে ব্যক্তি পুত্রকে পাইয়াছে, সে জীবন পাইয়াছে, যে ঈশ্বরের পুত্রকে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই"। এ ব্যাখার সহিত নাচিকেতার কোন সম্বন্ধ নাই।

মোট কথা এই ঈশ্বরের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ, তিনি আমাদের

সকলের পিতা; যেখানে তাঁহার প্রকাশ দেখিব, যেখানে তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিব, সেইখানেই আমরা ভক্তি ও প্রীতি-প্লুত হৃদয়ে যাইব ও সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। ধর্ম্মজগতে যিনি যতই ব্যাখ্যা দিক না কেন, সাধনতত্ত্বে আমাদিগকে উঠিতে হইবে, এ ভূমিতে না উঠিলে ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে, সাধনতত্ত্বের সোপান অবহেলা করিলে হৃদয়ের মলিনতা ও সংকীর্ণতা থাকিয়া যাইবে। এমন অনেক বস্তু আছে যাহা লাভ করিতে হইলে এই সাধনতত্ত্বের মধ্য দিয়া আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে।

যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, জগতের নানা স্থানে যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ খৃষ্টীয় সাধক ও সাধিকাদলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহাদিগের বৈরাগ্য, পরার্থপরতা, সাধনক্রম ও সাধন-ফল বিস্ময়জনক, এবং খৃষ্টীয় তাপসগণের হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল—ঐ সাধনতত্ত্বের ফলে; সুতরাং আমরা এ বস্তুকে হেয়জ্ঞান করিতে পারি না এবং কাহারও করা উচিত নহে। বর্ত্তমানকালে সাধনতত্ত্বের শক্তির ফলে ধর্ম্মজগতে ম্যাডাম্ গাঁওন্ এবং ইভিলিন্ আণ্ডারহিল্ * তাঁহার কৃত Mysticism নামক গ্রন্থে জগতের ক্রোড়ে যে বস্তু রাখিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় যেন পৃথিবীর বায়ু পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা খ্রীষ্টোপদেশ এবং তাঁহার অখণ্ডনীয় দাবী হেয়জ্ঞান করেন, যাঁহারা সে বস্তু মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, যাহাদিগের মন কুজ্ঝটিকাতে সমাচ্ছন্ন, তাঁহারা একবার চক্ষু খুলিয়া উহাতে যে বস্তু নিহিত রহিয়াছে—তাহা দেখুক্। যাঁহারা এ দেশে সুসমাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা কথা কহিতে ভালবাসেন তাঁহাদেরও ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইবে যদি Christian Mysticism গ্রন্থে প্রবেশ করেন। জর্ম্মাণের নাস্তিক শিরোমণি নীচে, তাঁহার কৃত Anti-Christ গ্রন্থে খৃষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিষ বড়ি

* Mysticism—by Evelyn Underhill.

ঢালিয়াছে, সেই বড়ি ভক্ষণ করিয়া অনেকে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। মাননীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও তাঁহার কৃত গীতারহস্তে কত কথাই বলিয়াছেন। তিনি আবার নীচেকেও তন্মধ্যে দেখাইয়াছেন। আমি একথা বলিতেছি না যে তিনিও নীচে প্রদত্ত বিষবড়ি ভক্ষণ করিয়াছেন। তবে কিনা নীচের অত্যন্ত কলুষিত বাক্য অনুমোদন করা বিজ্ঞের পক্ষে কি শোভনসুন্দর হয়? গীতারহস্তে কত কথাই বলিয়াছেন —সে সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর করিবার আমাদের এস্থান নহে। সুখের বিষয় আওারহিল তাঁহার লেখনী দ্বারা সেই সকল বিষবড়ি ঝাড়িয়া দিয়াছেন। সেগুলি দেখিলে নীচেকে মূর্খ শিরোমণি আখ্যায় অভিহিত না করিয়া থাকা যায় না। উদাহরণস্বরূপে ষ্ট্রষকেও নীচের দলে গণ্য করা যাইতে পারে। যাহা হউক সে বিষয় আর আমরা অগ্রসর হইব না। কারণ আমরা লক্ষ্য স্থান হইতে অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছি।

পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের এলিয় ও নূতন নিয়মের যোহন বাপ্তাইজক। দুই ব্যক্তিকে আমরা প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিতে পারি, উভয়ের সাধনা ও বৈরাগ্যের জলন্ত উদাহরণ পৃথিবীতে রাখিয়া আজও সর্ব্বজাতির মধ্যে শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কে তাঁহাদিগের জীবনকালের ইতিহাস ও সাধনশক্তিকে উল্লঙ্ঘন বা মিথ্যা বলিতে পারে? আমি খৃষ্টপন্থী পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে তাঁহাদিগকে সাধন-পথের পথিক হইতে হইবে এবং তাহার ফল জগৎকে দেখাইতে হইবে। সেই ফল বড় মধুর অর্থাৎ খৃষ্টযুক্ত তুমি, এবং তুমিযুক্ত খৃষ্ট। তোমাকে দেখিয়া যদি লোকে খৃষ্টকে চিনিতে না পারে তবে তোমার সাধন এখনও হয় নাই।

সেভয় কন্‌ফারেন্স আমাদের উপাসনার পদ্ধতি তৈয়ার করিয়া দিবেন, আমাদের প্রার্থনা করিতে শিখাইবেন, তবে আমরা প্রার্থনা করিতে শিখিব, এ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ক্যানৈথ, সভা আইন বেদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া দিবেন, লিপি, এবং নেশনই আমাদের

কোলে শান্তিবারি ঢালিয়া দিবেন—এ আশায় প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা কেবল ধৃষ্টতামাত্র। ইহাতে ঐশী যোগতত্ত্ব খুঁজিয়া পাইবে না। এ আশায় বসিয়া থাকিলে আত্মার মিলন ঘটিবে না। মনে রাখ ভারত কর্ম্মভূমি, আর ইউরোপ বিলাস-ভূমির ক্ষেত্র। যাঁহারা বিলাসভূমির পথে প্রধাবিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাধনভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিবেন না। আর যাঁহারা কর্ম্মভূমিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা বিলাসরাজ্যের কোন বস্তুই স্পর্শ করিতে চাহিবেন না। আমরা খৃষ্টপন্থী হইলেও ভারতসন্তান্, ভারতে অনেক বস্তু আছে যদ্দারা আমরা ঐশীতত্ত্ব জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারি, তাহার জন্য আর অন্যত্রে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ সুসমাচারের সৎবস্তুগুলি'ত কাহারও হাত-তোলা বস্তু নয়; উহা যে স্বয়ং প্রভুর বাণী।

একবার ভাব তোমার সাধন-তত্ত্বের শক্তি কত গভীর, এ সাধন-তত্ত্ব গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত আছে; "যাহারা প্রভুতে আসক্ত হয় তাহারা একাত্মার ভাগী হয়"—এ সংজ্ঞা ধ্যান-যোগের বিষয়। "Substantial unity of Spirit"—এই যে একটা কথা বহু বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল্ তাঁহার "Philosophy of Religion"-নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—তাহার কোন অংশই পরিত্যাজ্য নহে, চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে ইহা বড় মূল্যবান বস্তু ও ধ্রুব সত্য; সাধকমাত্রেই ধ্যান ও সাধনার ফলে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যে সকল খৃষ্টপন্থী সাধক আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন হইতে ঐ বাক্যের প্রভাব ও শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সেগুলি অস্বীকার করিবার যো নাই।) এস্থলে পাঠককে "Substance" কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইহা ভুলিলে চলিবে না; আমি জানি আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ঐ কথাটিকে একবারও ভাবিবার বিষয় মনে

করেন না। জার্ম্মাণ তত্ত্ববিৎ লেভিনিস্ দেহকে "Tabernacle of God" বলিয়াছেন, হঁা, ইহা তাঁহার ঠিক কথা, আর ভারতীয় ভাষায় বলিতে হইলে আমাকে বলিতে হয় দেহখানা "ব্রহ্মপুর"। আর দার্শনিক সাধু পৌলের ভাষায় বলিতে গেলে "দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং "যে দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির" এবং "যিনি আমাদের অন্তরে থাকেন" এবং যাঁহাকে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি"—তিনি'ত মূলাধার, স্থিরাংশ, বা প্রধানাংশ; সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, বিকাশ, শক্তি দেখাইতে হইলে সাধকমাত্রকেই ত্রৈশীতত্ত্ব খৃষ্টরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সংগ্রথিত হইতে হইবে; খৃষ্টীয়-যোগদর্শনের অমোঘ উপায় ইহা সেই "Unity of Spirit"-এ আছে, এবং সাধককে বিশ্বাস (ভক্তির) উপর থাকিতে হইবে। ইহাতে আমাদিগের বাহ্য পুরুষ ক্ষীণ হইলেও আত্মিক পুরুষ দিন দিন নবীনী-কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। খৃষ্টীয় যোগতত্ত্বের এ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে গভীর সাধনা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং যীশুখৃষ্টই সেই সাধকের জীবন; যাঁহার সহিত আত্মায় মনে-প্রাণে সংযুক্ত হইলে সাধক ইব্রীয় কবির ন্যায় বলিতে পারে "প্রিয় আমার আমি প্রিয়ের"। কিম্বা দার্শনিক পৌলের ভাষায় বলিতে হয়—"খৃষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি,—আমি আর জীবিত নহি, কিন্তু খৃষ্টই আমাতে জীবিত আছেন"। আমরা খৃষ্টীয় দর্শনের উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যায় বলিতে পারি খৃষ্টতত্ত্বই পূর্ণ ঈশ্বর তত্ত্ব। খৃষ্টনিহিত ঈশ্বরতত্ত্বকে পরিত্যাগ করিলে, যোগের অর্থাৎ Unity of Spirit-এর কোন ব্যাখাই হয় না। কারণ খৃষ্টই সেই কেন্দ্র এবং এই খৃষ্টনিহিত ঈশ্বরতত্ত্বকে জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রাহ্য করিয়াছেন; * অতএব খৃষ্টীয় দর্শনের যোগের ব্যাখ্যায় যাহা Philosophy of the Fourth Gospel-এর

*পাঠক ইচ্ছা করিলে এই দুখানি মূল্যবান সৎগ্রন্থ যত্নের সহিত পাঠ করিতে পারেন।

লেখক আচার্য্য J. S. Johnston মহোদয় দেখাইয়াছেন এবং হেগেল যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কিরূপে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে? সাধক যিনি, তাহাকে সাধনতত্ত্বের এই কেন্দ্রে আসিতে হইবে, এ বিশ্বাস না থাকিলে তিনি মৃত। খৃষ্টপন্থীদিগের মধ্যে সাধক, সাধনা, বৃদ্ধি হইলে ভাল হয়। ভারতক্ষেত্রে খৃষ্টীয় সমাজে সত্য যোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ভাল হয়। আমাদের নেতৃবৃন্দ কি সে পথে অগ্রসর হইয়া উদাহরণস্বরূপে দাঁড়াইবেন? না—Do it, Do so to me; এই বচন শিখাইবেন? ভারত আর এ বচনে ভিজবে না। এখন তোমাকে যীশু-যোগী, যীশু-সাধক সাজিতে হইবে। কর্তৃত্ব, আধিপত্য, স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মের গুণ নহে।

ব্রহ্ম অধ্যাত্মযোগ-গ্রাহ্য, এই কথায় বিরোধ ঘটিবে না; বিরোধ ঘটে কোথায় না—যখন সদ্‌গুরুর আবশ্যকতার কথা উঠে। আমরা বলি যীশুখৃষ্টই সেই সদ্‌গুরু, যিনি জীবনের সকল অবস্থায় পিতা ঈশ্বরের সহিত পবিত্র যোগে যুক্ত ছিলেন। আমাদের করণীয় কি? না—তাঁহার অনুকরণ। চিত্তশুদ্ধি ও ধ্যানের মধ্য দিয়া আমাদের মনকে নিমজ্জিত করিতে হইবে; ইহা একটা মস্ত কঠিন বিষয় বটে, বোধ হয় অনেক চিন্তা করিয়া পণ্ডিতপ্রবর James Martineau মহোদয় তাঁহার কৃত সুবিখ্যাত Types of Ethical Theory নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে Transcedental Plato নিবন্ধে ৪৫ পৃষ্ঠায় বলিতে পারিয়াছেন—"All Philosophers agreeing that Mind is King of heaven and earth". এই উক্তিতে কাহারও সহিত যে বিরোধ ঘটিবে এমন মনে হয় না।

---

(১) Christianity As Bhakti Marga, A Study of the Johannine Doctrine of Love. by E. A. J. Appasamy, M, A, (Harvard) D, Phil. (Oxon)

(২) The Sadhu, A Study in Mysticism and Practical Religion, By B. H. Streeter, M, A, (Oxon), Hon. D. D. (Edin)

যোগসাধনের বস্তু মনস্থির করা, ইহা যীশুখৃষ্টের জীবনে বেশ বুঝা যায়; যীশু খৃষ্টের Inner life বিশ্লেষণ কর দেখিবে এই যোগতত্ত্ব গভীর ভাবে তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। বহু শতাব্দী অতীত হইল একজন প্রসিদ্ধ ইব্রীয় কবি লিখিয়া গিয়াছেন—"হে বৎস তোমার হৃদয় আমাকে দাও"। যে আপন হৃদয় ঈশ্বরকে দিতে পারে নাই তাহার এখনও কিছুই হয় নাই; সে কেবল জড়াংশে লিপ্ত আছে বুঝিতে হইবে। এবং "যে আপন আত্মা দমন বা শাসন না করে, সে এমন নগরের তুল্য, যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং যাহার প্রাচীর নাই"। আমাদিগের প্রার্থনায় মন স্থির রাখিতে হইবে। একজন খৃষ্টসেবকও ভাবোচ্ছ্বাসে গাহিয়া গিয়াছেন— "কবে এ হৃদয় নাথ একেবারে তোমার হবে, তব ইচ্ছা মম ইচ্ছা সমভাবে মিলে যাবে"। ঐ শুন আর একজন খৃষ্টভক্ত কি গাহিয়া গিয়াছেন—"আমার তাপিত প্রাণ শীতল হবে, পেলে গো তোমায় অন্তরে, যীশু এস আমার হৃদয়ে"। পাঠক চিন্তা কর—যাঁহার বাক্য পিপাসার জল, আশার স্থল, যাঁহার বাক্য চরণের প্রদীপ, যিনি জ্যোতির্গণের জ্যোতি, তাঁহার (প্রভু যীশুর) সহিত ঐশ্বরিক বিধানে সম্বন্ধ স্থাপন করাই বিশ্বের নরনারীর কর্ত্তব্য নহে কি? সৎ ও উন্নত চিন্তা সর্ব্বদা মনে স্থান দিও কারণ Law of associations (যোগাযোগের নিয়ম) মতে এক উত্তম ও পবিত্র চিন্তা আর এক উত্তম ও পবিত্র চিন্তাকে আকর্ষণ করে। খৃষ্টই সেই আদর্শস্থল, তুমি নিষ্ঠাবান হইয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধিস্থ কর। তুমি যুক্ত খৃষ্ট, এবং তোমার জীবন যুক্ত খৃষ্ট হইবে। তবে তোমাকে খৃষ্টের আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক বাক্য ভক্ষণ করিতে হইবে, নচেৎ ধর্ম্মজগতে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। বাক্য পরিপাক করিতে পারিলে জীবন মধুময় হইবে—উদাহরণস্বরূপে যিহেস্কেলকে ধরা যাউক; তিনি বাবিল প্রদেশের কবার নদীতীরস্থ তেলাবীব নগরই তাঁহার কার্য্যের প্রধান স্থান ছিল এবং এই নদীর তীরে নির্ব্বাসিত লোকদের বসতি

ছিল; তিনি সেখানে থাকিয়া পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন যথা—"হে মনুষ্যসন্তান, তুমি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও আমি তোমার সহিত আলাপ করিব", তোমার কাছে যাহা উপস্থিত তাহা ভোজন কর। এই পুস্তকখানি ভোজন কর······তাহাদের সহিত কথা বল"। ভারত তুমি চিন্তা কর; যিনি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন তিনি কে? যিনি যিহেস্কেলের সহিত আলাপ করিতেছেন তিনি কি ঐ পুরুষ? ভাব ভক্তের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কেমন জড়িত। সে ঐ পুরুষ "আমি"। পুনশ্চ, যিনি মুশার সহিত আলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি ফরৌণরাজকে বলিও 'আমি' পাঠাইয়াছি তাঁহাকে আমার পরিচয় দিও 'আমি' নামে।"

খ্রীষ্টীয় যোগ দর্শনের আরও একটি চমৎকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিতেছি পাঠক কষ্ট স্বীকার করিয়া যিশাইয়া গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১—৩ পদ চিন্তা করিবেন,—সেখানে দেখিবেন Law of Spirit. ভক্ত আত্মায় অনুপ্রাণিত হইয়া কত উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। এবং যিশাইয়ের এই যোগাযোগের অবস্থা কত মধুময় হইয়াছে। তোমার জীবনকালে যে এরূপ ঘটিতে পারে না—তাহা কে বলিতে পারে? ইহা'ত মায়াযুক্ত ব্যাপার নয়। তুমি খ্রীষ্টের বাক্যকে হেয়জ্ঞান করিও না, উপদ্রবের ও কুটিলতার উপর নির্ভর করিও না, কিন্তু সুস্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমার পরাক্রম হইবে; ভারতবাসী কি তাহা করিবে? যদি এই সাধনার পথে পদার্পণ কর তবে মধুর ফল ফলিবে; এবং ইহাতে একটা গভীর অঙ্গীকার আছে যাহা কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞানে পাওয়া যায়—সেই অঙ্গীকার বাণী এই যথা—"আর তিনি আপনার রচিত সমস্ত জাতি অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রশংসা, কীর্ত্তি, শ্রদ্ধাস্বরূপ করিবেন, ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র প্রজা হইবে"। সিদ্দুকী, ফরীশী, এসেনী, সেন্‌হাড্রিন্‌সভা, ইহারা প্রভুর শিক্ষামালা ঠিকমত ধরিতেই পারে নাই, এমন কি পুরাকালের যিহুদী রব্বিরাও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই কারণ তাহাদিগের হৃদয় স্থূল

ছিল, জড় ভাবে পূর্ণ ছিল, তাই ঐশ্বরিক তত্ত্বের সূক্ষ্মভাব তাহাদিগের প্রাণে ভাল লাগে নাই। এভাব প্রভুর অনেক শিষ্যদেরও ছিল, তাই অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু যাঁহাদিগের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারাই যীশুর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। খৃষ্টপন্থীর দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না কারণ স্থূল হৃদয়ে এ ভাব স্থায়ী হয় না। "He can't be wrong whose life is in the right" এই কথা পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ব্রহ্ম চিরজাগ্রত ও সর্ব্ব লোকাশ্রয়, ব্রহ্ম দর্শন সুখ ও শান্তির নিদান, ভক্তের এ প্রাণের কথা, ইহার সহিত কাহারও বিরোধ ঘটিতে পারে না। কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে এই খ্রীষ্টীয় যোগ-সাধন তত্ত্বের সহিত হিন্দু দর্শনের "সর্ব্বাত্মবাদের" একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ এস্থলে জড়িত আছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। সর্ব্বাত্মবাদ একটি পৃথক বিষয়, এবং ঐশী যোগতত্ত্ব একটি পৃথক বিষয়। আমি কেবল এস্থলে সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম যে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগই আধ্যাত্মিক জীবনের মূল। এই পদবীতে উঠিতে হইলে খ্রীষ্টের সহিত আত্মায় সাধন, আত্মার গমন, আত্মায় মনন, ও আত্মায় মগম হইতে হইবে। ইহা পরিষ্কার কথা ইহাতে কোন গোঁজামিল নাই। এবং তোমাকে খ্রীষ্টের যোগাবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, নচেৎ আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি বিকাশ হইতে পারে না;. খ্রীষ্টপন্থী মাত্রেই মনে রাখুক যে ইহা যাদুকরের কিম্বা অবহেলার বিষয় নয়; জীব (মনুষ্য) ভোগাসক্ত হইলে এবং জগৎটাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে,—তাহার সকল অবস্থা স্থূল ও ম্লান হইবে। কারণ সে সূক্ষ্মদর্শি হইতে পারে না। তাহার সম্মুখে সকল বিষয় প্রচ্ছন্ন। এমন কি "পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন", তাঁহাকেও যেন অনুভব করিতে পারে না। ফলতঃ স্থূল হৃদয়ের এরূপ অবস্থা মানুষের যাবৎ থাকিবে, তাবৎ বৈরাগ্যের ভাব বা সাধন, ভজন, সমাধি, ধারণা, ইহার কিছুই হইতে

পারে না; ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত সুসমাচারে ও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নহে। উপনিষদের অনেক বিষয় প্রভুর শিক্ষামালায় পরিষ্কাররূপে পূর্ণ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত আছি।* অতি পুরাকালে দেখা যায় খৃষ্টীয় তাপসগণ যখন পবিত্র ভাবগুলি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগের মনের গতি, চিন্তার ধারা, অন্যরূপ ছিল, আর যখনই স্থূল কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছে, তখন হইতেই তাঁহাদিগের পতন, ও নানা প্রকার কলুষভাব পূর্ণ হইয়াছে, ইহা ইতিহাসের পাতা খুলিলে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবাদ, উপাস্য দেবতা এবং তিনি কিরূপ, ও হিন্দুশাস্ত্রের সাক্ষ্য।

হিন্দুশাস্ত্রের সাক্ষ্য প্রমাণে যাহা নির্ণীত হইয়াছে তাহা এস্থলে বাহির করিয়া আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। বিচার অমান্য করিলে চলিবে না।

(১) শ্রুতির প্রমাণ কি?—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"—পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করা বিধেয়।

(২) যোগী যাজ্ঞবল্ক্য—"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতম্"—আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি একমাত্র পরব্রহ্মই উপাস্য।

(৩) শ্রুতি:—"তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বচো বিমুঞ্চথ"—একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই জান, আর সকল পরিত্যাগ কর।

---

* The Upanishads and the Christian Gospel some contrasts and Fulfilment নামক গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থখানি by a member of the Oxford Mission কর্তৃক লিখিত এবং ১৯০৮ সালে C. L. S. Madras হইতে প্রকাশিত এবং The Ethical Transcendenee of Jesus by A. M. Fairbairn, D. D. L. L. D. মহোদয় কৃত এই গ্রন্থখানি সুসমাচারের গভীর উচ্চাঙ্গের অর্থ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

ইহা হইতেছে ব্রহ্মবাদ—এ কথার সহিত আমাদের কোন বিরোধ দেখা যায় না। কোন খৃষ্টপন্থী এই বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে, কারণ বাস্তবিক পিতা (ঈশ্বর) এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা আর যাহারা তাঁহার (ঈশ্বরের) ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে। যোহন ৪ ; ২৩—২৪ পদ ; ইহা ধ্রুব সত্য যে কোন চিন্তাশীল সাধকের পক্ষে এই বাক্যের সহিত কখনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।

এই যে উপাস্য দেবতা তিনি কিরূপ ?

(১) শ্রুতির সাক্ষ্য কি ?—"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্—তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। যাঁহারা আকার কল্পনা করিয়া ঈশ্বর ভাবনা করিতে চায়, তাঁহাদের চক্ষুদানের জন্য তর্ক সম্রাট শঙ্কর বলেন, "ন দর্শয়িতুং শক্যতে গবাদিবৎ" - গরু বাছুরের ন্যায় তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায় না। কেননা, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" (শ্রুতিঃ) তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রতিমা হয় না।

(২) শ্রুতিঃ—"তিনি অশব্দম্‌স্পর্শমরূপমব্যয়ম"—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। তাঁহাকে কিরূপে উপাসনা করিতে হয় ? .

(৩) শ্রুতিঃ—"অধ্যাত্ম যোগাধিগমনে দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা তাঁহাকে মনন করিতে হয়।

(৪) শ্রুতিঃ—"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি"—অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।

(৫) শ্রুতিঃ—"য এতদ্বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"—যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

রাম মোহন রায় ;—ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে জানা যাইবে ? এবং স্বরূপ কি ?

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থের ধারণা করিবার চেষ্টা দ্বারা উপাসনা করিবে। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা হইলে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমি লাভ হইবে। ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে জানা যাইবে ? সাধকগণের হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞান মূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সকলের শ্রবণ মননের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সাধিত হয়। ইহা হইতেছে রাজা রামমোহন রায়ের উক্তি।

সে স্বরূপ কি ?

(১) তৈত্তিরীয়-শ্রুতি :—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।

(২) মুণ্ডক-শ্রুতি :—"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"।

(৩) মাণ্ডুক্য-শ্রুতিঃ—"শান্তং শিবমদ্বৈতম্"।

(৪) ঈশ-শ্রুতি :—"শুদ্ধম পাপবিদ্ধম্"।

(৫) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি :—"ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্"।

(৬) কেন শ্রুতিঃ—"প্রাণস্য প্রাণঃ।

(৭) কঠ-শ্রুতি :—অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো"।

(৮) ঐ—"ঈশানো ভূতভব্যস্য"।

(৯) মুণ্ডক-শ্রুতি :—"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ"।

(১০) তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ—"রসো বৈ সঃ"।* এই শ্লোকগুলির মধ্যে কঠোরতা নাই, পরিপাক করিতে পারিলে—হৃদয়ে সুখ জন্মে।

---

* রস কথাটি অন্যান্য উপনিষদে (যথা, ছান্দোগ্যের প্রারম্ভে) প্রায়ই "শ্রেষ্ঠ অংশ" অথবা "সার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উপনিষদের এই স্থলে এ শব্দটি তাহার অধিক প্রচলিত লৌকিক অর্থে (অর্থাৎ বস্তুর আনন্দজনক গুণ অর্থে)

ব্যবহৃত। সৎ স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের মধ্যে সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই যেন ঋষি "রসো বৈ সঃ' কথার অবতারণা করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন (১) জীব যখন কোনও বস্তু হইতে আনন্দ আস্বাদন করে, তখন সে-বস্তুতে একটি আনন্দদায়ক রস নিহিত থাকে বলিয়াই তাহা হইতে সে সেই আনন্দটি পায়, এবং (২) বিশ্বের যত বস্তুতে যতরূপ আনন্দ আছে, সকল বস্তুর সব আনন্দ রস এক সেই সৎ-স্বরূপ "সুকৃত" ব্রহ্মই। তিনিই আনন্দজনন রস হইয়া জগতে ও জীবনে অনুপ্রবিষ্ট, তাই জীবের আনন্দ সম্ভব হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৬।৭) বলা হইয়াছে, পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, আমি জন্মধারণ করিব। এই ইচ্ছাতে প্রণোদিত হইয়া তিনি জগৎ সৃষ্টি-বিষয়ে আলোচনা করিলেন ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই (জগৎ) অগ্রে 'অসৎ' ছিল (অর্থাৎ কিছুই ছিল না) তাহা হইতে "সৎ" (অর্থাৎ অবয়বে আসিল) হইল। তিনি স্বয়ং আপনাকে প্রকাশ করিলে (অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বে প্রকাশিত ছিলেন, এখন জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন) এই জন্য তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) "সুকৃত" (অর্থাৎ স্ব-কৃত অথবা স্বয়ংকৃত বলে)। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই রস। এই (জীব) রসকে প্রাপ্ত হইয়াই আনন্দবান হয়েন। এবং ব্রহ্মরস অর্থে ব্রহ্মের আনন্দ মনে প্রবেশ করে বুঝিতে হইবে। পাছে কোন পাঠক উপনিষদের "ব্রহ্মরস" শব্দের বিপরীত অর্থ বুঝেন তাই মনে করিয়া এস্থলে প্রকৃত ভাবার্থ পরিস্ফুট করিয়া দিলাম; আশা করি ঐ অর্থে আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। আমাকে এস্থলে আরও কয়েকটী শব্দার্থ পৃথক ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইতেছে, কারণ খ্রীষ্টীয়ান সমাজের অনেক পাঠক হয়ত সেগুলির অর্থ নির্ণয় করিতে অপারগ হইবেন, অবশ্য আমি কাহারও উপর দোষারোপ করিতেছি না, কেবল উপনিষদের প্রকৃত ও চলিত শব্দার্থ প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। কারণ সেগুলির মধ্যে একটা গভীর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে "জ্ঞান" কথাটা অতি গভীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞান কেবল অধ্যয়ন ও বিচারের ব্যাপার নহে। জ্ঞান বলিতে ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই সমস্ত উচ্চাবস্থাও বুঝায়। "শ্রবণ" অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ অর্থাৎ গুরুমুখে শিক্ষা বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাধ্যয়ন। "মনন" অর্থ শ্রুত বা অধীত বিষয় বিচার পূর্ব্বক বোঝা এবং তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। "নিদিধ্যাসন" অর্থ গভীর

নিম্নে শ্লোক কয়েকটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম।

(১) যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মসহ সমুদায় কাম্য বস্তু ভোগ করেন।

ধ্যান দ্বারা আত্মাকে ধরিবার চেষ্টা, এই ধরাকে বলে "ধারণা"। ধারণাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা "ধ্যান"। ধ্যানের স্থায়ী অবস্থা—যে অবস্থাতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না। অন্তর বাহির সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়—সে অবস্থার নাম সমাধি"। নির্জ্জনে—গভীর প্রার্থনার বিষয় চিন্তা করিলে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একটা ছোট দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক—শোলা যেমন জলে থাকে এবং শোলায় যেমন জল থাকে, কিন্তু একে অন্য নহে, সেই প্রকার যীশু আপন প্রেম, ভয়কারী ও ভক্ত সাধক সন্তানদের মধ্যে অবস্থিতি করেন। ইহা অদ্বৈতবাদ নহে। পরন্তু ইহাই স্বর্গরাজ্য যাহা প্রকৃত ভজনাকারীর হৃদয়ে বর্ত্তমান।

খ্রীষ্টভক্তের এই সাধনতত্ত্বের অবস্থার একটা আশ্চর্য্য মধুর ভাব বর্ত্তমান থাকে, আমি ১৯২৭ শালের মে মাসের "The Missionary Review of the World" নামক ইংরাজি মাসিক পত্রের এক স্থান হইতে দেখাই যে খ্রীষ্টীয় যোগের কি মনোহর অবস্থা। ঐ পত্রের * An Indian Christian Light-Bearer II. নিবন্ধে দেখা যায়—

* "The Use of Yoga in Prayer." (C. L. S. Madras) Mystic Visions became a part of his daily experience and were a real encouragement and inspiration to him. He often used to tell me of these Visions and it was clear that they meant a great deal to him. Some of them reminded me of the Visions of an eclectic Saint of Lahore, whose religious outlook was a mingling of the thoughts of the Gita and St. John's Gospel. The essential part of these Visions of Mr. Appaswamy was that God was seen as Light in many forms. He says, "I practice advaitic Yoga and I behold God as pure Light. He has no form. He appears to me in his primeval and original condition as Light. When I practice another type of Yoga, I see the Christ appear before me in his Sukhsma Saria (i.e., mystical body) of dazzling glory."

There is no doubt that his practice of Yoga Sadhana helped him to concentrate his mind on Christ more firmly and clearly, and at a time when the minds of most men begin to lose their power

(২) যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই আত্মা জ্ঞান দ্বারা দীপ্ত, ব্রহ্মপুরে হৃদয়রূপ আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা; তিনি অন্নে অর্থাৎ হৃদয় মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞান দ্বারা বিশেষরূপে দর্শন করেন।

---

he was gifted with a habit of concentration and with a clarity of thought which were remarkable. It is interesting to trace the progress of his Christian thought in his later years. The method of Yoga Sadhana was for him a pathway to the feet of the Lord, while remaining absolutely loyal to Christ and His teaching and continually renewing his experience of Christ's saving power, he more and more expressed himself in the language of Hindu Bhakti and Sadhana. When the writer was staying with him about two years before his death, Mr. Appaswamy used to put on the gramophone records of some of the finest songs of Saivite Bhakti and also the Christian songs of his first Christian guru, Pandit H. A. Krishna Pillai. The essential content of his religious life was Christian but the expression of it took on more and more of a Hindu coloring. Meditation and contemplation filled a great part of his life but he never lost his passion to help men to see the Glory of Christ. He passed away at the age of seventy-eight on April 14, 1926, from a peaceful sleep into the land beyond, leaving all his affairs in perfect order and explicit directions in regard to his estates. By his life and high moral rectitude, by his love and service, by his sympathy with all in need and his appreciation of all that was good, by his passionate evangelism and by vital and genuine religious experience, Mr. Appaswamy continually commended the personality and teaching of Christ to all his Hindu friends and acquaintances and led many of them to see in Him the Light that lighteth every man and the Saviour of the world."

The story of Dewan Bahadur A. S. Appaswamy, Pillai of Palomcottah.

By Rev. H. A. Popley, Madura, India.

(৩) যিনি একাত্ম প্রত্যয়ের বিষয়, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থায় এই এক আত্মাই আছেন এই প্রত্যয়গম্য, রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয়ের অতীত, শান্ত অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি রহিত, মঙ্গলস্বরূপ, এবং অদ্বৈত।

(৪) তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ (পাপবর্জ্জিতম)

(৫) তিনি সমুদায়ের আদি, সংযোগ—কারণ সমূহের কারণ, ত্রিকালাতীত, এবং কলারহিত, এইরূপ দৃষ্ট হন, সেই বিশ্বরূপ কার্য্যকারণাত্মক, সম্ভজনীয় দেবতাকে স্বচিত্তস্থ রূপে উপাসনা করিয়া সাধক মুক্ত হন।

(৬) তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু এই জ্ঞান দ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব ধারণা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিগণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হন।

(৭) ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত (অপক্ষয় বর্জ্জিত) ও পুরাতন শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

(৮) ইনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, ইহাকে জানিয়া সাধক কিছুই গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। ইনি সেই আত্মা।

(৯) সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মরহিত, অপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু বর্জ্জিত, ইন্দ্রিয় প্রধান মন-বিবর্জ্জিত, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ হিরণ্য গর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ।

(১০) যিনি সেই সুকৃৎ, তিনিই রসস্বরূপ, এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়।

পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে মাত্র—কিন্তু এস্থলে প্রমাণসহ বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—পাঠক বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

(১) বৃহদারণ্যক শ্রুতির সাক্ষ্য কি ?—"অথ যোঽন্যাং। দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স

দেবানাম্”—যিনি আপনার বাহিরস্থ স্বতন্ত্র দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞান, তাঁহাকে দেবতাদের পশু বলিলেই হয়।

(২) ঐ—“যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেব মেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্তি। একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্নপ্রিয়ং যৎ এতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ—যেমন মানুষের বহু পশু থাকে, তেমনি দেববাজী মানুষেরা দেবতাদের পশু। একটা পশু কমিয়া গেলে মানুষের তাহা ভাল লাগে না, বহুর তো কথাই নাই। সেইজন্য দেবতারা চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর মানুষ দেবতার আরাধনা করিবে না, সুতরাং দেবতাদের পশুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে। শ্রুতির মতে যাহারা দেবতার আরাধনা করে, তাহারা পশুতুল্য। ঝঞ্ঝাট আরও আছে। “সর্ব্বে দেবা তং বলিমাহরন্তি” (শ্রুতি) দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা করেন।

কেহ কেহ মনে করেন আগে পৌত্তলিকতার সাধন পরে ব্রহ্মোপাসনা।

কোন কোন অজ্ঞ লোকে মনে করে, যে আগে পৌত্তলিকতার সাধন, পরে ব্রহ্মোপাসনা। যাহারা এই প্রশ্ন তুলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের শতবর্ষ পশ্চাৎগামী। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, যে, প্রথমে সাকারোপাসক ছিলেন, পরে নিরাকারবাদী হইয়াছেন। তাহাতে সাকারোপাসনা নিরাকারোপাসনার সোপান বলিয়া প্রমাণ হয় না। যাহারা এরূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাকারোপাসনার ভ্রান্তি বুঝিয়া উহা পরিত্যাগ করতঃ নিরাকার ধরিয়াছিলেন। আম্রফল লাভ করিবার আশায় কেহ যেমন ভেরাণ্ডা গাছ রুয়ে না, তেমনই ব্রহ্মলাভ করিবার আশায় কেহ পুতুল পূজা করে না। ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই

ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে। ব্রহ্মোপাসনাই যে মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, আর সব যে পণ্ডশ্রম, তাহা নিঃসন্দেহ।

সাক্ষ্যবাণী কি?

(১) বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ঃ—"যো অন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি"—পরমাত্মা (ঈশ্বর) ছাড়া আর কিছুকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিলে তাহার বিনাশ হয়।

(২) অপরঞ্চ, সোপান ভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোহত্র কঃ"—মোক্ষের সোপানভূত এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে আপনার মোক্ষের চেষ্টা না করিল, তার অপেক্ষা অধিকতর পাপী আর কে? অথচ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষ হইতেই পারে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসকের যে নিন্দা করে, তার মত পাপিষ্ঠ আর নাই। ইহা'ত ধ্রুব সত্য, খ্রীষ্টীয়দর্শন এবং খ্রীষ্টোক্তি যে অখণ্ডনীয় সৎ বস্তুগুলি-মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, মানুষ কেন যে তাহা প্রণিধান করে না তাহা বুঝা যায় না।

(৩) "যে দ্রুহ্যন্তি খলা পাপা পরব্রহ্মোপদেশিনঃ"—তাহারা নিজেদেরই অনিষ্ট করে—"স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি"। যেহেতু, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" (শ্রুতি) দেবতারাও ব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করিতে পারেন না, কেননা, তিনি দেবতাদেরও পূজ্য।

(৪) পঞ্চদশী চিত্রদীপ, ২১৭—"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা। ভ্রান্তা এবাখিলা স্তেষাং ক্ব মুক্তি ক্বেহ বা সুখম্"।—যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না. তাঁহারা ভ্রান্ত. তাঁহাদের মুক্তিই বা কোথায়. সুখই বা কি।

(৫) কেন-শ্রুতি—"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—ইহলোকেই যদি তাঁহাকে জান, তবেই জীবনের সার্থকতা

হইল, যদি ইহজীবনে তাঁহাকে না জানিলে, তবে মহা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

সকাম ধর্ম্ম তবে কিরূপ ?

(১) রঘুনন্দন—"পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মণিনপ্রবর্ত্তয়িতব্যঃ—পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকেও সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। সুতরাং যাঁহারা "ধনঃ দেহি শত্রুং জহি" বলিয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কাজেই মূর্খ।

(২) মহানির্ব্বাণ—"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেৎ মোক্ষসাধিনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা"—মূর্ত্তি কল্পনার দ্বারা যদি মানুষের মোক্ষ সাধিত হইত, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাই মানুষ রাজা হইত।

(৩) ভাগবত—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু, ভৌম ইজ্যধীঃ যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলীলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ"—দেহে যার আত্মবুদ্ধি, পুত্রাদিতে আপনবুদ্ধি, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে উপাস্যবুদ্ধি, জলে যার তীর্থবুদ্ধি, যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাগমকেই তীর্থ মনে করে না, সে গরুরও গাধা।

(৪) মহানির্ব্বাণ—"মৃত্তিকাশিলা ধাতু কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যাহারা ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা তাহাদের চেষ্টা দ্বারা কেবল কষ্ট পায়, কখনও শান্তি পায় না"।

(৫) রঘুনন্দন, আহ্নিকতত্ত্ব—"কাষ্ঠ-লোষ্ট্রে মূর্খদিগের দেবতা-বুদ্ধি হয়।

(৬) অষ্টাচক্র-সংহিতা, ১ম প্রকরণ—"সাকার মিথ্যা বলিয়া জান। নিরাকারই ধ্রুব সত্য।

(৭) মহানির্ব্বাণ—"যে ব্যক্তি রূপ-নামাদি কল্পনাকে বালক্রীড়নবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সেই মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

(৮) পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ—"পরব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রাদিতে রত, তাহারা হস্তস্থিত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াই হস্তই লেহন করে।"

(৯) ভাগবত ৩।২৯ "সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা না করিয়া মূঢ়তা বশতঃ যে প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যেন চিরদিন পুতুল পূজাই করিবেন, তাঁহাদের হাতচাটা আর ছাইয়েতে ঘি ঢালাই সার। বৃথা পরিশ্রম। জীবনটা পণ্ড। তাই মনু প্রতিমাপূজক ব্রাহ্মণকে দৈবপিত্র্য কার্য্যে বর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন মনু, ৩।১৫২। পাঠক হিন্দুশাস্ত্রের সাক্ষ্যবাণী যে কিরূপ গভীর তাহা বিচার করিবেন এবং সেই সঙ্গে যিরমিয় ভাববাদী পুস্তকের ৪৪ অধ্যায়ের ইতিহাস তুলনা করিবেন।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই শব্দের পরিচয়। *

নির্গুণ ও সগুণ দুই বস্তু নহে, একই বস্তুর দুই দিক্। গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ। এই তিনের সমাবেশ বিধানে জগতের উৎপত্তি। যিনি ইহার অতীত, তিনি নির্গুণ। তিনি ইহার অতীত হইলেও ইহার

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম, এ, প্রণীত অদ্বৈতবাদ (শঙ্কর বেদান্তের বিস্তৃত ব্যাখ্যা) গ্রন্থে ব্রহ্মের নির্গুণভাব, সগুণভাব, ও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ, সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন. সেগুলি যে সর্ব্ববাদীসম্মত তাহা বলিতে পারি না। হইতে পারে তিনি তাঁহার মত মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সে বিচার এস্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। পাঠক ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্রভাবে সেগুলি দেখিতে ও বিচার করিতে পারেন। যাঁহারা শঙ্করের স্কন্ধে Pantheism আরোপ করিয়াছেন, তিনি সেই Pantheism মতের খণ্ডন করিয়াছেন, শঙ্করের উপনিষদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ সূচিত হইয়াছে; কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা যে সকলে গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত নহি।

সম্বন্ধবর্জ্জিত হইতে পারেন না; কেননা, জগতের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাহাতে জগদতীত (Transcendent) এই আখ্যা প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে তিনি নির্গুণ কিরূপে? এই সকলের অধীন নহেন, তাই তিনি নির্গুণ। এই জগৎ দেশ ও কালে প্রকাশিত। দেশ ও কালকে ছাড়িয়া জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। "এখান" ও "সেখানের" সম্বন্ধই দেশ এবং "এখন" ও "তখনের" সম্বন্ধই কাল। কিন্তু যিনি এই সম্বন্ধের অতীত নহেন, তিনি এই মিথুনকে একত্রিত করিয়া দেশ ও কাল রচনা করিতে পারেন না। যিনি দেশ ও কাল রচনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। আমরা আমাদের আত্মায় যে বস্তুর পরিচয় পাই, তাহাকে যে সগুণ রূপেই ধারণা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থই নাই। আমরা আমাদের আত্মাতেই ত্রিগুণের অতীত বস্তুরই পরিচয় পাইতেছি। আমরা এখানে যাহার পরিচয় পাইলাম, তিনি সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সম্মিলনে উৎপন্ন বিচিত্র বিশ্বের আধার এই দেশ ও কালেরও অতীত—তিনি নির্গুণ। সগুণও আবার তিনি। কেহ কেহ বলেন, সগুণ ও সাকার একই। আকার—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও বেধ। সুতরাং গুণ ও সাকারকে এক করিতে হইলে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণগুলিকে দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি বিশিষ্ট করিতে হইবে। কবির নিকট গুণগুলির মূর্ত্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, দার্শনিকের নিকট নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তু সকল গুণের প্রকাশ হইলেও গুণের সকল প্রকাশই সাকার নহে। সগুণের উপাসনা কোন কোন স্থলে সাকার উপাসনা হইলেও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কখনও সাকারোপাসনা নয়। কেননা, সাকার হইলেই একভাবে সীমাবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। তিনি গুণগুলিকে পরিচালিত করেন, তাই তিনি সগুণ। গুণের নিয়ন্তাকে সাকার ভাবিতে হয় না। গুণের প্রকাশ অসীম না হইলেও গুণের নিয়ন্তা অসীম। সগুণ ভাবেই দেখি, আর নির্গুণ ভাবেই দেখি, কোন দিক্ দিয়াই তিনি সাকার নহেন। অনেকে মনে করেন, আকার ছাড়া চিন্তা হয় না, ইহা তাঁহাদের একটা ভ্রান্তি।

সাংখ্য মতেই সত্ত্ব, রজ তমো গুণের বৈষম্যে উৎপন্ন যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তাহারা অবশ্য সগুণ হইলেও মন বুদ্ধি অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি আকার শূন্য—আকার কেবল পঞ্চ স্থূলভূতের। ইহার মধ্যে পূর্ণ আকারের স্থান আরও সংকীর্ণ। যে পশু-জীবন যাপন করে, সে-ই কেবল সর্ব্বদা আকারের মধ্যে থাকে।

সাকার ও নিরাকার এই দুই বাক্যের পরিচয়।

সাকারোপাসনা দ্বারা মানব-জীবনের কোনই উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না! মানবাত্মাকে প্রেম, জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তিতে উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়াই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ভক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য আত্মার স্বরূপ। ইহারা কেহই সাকার নহে। এমন মূর্খ কে আছে যে বলিবে, জ্ঞানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আছে, প্রেম গোলাকার বা চতুষ্কোণ, পুণ্য হরিৎ বা লোহিত বর্ণ। কোন আকার চিন্তনে ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। ভগবান্ যদি সাকার হইতেনও, তবুও তাঁহার আকারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, বিশ্বাস, পবিত্রতা, পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, সেই পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন, আত্মার আশ্রয় পরমাত্মরূপে তাঁহার সঙ্গে যোগ। অন্তর্য্যামীরূপে তিনি আত্মায় বর্ত্তমান—এই চিন্তন ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, ইহাই ধর্ম্ম। কোনরূপ মূর্ত্তি-পূজায় মানবজীবনের সফলতা নাই। যাহারা নিতান্ত মননহীন জীবন যাপন করে, ইন্দ্রিয়ঘটিত পশুজীবনের উপরে উঠিবার সাধ্য নাই, তাহারাই মাত্র সাকারের পক্ষপাতী হইতে পারে, অন্যেরা নহে। অনেকে কেবল গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়াই ইহার সমর্থন করেন। একটু চিন্তা করিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভ্রান্তি অপনোদিত হয়। বাইবেল ও কোরাণ প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। যতদূর পারিয়াছি উপনিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে

প্রতিমাপূজা অলীক এবং উহার বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনেক বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি এস্থলে পণ্ডিতদিগের মন্তব্য পাঠকবর্গকে দিতেছি।

"বিগত কার্ত্তিকমাসের (১৩২২) শারদীয়া সংখ্যার নারায়ণে পৌত্তলিকতার সপিণ্ডকরণ হইয়া গিয়াছে। পুরোহিতত্রয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র পাল। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, "দুর্গোৎসবের প্রতিমাটা নিতান্তই অবান্তর। উহা নিতান্ত আধুনিক। শারদীয়া পূজা আদিতঃ গাছপালা লইয়া আনন্দোৎসব ছিল। বর্ষাপগমে শরতে নবজাত বৃক্ষলতার শোভায় মুগ্ধমানুষ লতাপাতা লইয়া আমোদ করিত। তাহা হইতেই নব পত্রিকার পূজা আসিয়াছিল। বসন্তকালের পূজা শ্রীরাম অকালে করিয়াছিলেন; ইহা মিথ্যাকথা—রামায়ণাদিতে তাহা নাই। নব পত্রিকার পূজা বসন্তকালের সৃষ্টি নহে, তৎকালে ঐ সকল লতাপাতা দুষ্প্রাপ্য।" পণ্ডিত পাঁচকড়ি দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অকালবোধনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়াছেন, ষটচক্র ভেদ করিয়াছেন। উহাই দুর্গা পূজা। তবে যে পুতুলগড়া, ভোগরাগ দেওয়া—পশুমাংসের যোড়শোপচার করা; এ সকলই সামাজিক সম্মিলনের জন্য। উহা উৎসব, পূজা নহে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন পুঁতুল পূজার জন্য নহে, তামাসার জন্য। "প্রতিমা আরাধ্য নহে, উহা ঘর সাজান সামগ্রী।" ....বিপিনবাবু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরবর্ত্তী। যাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, তাঁহার পুতুলে অধিকার নাই। সুতরাং প্রচলিত পুতুলপূজা উঠাইয়া দিতে হইবে। উহা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অনিষ্টকারী। "ইহলোকের ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে।"........যাহা হউক "নারায়ণ"—কার্ত্তিকমাসে পৌত্তলিকতার সৎকার করিয়াছেন। (ধর্ম্মেরতত্ত্ব ও সাধন গ্রন্থের হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম নিবন্ধের ৫০৯—৫১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* IONIC SCHOOL OF PHILOSOPHY.

(১) প্রবর্ত্তক—থেলিস্ পণ্ডিত। জন্ম খৃঃ পূঃ ৬৪০—মৃত্যু ৫৫০। স্থান মাইলিটস্ নগর; মত—"জলই সমুদয় পদার্থের আদি কারণ। জীবন ও মৃত্যুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।" সক্রেটীশের পূর্ব্বে কেবল এক থেলিসকে ঐশ্বরিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে উক্ত নগরে;

(২) প্রবর্ত্তক—এনাক্সিমিনিস্ পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করেন যে—"বায়ু হইতেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।"

(৩) প্রবর্ত্তক—হিরাক্লাইটস্ পণ্ডিত। স্থান—ইফিস নগর। মত—"অগ্নিই সদমুয় মুল কারণ," ইহাদিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি মূলকই ক্রমে ক্রমে গ্রীশদেশীয়দিগের এই স্থির হয় যে, জগতের কারণভূত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন, সমুদয় পদার্থই তাঁহার সৃষ্ট, তিনি সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া, পদার্থ সকলের আকৃতি গতি, ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি নির্লিপ্ত এবং জগৎ ভিন্ন; তিনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন সেই নিয়মানুসারে এই জগৎ চলিতেছে।

(৪) খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে, ইটালীর দক্ষিণ ইলিয়া নগরে এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়, জেনোফেনিস্ তাহার আদি প্রবর্ত্তক, তিনি

---

* Dr. J. Hunt, D. D. তাঁহার কৃত An Essay on Panthiesm নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এবং Dr. F. Ueberweg স্বরচিত History of Philosophy নামক গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় "Ionic School of Philosophy"র সম্বন্ধে সুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমি এস্থলে কেবল তাহার সারাংশ মাত্র নিষ্কাসন করিয়া দিলাম; অনাবশ্যক বোধে অপরাংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, আইওনিক্ স্কুলে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন তাঁহাদের শিক্ষার শাখা, প্রশাখাগুলি ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরবর্ত্তিকালে ছাত্রেরা নিজ নিজ চিন্তা বলে বহুদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গ্রীকদিগের ইতিহাসে ও দর্শনে পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ৫৩৬ অব্দে কলোফন হইতে ইলিয়া নগরে যাত্রা করেন। জেনোফেনিসের মত ও শিক্ষা এই—"জগদতিরিক্ত আত্মা নাই, জগতই চৈতন্যস্বরূপ" এই মূল হইতেই তাঁহার সমুদয় মত প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার শিষ্যের নাম পার্ম্মিনিডস্, তিনিও তন্মতানুসারী হন; তাঁহার মতে এবং তাঁহার গুরুর মতে আংশিক ভেদমাত্র ছিল।

(৫) জিনোর জন্ম আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৫৭; মৃত্যু ২৬৩ খৃঃ পূঃ। জিনো ও মেলিসস্, এই দুইব্যক্তি পার্ম্মিনিডসের শিষ্য, তদানীন্তন লোকদিগের বিশেষতঃ তদানীন্তন দর্শনশাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের মত খণ্ডন করাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম ছিল। থেলিস্ পণ্ডিত যে মত প্রচারিত করেন, তাহার প্রতিপোষক প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেইমত প্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ করেন কিনা এক্ষণে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার শিষ্য এনাক্সিমেণ্ডর সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া একগন্ড গ্রন্থ করেন। জিনোকে—"The founder of the Stoic School বলা হইয়াছে, জিনোর উক্তি এই—"প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ, এই সক্ষমতা নীতিমার্গ অনুসরণে সাধিত হয়, যেহেতু তাহা তদ্রূপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহই প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহাই প্রায় সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিদবর্গের ধারণা। জিনো আরও কহেন, কাল পৃথিবীর ব্যবধান মাত্র। উহার ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাগ অসীম কেবল বর্ত্তমানভাগ সসীম।

(৬) অনাক্ষ গোরার সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত মত ছিল। তাহার বিশ্বাস স্বর্গাদি বস্তু যেরূপ বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ ভিন্ন কিছুই নহে। পৃথিবীও সেইরূপ, সূর্য্য, ইহার মতে একটি বৃহৎ তপ্ত লৌহপিণ্ড। চন্দ্র, জীবগণের বাসস্থানের উপযুক্ত, তথায় লোকের গৃহাদি আছে এবং চন্দ্রের উপরিভাগ পর্ব্বত অধিত্যকাদি বিশিষ্ট ইত্যাদি। তিনি আরও বলিতেন, যাবতীয়, জীবসৃষ্টি তাপ, শৈত্য পার্থিব পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৭) আর্কিলাউস্—বলিতেন "তাপ এবং শৈত্য" এই দুই সকল উৎপন্ন বস্তুর আদি। জল তাপের দ্বারা দ্রব হইয়া পুনর্ব্বার গুণবিকার বিশেষের দ্বারা অগ্নির সহ সংস্রবে ঘনীভূত হওয়াতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি। সেই মিশ্র পদার্থ আবার যখন তরলিত হয় তখন বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিক্ষুব্ধ। বায়ু আবার অগ্নি দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। তাপযুক্ত মৃত্তিকা অপরাপর ভূতাদি সংযোগে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবাদির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

(৮) "মিশর দেশে এবং (Sparta) স্পার্টা নগরে চৌর্য্য ক্রিয়া বিধেয় বলিয়া প্রচলিত ছিল। এরিষ্টল ইনি ভ্রূণহত্যার অনুমোদন করিতেন। লাইকরগস্—তিনি নীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্বীয় নিয়মাবলীতে এই শিক্ষা দিয়াছেন "প্রত্যঙ্গবিহীন অর্থাৎ খঞ্জ প্রভৃতি দুর্ব্বল বালক বালিকাগণের বিনাশ কর্ত্তব্য।"

(৯) সেনেকা—ইনি বলেন আত্মহত্যা দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সহজ উপায়।" নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত সুবিখ্যাত রুসো Rouseau সুমধুর কথায় সকলকে ভ্রাতৃভাব ধারণ করিতে কহিতেন, কিন্তু তাঁহার নিজের সন্তানগুলিকে জন্মিবামাত্র একে একে অনাথ আশ্রমে (Foundling Hospital) পাঠাইয়া দিযাছিলেন, যেন তাহাদিগের প্রতিপালনের ব্যয়ভার তাঁহাকে বহন করিতে না হয়।" যিনি আপনার ঔরসজাত সন্তানকে প্রতিপালন করা আবশ্যক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, তাঁহার শিক্ষায় যে জগতে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইবে ইহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র।

কবিলিউক্যান ও ইপিক টেটস্

এরূপ একটি প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে নিরোর শিক্ষক ও পরামর্শ দাতা সুপ্রসিদ্ধ ষ্টোয়িকীয় দার্শনিক সিনেকা সাধু পৌলের শিষ্য ছিলেন।

কিন্তু সিনেকা কখনও খ্রীষ্টিয়ান হন নাই। তথাপি তাঁহার কতক কতক গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়, যেন তিনি নূতন নিয়মের শিক্ষার বিষয় কিছু ২ জানিতেন। ইহা অতীব সম্ভব যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতা গাল্লিয়ো প্রেঃ ক্রিঃ ১৮; ১২ বা তাঁহার বন্ধু ও সহমন্ত্রী (নিরোর) বিউরস আফ্রিকানদের নিকট হইতে সাধু পৌলের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন; কেননা বিউরস্ সম্রাটের রক্ষক সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন (খৃঃ অঃ ৬১) আর তিনি ফীষ্টের নিকট হইতে বন্দী পৌলের বিবরণ অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবিলিউক্যান ও ষ্টোবিকীয় পণ্ডিত ইপিকটেটস্ সাধু পৌলের শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(১০) ইপিকিউরিয়ান ও ষ্টোয়িক—ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল দুইটি গ্রীক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে—ইহার একটী সম্প্রদায়ের নাম "ইপিকিউ-রিয়াণ," এবং অপরটীর নাম "ষ্টোয়িক"। প্রথম সম্প্রদায় ইপিকিউ-রিয়াণ," ইহারা চার্ব্বাক অর্থাৎ নাস্তিক। ইহারা শিক্ষা দিতেন যে, ঈশ্বর জগতের কার্য্যে কোন মনোযোগই দেন না, তিনি জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু তিনি বিশ্বের কোনও দূরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করেন, এবং শারীরিক সুখ ও চিন্তাশূন্য আরামই ধর্ম্মের মূল।"

আচার্য্য T. Walker, M A. তাঁহার স্বরচিত The Acts of the Apostles নামক গ্রন্থের টীকায় ঐ দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে এস্থলে পাঠকবর্গের বিবেচ্য—"Epicurus was born in Samos 342, B. C. and settled in Athens, 35 years later as a teacher of Philosophy. He taught that pleasure is the chief end of man, pleasure, i.e., not in the sense of the gratification of each desire as it arises, but in the sense of securing the greatest possible amount of happiness in life when all the interests concerned have been taken into account. He regarded the gods as living a life of calm felicity, far removed from earthly turmoil and dessociated from all interference with mundane things. He gathered his desciples together in a famous garden for instruction. The Epicureans did not believe

in the immortality of the soul; to them man's Existence ceases with death. They were the materialists and utilitarians of Greek philosophy. Their doctrines would hardly appeal to Indian minds, although many modern educated Indians who live for money and comfort and do not trouble their heads about either religion or the life to come are more than Epicurean in practice.

The other great philosophy then prevalent in Athens the stoic were followers of Zeno, a native of Cyprus, who flourished about 278 B. C. They were so called because he taught in a painted "Stoa, (Portico), The practice of Virtue for its own sake was his favourite doctrine, and the great end of Existence was considered to be the attainment of a state of mind which is not disturbed by either Good or Evil, pleasure or pain. He taught the need of mortyfying the senses to this end. The Stoics, unlike the Epicureans, were strong believers in a spiritual universe, but were practically pantheists, holding the all pervasiveness of the divine essence and the final absorption of human spirits into the divine. Their system was also strongly tinged with fatalism. It will be seen, therefore, that their tenets bore a strong resemblance to those of Hindu philosophy, especially to the doctrines of the Vedanta school. In fact, Stoicism was really oriental in origin and represented the contact of eastern influences and doctrines with the world of Western classic thought. Zeno himself appears to have sprung from an Asiatic stock. Tarsus, St. Paul's birthplace, was a famous centre of stoic teaching.

সাধু পৌলের এথেন্স নগরে বাস করিবার সময় কয়েকজন ইপীকিউরিয় ও ষ্টোকীয় দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই; প্রেঃ ক্রিঃ ১৭ ; ১৮। পুনশ্চ, এই সকল শিক্ষক আপনাদিগকে সাধারণ খ্রীষ্টীয়ান অপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া প্রকাশ করিত, ইহারা "নাস্তিক" নামে অভিহিত। সাধু পৌল ইহাদিগকে ভালরূপ জানিতেন, ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি তিমোথীয়কে কল্পিত বিজ্ঞানের প্রতিকূলে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দেন। পুনশ্চ, কলসীয়ান খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে এইরূপ

অলীক শিক্ষার বিষয় শুনিয়া, সাধু পোল তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণের সাধন কর্ত্তা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তিদায়ক অলীকদর্শনবিদ্যা ও মনুষ্যের কল্পিত তপস্যা সংযুক্ত রীতি হইতে সাবধান করিয়া দেন। সেই সকল ভ্রষ্টমত খ্রীষ্টীয়ানের ধর্ম্মমতের সঙ্গে যিহুদীয় ও পৌত্তলিক ধর্ম্মমত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের এই সকল ধর্ম্মমত লইয়া পরবর্ত্তী লোকেরা এক একটি মত প্রকাশ করিত; আর মনে মনে জ্ঞান করিত যে সেটী তাহাদের আবিষ্কৃত নূতন মত। ফলতঃ ইহার কিছুই নূতন নহে, সকলই, সেই আদিম যুগের রোপিত ভ্রান্তি বৃক্ষের ফল। কিরূপে মনুষ্য পবিত্র হইবে? খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা? না—ব্যবস্থা দ্বারা কেমন করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিবে? পবিত্র আত্মার শিক্ষা দ্বারা? না—স্বর্গ দূতগণের সহিত আলাপ দ্বারা? বস্তুতঃ এই সকল বিষয় লইয়া, তাহারা বিবাদ আরম্ভ করিত এবং তাহারা উত্তর দানকালে একমাত্র মধ্যস্থ খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করে। ইহার উত্তরেদার্শনিকসাধু পোল খ্রীষ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দেখান আর খ্রীষ্টের সহিত যে সংযোগ তাহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার মূল।

নবম অধ্যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

ঈশ্বর যে আছেন, বিশ্বরাজ্যই যে তাহার প্রমাণ, কারণ বিনা কার্য্য হয় না। তিনি যদি না থাকেন, বিশ্বকারণ থাকে না। প্রকৃত মানুষকে আর কোন প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার যে পরিমাণে নিশ্চিত জ্ঞান আছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েও তাঁহার সেই পরিমাণে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা উচিত। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অধীন বলিয়া জানেন। তাঁহার সহিত সম্মিলনে তিনি প্রকৃত জীবন ও পবিত্র সুখ সম্ভোগ করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞান আছে বলিয়াই, সকল কালের সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, এমন কথন

হইত না। ঈশ্বরসেবা ও তৎসহ সম্মিলন লাভের যত্ন ও পদ্ধতিকেই ধর্ম্ম কহে। কিন্তু পাপ প্রযুক্ত মনুষ্য ঈশ্বর হইতে চ্যুত ও অন্ধবুদ্ধি হইয়াছে। সেই জন্য তাহার ঈশ্বর বিষয়ক বোধও তমসাচ্ছন্ন ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল তাহাই নহে, জগতে এমন লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঈশ্বর নাই বলিয়া আপনাদিগকে ঘোরতররূপে বঞ্চনা করেন। পশু হইতে মনুষ্যের এই এক মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, যে ঈশ্বর ও পারলৌকিক বিষয়ে মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান আছে, পশুর তাহা নাই। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর ভক্তি উদয় হয় না, তাঁহারা মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।

আমাদিগের মোট কথা এই হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শনে এক ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইলেও হিন্দু দর্শন অনেক ব্যাপারে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব, আধিপত্য, এবং গুণরাজিকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে, ফলতঃ হিন্দুদর্শন ঈশ্বরের অনাদ্যনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরীয় প্রভাব প্রভৃতি অদৃশ্য গুণ সকল জগতের সৃষ্টিকালাবধি তাঁহার বিবিধ কর্ম্মেতে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে," এই কথার গভীর অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং বুঝাইয়া দেন নাই; আরিষ্টটল "জগৎ বিষয়ক" নামক গ্রন্থে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন যে, "অদৃশ্য যিনি, তন্নির্ম্মিত বস্তুযোগে তিনি দৃষ্টিগোচর হন।" খুব সম্ভব যে এই কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া চিন্তাশীল গ্রীক পণ্ডিতগণও সৃষ্টির দৃশ্য হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত করিতেন; আলেকজান্দ্রিয়া নগরের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ফাইলো এইরূপ অনুমান করিবার প্রণালী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এমন একটি মনোবৃত্তি মনুষ্যত্বের অঙ্গীভূত হইয়াছে যে, তদ্যোগে, প্রকৃতির শোভা ও প্রক্রিয়া সকল অবলোকন করিলেই আপনা আপনি এমন পরিমাণে ঈশ্বর জ্ঞান মনুষ্যের অন্তরে উদয় হয় যে, তাহারা সমুচিতরূপে ঈশ্বরের সেবা করিতে সমর্থ হয়, কাজেই তাহা করিতেও বাধ্য হয়, না করিলেই জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করিয়াছে বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হয়।

খ্রীষ্টীয় দর্শনের উত্তর।

ন-খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় দর্শনের চর্চ্চা কি পরিমাণে আছে আমি তাহা জ্ঞাত নহি, আমার একথা বলিবার এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে আমি তাহাদের নিন্দা করিতেছি। হিন্দু দর্শন, "ঐশ্বরিক বিশ্বাস" "ঈশ্বরের কর্ত্তৃক স্বীকার" এবং "তাঁহার সাক্ষ্যদান," এই তিনটী বিষয়ে এক প্রকার অমনোযোগী ও নীরব, বলিতে গেলে উহার মধ্যে ঐ তিনটীর সাক্ষ্যসম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এইখানে খ্রীষ্টীয় দর্শনের সহিত উহার মর্ম্মান্তিক প্রভেদ দেখা যায়। মিসেস্ এনি বেশান্ত হউক, কি থিয়জফিক্যাল সোসাইটি হউক, কি বৈদান্তিক দল হউক, কি অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ হউক আমি উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা মিথ্যা বা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া খণ্ডন করুন দেখি? খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্ম, উভয়ের মধ্য দিয়া ঐ তিনটী বস্তুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ইহা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিলে দর্শন শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের কোন ব্যাখ্যা হয় না এবং গৌরব থাকে না।

ঋষি সমাজে প্রবল বাদানুবাদ।

বেদ্ প্রবেশিকা নামক গ্রন্থের ২১২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, এই প্রশ্ন উঠিলে ঋষি সমাজে প্রবল বাদানুবাদ উঠিয়াছিল এবং ঋগ্বেদের পর যখন উপনিষদ্ সকল রচিত হয়, তখন অধিকাংশ ঋষিরই বিবেচনায় ঈশ্বর একমাত্র, লেখক আবার উক্ত গ্রন্থে বলেন "সে ঈশ্বর বাইবেল বা কোরানের ঈশ্বরের মত নহেন। সে ঈশ্বরও যিনি, হে প্রিয়দর্শন পাঠক, তুমিও তিনি। সে ঈশ্বর খ্রীষ্ট-পন্থা ও-মহম্মদ-পন্থার ঈশ্বরের ন্যায় তোমার আত্মার সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন। মহর্ষি কপিল এই মতের প্রতি অনেক বিদ্রূপ করিয়া-ছিলেন। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদী ঋষিরা এই মত সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে অবলম্বন করেন নাই। দীর্ঘতমা ঋষি ভয়ে ভয়ে একস্থানে বলিতেছেন, "আমি বালক, কিছুই জানি না। অজ্ঞান আমি, যাঁহারা জানেন—

সেই কবিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, যিনি ষড়লোকের স্তম্ভস্বরূপ সেই পরমাত্মা এক কি না" ? (ঋগ্বেদ ১।৬৪।৫।৬) তদুত্তরে তিনিই আবার বলিয়াছেন যে, হাঁ একই বটেন,—অগ্নি ইন্দ্র বায়ু ইত্যাদি তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। তিনি এক‍ং সৎ, অর্থাৎ তিনি একভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই"। পুনশ্চ, "মনু অসংখ্য দেবতাকে ৩৩ সংখ্যক করায় প্রশ্ন উঠে যে অসংখ্যকে যদি ৩৩ বলা যায়, তবে "এক" বলিতেই বা হানি কি ? এইরূপে বহু ঈশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের তর্ক আর্য্যবর্ত্তে আরব্ধ হয়।"

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ আজকাল অতি প্রবল বটে, এবং ইহার বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ আছে তাহা খ্রীষ্টীয়দর্শনে ও সুসমাচারের নিকটে পরাজিত ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, কিন্তু সেগুলির উপর নির্ভর দ্বারা অটল নিশ্চয়তা লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত একযোগে যুক্ত হইতে সমর্থ হই না। এক ব্যক্তি একটি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সব লোকের মনের মত প্রমাণ ও যুক্তি আজও উদ্ভাবিত হয় নাই।' মাধবাচার্য্য—যে কথা বলিয়াছেন তাহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়—"If God is known then His Existence must be granted, if He is not known, how can we argue about Him,"

ঈশ্বর যে আছেন, ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক, কারণ এই ধারণা ব্যতিরেকে কোন ঐশ্বরিক বিশ্বাস থাকা অসম্ভব কেননা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার এবং তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে তবেই তাহাকে ঐশ্বরিক বিশ্বাস বলা যায় ; এই ঐশ্বরিক ব্যাখ্যাটী হিন্দু দর্শনে পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায় না এবং আমরা ঐশ্বরিক সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহার অস্তিত্ব নাই, তাঁহার কি কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে ? উত্তরে বলিব, কদাচ নহে। তিনি কি কোন সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন ? উত্তরে বলিব, না। ফলতঃ ঈশ্বরের সত্যবাদিতাই তাঁহার

সাক্ষ্যের মূল এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও পবিত্রতাই তাঁহার সত্যবাদিতার ভিত্তি মূল; কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব না থাকিলে, এতদুভয়ের কোনটিই থাকিতে পারিত না; কারণ যাহা নাই, তাহার জ্ঞান বা পবিত্রতা কিছুই থাকিতে পারে না। যেন তদ্দ্বারা আমরা স্বীকার করি যে, এরূপ শ্রেষ্ঠ-স্বভাব পরম পুরুষ একজন আছেন এবং তিনি ভজনা ও উপাসনার যোগ্য-পাত্র এবং আমাদের নিকট হইতে তাহা ন্যায্যরূপে দাবী করিতে পারেন। খ্রীষ্টীয় দর্শন এই শিক্ষাটী অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়াছে এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিব যে একই কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যের প্রধান অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছে; সুতরাং ইহা তাহার পক্ষে অশ্রদ্ধেয় ব্যাখ্যা নয় কিম্বা অনধিকার চর্চ্চা করা হয় নাই। বেদান্তের ব্যাখ্যাকারগণ এই কেন্দ্রে না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষা কখনও পূর্ণ ও সিদ্ধ হইবে না। কেননা যদি এরূপ কেহ না থাকিতেন, যিনি আমা-দের নিকট হইতে ভক্তি ও উপাসনা ন্যায্যরূপে দাবি করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ও উপাসনাদি অনর্থক হইত। যখন আমরা কোন ব্যক্তির উপাসনা করি, তখন স্বীকার করি যে, সেই ব্যক্তি আমা-দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ যদি তিনি শ্রেষ্ঠ না হন, তবে তাঁহার উপাসনা করাতে আমাদের নিজের অগৌরব হয়। কিন্তু যখন আমরা কোন স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভূ, ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন পর পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হই এবং জানি যে অন্যান্য সমস্তই তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, আর তিনিই তত্তাবতের সৃষ্টিস্থিতি প্রতিপালন কর্ত্তা, তখন অতি নম্রতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করা কি আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? এই অত্যাবশ্যকীয় তত্বটী জগতের সর্ব্বত্র অধিকাংশ লোকে এত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে যে, এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বজাতিই পুত্তলি পূজা এবং দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমধিক তৎপর; কিন্তু খ্রীষ্টীয় দর্শন এবং আমাদের বিশ্বাস নাস্তিক্য ও পৌত্তলিকা উভয়ই অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা দেয়; ফলতঃ আমরা নাস্তিকতার বিপরীত

মত আস্তিকতায় বিশ্বাস করি; এবং পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরোপাসনার বিপক্ষে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহা স্বীকার করিবার জন্য এই দর্শন শিক্ষা প্রদান করে। হিন্দু দার্শনিকগণ যদি খ্রীষ্টীয় দর্শনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাহেন যদি যথার্থই পারমার্থিক সত্য চাহেন, যদি ইহার মূল ভিত্তি ও আশ্রয় স্থান লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে ঐ পথ দিয়া তাহাদিগকে উঠিতে হইবে।

একাধিক ঈশ্বর থাকা অসম্ভব।

ঈশ্বরের প্রকৃতির বিশেষত্ব এই একটী বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিই সর্ব্ব বস্তুর মূল ও আদিকারণ, একমাত্র স্বতন্ত্র পরমপুরুষ এবং তাঁহারই উপর অন্যান্য সমস্তই নির্ভর করে, এতদ্ভিন্ন, তিনিই যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের মূলীভুত কারণ। কিন্তু এই অর্থে দুই আদি কারণ অচিন্তনীয়। যেহেতু সমস্তই একজনের উপর নির্ভর করে, অথচ সেই একজন ভিন্ন আরও স্বতন্ত্র পুরুষ যে আছেন, একথা বলা স্পষ্টই যুক্তি বিরুদ্ধ। এই মৌলিক বিশেষত্ব একা ঈশ্বরেরই আছে, তিনি বলেন, "আমি আদি এবং আমিই অন্ত", তিনি আরও বলেন আমি এক—"আমা ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই"। যদি একাধিক ঈশ্বর থাকিতেন, তাহা হইলে, ঈশ্বরত্বের পূর্ণ গুণরাজি বিভক্ত হইয়া যাইত এবং সেরূপ ঈশ্বরগণের কেহই সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইতে পারিতেন না। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বগুণের আধার এবং তাঁহার গুণরাজি সম্পূর্ণ ও পরিমেয়।

"যিহোবা" ও "আছি"।

সাধারণতঃ লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তিনি যে আছেন, কি উপায়ে আমরা তাহা জানি, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে; এরূপ মতান্তর সংসয়বাদিগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এ জ্ঞান সহজ নহে—ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। ঈশ্বরের নামের অর্থাৎ

"যিহোবা" শব্দের প্রতি যিহুদিরা অসীম ভক্তিমান ছিল। যদৃচ্ছাক্রমে কেহ "যিহোবা" শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার গুরুতর দণ্ড হইত, তাহারা ভাবিত সেই মহামহিম নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে বিশেষরূপে শুচি এবং ভয়-ভক্তি-যুক্ত হওয়া উচিত; যিহুদিদের এই ধারণা ভালই বলিতে হইবে এবং আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।" "ছিলাম" না বলিয়া "আছি" বলা হইল কেন? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের টীকাকার-গণ বলেন যে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ দ্বারা বক্তার ঈশ্বরত্ব সূচিত হইতেছে; কেননা বাইবেল কেবল ঈশ্বরই ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা কহিবার সময়ে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ করেন; যেহেতু তাঁহার পক্ষে কি ভূত কি ভবিষ্যৎ সমস্তই বর্ত্তমান। এই জন্য ঈশ্বরের নাম "আছি"। ঈশ্বর মুশার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন "আমি যে আছি" সেই আছি ...ইস্রায়েল সন্তানদিগকে বলিও আছি"। সংস্কৃত বাইবেলে নাকি ঐ পদ ওঁ তৎ সৎ ওঁ নামে অনুদিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় ইহা আমি নিজে কখন দেখি নাই; কিন্তু সেপ্‌টুয়াজিণ্ট অনুবাদে "ওন্" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। হিব্রু ভাষায় "এ হা-ইয়া" এবং আরবী ভাষায়- "আহি হে, আসরাহিহে" এবং "I am" এই বাক্যকে "আনা মৌজুদ্দুন" এই কথায় অনুদিত হইয়াছে; অর্থ কিন্তু একই। অতএব যিনি আপনাকে "আছি" "ওন্" প্রভৃতি নামে স্বপ্রকাশ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই আছেন, এই "আছির" "আছিত্ব" অস্বীকার করিবার যো নাই। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন—এ কথা শ্রুতির আদি—শ্রুতির মধ্য—শ্রুতির অন্ত। কপিল যখন বলিয়াছিলেন যে ঈশ্বর আছেন ও কথার প্রমাণ নাই—তখন তিনি প্রমাণ অর্থে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটীকেই প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার বিশ্বাস যে, মূল কপিল বিজ্ঞানে "শ্রুতি" প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। নতুবা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণ ভাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ ইত্যাদি সূত্র কপিলের দ্বারা উপদিষ্ট

হইত না। সাংখ্য দর্শনের সময়ে শ্রুতি যে কোনও স্থানে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে ইহা অর্ব্বাচীন কপিল শিষ্যদের ভ্রম মাত্র। আমি বিশিষ্ট পণ্ডিত দিগের সাহায্যে যতদূর দেখিয়াছি যে যে সূত্রে শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতার চেষ্টা করা হইয়াছে সে সমুদয় কপিল হইতে অর্ব্বাচীন এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র মধ্যে শ্রুতির বচন প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না কারণ উভয়ের পথ বিভিন্ন, কেবল তর্কস্থলে দর্শনের প্রমাণকে বলবৎ করিবার জন্য শ্রুতিকে টানিয়া আনিতে হইয়াছে। তাই বলিয়া শ্রুতিকে অমান্য করা বিধেয় নয়।

"য়িহুদীগণ আর তাহাদের ক্ষুদ্র বাসভূমির মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাহারা ইদানীং জগতের বহুস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।' তাই তাহাদের চিন্তাগুলি বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে রসসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছিল। বিদেশীয় ভাবের সংঘাতে য়িহুদীচিত্ত কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইলেও মূলতঃ উহা য়িহুদীই রহিয়া গেল। য়িহুদীজাতির রক্ষণশীলতা সর্ব্বজন বিদিত। সভ্যতার এই দীপ্ত মধ্যাহ্নে অনায়াস গতায়াতের ফলে যখন চিন্তার অসঙ্কুচিত আদান প্রদান সংঘটিত হইতেছে তখনও দেখা যায় যে, স্বদেশ ভ্রষ্ট ইস্রায়েল সম্প্রদায় সযত্নে তাহাদের পুরাতন ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানে অল্পাধিক অ-য়িহুদী উপাদান পরিলক্ষিত হইলেও তাহার প্রাণটা অ-য়িহুদী নহে। এ প্রাণটা যে কি, তাহা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। য়িহুদী জাতির প্রাণটা কি তাহা এক কথায় বলা সুকঠিন। যাঁহাদের য়িহুদীধর্ম্ম সাহিত্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তাঁহারা এই প্রাণের সাক্ষ্য পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন। য়িহুদীগণ গ্রীকদের ন্যায় কলাবিদ্, রোমানদের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ, অথবা ভারতীয় আর্য্য ঋষিদের ন্যায় উদার-প্রকৃতি ছিল না। তাহাদের চরিত্র যে সঙ্কীর্ণ ছিল, তাহাদের দৃষ্টির বহুপথ অতিবাহণ করিবার যোগ্যতা ছিল না তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি তাহাদের ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তাও সকল সময় যথোচিত প্রশস্ত ছিল না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ, মহোদয় "Book of wisdom" নামক গ্রন্থের অনুদিত অংশের ভূমিকায় তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়া দিয়াছেন।

তথাপি একথা সত্য যে, যিহুদীদিগের ধর্ম্মের মধ্যে একটি পরম বৈশিষ্ট্য বিরাজ করিত। সেই বৈশিষ্টকে সংক্ষেপে একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই একেশ্বরবাদ আমাদের দেশের ঋষিদিগের একেশ্বরবাদ হইতে স্বতন্ত্র। উহা তত্ত্বজ্ঞানের (এস্থলে আমি "তত্ত্ব" শব্দ তাহার ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করিতেছি) উপর স্থাপিত নহে। বাস্তবিক পারমার্থিক বিষয়গুলি সূক্ষ্মাকারে যিহুদী সাধকের অন্তরে উদিত হইত না বটে; কিন্তু তাহাদিগের শক্তি সমগ্র যিহুদী জাতির জীবনে বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। যিহুদী একেশ্বরবাদ অনুদার হইলেও শক্তিমান, কেন না উহা জাতীয় সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। যিহুদী জাতিও আমাদের মত অতি প্রাচীন জাতি। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিহুদী মনীষীগণ যে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন—বিচ্ছিন্ন যিহুদীরা অদ্যাপি জগতের বিভিন্নস্থানে তাহা সযত্নে সাধন করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সভ্যজাতিসমূহ যিহুদীধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি যে অশিষ্ট আচরণ করিয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু মানব সভ্যতার উষাকালে বসুধার প্রান্তবর্ত্তী প্যালেষ্টাইন জনপদে যিহোবার (ঈশ্বরের) যে মহতীবাণী বিঘোষিত হইয়াছিল সেই বাণী আজ অবধি যিহুদী-হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইতেছে। কেবল যিহুদীহৃদয়ে কেন, যিহুদীধর্ম্মশাস্ত্র নিখিল-বিশ্বে শান্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। যিহুদী জাতির ধর্ম্ম-সঙ্গীত, যাহা সাধারণতঃ দায়ুদের গীতাবলী নামে প্রসিদ্ধ তাহার উপমা কি পৃথিবীতে অধিক পাওয়া যায়? আত্মাকে জানিবার যদি কোন ভাষা থাকে তবে তাহা এই সঙ্গীতগুলিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। মানবের ধর্ম্মসাহিত্যে এই সুললিত পদাবলীর স্থান যে কত উচ্চে তাহা নির্ণয় করা আয়াসসাধ্য। ইহা সরল অথচ

সুগভীর। কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ প্রবাহের মত ইহার গতি নিতান্ত সহজ; কিন্তু আত্মার এরূপ কোন অবস্থা নাই যাহা ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই। মানব মনের হর্ষ বিষাদ-বিরহ প্রভৃতি বিচিত্র ভাবনিচয় পক্ষী-কূজনের ন্যায় এই পদাবলীতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গীতমালা ইব্রীয় (Hebrew) ভাষায় রচিত; কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ ভাবটী এতই প্রাণস্পর্শী যে, অনুবাদ পাঠ করিয়াও আমরা পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারি না। তিন সহস্রাধিক বৎসর হইল এই গীতি-সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহা শত শত সাধকের নিকট সমাদর লাভে বঞ্চিত হয় নাই। আত্মার সুখদুঃখ প্রাচীন ও আধুনিক অনেক গ্রন্থেই গ্রথিত আছে; কিন্তু দায়ুদের গীতাবলীতে যে-ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকটিত দেখা যায় তাহা বাস্তবিক অতুলনীয়। ঈশ্বরের ভক্ত বিনষ্ট হইবে না, ইস্রায়েল জাতি রক্ষা পাইবে এই কথা যে-কত অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে গীতাবলী প্রকাশ করিয়াছে তাহা বলা দুঃসাধ্য। এই বিশ্বাসই যিহুদী জাতির বিশেষত্ব। তাই বলিতেছিলাম, যিহুদী একেশ্বরবাদ ঠিক ভারতীয় একেশ্বরবাদের ন্যায় নহে। ভারতীয় একেশ্বরবাদ আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা নিখিল ভারতকে আশ্রয় দেয় নাই।* যিহুদীয় একেশ্বরবাদ উন্মুক্ত নহে সত্য; কিন্তু উহা যিহুদীর কাছে গৃহাবরণের কার্য্য করিয়াছিল। এই একেশ্বরবাদ যে শক্তিরূপে দেখা দিয়াছিল তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। যেমন সৌরকর তেজো-রূপে অবতরণ করিয়া জগৎকে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করে তেমনি যিহুদীধর্ম্ম প্রবল প্রতাপে যিহুদী জাতিকে যুগপৎ পরিশোধিত ও পরি-বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যাঁহারা আইজায়া, জেরিমায়া, আমোস প্রভৃতি মহাজনগণের উক্তি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা এই বাক্যের সার্থকতা

* Hinduism and its Relations to christianity by Rev. J. Robson, M. A. Formerly of Ajmer এবং The Higher Hinduism in Relation to Christianity by T. E. Slater নামক গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

উপলব্ধি করিবেন। ভারতবর্ষে অধ্যাত্মচিন্তা যেরূপ বহু পথে প্রধাবিত হইয়াছে জুডিয়াখণ্ডে সেরূপ হয় নাই। কিন্তু তাহা যে ভারতীয় চিন্তা অপেক্ষা বলবত্তর তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যতই তর্ক, বিতর্ক বা কুতর্ক করি না কেন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনাই যে প্রকৃত বস্তু তাহা অস্বীকার করা যায় না। যিহুদীরা সেই খাঁটি বস্তুটা সন্তর্পণে পোষণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা স্বদেশভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হইলেও অদ্যাপি জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম। আর আমরা যে পরিমাণে মিথ্যার অর্চ্চনা করিয়াছি ঠিক সেই পরিমাণেই যে বিফলকাম হইয়াছি তাহা আমাদের স্বদেশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাক সে কথা অতঃপর যিহুদীধর্ম্মে অপরিসীম বীর্য্যের পরিচয় প্রচান করিতেছে।”

এ জ্ঞান কি মানবাত্মার সহজাত ?

এটা একটা বিভিন্ন তর্ক বটে, এ তর্কের উত্তর আছে, এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান মানবাত্মার সহজাত কিন্তু আমার বোধে, মানবাত্মার একেবারেই কোন সহজ জ্ঞান নাই; জন্মগ্রহণ কালে মনুষ্যের মনে কোন বিষয়ের কোন বিশেষ ভাবই থাকে না, আর আমরা জীবাত্মার পূর্ব্বাস্তিত্বের অনুকূলে কোন প্রমাণ পাই না বলিয়া, যুক্তি সিদ্ধরূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আত্মা প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়োপলব্ধি করিয়া তৎপরে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোপার্জ্জন করে। যদি এই কথা সত্য হয়, যদি জন্মগ্রহণ কালে জীবাত্মা একখণ্ড পরিষ্কার শুভ্র কাগজের সদৃশ হয় উহাতে কোনরূপ জ্ঞানের চিহ্ন বা লেশমাত্র না থাকে, যদি আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ, শিক্ষার্জ্জিত, এবং তুলনা করিয়া ক্রমশঃ সঞ্চয়ীকৃত হয় তাহা হইলে আমরা কদাচ বলিতে পারিনা যে, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান আমাদের সহজাত।

ঈশ্বর আছেন।

যাঁহারা বলেন ঈশ্বর নাই, তাঁহারা তিনি "নাই" বলিয়া এপর্য্যন্ত প্রমাণও দিতে পারেন নাই। আর কখনও যে পারিবেন এমন বিশ্বাস কদাচ হয় না। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব, যে কেহ "ঈশ্বর আছেন" কথাটি শ্রবণ করিয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝে, যে উহা নিশ্চিত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি "সমগ্র" ও "অংশ" শব্দের ভাবার্থ বুঝে, তাহাকে যেমন স্বীকার করিতেই হইবে যে, অংশ অপেক্ষা সমগ্র বৃহৎ, তেমনি যে ব্যক্তি "ঈশ্বর" ও "আছেন" শব্দের মর্ম্ম জানে, সে কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ কোন স্পষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণ যে পাওয়া যায়, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না; বাস্তবিক আমরা কোন ব্যক্তিকে বলিতে পারিনা যে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব; কারণ সে উত্তর করিতে পারে যে, ইহা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ নহে বলিয়াই আমি সংশয় প্রকাশ করি। তত্রাচ আমরা বলিব, অন্যান্য তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তদ্দ্বারা ইহা আমাদের নিকট স্পষ্টীকৃত ও প্রমাণিত হইয়া থাকে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব তাঁহার সৃষ্টিদ্বারা প্রতীয়মান হয়।

অধিকন্তু সমস্ত সৃষ্টির পারতন্ত্র্য দেখিয়া আমরা, একজন স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করি; এই বিষয়টী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত Dr. Robert Flint তাঁহার কৃত "Theism" নামক মূল্যবান গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া যুক্তিসহ দেখাইয়া দিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং নাস্তিক্যবাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়েছেন।

কার্য্যদর্শন ও নির্ম্মাণ কৌশল।

যে কোন ব্যক্তি কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান বিষয়টি গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিবেন, তিনি কখনও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে,

আমরা যাহা যাহা দেখি বা জ্ঞাত হই, তৎসমস্তই কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিদ্যমান আছে, সুতরাং আমাদিগকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে এই সকলের একজন আদিকারণ আছেন, এমন কেহ আছেন, যিনি পরমবিজ্ঞ, ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনার্থ সর্ব্ববস্তু বিবেচনা পূর্ব্বক উৎপন্ন ও উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী করিয়াছেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে যাহা নিজে কার্য্য নহে, কিন্তু চিরকালই কারণের অনধীন সুতরাং অন্যান্য সকল কারণ ও কার্য্যের উৎপাদক তাহাই প্রকৃত কারণ।

আমরা নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ঈশ্বর আছেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, যে জড়শক্তি ও জীবগণ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সতত তৎপর (তাহা তাহারা নিজে জানে না) তাহারা অবশ্যই কোন না কোন মহাশক্তিশালী ও পরমবিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে; ফলতঃ যিনি উহাদের অস্তিত্বের কারণ তিনি ব্যতিত অন্য কেহই উহাদিগকে স্ব স্ব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী কার্য্য সকল করাইয়া লইতে পারে না। বাস্তবিক যে মহান্ শিল্পী সমগ্র প্রাকৃতিক জগতে কার্য্য করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করাইয়া লইতেছে না। ইহা চিন্তা করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, এই সকল বস্তুর একজন সঙ্কল্পক, নির্ম্মাতা ও নিয়ন্তা অবশ্যই আছেন। এইরূপে সৃষ্টি পদার্থের সাক্ষ্যে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে একজন অনাদি অনন্ত, স্বতন্ত্র বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই আছেন, এবং তাঁহারই উপর অন্যান্য সকল পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং তিনিই সমস্তের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। কার্য্যে উদ্দেশ্য থাকিলে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারণে অভিসন্ধি আছে; জগৎ একটি কার্য্য এবং ইহাতে বিস্তর উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, অতএব যিনি জগতের কারণ তিনি অবশ্যই বুদ্ধিমান।

সর্ব্বদেশের সাধারণ মত।

"বেদ-প্রবেশিকার" গ্রন্থের মধ্যে লেখক বিদ্রূপাত্মক ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কোন ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ

সেগুলি আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে মঙ্গলজনক কি তৃপ্তিজনক সূত্র বা নিয়ম নহে। এ স্থলে খ্রীষ্টীয়দর্শন দৃঢ়তা সহকারে যে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা দেখাই উচিত; এই দর্শন বলে যে মানব জাতির সাধারণ সম্মতি দ্বারা আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আছেন; প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুকূলে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা দুই চারিজন লোকের বা দার্শনিক পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্কের ফল নহে, তাহা সর্ব্বকাল সর্ব্ব-জাতি ও সর্ব্বদেশের সাধারণ মত।

দৈববাণীর সফলতা ও অলৌকিক কর্ম্ম।

"দৈববাণীর সফলতা" ও "অলৌকিক কর্ম্ম" এই দুইটী বলবৎ প্রমাণ দেখিয়া খ্রীষ্টীয়দর্শন আমাদিগকে সাহস সহকারে বলিয়া দেয় যে আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন। হিন্দু দর্শনের মধ্যে কোন স্থানে যে ঐরূপ মূল্যবান প্রমাণ স্থান পাইয়াছে তাহা স্বীকার করা কষ্টসাধ্য; এই প্রমাণ কেবল খ্রীষ্টীয়দর্শন ব্যতীত আর কোন দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রমাণ দোষশূন্য ও নির্ম্মল, এবং যিহুদী ধর্ম্ম ও দর্শনের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও গৌরবের বিষয় ও সার্ব্বজনীন শিক্ষা; পৃথিবীর কোন দার্শনিক পণ্ডিত এই দর্শনের মর্য্যাদা হীন বা ম্লান করিতে পারেন না; এবং পাশ্চাত্য জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রমাণকে ও প্রমাণ মূলক বিষয়কে বড়ই মূল্যবান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহোদয় "Theism of the Upanishads" গ্রন্থের "Hegel's view of Theism and Christianity" নামক নিবন্ধে যাহা ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অদার্শনিকের পক্ষে কষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল দার্শনিকের পক্ষে সুখকর ও গ্রহণ যোগ্য; ইহা আমি স্বীকার করিব।

CONSULTATION AND BOOKS.

General Metaphysics or Ontology; "Being."—By C. Mercier.

The Idea of God, in the Light of Recent Philosophy.—By A. Seth Pringle-Pattison.

The Christian Doctrine of God.—By the Revd. Charles A. Briggs.
The Philosophy of the Christian Religion —By A. M. Fairbairn.
The Philosophy of Religion.—By G. Galloway.
The Idea of Holy.—By R. Otto
The Reconstruction of Belief —By Dr. Gore Bishop of Oxford.
Hegel's Philosophy of Religion
The Testimony of Christ to Christianity.—By P Bayne.

মনুষ্যের অন্তরস্থ বিবেক।

সত্যশিক্ষা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, এবং প্রকৃত হিতাহিত নির্ণয় করণের শক্তিকে বিবেক বলা যায়, বিবেক আত্মার শক্তি বিশেষ এবং সংবেদের ঘনিষ্ট সহায়, আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে মনুষ্যের অন্তরস্থ বিবেক ইহার একটি অমোঘ সাক্ষ্য। ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মূলকারণ বলিয়া সকলই তাঁহার উপর নির্ভর করে, আর তিনি আপনার কার্য্যদ্বারা মনুষ্যের নিকট আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ সকল লোকেই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করে বলিয়া, আমরা বিশ্বাস করি যে একজন ঈশ্বর আছেন। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে বিবেক নামে এমন একটি অন্তঃসাক্ষী আছে, যাহা মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারকের অস্তিত্বের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। আমরা জানি, সকল লোকেরই অন্তরে "বিবেক" নামে একটি মহাশক্তি আছে। এই শক্তি থাকায়, তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর অভিযোগ করিতেছে অথবা প্রত্যুত্তর দিতেছে", রোমীয় ২, ১৫। ফলতঃ এই শক্তি আছে বলিয়া সৎকর্ম্ম করিলে তাহারা অন্তরে সুখবোধ করে। এমন কি, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহারাও আপনাদের অন্তরস্থ বিবেকের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে সমর্থ নহে। সত্য বটে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা মত এবং কুসংস্কার মূলক বিশ্বাস (ইহাতে সত্য ঈশ্বরের লেশ মাত্র নাই) থাকিলে, বিবেক এমন বিকৃত হইয়া যাইতে পারে যে, যদি তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া মনে করে, এবং তদনুসারে

কার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাদের বিবেক তাহাদিগকে দোষী করে। এ কারণ কেহ বলিতে পারেন যে, বিবেকের ক্ষমতা কোন ঈশ্বর বা দেবতার বিশ্বাস করার উপর নির্ভর করে, আর সেই বিশ্বাস মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু নানা সময়ের, মতাবলম্বী বিজ্ঞগ্রন্থকারগণের সাক্ষ্য এবং বহুবিধ লোকের ভুয়োর্দর্শনের ফলানুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বিবেকের দংশন বা পাপহেতু মনস্তাপ কোন ক্রমেই সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারা যায় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে বিবেকের ক্ষমতা ঈশ্বর বিষয়ক সত্যাসত্য মতামতের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু কোন ঈশ্বর যে আছেন, এই ধারণার উপরেই নির্ভর করে, সুতরাং ইহা তাঁহার অস্তিত্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রমাণ বলিতে হইবে। এমন কি, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সেই আবার আপনার বিবেকের ক্ষমতা দেখাইয়া সাক্ষ্য দেয় যে, কোন ঈশ্বর বা দেবতা আছেন। উদাহরণ স্বরূপে আমরা রোমের সম্রাট কালিগুলার কথা উল্লেখ করিতে পারি, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও, বিদ্যুৎ কিম্বা বজ্রধ্বনি হইলে ভয়ে লুকাইতেন। ফলতঃ প্রকৃতির ঐ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া ঈশ্বরের ক্ষমতা তাঁহার নিজের অপরাধ এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরতার বিষয় মনে পড়িত। হায়! যে ব্যক্তি নিজে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া, অপরের নিকট তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, তিনি যে আছেন, ইহা স্বীকার না করিয়াও, তাঁহার শক্তির বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে সমর্থ নহে, সে যথার্থই দুর্ভাগ্য; ক্রিঃ ১৭; ২৭।

অবতার তত্ত্ব।

দশম অধ্যায়।

সর্ব্বদেশে কোন না কোন প্রকারে অবতার তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে মনুষ্যগণ এই আশা অবলম্বন করিয়া

আসিতেছে যে, ঈশ্বর কোন কোন সময়ে পৃথিবীবাসীর দুঃখ ও পাপভারের লাঘব করণার্থে নররূপে অবতীর্ণ হইবেন; মনুষ্য জাতির আদিম পিতা মাতা প্রথমে শিশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন, কি একেবারে পরিণত বয়স্ক যুবা প্রকৃতি ধরিয়া আসিলেন, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন লোক নাই। বাইবেলে দেখা যায়. "আদিম পিতা মাতা জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়া ধরাতলে পাপ, দুঃখ, ও মৃত্যু আনয়ন করেন," এরূপ একটি কথা বহু যুগ হইতে পুরাতন জগত স্বীকার করিয়া আসিতেছে এবং এখনও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই বাক্য কয়েকটীর ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারা যায়! জ্ঞান হইতে পাপের ও তজ্জন্য দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে; অজ্ঞান অবস্থায় পাপ নাই, তজ্জন্য দুঃখও নাই ইহা জগতের অন্যতম বিভীষিকাময় সত্য। শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রথম নর-নারীর পাপে পতিত হইবার পর মানব কুলের মুক্তির প্রথম অঙ্গীকার ঈশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন, পরিত্রাতা সম্বন্ধে এই প্রথম প্রতিজ্ঞা—জগতের বাল্য ইতিহাসের পাতায় ঐ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। এই প্রথম সুসংবাদ শুনিয়া সে কালের লোকেরা যে কতদূর প্রকৃতিস্থ বা আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল তাহা বলা তত সহজ নহে; ফলতঃ প্রতিজ্ঞাটী অস্পষ্ট ইহাতে কখন কি উপায়ে বা কাহার দ্বারা ঈশ্বর ও মানবের পুনর্ম্মিলন সাধিত হইবে তাহা প্রকাশিত হয় নাই; কেবল অঙ্গীকার হইয়াছে মাত্র; কিন্তু এক বা একাধিক বংশের দ্বারা কি বহু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা, কি এক ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যের মুক্তি সাধন করিবেন ঈশ্বর তাহা প্রকাশ করিয়া তখন বলেন নাই। ফলতঃ ইহাকে আমরা Primitive যুগের Revelation আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি; বস্তুত ইহার মধ্যে কোন প্রকার বিভীষিকা নাই, এবং মুশা কাহাকেও ভয় দেখান নাই, বা মিথ্যা কথা প্রয়োগ করেন নাই। যাহারা মনে করেন মুশা অপরের নিকট হইতে উহা হরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহারা "Primitive Revelation" শব্দের অর্থ বুঝেন না এবং ঈশ্বরের

সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করেন। স্বীকার করিয়া লইলাম যেন মুশা এস্থলে অপরের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়াছে—তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব যথা—"The Passage is Fonnd in Papyrus 1116 of the Hermitage at St Petersburg". The words "son of * man" are a literal translation of the original Si-n-sa" Page 249, Egyptian Religion in History of Theology —By A. H. Sayce. D. D: L. L. D. ঈশ্বর যে তাঁহার বাক্য সাক্ষ্যবিহীন রাখেন নাই তাহাই স্বীকার করিতে হইবে, অতএব মুশা আত্মায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে জগতের বাধা কি আছে ? •

ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে লাগিল, প্রাচীন যুগে স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও পরে পরে অনেক বিষয় মানবের বোধগম্য হইয়াছিল, শেষে মানব আরও স্পষ্ট ও নিশ্চিত জ্ঞান পাইতে লাগিল যে, পতিতের উদ্ধার নিশ্চয়ই হইবে। এই আদিম প্রত্যাদেশের মধ্যে তিনটী স্তর পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মূল—ভিত্তি একটি :—

(১) গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণের চিন্তা।

(২) ইব্রীয় ভাববাদীগণের সাক্ষ্য ও একজন নায়ক।

(৩) খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পিতৃগণের ব্যাখ্যা। যাহাকে Positive এবং Negative Theology বলে।

*The title "The Son."—This term emphasizes the leading thoughts in the author's Christology, the Son is the complete revelation of the father whose nature He shares, and of whose powers He is the sole heir, the only —begotten Son, and He is in absolute dependence on the Father. "I and My Father are one,"("My Father worketh hitherto and I work," the Son can do nothing same what he seeth the Father do," As Son He knows the Father. As God He can speak for God. As wholly dependent on the Father, and wholly obedient to His will His message is true."

ইহারা অবতার তত্ত্বের স্তরে যে সকল প্রমাণ মূলক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেইগুলিকে ভাববাদ হইতে খ্রীষ্টের বাস্তবে সফল ও পূর্ণতার চরম অবস্থা দেখা যায়। "The Essence of Christianity." নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক আচার্য্য Williams Adams Brown—এক স্থানে লিখিয়াছেন যথা—"The religious preparation of the world before Christ came was almost wholly negative." এবং ইহারই পর্য্যয় ধারা Positive এবং Negative থিওলজি নামে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে সর্ব্বদেশে কোন না কোন প্রকারে অবতার তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—মূলের সংজ্ঞা কিন্তু একটি মাত্র, যাহা মুশা জগতের বাল্য ইতিহাসে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতিহাসে অবতার তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট সূত্রপাত এবং এক ব্যক্তির আগমনের অঙ্গীকার কোথায়?

ঈশ্বরের মনোনীত ও বিশ্বস্ত ভক্তদাস মুশা কর্ত্তৃক লিখিত—আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ১৫ পদের সংজ্ঞাকে অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই, উহা যে ভূমির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা একটি মহৎ ও গৌরবের বিষয়; এবং প্রাচীন পৃথিবীর সর্ব্বজাতির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে এই সত্য-বীজ তৎকালে তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; আবার অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিল। অপর দিকে পৃথিবীর একটী প্রাচীন গ্রন্থে (ঋগ্বেদে) ইহার একটা উজ্জ্বল অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব যে শাম বংশের বংশধরগণ যখন এদেশে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহাদের স্মৃতি ভাণ্ডারে এই বীজ বীজাকারে নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই অধ্যাপক S. Radhakrishnna তাঁহার স্বকৃত Indian Philosophy গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "Theolosy" নিবন্ধে ১২৯ পৃষ্ঠায় এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—In the Rg—Veda Vak, or

speech, was a goddess. And now they said from Vak the Vedas issued forth, Vak is the mother of the Vedas" ....তিনি আবার এইরূপ টীপ্পনী দিয়াছেন—Vedanam Mata. Taint. Breh, 11. 8. 8. 5. Compare the opening of St. John's Gospel;—"In the beginning was the word."—হাঁ, ইহা তাঁহার ঠিক কথা, ঐ word—বাক্ (বাক্যই) নররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে অবতার তত্ত্বের বাল্য ইতিহাস এইখানে সূচিত হইয়াছে। যাহা মুশা আত্মায় প্রণোদিত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কাল্পনিক, কি পথারোধক বিষয় নহে। ফলে এই Logosই (বাক্যই) বেদান্তে "ব্রহ্মশব্দ" ও "অপরব্রহ্মনামে" অভিহিত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্ম যে ব্যক্তিরূপী (Personal being) এবং জীবের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত (Personal) সম্বন্ধ আছে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ মহোদয় ঋগ্বেদের উক্ত বিষয়টীকে তত পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমি বলিতে পারি যে, বাইবেল উক্ত ধর্ম্মের উল্লেখের পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মের সহিত উপনিষদুক্ত ধর্ম্মের একটী সাদৃশ্যের কথা সংক্ষেপে বলি। পাঠক পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের ভেদের কথা হয়ত অন্যত্রে পাঠ করিয়াছেন। দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অপরব্রহ্ম বা ব্রহ্মার ব্রহ্মের প্রথমতা সন্তান, কিন্তু তিনি অন্য প্রাণীর মত স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন নহেন, তিনি পরব্রহ্মের সঙ্কল্প জাত। দেশ-কাল-গত জগৎ তাঁহার সহিত এক, এক অর্থে তাঁহার শরীর। জাগতিক ঘটনা সমুদায়ই তাঁহার মানসিক ক্রিয়া। সুতরাং এক অর্থে তিনি জগতের কর্ত্তা। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই আছে—'ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন", তিনি বিশ্বের কর্ত্তা এবং ভুবনের গোপ্তা"। এই উপনিষদেই এবং বিশেষ ভাবে শ্বেতাশ্বতর

উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে তিনিই প্রথমে ব্রহ্ম হইতে বেদ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার সন্তান অন্যান্য জীবকে তাহা প্রদান করেন। বাইবেল-উক্ত ধর্ম্মে এরূপ একজন পুরুষ বিষয়ক সত্যমত অতি উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান। তিনি আর কেহ নহেন তিনি তোমার পরিত্রাণ কর্ত্তা, যীশুখ্রীষ্ট। এই বাক বা বাক্যই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। শ্রুতি, জ্যোতির বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, সে সাক্ষ্য অমান্য করা কাহারও উচিত নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই জীবহৃদয়ে ধ্যেয়", আবার বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ সূত্রে এই কথা আছে যথা…"জ্যোতিশ্চরনাভিধানাৎ"। এই জ্যোতিঃ প্রাকৃত জ্যোতি নহে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম জ্যোতি যাহার বিষয় প্রভু যীশু নিজেই বলিয়াছেন "আমি জগতের জ্যোতি"। অতএব এস্থলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টের বাস্তবে সকল অংশ পূর্ণ হইয়াছে, কারণ খ্রীষ্টই সেই পূর্ণ অবতার যাহার সম্বন্ধে এক সময় সমগ্র পৃথিবী উদ্‌গ্রীব ছিল ইহাই খ্রীষ্টের প্রথম আগমন বার্ত্তা এবং তাঁহার বাস্তবের প্রমাণ এই :—

(১) তিনি অভিষিক্ত (গীত সংহিতা ২, ১—৩)

(২) "যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে উর্দ্ধে নীত হইলেন"।

(৩) পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, হে ঈশ্বর; তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী………এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন……"

(৪) যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ইতিহাস—পৃথিবীর প্রাচীন জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেহ অবরোধ করিতে পারেন

নাই। খ্রীষ্টের বাস্তবে তাহা পুর্ণ পরিমাণে সফল হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫). আচার্য্য C. I. Scofield, D. D. মহোদয় মুশার বাক্যে এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—The first promise of a Redeemer (v. 15.) Here begins the "High way of the seed," ....Immanuel—Christ (Isa 7. 9-14 ;) Mtth. 1. 1, 20-30. 1 John 3, 8 ; John 12, 31.

খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় যাঁহারা বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"পুরাতন নিয়মের অঙ্গীকৃত মশীহ নূতন নহেন, উহা পুরাতন। পুরাতন ধর্ম্ম হইতেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উদ্ভব। জোরওয়াষ্টর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি কিম্বা কংফুসি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ইহার কোনটীই প্রাচীনত্বে মুশার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মতত্ত্বকে পরাভূত করিতে পারে নাই। এই পৌর্ব্বাপর্য্য * আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয় যে ইস্রায়েলীয়দের ধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্ম।

অবতার তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট সূত্রপাত এই, যথা—"I will put enmity between thee and the woman and between thy Seed and her seed ! it shall bruise thy seed and thou shalt bruise his head." কোন পাঠক যদি মনে করেন "Genesis are stamped with a Babylonian impress." তাহা হইলে আমাদের ভীত হইবার কারণ নাই, কিম্বা আমাদের প্রমাণ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহার কোন শঙ্কা নাই। মুক্তি কর্ত্তার সম্বন্ধে প্রথম অঙ্গীকার এইখানে প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রের ইতিহাসের নির্দ্দিষ্ট সূত্রপাত এইখানে। এই কারণে আমরা বলিতে

---

* জোরওয়াষ্টর (স্পিগেলের গণনাক্রমে) ১৯২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে।
অব্রাহাম (.............) ১৯২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে।
কংফুসি (পাশ্চাত্যমতে) ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে।

বাধ্য যে পুরাতন নিয়ম নূতন নিয়মের প্রকৃত উপক্রমণিকা। এবং আদি পুস্তক ৩; ১৪ পদে "Not his" (A. V. R. V.) the Hebrew word for seed is masculine অর্থাৎ পুরুষ লিঙ্গে বুঝিতে হইবে, ইহাই ইব্রীয় ব্যাকরণের ও সাহিত্যের শিক্ষা উক্ত অঙ্গীকারের পূর্ণতারূপ সোপানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য যে যে ধাপ দিয়া উঠা আবশ্যক, তাহা পুরাতন নিয়মে বা ইব্রীয়দিগের গ্রন্থে এবং তাহাদিগের তালমুদে, ও তর্গমে। একই নায়কের বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার যো নাই; যিনি এই ইতিহাস অগ্রাহ্য করেন তিনি সত্যের স্তম্ভকে পদতলে দলিত করেন; এইবাক্যের মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদের কথা নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই পবিত্র ইতিহাস জীবন দায়ক ও আশা জনক বাক্যে পরিপূর্ণ ইহা সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে শিক্ষা দেয়। ইহার মূল কথা জগতকে এক ব্যক্তির আগমনের জন্য প্রস্তুত করা। আর তিনি নারীর বংশ; জগতের সৃষ্টিকাল অবধি পিতা ঈশ্বরের এই কল্পনা ছিল যে, "ইহাতেই তিনি স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই সংগ্রহ করিবেন"।

অন্যান্য ধর্ম্মেও ঈশ্বরাবতারের কথা পাওয়া যায়, যাহারা প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন; তবে কি না সেই সকল প্রাচীন প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে, ঈশ্বর অবতার নানারূপে কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা বা চিত্র মানব জাতির পারমার্থিক উপকারে আসিয়াছে কি না তাহাতে বড় সন্দেহ হয়। এ দেশের লোকেরা বরাহ, কুর্ম্ম, মৎস্য, প্রভৃতি জন্তুকে ঈশ্বর-অবতার বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ইতর জন্তুদের দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজের মধ্যে বসবাস করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত বলা যাইতে পারে, এমন ঈশ্বর অবতারের বৃত্তান্ত এদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমরা এমন অবতারকে চাই যিনি একেবারে নিষ্পাপ

ও নিষ্কলঙ্ক হইবেন, যাঁহার চরিত্র, শিক্ষা, কার্য্য, উদ্দেশ্য সবই পবিত্র হইবে, পাপের বা কোন প্রকার কলঙ্কের লেশমাত্র থাকিবে না, কেবল এই প্রকার অবতারে, আমাদের বিবেচনায় ঐশ্বরিক স্বভাব ও জীবন উপযুক্তরূপে ব্যক্ত হইতে পারে।

ঐ প্রকার নিখুঁত ও সিদ্ধ ঈশ্বর অবতারের বৃত্তান্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় কি? এই প্রশ্নটী, বহুযুগ হইতে খ্রীষ্টীয় জগৎ সাধারণ সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ইহার যথার্থ উত্তর কেহই প্রমাণ সহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা উত্তর দিবার জন্য চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন তাঁহারা প্রকারান্তরে যীশুর মাহাত্ম্যই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে ভক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহোদয়ের ১৮৯৭ সালের ৯ই এপ্রেল তারিখের "India asks, Who is Christ" নামক হৃদয়স্পর্শী উপদেশ গভীরভাবে চিন্তা করিলেই যীশুখ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যায়।

অবতারতত্ত্বে আদর্শ পুরুষ।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে যেমন খ্রীষ্ট, হিন্দুধর্ম্মে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহা এই স্তবকে বর্ণিত হইবে। আশা করি পাঠকবর্গ সমস্ত বিষয়টী ধীরে ধীরে অন্তরে পরিপাক ও বিচার করিয়া লইবেন। কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষরূপে বর্ণিত হয় হউক, যদি কেহ তাঁহাকে সেই ভাবে দেখাইতে পারেন তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই; আমরা কেবল তাঁহার পবিত্র জীবন, কার্য্য, ও প্রমাণ চাই, যদি এই গুলির মধ্যে কোন প্রকার কলঙ্ক থাকে তাহা হইলে তিনি কি আদর্শরূপে গণ্য হইবেন? উত্তরে, বলিব কদাচ নহে। বর্ত্তমান প্রমাণে ও নানাবিধ পরীক্ষার ফলে যাহা কিছু বাহির হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া ন্যায় ও সত্যভাবে কথা প্রসঙ্গ করিলে অন্যায় হইবে না এবং সে কথা বলিবার অধিকার সকলেরই

আছে। ভক্তি বিশ্বাসের চশমা চক্ষে দিয়া যদি এ দেশবাসী কৃষ্ণভক্ত-গণ বিচার ও চিন্তা করেন তাহা হইলে অচিরে সকল গোল মিটিয়া যায় এবং খ্রীষ্টীয় ব্রহ্মবীজে বা বিশ্বাস পদার্থ কেন্দ্র মধ্যে সকলকেই আসিতে হয়।

এখন প্রমাণ এই—প্রস্থান ত্রয়ের প্রথম দুই প্রস্থান, শ্রুতি প্রস্থান, ও ন্যায় প্রস্থানে, কোন আদর্শ পুরুষের প্রমাণ নাই, ও উল্লেখ নাই, কোন অবতারের কথা নাই; ইহা হিন্দু মাত্রকেইস্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু স্মৃতি প্রস্থান গীতায় অবতারতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি এবং এ সম্বন্ধে গীতার সহিত কোন বিরোধ নাই।

(আমাদিগের মধ্যে হয়ত অনেক পাঠক আছেন—যাহারা "প্রস্থান ত্রয়" বিষয়টীর কোনই ধারণা করিতে পারেন না, তাহাদিগের অবগতির জন্য আমি এস্থলে উহার অর্থ সংক্ষেপে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখিয়া দিলাম। "অতি প্রাচীন" কাল হইতেই উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ও ভগবদগীতা এই তিনখানি গ্রন্থ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থত্রয়কে "প্রস্থানত্রয়" কহে।)

প্রচলিত পুরাণ সমূহের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদিগের মত।

হিন্দুদিগের মতে বিষ্ণুর দশ অবতারই অতি বিখ্যাত, কিন্তু ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের কথা লিখিত আছে, এবং তাঁহার অবতার হওনের বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা হিন্দু ভ্রাতৃগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অবতারতত্ত্বের বিষয়টীর সূচনায় আমাদের সহিত মতভেদ না ঘটিলেও অপরাপর বিষয়ে মারাত্মক প্রভেদ দেখা যায়। আমি পুরাণগুলির মধ্য হইতে অবতার-দিগের জন্ম, কার্য্য, উদ্দেশ্য, চরিত্র, ও অবস্থাদির বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা ও প্রমাণ উল্লেখ করিতে পারিতাম সত্য, কিন্তু তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়ো-

জন, এবং কোন ফলও দর্শিবে না, ফলতঃ পাছে কোন হিন্দু পাঠক হৃদয়ে ব্যাথা পান বা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন এই ভাবিয়া পুরাণের অন্তঃর্গত শ্লোকগুলি আর এস্থলে একটি একটি করিয়া উদ্ধৃত করিলাম না ; এবং উদ্ধৃত না করিবার আর একটি কারণ এই যে, তাহাদের অবস্থা-গুলির বর্ণন যে হোমরের ইলিয়ডের ন্যায় কল্পিত তাহাও এখানকার প্রমাণে স্থিরিকৃত হইয়াছে বলিয়া শিক্ষিত লোকে ঈশ্বর বিষয়ক পৌরাণিক গল্পাদি অনুপযুক্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

অবতার সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের শিক্ষা কি ?

উপনিষদের স্থানে স্থানে অবতারতত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শন উহা আদৌ গ্রাহ্য করে নাই ; ইহার প্রমাণ কি? হাঁ, প্রমাণ আছে যথা—"অন্তবত্তম সর্ব্বজ্ঞতা," বেদান্তদর্শন দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১ সূত্র দ্রষ্টব্য—ইহা দেখিয়াই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যথা—"বেদান্তদর্শনে অবতারতত্ত্বের কোন ইঙ্গিত বা আভাষ নাই"। ঐ সূত্রের অর্থ যথা—"যদি এ কথা বল যে, অদৃষ্টানুরোধে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহাদি কল্পনা করিলে ক্ষতি কি ? ইহলোকে ঐ প্রকারই'ত দৃষ্ট হয়, পুণ্যবান রাজা সর্ব্বশরীর ধারী। তাঁহারা আপনাপন অধিষ্ঠানভূত রাজ্যের অধীশ্বর। তদ্বিপরীত ধর্ম্মী কদাচ রাজা নহেন। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে—ঐ প্রকার বলিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের শরীরাদি সম্বন্ধ ঘটিতত্ত্ব, অন্তবত্ত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞতা ঘটে। যে ব্যক্তি কর্ম্মের অধীন, সে কদাচ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না"। যতদূর বুঝা যায় তাহা দেখিয়া আমি বলিতে পারি যে শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত ভাষ্যে ঐ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গীতার ভূমিকা ভাষ্যে অবতারের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

উপনিষদ ও বৈদিক সময়ে অবতারবাদ ছিল না সত্য, কিন্তু সূত্র ছিল, ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈষ্ণব

ধর্ম্মে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার শীল মহাশয়, তৎকৃত "খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম"* নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন—যে দক্ষিণ ভারতে "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" ও তাহার ভিত্তি, উৎপত্তি, বিস্তৃতি খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে হইয়াছে। সুতরাং পুরাণগুলির মধ্যে যে অবতারতত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে অবতারবাদ লওয়া হইয়াছে, গীতায় পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায় তাহা সপ্রমাণ করিব।

ইহার আর এক প্রমাণ এই, কোন কোন মহাভারতকাব্য (Epic Poem) মধ্যে সিরিয়ান চর্চ্চের নামোল্লেখ দেখা যায় ও শ্বেতদ্বীপ অবতারের কথা পাওয়া যায় মহাভারতকাব্য মধ্যে উহার হঠাৎ উল্লেখ হয় কিরূপে? মহাভারত খ্রীষ্টিয়ানদিগের গ্রন্থ নহে ও হিন্দুর গ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিবেচক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন, অথচ, তিনিও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের আগাগোড়া না দেখিয়াই বাতুলের ন্যায় নানা প্রলাপ বলিয়াছেন, প্রমাণ স্বরূপে তাঁহার স্বরচিত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই তাঁহার জ্ঞানের মর্য্যাদা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের ব্যুৎপত্তি অনায়াসে

---

* Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity with an Examination of the Mahabharat Legends about Narada's Pilgrime to Svetadvipa—এই গ্রন্থের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (1) As বিশ্বভাবন শব্দে—The Logos as Creator. The Logos Created the World. (2) Christ is here invoked (1) পুণ্ডরীকাক্ষ—the Incarnation of the Logos God in the flesh. (3) হৃষিকেশ, মহাপুরুষ, পূর্ব্বজা—First begotten, I. E. The Logos, the first begotten, or only begotten Son, পুনশ্চ একথাও বলিতে পারি যে বঙ্গের লব্ধ প্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহোদয় Krishna and the Puranas নামক ইংরাজি গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়ই মূল্যবান। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব আর এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। ইংরাজি জানা পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

বুঝিতে পারা যায়, তিনি লিখিয়াছেন যথা—"ঐ যে মা কালী, উনি চীন জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্চেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরী করে খ্রীষ্টানরা, পূজা করছে"। বলিহারি যাই তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান; এরূপ জ্ঞান যে স্বামী বিবেকানন্দের ছিল তাহা কখনও ভাবি নাই। রাজা রাম মোহন রায়, কি ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন, কি আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইহাদের মধ্যে একজনও ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করেন নাই।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য পাওয়া যায়?

হিন্দু ধর্ম্ম মন্থন করিলে এ বিষয়ে অনেক তথ্য বাহির করিতে পারা যায়, যাহা শাস্ত্রসঙ্গত ও প্রমাণমূলক এক্ষণে কেবল তাহাই উল্লেখ করিব; বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এখন এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানের পদ পাইতে তাঁহাদের অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণুঃ "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা'ত হইবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আর কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা। সূর্য্য বাষ্পাকারে জল আকর্ষণ-পূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা করেন। "ত্রিবিক্রম" আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র।

বামনাবতারের বৈদিক গল্প শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। ঋগ্বেদের "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—বিষ্ণুর সেই পরম পদ—যার অর্থ উপনিষদে দাঁড়াইয়াছে—ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান মাত্র। গায়ত্রীতেও (১।১৬৪।৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ, যদিও গায়ত্রীর-বৈদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই। হংসবতী ঋক্ (৪।৪০।৫) সূর্য্য-বিষয়িণী কি না সন্দেহ,

কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্ত্র রচয়িতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পূরাণ সমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পূরাণ উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়, কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পূরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিষিক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও বৈদিক।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্র রচয়িতা ঋষি, আর একজন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি—কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরা ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানাস্থানে উভয়ে কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত, পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিনিদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিশ্বাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিনিদ্বয় তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। কৃষ্ণ, পুরাণে ঐশী শক্তিসহ পুনরাবিভূ‍র্ত হইয়া নিজ গুরু সান্দিপনি সম্বন্ধে এই দৈব কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যে তিনি "দেবকী-পুত্র" এবং আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর নামক ঋষির শিষ্য।

ঋগ্বেদে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে অনার্য্য যোদ্ধা কৃষ্ণ। স্থান অংশুমতী নদীর তীর। "অংশুমতী" বোধ হয় কাবুল নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে

আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তাহার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে "আদেবী" অর্থাৎ দেবপূজা-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র—কৃষ্ণের যুদ্ধই পুরাণোক্ত ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল।

পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজার স্থলে কৃষ্ণপূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুইটিমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটী, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পূজা উপলক্ষে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য্য উপকরণ আছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য্য নেতা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। জয় অবশ্য কৃষ্ণ পক্ষেই হইল। যে সময়ে বিষ্ণু অন্য বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন তখন ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে সেই গল্প আছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ কোথায় ?

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করা তত কষ্টসাধ্য নয়, যতদূর অনুসন্ধান করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাই আমরা উত্তর স্বরূপে প্রকাশ করিলাম। আমাদিগকে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ "দেবকী নন্দন কৃষ্ণের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; তিনি ঘোর অঙ্গিরস ঋষির নিকট পুরুষ যজ্ঞ শিক্ষা করিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ বোধ হয় এই। পরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রন্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ যুদ্ধ "কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ" নামে

অভিহিত, সেই সকল স্থলে পাণ্ডবদের কোন উল্লেখ নাই এবং পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই; মহাভারত, একখানা কাব্য গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা যে স্তরে স্তরে রচিত এবং ক্রমবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা এখনকার প্রমাণে সুন্দরভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কারণ, মহাভারতের তিন-চারি প্রকার version আছে,—সম্পূর্ণ ঐক্য কাহারও সহিত কাহারও নাই। এবং আধুনিক ঐতিহাসিক মতে মহাভারতও অনেক বিষয়েই কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত; "পুনশ্চ, গৌড়ীয় যুগে গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়, গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল; এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, সেই মহাভারতখানি এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়"।

ভারত-সংহিতা।

মহাভারত গ্রন্থের প্রথম স্তরের নাম ছিল "ভারত-সংহিতা," এবং তাহাতে দশ সহস্র শ্লোক ছিল, সেই দশ সহস্র শ্লোকে পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকার কোন প্রমাণ নাই। কুরু ও পাঞ্চালদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং পাঞ্চালেরা জয়লভে করেন; কিন্তু "ভারত-সংহিতা" রচয়িতার সহানুভূতি কুরুদের সহিত ছিল, সম্ভবতঃ কোন বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পঞ্চপাণ্ডব ও তাহাদের পত্নী দ্রৌপদীর কল্পনা করেন এবং তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া কৃষ্ণভক্তির জয় ঘোষণা করেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যে সম্পূর্ণরূপেই কবির কল্পনার ফল, তাহা, তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহারা যে কল্পিত তাহা কবি গোপন করিতে চেষ্টাই করেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে গীতার ন্যায় একটী

সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং আলোচনা হওয়া অসম্ভব। এই সকল কারণে আমি বিশ্বাস করি না যে গীতার শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ।

অপিচ, অনুগীতায় (মহাভারতে) দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তে অর্জ্জুন পুনরায় যুদ্ধকালীন প্রদত্ত উপদেশ শুনিতে চাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সেই যোগের অবস্থা এখন আর আমার স্মরণ নাই, সুতরাং সেই অবস্থার প্রদত্ত উপদেশ এখন আর দিতে পারি না"—ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগভ্রষ্ট হন নাই, কিন্তু আবার অনুগীতায় (মহাভারতে) তিনি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন ; ফল কথা অসীমের গুণরাজি বা ঐশিক সত্বের পূর্ণ বিকাশ কৃষ্ণ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা খণ্ড শক্তিতেই করিয়াছেন, কারণ তিনি পূর্ণ ছিলেন না, এ বিষয় যদি কাহারও প্রমাণে সন্দেহ জন্মে তিনি যেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কৃত "Krishna and the Gita" নামক পুস্তক পাঠ করেন। এস্থলে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে গীতায় ঈশ্বরবাদ, অবতারতত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা আধুনিক, ভারতভূমে সুসমাচার প্রচারিত হইবার পর*

---

* Gita and Gospel গ্রন্থের লেখক Neil Alexander মহোদয় বলেন Dr. Lorinser's attempt (Die Bhagavadgita, ubersetzt und Erläutert von Dr. F. Lorinser 1869) to prove that the author of the Gita borrowed many ideas from the Bible must be pronounced a failure . C. f. Garbe 19, 83-85 ; Max Muller Natural Religion, 97-100 Hopkins R, I , 429.

পুনশ্চ Julius Richter, D. D. মহোদয় তাঁহার কৃত A History of Missions in India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের The First Missionaries from Rome নামক নিবন্ধের ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন "This is clearly an echo of Christian teachimg, which had somehow come to the knowledge of the sacred singer. Dr. Lorinser, a German Orientalist, claims to be able to point out in the Bhagavadgita one of the most beautiful and profound sections of the same Mahabharata more than a hundred passages which are reminiscent of the New Testament...........

গীতায় ঐ সকল বিষয় স্থান পাইয়াছে। যদি লোকে ঠিক ভাবে অবিমিশ্রতা সহকারে পর্য্যালোচনা করেন তাহা হইলে প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রমাণিত হইবে।

পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নিম্নে একটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি যদ্দ্বারা আমাদিগের এই উক্তি সমর্থন করে, যথা—"The Sadhu, A Study in mysticism and Pracitcal Religion" নামক গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—"Christianity is the fulfilment of Hinduism. Hinduism has been digging channels. Christ is the Water to flow through these channels. The Bhagavadgita is very much like St. John's Gospel, It is probable as one of my friends suggested that a Hindu took St John's thoughts and put them into Hindu form. The Bhagavadgita was composed in the second Century. A. D. and at that time there were Christians in India."……

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যে রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদি কৃষ্ণ জীবনের একাংশ রূপক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অপরাংশে ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারা যায় না; যদি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্য্য রূপকভাবে হিন্দুগণ গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব একেবারেই থাকে না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলেন তাহা হইলে তাহার জীবনের আপত্তি জনক অংশকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রাহ্য করিতেই হইবে। আর যদি তাহার জীবনের আপত্তি জনক অংশকে রূপক

বলিয়া তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাগুলিকে কল্পিত আখ্যায়িকা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া থাকা যায় না। এ বিষয় আমার নিজের সিদ্ধান্ত ঐরূপ কিন্তু হিন্দু ভ্রাতৃগণ আমাদিগকে কি উত্তর প্রদান করেন তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই হয়।

হিন্দুদিগের গবেষণা, বিচার, ও বুদ্ধিতীক্ষ্ম, সুতরাং সত্যের দিক হইতে একটা নিশ্চিত মীমাংসা হইবে এরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা প্রবল কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা রাসলীলা ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা ও পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন সত্য, আমি তাঁহাদেরই মতামত নিষ্কাষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে যে রস বাহির করিয়াছি তাহাই সাধারণ সমীপ প্রকাশ করিলাম, আশা করি যাঁহারা প্রকৃত সত্যান্বেষী তাঁহারা এই বিষয়টী বিচার করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার কি পূর্ণাবতার ?

শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার কি পূর্ণাবতার? এ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে তত গুরুতর নহে, এবং উহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতুক সত্যমূলক প্রমাণই যথার্থ এবং কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভাগবত গ্রন্থখানি হিন্দুরা শ্রদ্ধার নয়নে দেখেন, ঐ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "অংশাবতারের" পরিবর্তে কেন শ্রীকৃষ্ণকে "পূর্ণাবতার" বলিয়া উল্লেখ করেন তাহার কারণ দেন নাই ভাগবতের বরং শ্রীকৃষ্ণ যে "অংশাবতার" তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি এ স্থলে ভাগবত গ্রন্থের স্থলগুলি উল্লেখ করিয়া দেখাইয়া দিই যে শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার মাত্র।

(১) ভাগবত ১০ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ৯ শ্লোক, যোগমায়ার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :—

"হে শুভে, তৎপর আমি আংশিকভাবে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব এবং তুমি নন্দ পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মিবে"।

(২) ভাগবত ১০ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

"ভক্তের অভয়দাতা ভগবান বিশ্বাত্মা আনকদুন্দুভি (অর্থাৎ বসুদেবের) মনে আংশিক ভাবে প্রবেশ করিলেন"।

(৩) ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় ১৮ শ্লোক

"তৎপর দেবী দেবকী শূরসুত (অর্থাৎ শূরবংশীয় বসুদেব) কর্ত্তৃক অর্পিত জগতের মঙ্গলকর সর্ব্বাত্মক এবং নিজের আত্মস্বরূপ অচ্যুতাংশ মন দ্বারা, ধারণ করিলেন, যেমন পূর্ব্বদিক আমস্থকর চন্দ্রকে ধারণ করে"।

(৪) ভাগবত ১০।২।৪১।

"দেবকীর প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি—হে মাতঃ, আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ পরম পুরুষ আংশিক ভাবে তোমার গর্ভস্থ হইয়াছেন। ভোজপতি কংশের মৃত্যু আসন্ন, তাহাকে আর ভয় করিও না। তোমার পুত্র যদুগণের রক্ষক হইবে"।

(৫) ভাগবত, ১০।১০।৩৫।

(৬) „ ১০।২৬।২৩।

(৭) „ ১০।৩০।২৬।

আমি আরও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, প্রমাণ স্বরূপে যাহা দেখান হইল তাহাই যথেষ্ট। ঐ সকল স্থলের শ্লোকগুলি পাঠ করিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদিগকে বলিতে পারেন না যে "কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার"; বরং তাঁহাকে "অংশাবতার বলিয়াই ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন"। "অংশাবতার" এবং "পূর্ণাবতার" এই দুই শব্দের অর্থ এক নহে ইহা মনে রাখিলে অনেক সন্দেহজনক বিষয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ভাগবত যখন কৃষ্ণকে অংশাবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন আবার কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার হন কিরূপে? এবং বঙ্গবাসীই বা কোন হিসাবে ভাগবতের অংশাবতারের স্থলে পূর্ণাবতার বলেন? বঙ্গবাসীর এইরূপ একটা মন গড়া ব্যাখ্যা দেখিয়া তাহার নিকট পাঁচবার পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই এবং পাইব বলিয়া বিশ্বাস হয় না, তৎপর নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী এম, এ, মহোদয়কে বঙ্গবাসীর ব্যাখ্যার কথা জানাই, কিন্তু তিনিও নীরব রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মৃত বঙ্কিম বাবু তাহার স্বকৃত কৃষ্ণ চরিত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে অংশ অবতারের কথা একেবারে লোপ করিয়া দিয়া কি ভাল করিয়াছেন? তাহা বুঝা যায় না। তবে আমরা কিরূপে স্বীকার করিব যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-ঈশ্বর ও পূর্ণ মনুষ্য? এ উত্তরের ভার হিন্দু ভ্রাতাদিগের উপর অর্পণ করিলাম। "অপূর্ণ"।—অপূর্ণের পক্ষে 'পূর্ণ' কল্পনা অসম্ভব। অপূর্ণ কখন পূর্ণ কার্য্য করিতে পারে না, পূর্ণ বিষয় ভাবিতে পারে না, পূর্ণের কল্পনাও করিতে পারে না। অপূর্ণ যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভাবিবে, যাহা কিছু কল্পনা করিবে, তাহাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহার প্রমাণ পৃথিবীর কোন যুগে, কোন সাহিত্যে, কোন সমাজে একটীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ-চরিত্র মানব দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাচিন্তাশীল, মহা বিচক্ষণ কোন গ্রন্থকার এ পর্য্যন্ত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট-চরিত্রের ন্যায় অনিন্দসুন্দর পূর্ণ চরিত্র কোথা হইতে আসিল? ইহা কি তাঁহার জীবনচরিত লেখকদিগের লেখনী প্রসূত? এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূত চরিত্র কি তাঁহাদের কপোলকল্পিত? খ্রীষ্ট-চরিত্র লেখকদিগের ন্যায় অপূর্ণ মানবের কল্পনায় কি এমন পূর্ণ চরিত্রের উদ্ভব সম্ভব? কখনই নহে। খ্রীষ্ট স্বয়ং সিদ্ধ—স্বয়ং পূর্ণ! তিনি যে ঈশ-মানব ছিলেন। ঐশী-বিভূতি যে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অংশে পূর্ণভাবে

বিস্ফুরিত হইয়াছিল, তাঁহার চরিত্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, প্রভাত কুসুমের ন্যায় সুনির্ম্মল, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুবিমল ছিল। তিনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চরিত্র ছিলেন। অপূর্ণ মানব তাঁহাকে পূর্ণ করিতে পারে নাই;—পূর্ণ তিনি, অপূর্ণকে পূর্ণ করিতে তিনি আসিয়াছিলেন। অপূর্ণ যখন আকুল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, তখন সেই পূর্ণের জ্যোতিঃ-প্রবাহ তাহার অন্তরে প্রবাহিত হয়, অপূর্ণ তখন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। কেহ যে অপূর্ণ থাকে, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি অপূর্ণকে পূর্ণ করিতে চাহেন। তাই তিনি বলেন,— "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।"

* আমাদিগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ কেহই যীশু খ্রীষ্টকে অংশাবতার বলিয়া ব্যাখ্যা দেন নাই এবং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণে, ইতিহাসে, দর্শনের ব্যাখ্যায়, ও যীশুর নীজ কথায় পূর্ণ অবতারের একত্ব শক্তি, মাহাত্ম্য, ও প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। Incarnation of God (ঈশ-মনুষ্য) হইতেছে খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিমূল। এস্থলে সংক্ষেপে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের আভাস প্রদান করিয়া দেখাই যে খ্রীষ্ট ভক্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে কি মত বা ব্যাখ্যা জগতের ক্রোড়ে রাখিয়া গিয়াছেন—খ্রীষ্টের ঐশী প্রকৃতি "পিতার সমবস্তু," তাঁহার মানব প্রকিতি তাঁহার মাতা ধন্যা কুমারী মারিয়ার বস্তু হইতে প্রাপ্ত। এই দুই প্রকৃতি তাঁহার নরদেহ ধারণ কালে সংযুক্ত হইয়াছিল। নরদেহ ধারণের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট কেবল ঈশ্বর ছিলেন; কিন্তু দেহধারণে ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ই হইলেন; আর তাঁহার এই দুই প্রকৃতি "কি না ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্ব" "কখনও বিভক্ত হইবে না" বলিয়া, তিনি চিরকাল ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ই

---

* Dr Adolph Harnack তাঁহার History of Dogma গ্রন্থে ঠিক কথা বলিয়াছেন Now that first happened when the doctrine of Christ, as the pre-existent and personal Logos of God, had obtained acceptance everywhere in the confederated churches as the revealed and fundamental doctrine of faith............

থাকিবেন। এবং আমরা স্বীকার করি যে "তিনি এক, ইহা মাংসে ঈশ্বরত্বের বিকার হেতু নহে, কিন্তু ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের গ্রহণ হেতু। তিনি নিতান্ত এক, বস্তুর মিশ্রণে নহে, কিন্তু ব্যক্তির একত্বে"।

যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে সাধু যোহন সুসমাচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহারা যেন আচার্য্য J. S. Johnston কৃত The Philosophy of the fourth Gospel এবং আচার্য্য E. L. Strong, M. A. কৃত "Lectures on the Incarnation of God" এই দুইখানি গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন; গ্রন্থ যে খুব সংক্ষিপ্ত তাহা নহে, উহা সুলিখিত গভীর চিন্তাপূর্ণ এবং তাহাতে সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে।

"আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান্" এ বাক্যের অর্থ কি? এবং খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাতে কি বুঝিতেন?

এই বাক্যে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে খ্রীষ্ট অংশাবতার হইয়াছিলেন, পিতা (ঈশ্বর) পুত্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া মহান আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন; ইহাতে পদার্থ গত প্রভেদ না বুঝাইয়া বরং পদার্থের অভিন্নতাই বুঝায়। আবার কেহ কেহ ইহা যীশু খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতির বিষয়েই বুঝিয়াছিলেন। আবার কেহ বা বিবেচনা করিয়াছিলেন "মহান" শব্দটী বাক্যের বিষয়ে, তাঁহার (খ্রীষ্টের) অবতার হওয়ার বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার পদার্থ, স্বভাবাদি বিষয়ে নহে। কেননা পিতা আপনার মহিমা ত্যাগ করিয়া অবনত হন নাই, কিন্তু পুত্র অবতার হইয়া অবনত হইয়াছিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, পদার্থ, স্বরূপ, গুণাদি, সর্ব্ববিষয়ে পুত্র (যীশুখ্রীষ্ট) পিতার সমান ও সদৃশ; কিন্তু পিতা স্বয়ম্ভূ—অন্য কোন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হন নাই; পুত্র পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই জন্যই পিতা মহান। যোহন ৮; ৫৮। ১০; ৩০। ১৪; ২৮ পদ তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া

যাইবে যে, যীশুখ্রীষ্ট এই সুসমাচারের আদ্যোপান্ত একই অপরিবর্তনীয় উত্তম পুরুষ ব্যবহার করেন। "আমি"—অস্মদ-শব্দে প্রত্যেক স্থলে একই অর্থ বুঝাইবে; সুতরাং "আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান" কথায় এমন বুঝায় না যে, পদার্থ, বা ঈশ্বরত্ব বা শক্তি বা অস্তিত্বকাল বিষয়ে পিতা পুত্র অপেক্ষা মহান; কিন্তু পুত্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়াই মহান। আমাদিগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ব্যাখ্যান দিয়া গিয়াছেন ইহাতে কোন প্রকার অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই এবং ব্রহ্ম বীজের মধ্যে এই মূল শিক্ষা নিহিত আছে যথা—"সর্ব্ব যুগের পূর্ব্বে আপন পিতা হইতে জনিত, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর, দীপ্তি হইতে দীপ্তি, সত্য ঈশ্বর হইতে সত্য ঈশ্বর, জনিত, সৃষ্ট নহেন, পিতার সহিত একবস্তু, যাঁহা দ্বারা সকল সৃষ্ট"...ইত্যাদি; ঈশ্বরই অবতার রূপে আমাদের কাছে আইসেন। যদি ঈশ্বর-দর্শন করিতে আমরা চাই তাহা হইলে সত্য অবতার পুরুষের মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে এবং তাঁহাকে (খ্রীষ্টকে) পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না, এবং এ কথাও বলিতে পারা যায় যে ঈশ্বরকে মানুষ রূপ ব্যতীত চিন্তাই হয় না অবতার পুরুষেতেই (in the Son) ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। খ্রীষ্টের আগমনের নিমিত্ত ঐশ্বরিক আয়োজনের কথা বলিবার পর সাধু পৌল তাঁহার প্রকাশের এইরূপ প্রসঙ্গ করেনঃ—"কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেন"। যে গ্রীক ক্রিয়াপদ এই স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ১ যোহন ১; ২ পদেও পাওয়া যায় :---"যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি"। যখন যীশু জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন এমন ব্যক্তি মনুষ্যদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, যিনি পূর্ব্বে ছিলেন। পৌল এবং যোহন উভয়েই আমাদিগকে খ্রীষ্টের পূর্ব্বসত্তার প্রতি মনোযোগ করাইয়াছেন। যীশুর জন্ম গ্রহণ তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ ছিল না। বাইবেল আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ

হইয়া মানবজাতির পরিত্রাণে লাগিয়াছিলেন। যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য বা মহাপুরুষও নহেন, বরং ঈশ্বরের সনাতন পুত্র। (১)

অবতার তত্ত্বের আর এক পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না মানিলে পৌরাণিক অর্থে অবতার না হয় গ্রহণ করা যায়। বৈদান্তিক অর্থে জীব ব্রহ্মের অবতার, তাহাও স্বীকৃত। কিন্তু বৈদান্তিক ও পৌরাণিক মিলাইয়া যে অবতারের খিচুড়ী তাহা যুক্তি ও প্রমাণ করে না, ইতিহাসও স্বীকার করে না;—ফল তার অতি ভীষণ। বিকৃত অদ্বৈতবাদে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে—যাহার হস্ত হইতে দেশ এখনও নিষ্কৃতি পায় নাই—এই অবতারবাদ তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী অনিষ্ট করিতে সমর্থ। ইহা "গণ্ডোপরি পিণ্ডক" রূপে দেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, মানব সমাজকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—কৃষ্ণতত্ত্বের সার রাসলীলা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, যিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ("বিশেষ আধারে"?) অবতীর্ণ;

ভাগবত, ১০।৩২।২১ স কথং ধর্ম্ম সেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ পরদারাভিমর্ষণম্। তিনি পরদারাভিমর্ষণ করিলেন কেন? শুকদেব দুইটি যুক্তির দ্বারা এই পরদারাভিমর্ষণ সমর্থন করিলেন। একটি যুক্তি এই, তেজিয়ান ব্যক্তির কোন অপকর্ম্মে দোষ হয় না,—এই যুক্তির সঙ্গে এখানে খ্রীষ্টের The doctrine of the incarnation-এর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এক যুক্তিই যথেষ্ট। একা রামের রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসরের আর প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় যুক্তি পৌরাণিক ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের খিচুড়ী। "গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ

(১) পণ্ডিত হারনাকের—"No one could any longer be a God who was not also a Saviour—"এই মূল্যবান কথাটি অনেকে ঠিকমত বুঝিতে পারেন না বলিয়া যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে ভয় করেন ও নানাপ্রকার অসৎ তর্ক উত্থাপন করেন। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে উহা ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সর্ব্বেষামেব দেহীনাম্”। “যোঽন্তশ্চরিত সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়ানেনেহ দেহভাক”। *

একাদশ অধ্যায়।

গীতায় অবতারবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের সাক্ষ্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকের ধারণা যে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া ভারতবর্ষে পূজিত হন নাই, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যীশু খ্রীষ্টের অবতারত্বের অনুকরণেই শ্রীকৃষ্ণে অবতারত্বের আরোপ হইয়াছিল। যেহেতুক গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গৃহীত, অতএব তাঁহাদের মতে গীতাও যীশু খ্রীষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলার এই মতবাদ যে সত্য এবং বিশ্বাস-যোগ্য, তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? এবং প্রাচীন ইতিহাসের ধারা হইতে কি কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়—যদ্দ্বারা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে উক্ত দেশের পণ্ডিতদিগের প্রমাণ নির্ভুল ও বিশ্বাস যোগ্য? হাঁ—ইহার যুক্তিমূলক সদুত্তর আছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত্ত হইবে।

(১) পণ্ডিত প্রবর মণিয়র উইলিয়মস্—তাঁহার “Hinduism” নামক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠার টীকাতে এই কথা লিখিয়াছেন যথা—“মুর সাহেব তাঁহার Pantheon নামক গ্রন্থের ৪০২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, “কোন সময়ে একজন বিদ্বান পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতি আধুনিক বলিয়া একটি মাত্র অবতারের কথা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে; কিন্তু হিন্দুরা অতি প্রাচীন জাতি, আর সেই জন্যই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক-অবতারের কথা আছে। যদি পুরাণ অনুসন্ধান করা যায় তবে

* এ যুক্তিটির আবিষ্কর্ত্তা বিষ্ণু পুরাণাকার—
অন্তর্ভূষু তথা তাষু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ। ৫।১৩।৬।

দেখা যাইবে যে তন্মধ্যে খ্রীষ্টাবতারের কথাও আছে। পুনশ্চ, ঐ গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠার টীকাতে এই কথা পাওয়া যায়—"কৃষ্ণের জীবনবৃত্তের উপর খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যে কতদূর প্রভাব তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ জনগণ অনেক কথা বলিয়াছেন। ডাক্তার লরিনস্ বলেন যে ভগবদ্গীতায় অনেক ভাব নূতন নিয়ম (New Testament) গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। বোধ হয় উক্ত সুসমাচার গ্রন্থের অনুলিপি খ্রীষ্টীয় ১—৩ শতাব্দীতে ভারতে কোনরূপে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বিবেচনায় ভগবদ্গীতা গ্রন্থও ঐ সময়ে অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্ট এই দুই নামের মধ্যে যে পরস্পর কতকটা সাম্যভাব আছে তিনি সে বিষয়েরও বিচার করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মধ্যে, উল্লিখিত বিবরণটী মিথ্যাই হউক আর নাই হউক সত্যের গুঁড়া যে তন্মধ্যে আছেই লরিনস্ সাহেব এটি বিশেষরূপে মনে রাখিতে পারেন নাই। বাইবেল পুস্তক প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি প্রাচ্য গ্রন্থ। প্রাচ্য গ্রন্থের ধরণেই উহা লিখিত। উহার ভাব ও ভাব-প্রকাশের ধরণ সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্য। ঐ পুস্তকে সাহেব স্থানে স্থানে যে সকল তুলনা করিয়াছেন তাহার কতকগুলি কেবল ভাষার মিল (Coincidences) সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও বিবৃত করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলেও ডাক্তার লরেন্সের পক্ষে গুটিকতক কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার জর্ম্মণ অনুবাদ (১৮৬৯) মধ্যে অনেক টীকা টীপ্পুন্নি আছে এবং একার্থ-বোধক স্থল সমূহ অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে আছে, কতক কতক সেই সকল গ্রন্থের সেই সকল স্থানের ঠিকানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"ইণ্ডিয়া এণ্টিকোয়েরী গ্রন্থ দেখ (১৮৭৩ অক্টোবর)।

(২) মৃত H D. Mukerjee মহাশয়, তাঁহার কৃত "শ্রীকৃষ্ণ অবতার" নামক গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—"আমেরিকার ইয়েল কলেজের অধ্যাপক হপ্‌কিনস্ সাহেব বলেন গীতা মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ঐ গীতা আবার

খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় সজ্জিত। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যখন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অধিকার ও বিস্তার করে তখন মহাভারতের কৃষ্ণযোদ্ধাকে হিন্দুরা ভগবানের অবতার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আমি অনুমান করিয়া বলিতেছি না, ইহা অকাট্য সত্য ইতিহাস"।

(৩) Apostles of India নামক গ্রন্থে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় :—"So decided is the alteration and so direct is the connection between the latter Phase of Krishnaism and the Christianity, that it is no expression of extravagant fancy, but a sober historical fact, Hindus of this cult, have, though unwillingly, been worshipping the Christ Child for fully a thousand years."

(৪) অধ্যাপক হপকিন্‌স্ সাহেবের সাক্ষ্য ব্যতীত আরও সাক্ষ্য আছে। সহযোগী "হিন্দু রঞ্জিকায়" প্রকাশ, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল, এম, এ, মহোদয় রাজসাহীর একটি প্রকাশ্য সভায়, জর্ম্মাণ দেশের প্রফেসর ওয়েবারের মতানুসারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "যীশুর বাল্যলীলা অবলম্বনে ভারতীয় বালকৃষ্ণ উপাখ্যান রচিত হয়"।

(৫) স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার বলেন যে, "মধ্য এসিয়ার আভীরগণ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বালকৃষ্ণ উপাসনা ভারতে আনয়ন করেন"।

(৬) Father Biscay ১১শদ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং Robert de Nobili ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে অবতার তত্ত্ব আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পারমার্থিক বিদ্যালয় হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারত আসল বিষয়টী ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই কিন্তু পৌরাণিক যুগে দেখা যায় যে অবতারতত্ত্বটী বেশ পরিপক্ক অবস্থায় লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এস্থলে একটি কথা আপাততঃ বলিলে

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় তাঁহার কৃত "বেদ মাতা" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩—১৪ পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের "ব্রহ্মশব্দের" বা "নিত্যশব্দের" যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার সেই ব্যাখ্যার সহিত অর্থাৎ ঋগ্বেদের ১—১৬৪—৪১ শ্লোকের ভাবার্থ এবং যোহনের সুসমাচার ১; ১৪ পদ একই ভাবাপন্ন। ব্রহ্ম নিজ গুণে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে মানব তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু প্রকাশিত হওয়া, আত্ম প্রকাশ করা, ইহা ব্রহ্মের স্বভাব সিদ্ধ। তাঁহার প্রথম প্রকাশ শব্দরূপে, এই "নিত্যশব্দ" এমন একটি অপূর্ব্ব ভাবোদ্দীপক শব্দ যদ্দ্বারা লোকের মনে এক অখণ্ড প্রত্যয়ের বিষয়রূপে সহসা প্রকাশ পায় এবং বৈদিক "গৌরী" (বা শব্দ-ব্রহ্ম, বা "নিঃশব্দশব্দ) ই চতুর্থ সুসমাচারের "Logos" বা "বাক্য"। এই 'Logos' কথাটি অতি গভীর অর্থযুক্ত, ইহা স্বরূপে এক, কেবল প্রকাশে ভিন্ন, ইনি "অনাদি পুত্র"। ইহাই হইতেছে খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিমূল; ইহাই "Historical Certitude and the Certitude of faith," এবং ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় অবতারতত্ত্ব হইতে পুরাণ-রচকেরা গ্রহণ করিয়াছেন।

(৭) ঋগ্বেদে যে পুরুষ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রজাপতির দেহ ধারণ এবং আত্মোৎসর্গের বৃত্তান্ত যে খুব প্রাচীন তাহা মনে হয় না; উহা পৌরাণিক সময়ের রচনা এবং বেদে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকের ধারণা।

(৮) বৈষ্ণবগণ বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করেন না, প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক যুগেও এদেশে অবতার তত্ত্ব (১)

---

(১) "হিন্দু ধর্ম্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্ম্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"নজায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ, নায়ং কুতশ্চিন নব ভুব

ছিল না, যদি থাকিত, দার্শনিক পণ্ডিতগণ অবশ্যই তাহার একটা আলোচনা করিতেন। এদেশের অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে পৌরাণিক কালেই ভারতে সর্ব্ব প্রথমে অবতারবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে পৌরাণিক সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে অবতারবাদ আসিল তাহা নিতান্তই বিবেচনার কথা। যদি আমাদিগের ভারতবর্ষের মণ্ডলী স্থাপনের পুরাবৃত্তের অবস্থা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বলিব যে, প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস এবং সাধু বর্থলমিউ ভারতভূমে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম * প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঞ্জাব প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার এবং অনেক লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারাই এদেশে অবতারের কথা প্রথম আনিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্ট শিষ্যগণের প্রভাবেই এতদ্দেশীয় পুরাণ সমূহে তদবধি অবতারবাদ বদ্ধমূল হইয়াছে। (Rev. R. C. Biswas কৃত Early Church History. সপ্তম অধ্যায় এবং J. Richter কৃত History of Mission in India নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (The most comprehensive and scholary account of mission work in India written by a great authority. এবং V. S. Smith. কৃত Early History of India including, Alexander's Campaigns নামক গ্রন্থের Legend of St. Thomas নিবন্ধ দ্রষ্টব্য—২১৯—২২১)

(৯) যে সকল এদেশীয় পণ্ডিত এইরূপে ভগবান মানবরূপে শ্বেত দ্বীপে আসিয়াছেন জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাঁহারাই পুরাণাদি রচনা

কশ্চিৎ" অর্থাৎ "পরামাত্মা জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তুর মধ্যে তিনি কোন বস্তুই নহেন এবং তিনি কোন বস্তুও হয়েন না।" এই সমস্ত ভাব হিন্দু ধর্ম্মে রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে অত্যুক্তি স্থলে কোন দেবতা অথবা দেবাবতাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কোন স্থানে এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম মনুষ্য উদরে জন্মগ্রহণ ও মানব আকার ধারণ করিয়াছিলেন"। রাজ নারায়ণ বসু প্রণীত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নামক গ্রন্থের ২৩-২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* India and the Apostle Thomas—by A. E. Medly cott গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করিয়া এদেশেও শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়াছেন দেখাইয়া লোকদিগকে স্তোক দিয়াছেন। অতএব আমরা এস্থলে কিরূপে স্বীকার করিব যে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর প্রমাণ অমূলক? পণ্ডিত Charles. J, Stone কৃত "Christianity Before Christ, or Prototypes of our faith and culture" নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সুযুক্তি পূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

গীতা কি আধুনিক গ্রন্থ?

গীতা কি আধুনিক গ্রন্থ? এ প্রশ্ন যে জটিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতদিগের যে মত তাহাই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, আশাকরি পাঠক মাত্রেই বিচার করিয়া লইবেন।

বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রণ্য মৃত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রমাণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে পদ্মনাভ ঋষিই গীতা রচনা করিয়া মহাভারত কাব্যগ্রন্থে যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার এই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমার ধারণা, কারণ এই প্রমাণ যদি তাঁহার মিথ্যা বা ভ্রম প্রমাদ হইত, তাহা হইলে, বঙ্গের চতুর্দ্দিক হইতে ভূরি ভূরি তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হইত; সুখের বিষয় অদ্যাপি কেহ ইহার প্রতীবাদ করেন নাই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কৃত "Krishna & Gita" নামক গ্রন্থের বিরুদ্ধে অদ্যাপি কেহ লেখনী ধারণ করেন নাই, তিনি যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়। এতাবৎকাল সকল পণ্ডিতেই গীতা প্রক্ষীপ্ত, গীতা আধুনিক বলিয়া-গিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এই প্রকার অভ্রান্তমত এবং অবিসম্বাদী কথা বলেন নাই।

ইহার আর একটি প্রমাণ এই—"মৈথিলী মহামহোপাধ্যায় কাঞ্চ পদ্মনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন, তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক,

তিনি নিজ ব্যাকরণ (কলাপ) মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন ; সুতরাং বুঝা যায়, হর্ষবর্দ্ধনের জীবনাখ্য (হর্ষচরিত) প্রণেতা বাণভট্টের পরে পদ্মনাভ দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধন ৬৪৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় লেখক মাতনলীনের মতে খ্রীষ্টীয় ৬৪৮ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন ; সুতরাং বলিতে হইতেছে ভাগবতগীতা সপ্তম শতাব্দীর শেষে রচিত। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য এবং খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব গীতার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। আরও প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে গীতা আধুনিক গীতায় বহুল নূতন শব্দ পাওয়া যায়। ঐ সকল শব্দ পুরাণের পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না ; এমন কি গীতা কালীদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, প্রভৃতির ও পরসাময়িক। গীতাতে নিহিত শব্দ বিন্যাস ও অভিনব ভাব প্রকাশ -দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে বেদব্যাস মহাভারতে কৃষ্ণকে সারথি মিথ্যাবাদী, শঠ, ও প্রতারক সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাঁহাকে ভগবানের অবতার করিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ভারতে সারথি অথচ গীতায় কৃষ্ণ অবতার, ফলকথা "মন্দারমালার" সম্পাদকের লিখিত কথাগুলি অতীব সত্য, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্রে ঘোড়া ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে শ্রীকৃষ্ণ নীতি শিক্ষা দেন নাই।" "গীতার দোষগুণের ভাগী গোপালনন্দ পদ্মনাভ ঋষি।" গীতার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন মত দেখা যায় এবং কোন্ কালটী যে সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। প্রোঃ গার্বের সহিত ৺তৈলঙ্গের মত মিলে না। আবার জাবা দ্বীপে—যে মহাভারত এখান হইতে যায় তদন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এক গীতা প্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রায় একশো সওয়া-শো শ্লোক অক্ষরশঃ পাওয়া যায়। কেবল ১২, ১৫, ১৬ ও ১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাঁহাতে নাই। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক কৃতগীতারহস্য—(অনুবাদক শ্রীজ্যোতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আমাদিগের এই স্তবকের কথাই যে অকাট্য হইবে

তাহার কোন অর্থ নাই, পাঠক যে এই প্রমাণে সন্তুষ্ট থাকিবেন তাহা বলিতে প্রস্তুত নহি, এখন নূতন নূতন অনেক তথ্য, প্রমাণ, প্রকাশ পাইতেছে ও ভবিষ্যতে পাইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে এস্থলে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইল তাহা যেন কোন পাঠক লঘু জ্ঞান না করেন। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ধৈর্য্যশীল পাঠকের পক্ষে সম্ভবপর হইবে ও সত্য বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করিবে ও বিরোধ মিটিয়া যাইবে।

ব্যাস গীতা রচনা করেন নাই।

"বেদান্ত গ্রন্থের" লেখক রাজা রামমোহন রায়; ঐ গ্রন্থের ভূমিকা পৃষ্ঠে দেখা যায় যে "পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে সূত্রযুগের কাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ সাল হইতে ২০০ সাল পর্য্যন্ত। ইহাদের মতে পাণিনির সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ। পাণিনি তদীয় সূত্রে (৪ । ৩ । ১১০ ।) পারাশর্য্য অর্থাৎ পরাশরতনয় প্রণীত "ভিক্ষুসূত্রের" উল্লেখ করিয়াছেন। এই পারাশর্য্য যদি পরাশরতনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস হন এবং পাণিনির উল্লিখিত "ভিক্ষুসূত্র" বর্ত্তমান "বেদান্তসূত্র" হয়, তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে মাত্র, বিকাশ ও বিস্তার হয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের খণ্ডন আছে। ইহাতে সন্দেহ হয় বর্ত্তমান সূত্রগ্রন্থ সেই সময়ের "ভিক্ষুসূত্র,' কি না। এমন হইতে পারে যে এই গ্রন্থের উৎপত্তি তখনই হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে নূতন সূত্র রচিত ও ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে।

"ভগবদগীতা" রচনার আনুমানিক সময় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র যুগের প্রথমাংশ। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র যুগের আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ সাল হইতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দী ৫০০ সাল পর্য্যন্ত বলিয়া 'একটা ধারণা—তবে গীতা রচনার কাল ইহার মধ্যে গণ্য নহে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে— "ব্রহ্মসূত্র—পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" ১৩।৪। ইহাতে প্রমাণ হয়

যে, ব্রহ্মসূত্র অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণ বলেন সূত্র যে যে স্থলে স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণে মৃত্যুর ফলভেদ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া স্পষ্টরূপে গীতাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন. সুতরাং গীতা সূত্রের পূর্ব্ব-বর্ত্তিনী কিন্তু এই নির্দ্দেশ নিঃসন্দিগ্ধ নহে—ইহাতে প্রমাণ হয় না যে ব্যাস গীতা রচনা করিয়াছেন। পুনশ্চ,গীতা ব্যতীত তখন অন্য স্মৃতিও ছিল, এবং উক্তফলভেদ অন্য স্মৃতিতে উল্লিখিত থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক ভগবদগীতার সহিত ব্রহ্মসূত্রেব ঘনিষ্ঠ যোগ নিঃসন্দিগ্ধ।"

ইহার আর এক প্রমাণ এই, বেদান্ত সূত্রের রচয়িতা কে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এবং গ্রন্থের ভিতর তাঁহার কোন পরিচয় নাই। অন্যান্য প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যের নামের সঙ্গে এই গ্রন্থে বাদরায়ণের উল্লেখ দেখা যায় মাত্র, কিন্তু তিনি যে সূত্র রচয়িতা তাহা কুত্রাপি বলা হয় নাই এবং প্রমাণও নাই; বরঞ্চ এই উল্লেখ চলিত মতের অসাক্ষাৎ প্রতিবাদ, কোন গ্রন্থ রচয়িতা এই ভাবে নিজের উল্লেখ করেন না। যদি বাদরায়ণই সূত্র রচয়িতা হন, তিনি যে বেদব্যাস বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বেদব্যাস বলিয়া যে বিশেষ কোন ব্যক্তি ছিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে বেদব্যাস গীতা রচনা করেন নাই। পুনশ্চ, বেদবিভাগ অতি বৃহৎ কার্য্য, ইহাতে নিশ্চয়ই অনেক পণ্ডিত হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন; বেদান্তসূত্রে যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ আছে সেই সকল মত যে এত প্রাচীনকালে উদিত হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর নহে। জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবতপঞ্চরাত্র, প্রভৃতি মত নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বৈদিক যুগের অনেক পরবর্ত্তী। সুতরাং সেই বেদ বিভাগ সময়ের কোনও ব্যক্তি বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, ভগবদ্গীতা সম্বন্ধেও এই প্রমাণ খাটে। এই সকল হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থের গৌরবার্থেই এই সমুদায়কে বেদব্যাসের নামের সহিত সংযুক্ত করা হয় মাত্র, কিন্তু লেখকরূপে

প্রমাণ নির্ণীত হয় নাই। অপিচ, ইহাও স্বীকার্য্য যে কোনও গ্রন্থের প্রকৃত গৌরব ইহার আভ্যন্তরীণ বিষয়-সম্ভূত কল্পিত রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়া ইহার (ব্যাসের) গৌরব বৃদ্ধি করার চেষ্টা অনর্থক; শঙ্করের ভাষ্যের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে ইহাতে কেবল অসম্প্রদায়িক ব্রহ্মবাদই সমর্থিত হইয়াছে। শৈব, বৈষ্ণব, প্রভৃতি কোনও সাম্প্রদায়িক দেববাদ সমর্থিত হয় নাই। শঙ্করের ভাষ্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে রচিত"।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হিন্দু দর্শনে মুক্তিতত্ত্ব কোথায় ?

আর্য্য ঋষিগণ আগতিক ব্যাপার হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনও হীন, তুচ্ছ, সংকীর্ণ স্বার্থ প্রাপ্তি নহে, মানব জীবনের চরম কল্যাণ, আত্মার পরম শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় তাঁহারা দর্শনকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া যে তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী পরম পুরুষার্থে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন ইহাও কম নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝিতেন। হিন্দুদিগের মুখ্য ষড়্‌দর্শন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা প্রকৃত পক্ষে তিনটী পর্য্যায়ে বিভক্ত:—

প্রথম:—মীমাংসা। দ্বিতীয়:—ন্যায় বৈশেষিক। তৃতীয়:—সাংখ্য যোগ। মীমাংসা দর্শন পূর্ব্ব এবং উত্তর অথবা কর্ম্ম মীমাংসা, এবং তত্ত্ব-মীমাংসা এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মমীমাংসায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাওয়া যায় না। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য কি প্রকারে যাগযজ্ঞ করিতে হয় তাহারই উপদেশ জৈমিনির ধর্ম্ম মীমাংসা বা কর্ম্ম মীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনির মতে কর্ম্মই ফল প্রদানে সমর্থ। ইহার জন্য ঈশ্বরের

অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। এই পূর্ব্ব মীমাংসা ভিন্ন সকল দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্য মোক্ষ, মুক্তি বা অপবর্গ।

ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মুক্তি, এই মুক্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য মুক্তিকে নির্ব্বাণ বা কৈবল্য বলা যায়। নির্ব্বাণ বা কৈবল্য শব্দের মোটামুটি অর্থ এই—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি অর্থাৎ জীবের যে অবস্থায় সকল প্রকারে দুঃখ নিবৃত্তি হয় অথচ ভবিষ্যতে আর কখনও তাহার কোন প্রকার দুঃখ হইবার সম্ভাবনাও থাকে না; সেই অবস্থাই জীবের কৈবল্য বা নির্ব্বাণ। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, প্রভৃতি নাস্তিক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতবাদী পর্য্যন্ত সকল নাস্তিক দার্শনিকগণ নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের এইরূপ বিবৃতি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ইহাই হইল উক্ত শব্দ দুইটির সাধারণ ব্যাখ্যা। এ স্থলে খ্রীষ্টীয় দর্শন আসিয়া যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে তোমাদের উহাই যদি সর্ব্বসম্মত ব্যাখ্যা হয় অর্থাৎ এই প্রকারে মুক্তি হইলে জীবের (মনুষ্যের) অহংভাব থাকে কি না? তাহার সুখানুভব হয় কি না? শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত তাহার এখনকার ন্যায় সম্বন্ধ থাকে কি না? ইত্যাদি, বিষয় লইয়া আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না কি?

চার্ব্বাক ও বৌদ্ধদার্শনিকগণের মত।

এই মতে মোক্ষাবস্থায় জীবের অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং দুঃখভোগ করিবার সম্ভাবনারও নিবৃত্তি হয়; তাহার মধ্যে বিশেষ হইতেছে এই যে, চার্ব্বাক মতে এই দেহের বিধ্বংস হইলেই মুক্তি হয়; কারণ এই ভৌতিক দেহ হইতে পৃথক আত্মা নাই; সুতরাং দেহ পাতের সঙ্গে সঙ্গেই সকল ভবযন্ত্রণা মিটিয়া যায়।

তাঁহারা বলেন যথা—"আত্মাস্তি দেহ 'ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তি-র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম। আশেয় মাকাশতরো প্রসূনাৎ প্রথীয়সঃ স্বাদু ফলাভিসন্ধৌ"। অর্থাৎ—দেহ হইতে যাহার স্বরূপ পৃথক, এইরূপ এক

আত্মা এই দেহে আছে, আর সেই আত্মা লোকান্তরে যাইয়া এই লোকে কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিবে এই প্রকার যে আশা, তাহা আকাশতরুর পুষ্প হইতে স্বাদু ফল হইবে এবং সেই ফল আস্বাদন করা যাইবে, এই প্রকার আশার ন্যায় অর্থাৎ এই প্রকার কল্পনা ভিত্তিহীন। চার্ব্বাকদল সেইজন্য বলিয়া থাকেন—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ; ভস্মীভূত দেহস্য পুনরাগমণং কুতঃ"—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাক সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, প্রয়োজন বোধ করিলে ঋণ করিয়াও ঘৃত ক্রয় করিয়া খাইবে; এই দেহ একবার পুড়িয়া ছাই হইলে আর কি কখন ফিরিয়া আসিবে? কখনই নহে। যে কোন প্রকারে পার, ভোগের সাধন সংগ্রহ করিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাল কাটাও; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবিয়া এ সংসারের সুখে বঞ্চিত হইও না; ইহাই হইল চার্ব্বাক দার্শনিকগণের মত বা শিক্ষা। খ্রীষ্টীয় দর্শনের মধ্যে চার্ব্বাকের কোন স্থান নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বলিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জন মানব এই মতানুসারে যে চলিয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। চার্ব্বাকদর্শনের আর একটি নাম "লোকায়তিকদর্শন", লোক সমূহ যাহা আয়ত অর্থাৎ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রচলিত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এই দর্শন রচিত হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম "লোকায়তিক"।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মত।

এই মতে—দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকল বস্তুই ক্ষণিক, ইহারা যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তীক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহাদের বিনাশের জন্য পৃথক কোন সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। এই বিনশ্বর দেহাদির উপর স্থিরতা জ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের নিদান এবং সেই স্থিরতা জ্ঞানরূপে ভ্রান্তি হইতেই ইহাদের উপর আমাদের আত্মত্ব—ভ্রান্তি হয়। আত্মা, এই বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন স্থির বস্তু এ জগতে নাই; ধ্যান

সমাধি প্রবাহে এই স্থিরাত্মত্ব জ্ঞান যখন একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, সকল অস্থির বস্তুকেই ক্ষণিক ও মায়িক বলিয়া দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিব তখনই আমাদিগের সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। আত্মা বলিয়া একটা মায়িক বস্তু কল্পনার বা ভ্রান্তির সাহায্যে সৃষ্ট করিয়া আমরা এই ভবযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছি। ভ্রান্তিমূলক অনর্থের নিবারণ করিতে হইলে সেই ভ্রান্তিরই উচ্ছেদ করা প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞানই ভ্রান্তির উচ্ছেদক হইয়া থাকে, সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ-যোগের সাধনা করিতে হয়। যোগ সাধনায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান বা সকল বস্তুতে ক্ষণিকত্ব জ্ঞান আপনা আপনি উদিত হইয়া থাকে, ইহার জন্য যজ্ঞ, তপস্যা বা তীর্থ পর্য্যটনাদির কোন আবশ্যকতা নাই,—ইহাই হইল মোটামুটি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মত। বৌদ্ধদর্শনে যে নির্ব্বাণের আদর্শ আছে তাহাও এই মোক্ষেরই নামান্তর বলিয়া আমি মনে করি। অনাদি বাসনা সন্তান নিবৃত্ত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়। "রাগাদিজ্ঞান সন্তান বাসনাচ্ছেদ সম্ভবা চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেস প্রকীর্ত্তিতাঃ।" সর্ব্বদর্শন।

আর্হত দর্শনেও মোক্ষমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সকল প্রকার কর্ম্ম নিঃশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; কর্ম্ম হইতেই যাবতীয় ক্লেশ, কর্ম্ম হইতেই সংসার; জন্মমৃত্যু ক্লেশের নামান্তর। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইলে আত্মা ঘৃতাভিবর্দ্ধিত হোমানল শিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করে। খ্রীষ্টীয় দর্শনের শিক্ষা ইহার বিপরীত, পাপের নাশ হইলেই দুঃখের নাশ হয়। স্বর্গে পাপ নাই—তাই আনন্দ; জগতে পাপ তাই দুঃখ; পৃথিবীতে পাপ ও পবিত্রতা উভয়ই থাকাতে দুঃখ ও আনন্দ উভয়েই বর্ত্তমান।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক।

এক্ষণে দেখা যাউক, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক নামে প্রসিদ্ধ আস্তিক দার্শনিকগণের মতানুসারে নির্ব্বাণ বা কৈবল্যের পরে আত্মার কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ বলেন—আত্মা অজর ও অমর, ইহা

আকাশের ন্যায় নিরবয়ব এবং বিভু। সকল পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত যাহা মিলিত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে তাহাকেই বিভু বলা যায়। আত্মা এই কারণে নিষ্ক্রিয়, যে বস্তুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না কারণ ক্রিয়া হইলেই সেই ক্রিয়াশ্রয় বস্তু বিচালিত বা পূর্ব্বস্থান ভ্রষ্ট হয়; যাহা সর্ব্বদা একভাবে সকল স্থান ব্যাপীয়া থাকে, তাহা হইতে ক্রিয়া কিরূপে হইতে পারে? সেই বিভু বা ব্যাপক আত্মার গুণ হইতেছে জ্ঞান। জ্ঞান ও চেতনা একই বস্তু, এই চেতনা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া তাহা চেতন; চেতন আত্মার আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যথা—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ও সংস্কার বা বাসনা; এই সকল গুণ আত্মাতে সর্ব্বদাই যে থাকে তাহা নহে—বিশেষ বিশেষ কারণের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে এই গুণগুলি যথা সম্ভব আত্মাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন আকাশের গুণ শব্দ, অথচ শব্দ সকল সময় আকাশে থাকে না; দুই হাতে তালি দিলে আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ গুণ সকল সময়ে আত্মাতে যে হইবে তাহা নহে; আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি তখন আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা প্রভৃতি কোন গুণ থাকে না কিন্তু জাগরণ বা স্বপ্নকালে মনের সহিত সংযোগ-বিশেষরূপ কারণ ঘটিলে আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই সংযোগ-বিশেষ নিদ্রার সময় হয় না বলিয়া সে সময় আমাদের জ্ঞানও হইতে পারে না।

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে যে অহন্তা জ্ঞান ও মমতাজ্ঞান, তাহাই আমাদের সকল প্রকার দুঃখের কারণ, সুতরাং এই অহংজ্ঞান ও তন্মূলক মমতাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ হইতে পারে। আত্মা দেহ নহে, আত্মা ইন্দ্রিয়াদিরূপ জড় বস্তু নহে, এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানই সেই দেহাদিতে অহন্তাজ্ঞান ও তন্মূলক মমতাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ আমিই দেহ বা আমার দেহ প্রভৃতি এইরূপ ভ্রান্তি আর হয় না। মিথ্যাজ্ঞান এই ভাবে নিবৃত্তি হইলে দোষ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান মূলক রাগ ও দ্বেষ

নিবৃত্ত হয়। দোষ নিবৃত্ত হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তিও অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নিবৃত্ত হয়। সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে আর জন্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই ভাবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ক্রমে সকল দুঃখের নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক অনুৎপত্তিই আত্মার মোক্ষ বা নির্ব্বাণ।

তাই ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—"দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যা—"জ্ঞানানাং উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা পায়াদ পবর্গ," সুতরাং ন্যায়দর্শনানুসারে ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে যে, মোক্ষদশায় শব্দহীন আকাশের ন্যায় আত্মা একেবারে জ্ঞান হইয়া থাকে, সে অবস্থায় তাহাতে সুখ বা দুঃখ হয় না, এই মোক্ষাবস্থায় সংজ্ঞাহীন প্রস্তরাদির ন্যায় আত্মাও চেতনাহীন হইয়া থাকে, তাহার অনাদিকালের সঙ্গী অহংভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, এক কথায় অহন্তা বা জীবভাবের আত্যন্তিক অস্ফুরণই আত্মার নির্ব্বাণ বা কৈবল্য, ইহাই হইল ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষের স্বরূপ। ন্যায় মতে—অথ শাস্ত্রস্য পরমং প্রয়োজনমপবর্গঃ—মোক্ষই পরম প্রয়োজন।" কণাদ বলেন—"যতোঽভ্যুদয়-নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ"—ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলেন—"নিঃ শ্রেয়স্মাত্যান্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি"। বিবৃতিকার বলেন—"নিঃ শ্রেয়সং মোক্ষঃ।"

সাংখ্য ও যোগ।

সাংখ্য বলেন—"প্রাপ্তে শরীর ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ ঐকান্তিক মাত্যন্তিক মুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি"। (কৈবল্য অর্থে মোক্ষ। "মোক্ষই পুরুষার্থ)।

"পুরুষার্থো মোক্ষস্তদর্থং জ্ঞানমিদং গুহং রহস্যং শ্রীকপিলর্ষিণা সমাখ্যাতং"। (গৌড়পদ ভাষ্য)।

যোগ দর্শনের লক্ষ্যও মোক্ষ বা কৈবল্য। অভ্যাসের দ্বারা দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ ধন রত্ন স্ত্রী পরিজন এবং স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তি

পুরুষদর্শন অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান প্রসাদে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-শূন্য গুণের প্রলয় হইয়া আত্মা কেবলমাত্র চিৎশক্তিকে নিয়ত অধিষ্ঠান করে।

"পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যং"—স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি" (যোগসূত্র কৈবল্য পাদ) তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের নিকট পার্থিব কোনও সুখই দাঁড়াইতে পারে না"। "যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্"—"তৃষ্ণাক্ষয় সুখ স্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্"—তৃষ্ণাক্ষয় জনিত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিলে, লোক জীবন্মুক্ত হইতে পারে"। শ্রুতিও বলেন—"জীবন্নেব বিদ্বান মুক্তো ভবতি"। উভয় মতে মোক্ষদশায় আত্মা কি ভাবে অবস্থান করে এইবার তাহাই দেখা যাউক। সাংখ্য ও যোগদর্শনে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সেই আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক অথচ বহু; প্রত্যেক দেহের সহিত এক একটি আত্মার সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া দেহের মধ্যে অবস্থিত বুদ্ধিতত্ত্ব নামক প্রাকৃত বস্তুতে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখাদির সহিত আত্মার এক প্রকার ঔপাধিক সম্বন্ধ হয় এবং সেইজন্যই আত্মা সুখ দুঃখাদি রহিত হইলেও সুখী ও দুঃখী; এই প্রকার বোধের বিষয়ীভূত হয়। এই প্রকারে সুখ দুঃখের ভোগ আত্মাতে হয় বলিয়া তাহা সংসারী হইয়া পড়ে; নিঃসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সহিত প্রকৃতি কার্য্য জড়বস্তুর এইরূপ সম্বন্ধই আমাদের যাবতীয় অনর্থের হেতু। এই সম্বন্ধের কারণ হইতেছে জড় ও চেতনের অবিবেক। সেই অবিবেক পরস্পরের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানে বা বিবেকখ্যাতি দ্বারা বিনাশিত হইলেই আত্মা মুক্ত হইয়া থাকে; এই মুক্তদশায় আত্মা কেবল জ্ঞান বা প্রকাশরূপেই অবস্থিতি করে। তখন—অহংজ্ঞান থাকে না এবং আমি সুখী বা দুঃখী এই প্রকার কোন জ্ঞানই থাকে না, এই মুক্তির সময় আত্মার স্বপ্রকাশময় অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন ধর্ম্ম থাকে না; ইহাই হইল সাংখ্য ও যোগমতে নির্ব্বাণ স্বরূপ।

অদ্বৈতবাদীগণের শিক্ষা বা মত কি ?

শাঙ্কর মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদীগণের মতে মোক্ষ লাভের স্বরূপ কি ? এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব। এই মতে আত্মা জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, আত্মাই একমাত্র সদ্বস্তু, আত্মা ব্যতিরেকে আর যাহা কিছু সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক সৎ নহে; শুক্তির সত্ত্বা যেমন তাহাতে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতে প্রতীত হয়, সেই স্থলে দৃশ্যমান রজত বাস্তব নহে, শুক্তিই সৎ বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই-রূপ এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ বাস্তবিক সৎ না হইলেও ইহার অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম বা আত্মা, তাহার সত্তাই ইহার উপর আরোপিত হইয়া থাকে।

অপিচ শুক্তিতে অজ্ঞানবশতঃ রজতের সাক্ষাৎকারস্থলে যেমন শুক্তির স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে ঐ আরোপিত বা কল্পিত রজত নিবৃত্ত হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের নিরুপাধিক ভাবে সাক্ষাৎকার হইলে তাহার উপর আরোপিত এই সমস্ত প্রপঞ্চই নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার প্রপঞ্চ নিবৃত্তি হইলেই আত্মা মুক্তি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে আত্মা কোন সময়েই বদ্ধ হয় না, তাহা সর্ব্বদাই মুক্ত; কেবল অনাদি অজ্ঞান বা অবিদ্যা বশতঃ তাহার উপর এই প্রাপঞ্চিক দুঃখ শোকাদি আরোপিত হইয়াছে মাত্র। এই আরোপিত সাংসারিক ভাব, সুতরাং তাহার বাস্তব নহে; উহা আধ্যাসিক বা কল্পিত। এই কল্পিত সংসারই তাহার বন্ধন, এই বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় তাহার প্রকৃত স্বরূপে সাক্ষাৎ অনুভূতি। সেই অনুভূতির উপায় শ্রবণ, মনন ও ধ্যান; দীর্ঘকাল বিরক্তির সহিত এই আত্মাস্বরূপের শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান করিতে করিতে জীব স্বীয় ব্রহ্মরূপতা বা অখণ্ডচিদানন্দস্বরূপতা সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়; এবং সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সকল প্রকার কল্পিত অনর্থের নিবৃত্তি হয়; ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ অদ্বৈতবাদী বেদান্তিকগণের মতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণের স্বরূপ।

মুক্তি সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা কি ?

মুক্তি সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা পরস্পর অতিশয় বিরুদ্ধ। এই বিষয়ে সূত্রকারের মত স্থির করা অতীব কঠিন। মুক্তির অবস্থায় জীব-ব্রহ্ম কোন ভেদ থাকে কি না ইহাই প্রশ্ন। প্রশ্নের উভয় মীমাংসা সূত্রকার পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌টী তাঁহার নিজ মত তাহা স্পষ্টরূপে বলেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যাহাকে মুক্তি বলিয়াছেন সেই অবস্থায় জীব-ব্রহ্মে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট ভেদ আছে। মুক্তি প্রকরণে তিনি এই অবস্থা অপেক্ষা কোনও উচ্চতর অবস্থার কথা বলেন নাই, বরং রামানুজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রকার মুক্তি বিষয়েও ভেদাভেদবাদী। রাজা রামমোহন রায় সাধারণভাবে শঙ্করের অনুসরণ করিয়া থাকিলেও নানা স্থানে শাঙ্করভাষ্য হইতে পৃথক ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ মুক্তি প্রকরণের ব্যাখ্যায় তিনি শাঙ্কর ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকেও ভেদাভেদবাদী বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণও মুক্তি বিষয়ে ঐ মতাবলম্বী; কিন্তু শঙ্কর বলেন ভেদাভেদের অবস্থা "আপেক্ষিকী মুক্তি" মাত্র, ইহার উপরে "পরামুক্তি", যে অবস্থায় জীব ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকে না, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে জীব থাকেই না; ব্রহ্মই থাকেন। কিন্তু "আপেক্ষিকী মুক্তি" ও "পরামুক্তির" ভেদ শঙ্করের, সূত্রকারের নহে। বৃহদারণ্যক, পঞ্চমাধ্যায়, দশম ব্রাহ্মণ, প্রথম শ্রুতি সাধকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথা বলিয়া এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন, "তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ"—অর্থাৎ "তথায় চিরকাল বাস করে"। একান্ত নির্ব্বাণের অপেক্ষা থাকিলে শ্রুতি এই কথা বলিতেন না। কিন্তু শঙ্কর এই বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন- "ব্রহ্মণো বহূন্ কল্পান্ বসতীত্যেতৎ"—অর্থাৎ কিনা "ব্রহ্মার অনেক কল্প তথায় বাস করে"। এই মুক্তি ব্যাপার সম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যাদি একান্তই অতৃপ্তিকর। রামানুজ এই সকল স্থলে যে ব্যাখ্যা

দিয়াছেন তাহা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ও সন্তোষকর"। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কৃত অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামক পুস্তক; ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মীমাংসকগণের মত।

মীমাংসকগণের মতেও নির্ব্বাণ আত্মার আনন্দরূপতার নিরবধি স্ফুরণ হইতে থাকে। অবশ্য সকল মীমাংসকই আত্মাকে মুক্তদশায় আনন্দের অনুভবিতা বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু মুক্তাবস্থায় আত্মা যে দুঃখ অনুভব করে না, ইহা সকল মীমাংসকেরই স্বীকার্য্য, বিস্তার ভয়ে সেই সকল মতভেদ এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

ভারতীয় দর্শনে গৌণ মুক্তির অবস্থা কি?

এইবার একটু গৌণমুক্তির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে, গৌণমুক্তি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা:—

(১) "সালোক্য
(২) "সার্ষ্টি
(৩) "সাযুজ্য
(৪) "সারূপ্য"

জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন নহে, জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না, যাঁহারা এই প্রকার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতানুসারেই এই ভাবে গৌণমুক্তি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর যে লোকে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। বলা বাহুল্য এই সালোক্যরূপ মুক্তিদশায়ও জীবের কোন প্রকার জরা, মরণ, ব্যাধি ও শোকাদিজনিত সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভই সার্ষ্টি মুক্তি। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করাই সাযুজ্য মুক্তি; এবং তাঁহার ন্যায় আকারবান

হইয়া ঐশী শক্তিলাভ করার নাম সারূপ্য মুক্তি। বলা বাহুল্য, পরমেশ্বরকে যে সকল দার্শনিক সাকার ও নিয়ত লোক বিশেষে অবস্থিত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতানুসারে এই প্রকারে মুক্তির চারিটি বিভাগ বর্ণিত হইল; কিন্তু অদ্বৈতবাদী বেদান্তিকগণের মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্তরূপ গৌণ মুক্তিও অঙ্গীকার করিয়া থাকেন এই জীবন্মুক্ত, এই সাধনের দেহ থাকিতে থাকিতেই হইতে পারে, বৌদ্ধ দার্শনিকগণও এই জীবন্মুক্তি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ইহাও তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাক দশাতেই হইয়া থাকে। এই জীবন্মুক্তির স্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি গ্রন্থে নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

উপনিষদ্ বলিতেছে—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা-যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর হৃদয়ে সকল প্রকার কামনা যে সময় একেবারে নিবৃত্ত হয়, তখন সে মানুষ হইলেও অমৃত হয় এবং এই দেহই সেই আনন্দ চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপের আস্বাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর কৃষ্ণ কৃত সাংখ্যকারি।

ঈশ্বর কৃষ্ণ কৃত সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে, যথা—"এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যা পরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ—বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্"—এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস বা ধ্যান করিতে করিতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রসাদে এক অখণ্ডাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সেই দেহে অহন্তা বা মমতার প্রকাশ হয় না এবং আত্মার যে অহমাকার তাহাও তখন প্রকাশ পায় না।

মুক্তিতত্ত্বে গীতার শিক্ষা কি?

গীতাতে জীবন্মুক্তকে গুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সুখ, দুঃখ ও মোহময় সকল গুণকার্য্যেই

উপেক্ষা করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন; কোন গুণচেষ্টাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি ভাবিয়া থাকেন, গুণসকল গুণসমূহে ন্যূনাধিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে; তাহাতে আমার বিচলিত হইবার কারণ কিছুই নাই। সুখ ও দুঃখ তাহার সমক্ষে তুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। বহুমূল্য প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিম্বা সুবর্ণ সকলই তাঁহার তুল্যমূল্য বা হেয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না, তাঁহার মিত্র ও শত্রু সম হয়; ইহা আমার হউক বা উহা আমার হইবে, এই প্রকার ভাবিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না; তিনি সর্ব্বদা ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন থাকেন; এই প্রকার জীবন্মুক্তি মানব সাধনার যে পরম সিদ্ধি তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ হয় না কি? বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণও এই প্রকার জীবন্মুক্তিকে আর্হতাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল সংক্ষেপতঃ মুখ্য ও গৌণ মুক্তির পরিচয়। হিন্দুদর্শন ও শাস্ত্র উভয়েই—এই দ্বিবিধ মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ভারতীয় দর্শনই এই মুক্তির উপদেয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্য সর্ব্ব সময়ে সমুত্থিত। কিন্তু এগুলি দেখিয়া গুরুতর প্রশ্ন উঠে যে, এই মুক্তির সাধন কি? এবং তাহা লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে কেন? সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য বা সাক্ষাৎ সাধন—অথচ ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণের মতানুসারে সেই তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়। এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এইরূপ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মুক্তি বা মোক্ষকাম হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন্ দার্শনিকের কোন্ তত্ত্বজ্ঞানটী যে উপাদেয় তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন সমস্যা নয় কি? সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ পুস্তকের লেখক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় দর্শনের দিক্ দিয়া মুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার রচিত ব্যাখ্যার মধ্য হইতে অনেক

বিষয় দৃষ্ট হয়, যাহা তিনি আদৌ উল্লেখ করেন নাই এবং যে সকল জটিল প্রশ্ন আছে তাহার মীমাংসাই হয় নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশে খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল হইতে হিন্দু দর্শনের মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন। মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে হিন্দুদর্শন যে সেগুলির উত্তর দিয়াছেন তাহা তত মনে হয় না। নৈয়ায়িকের ভেদবাদ কিম্বা বেদান্তীর অভেদবাদ, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রসব করিতে সমর্থ, এই সন্দেহের মীমাংসা এখনও হয় নাই, কখনও যে হইবে তাহার আশা নিতান্ত অল্প। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ দেখিয়া ভক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, ভক্তিই তাহার সাক্ষাৎ ও একমাত্র কারণ।

ভক্তি, প্রেম, এবং দার্শনিক সাধু পৌল।

ভক্তির প্রতি ভারতের অন্য প্রান্তোদ্ভব জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীর দাবী যে কোন অংশেই কম নহে তাহা যেমন অবিসম্বাদিরূপে সত্য; সেইরূপ সমন্বয়ের দিক দিয়া দেখিলে তাহার ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় দাবী যে অত্যন্ত অধিক তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। দার্শনিক পৌলও ভক্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে মধুর ও উচ্চভাবের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তিনি বলেন যে—"ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস কর, কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয়ে সুফলদায়ক হয়, কিন্তু ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে সুফলদায়িকা, তাহা জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের"। 'তবে কি না "ভক্তির একটা রূপ"—রাখিয়া তাহার শক্তি অস্বীকার করিলে ভক্ত হওয়া যায় না। কারণ এ প্রকার লোকেরা "ভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান করে, বাস্তবিকই ভক্তি সন্তোষযুক্ত হইলে মহালাভের উপায়" হইয়া থাকে এ কথা স্বীকার করা যায়; এ কথার সহিত কাহারও কোন বিরোধ ঘটে নাই এবং ঘটিবে না।

"আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই এবং কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না"—এ কথা যেমন সর্ব্ববাদী সম্মত, তদ্রূপ ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য্য, মৃদুভাব জীবনে বহন না করিলে চলিবে কেন? এগুলি ত আমাদের নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মানুষ এ সকলের যতই অনুধাবন করিবে ততই সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

দার্শনিক সাধু পৌলের ঐ ভক্তিতত্ত্ব কথাগুলির মধ্যে দুইটি মহৎ বিষয় যেন একই বৃন্তে সজ্জিত আছে বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ প্রথমটি—ভক্তির শক্তি কি? এবং দ্বিতীয়টী—উহার কার্য্য কি? ইহার উত্তরে বলা যায় ভক্তি মানবাত্মাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, সদগুণের আদর করিতে এবং প্রথমে অননুভবনীয় প্রেমের অসীম মাধুর্য্যের কিয়দংশ অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়; ভক্তি প্রভাবে হৃদয়ের বহুতর দোষ দূরীভূত হয়, প্রবল রিপুকুল প্রশান্ত হয়, স্বার্থপরতা দূরে যায় এবং জীবন চরিতার্থ হয়। মূল কথা, যে অনন্ত গুণসাধ্য সুধাময়ী অবস্থার জন্য মানবাত্মা নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে যাহা না পাইলে আত্মার স্থিরতা কখনও হইতে পারে না, ভক্তি, প্রেম, তাহার একটি প্রধান অংশ প্রদান করে; এস্থলে বেদান্তের জ্ঞানমুক্তির কোন যুক্তিই খাপ খায় না। ভক্তি, সাধনা ব্যতীত আত্মার অভাব দূর হয় না, উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এবং হৃদয় উপযুক্তরূপ কার্য্যক্ষম ও উন্নত হইতে পারে না।

প্রেম, প্রেমভাজনে নিঃস্বার্থভাবে আত্মসমর্পণ করায়; ভক্তি ভক্তি-ভাজনের আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় জ্ঞানে প্রতিপালন করাইতে প্রবর্ত্তিত করে। ভক্তি শুষ্কহৃদয়ে রস সঞ্চার করে, প্রেম তাহাকে রসময় করে। ভক্তি মুক্তি-পথে অগ্রগামী করে, প্রেম মুক্তি প্রদান করে। মানবাত্মা যতই উন্নত হউক না কেন, ঈশ্বর ভক্তি জন্মিলেও পতনের ভয় থাকে এবং অবিশ্বাসও আসিতে পারে, কিন্তু প্রেম নির্ভরতা হৃদয়ে দান করিয়া ভক্তের পতন ভয় দূরীভূত করে ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করে। ভক্ত ঈশ্বরগুণ সমূহে বিশ্বাস

করিয়া অভয় হয়, কিন্তু প্রেমিক একেবারে অকুতোভয় হন। ভক্ত নিজে হাসিতে পারে, কাঁদিতে পারে ও পাগল হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক নিজে হাসিয়া হাসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ও পাগল হইয়া সমুদয় বিশ্বরাজ্যকে হাসাইতে, কাঁদাইতে ও পাগল করিতে পারে। ভক্ত কেবল স্ব-রক্ষার্থে সক্ষম, কিন্তু প্রেমিক নিজের কথা দূরে থাকুক, সকলকেই বাঁচাইতে পারে। যেমন সুপরিপক্ক অত্যুৎকৃষ্ট রসাল ফলের অম্ল মধুর রস অন্য ফল-রসে অনুপমের, তদ্রূপ প্রকৃত পথ (যে রূপে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি ও তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে হয়, খ্রীষ্ট তাহা করিয়া দেখাইয়াছেন, যোহন ৪; ৩৪ ও ১৭; ৪) অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম জগতে বিচরণ করেন তাঁহারাও এরূপ একটি গুণসাধ্য অনুপম অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, উহাও অম্ল মধুর অর্থাৎ ভক্তি প্রেম মিশ্রিত। ঐ অবস্থাটীকে কেহ মুখ্যাভক্তি, কেহ বা প্রেম বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ উহা ভক্তিপ্রেম; যেমন রসালের অম্লত্ব দূর করিতে গেলে মধুরত্ব থাকে না এবং ঐ অম্লত্বই মধুরত্বে অতৃপ্তির কারণ, আর যেমন উহার মধুরত্ব দূর করিতে গেলেও অম্লত্ব পূর্ব্বাবস্থা না থাকায় সুখাবহ হয় না, তদ্রূপ ঐ অন্তিম ফলরূপ অবস্থা লাভ করিতে গেলেও একটি দ্বারা হইবে না। উভয়েরই অর্থাৎ ভক্তি ও প্রেমেরই প্রয়োজন; এতদ্ভিন্ন ইহা বলিতে আমি বাধ্য যে নিজের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করা অপেক্ষা ঈশ্বরের বিধানে শান্তভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বিনাশ যে অসম্ভব। বিশ্বাসই মুক্তি। বিশ্বাসের শান্তি ব্যতীত অপর কোন আনন্দ থাকে কি? ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদির কি কোন ভেদ আছে? উত্তরে বলিব কোন ভেদ নাই। দার্শনিক সাধু পৌল নিজ জীবনে ও শিক্ষায় এ বিষয় জগতের ক্রোড়ে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রমাণ স্বরূপে রোমীয় ৮; ৩৭-৩৯ এবং ১কর ১৩ অধ্যায় তুলনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। পৌলের সময়ের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত গ্রীক লেখক

প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সুন্দর কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রেম আমাদের প্রভু, সে মনুষ্যদিগকে দয়া প্রদান করে, এবং তাহাদের মধ্য হইতে নির্দ্দয়তা দূর করিয়া দেয়, সে অর্থাৎ প্রেম মনুষ্যদিগকে বন্ধুত্ব দেয় এবং তাহাদের শত্রুতা ক্ষমা করে। প্রেম ধার্ম্মিকদের পক্ষে আনন্দজনক, এবং জ্ঞানীদের ও দেবতাদের কাছে বিস্ময়কর। যাহারা প্রেমের অংশভাক নহে, তাহারা তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যাহারা বেশ অংশভাক হইয়াছে তাহাদের কাছে সে বড়ই মূল্যবান; প্রেম হইতেছে কোমলতা, লাবণ্য, আকাঙ্ক্ষা, মমতা, মাধুর্য্য, ও দয়ার পিতা, সে অমঙ্গলের প্রতি অমনোযোগ পূর্ব্বক মঙ্গলের বিষয়ে সচেষ্ট থাকে। সমস্ত কথা, কার্য্য, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কাতে প্রেমই আমাদের পথ প্রদর্শক, সহায়, রক্ষক ও ত্রাণকর্ত্তা। প্রেম দেবতাদের ও মনুষ্যদের গৌরব স্বরূপ, তাহাদের শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম নেতা, প্রত্যেক মনুষ্যই তাহার অনুগামী হউক"।

"পোলের সময়ের পাঁচ শত বৎসর পর মহম্মদ এইরূপে প্রেমের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন:—সমস্ত সৎকার্য্য হইতেছে, প্রেম, তুমি যখন তোমার ভ্রাতার মুখপানে তাকাইয়া মৃদুহাস্য কর বা বিপথগামী পথিককে পথ প্রদর্শন কর; তুমি যখন তৃষ্ণার্ত্ত লোককে জল বা অপর লোকদিগকে হিতোপদেশ দেও, তোমার প্রেম প্রকাশ হইতেছে। আমরা ইহলোকে অপর মনুষ্যদের যে মঙ্গল সাধন করি, তাহা পরলোকে আমাদের প্রকৃত ধন স্বরূপ হইবে। আমাদের মৃত্যু হইলে, লোকে আমাদের বিষয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমরা কত ধন সম্পত্তি অপর লোককে ছাড়িয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছি। দূতগণ পক্ষান্তরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মৃত ব্যক্তি কত সৎকার্য্য তাহার অগ্রে পাঠাইয়া দিয়াছে।"

একজন পূর্ব্বকালীন দার্শনিক খ্রীষ্ট ভক্ত প্রেমের বিষয়ে এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রেম কষ্ট অনুভব করে না, ক্লেশ মানে না, প্রেম সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, বরং সাধ্যের অতিরিক্ত কার্য্য

করিতে চাহে। প্রেম কখন বলে না যে অমুক কার্য্য করা অসম্ভব বরং তাহার ধারণা এই যে, এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা সে করিতে পারিবে না। প্রেম দ্রুতগামী, সরল, ধর্ম্মশীল, মনোহর, আনন্দজনক, বলবান, ধৈর্য্যশীল, বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, সাহসী, নিঃস্বার্থ, নম্র, ন্যায়বান, জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মল, স্থির, শান্ত, ও সর্ব্বতোভাবে সতর্ক।"

প্রেমের এই উৎকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া আমরা বলিতে পারি যে প্রেম অপর মনুষ্যদের সহিত আমাদের আলাপের উপর এমনভাবে কার্য্য করে যে, সমগ্র মানব জীবন তদ্দ্বারা সুমিষ্ট ও পবিত্র হইয়া উঠে। আমরা যদি সত্য সত্যই ঐশ্বরিক প্রেমকে আমাদের হৃদয়ে থাকিতে দিই তাহা হইলে আমাদের স্বভাব তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত হইবে এবং আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহারের মূল হেতু হইবে। ইহাই শান্তি ও তাবৎ সদ্‌গুণের প্রকৃত বন্ধন, যদ্ব্যতীত জীবিত মাত্রেই ঈশ্বরের সমক্ষে মৃতরূপে গণিত হয়। দার্শনিক পৌল প্রেমের ঠিক ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছেন।

তবে প্রেমটা জন্মে কখন? না—যখন ঈশ্বর আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করেন তখনই আমাদের হৃদয়ে প্রেম জন্মে। এবং যেখানে প্রেম অনুপস্থিত সেখানে সকলই অনুপস্থিত ও অন্ধকার *। মথি বর্ণিত যীশুর নৈতিক শিক্ষার সহিত যোহন কথিত গূঢ়ার্থক শিক্ষার মূলে একতা আছে। পার্ব্বত্য উপদেশ মানিতে হইলে, নীকদীমের নিকটে কথিত পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইবে। যীশু যে স্বর্গ-রাজ্য আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সেই শুভ সময়ের আরম্ভ, যাহার বিষয় চিন্তা করিয়া কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মনোনয়ন ও কর্ত্তব্য এক হইবে, তখন প্রেম ও আনন্দ পথের একমাত্র পরিচালক হইবে :—

* Christianity As Bhakti Marga, a study of the Johannine Doctrine of Love, By A. J. Appasamy, M. A. গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এবং মৎ কৃত "হিন্দু দর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "God is Love" ও "The Logos is Love" নামক অধ্যায়ে ইহার পৃথক ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে।

"সেই শুভদিন যবে উদিবে ধরায়,
গম্ভীর উজ্জ্বল হবে দিবস যামিনী,
আনন্দে ভাসিবে সদা মোদের প্রকৃতি;
সেই দিনে প্রেম হবে অভ্রান্ত আলোক,
প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য হবে মাধুর্য্য তখন"।

হিন্দু দর্শনের সহিত খ্রীষ্টীয় দর্শনের মুক্তিতত্ত্বে পার্থক্য কোথায়?

এ প্রশ্ন গুরুতর হইলেও মারাত্মক নহে, এই বিষয়টী বুঝিবার জন্য হিন্দু দার্শনিক পাণ্ডিতগণ খ্রীষ্টীয় দর্শনকে আদৌ স্পর্শ করেন নাই এইখানে তাঁহাদিগের একটা দুর্ব্বলতার কিম্বা ভয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ভারতকে তাহার এরূপ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দিতে গেলেই নানা স্থান হইতে নানা প্রকার তর্ক উত্থাপিত হয় এবং সেই সঙ্গে সত্য বিষয়টী ম্লান হইয়া পড়ে। তবে এ পার্থক্যের মধ্যে যদি সেইরূপ কোন তর্ক উত্থাপিত হয়, হউক, তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই, আমরা সত্যকেই সত্য জানিয়া সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিব, ভারত যদি সেই সত্য সাদরে গ্রহণ করে তাহা হইলে আর কোন পার্থক্য থাকিবেনা। আমরা এ পর্য্যন্ত হিন্দু-দর্শন শাস্ত্রে মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলাম এবং যিনি যে ভাবে স্বীয় মত দর্শনে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও দেখিলাম। খ্রীষ্টীয় দর্শন দাঁড়াইয়া এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে মুক্তি বা পরিত্রাণ আবশ্যক, এ কথার সহিত কোন বিরোধ নাই। এবং এই মুক্তি মনুষ্যের ত্রিবিধ:—ইহা আপেক্ষিক মুক্তি নহে।

(১) পাপের দণ্ড হইতে মুক্তি বলিলে কি বুঝায়?

মনুষ্য পাপী বলিয়া ঈশ্বরের ন্যায়শাসনমতে দণ্ডার্হ অর্থাৎ শাস্তির যোগ্য হইয়াছে, এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমাদের পাপভার নিজ

মস্তকের উপরে থাকিলে তাহা আমাদিগকে নীরয়গামী করিবে; হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে "পরিজ্ঞাত পাপের ক্ষয়েব জন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও অবশ্য কর্ত্তব্য; পাপ দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয়"। পণ্ডিতদিগের উক্ত বাক্য মানিয়া লইতে আপত্তি নাই; সেই জন্যই'ত খ্রীষ্টীয়দর্শন সাক্ষ্য দিয়া বলেন কোন উপযুক্ত প্রতিনিধি আমাদের পরিবর্ত্তে সেই পাপভার বহন না করিলে আমরা কখনই মুক্তি-লাভ করিতে পারি না; ভারতের হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ আমাদিগের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন কি? না—বৃথা অবজ্ঞা সূচক তর্ক করিবেন?

(২) পাপ স্বভাব হইতেই মুক্তি বলিলে কি বুঝায়?

ইহাতে এই বুঝায় যে মনুষ্য কায়মনোবাক্যে পাপী বলিয়া পবিত্রতম ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইবার অনুপযুক্ত, এই জন্য পবিত্রকারী কোন শক্তি আবশ্যক। কোন পবিত্র ও পরাক্রান্ত ব্যক্তি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে পাপ দূর না করিলে এবং আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকার সদগুণে ভূষিত না করিলে আমরা প্রকৃত মুক্তি পাইতে পারি না।

(৩) পাপের কুফল হইতে মুক্তি বলিলে কি বুঝায়?

আমরা ইহাতে এই বুঝি যে, আমরা দুঃখের ও মৃত্যুর অধীন, এবং নানা শত্রুতে বেষ্টিত, সুতরাং বিপদ হইতে রক্ষা আবশ্যক; একজন বলবান মুক্তিদাতা আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকার অনিষ্ট হইতে উদ্ধার না করিলে আমরা প্রকৃত মুক্তি পাইব না।

মনুষ্যের এই ত্রিবিধ মুক্তি আবশ্যক, কিন্তু সে নিজে তাহা সাধন করিতে অক্ষম। কেননা:—(১) যাহার অর্থ নাই, সে যেমন ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, তদ্রূপ পাপী হওয়াতে ধার্ম্মিকতা না থাকায় মনুষ্য পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না।

(২) মনুষ্য স্বভাবতঃ পাপিষ্ঠ, সুতরাং আপনাকে বা অন্যকে পবিত্র করিতে পারে কি? উত্তরে বলিব, না। তর্কস্থলে না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম, "কর্ম্মদকল, পাপ-পাচক-পাপের নাশক";

কিন্তু তাহাতেই কি কলুষিত চিত্ত পরিষ্কার হয়? দর্শন কি বিজ্ঞান কি অগুরু চন্দনে, কি মনুষ্য হৃদয়ের পাপ ময়লা বিদূরিত হয়? তাহাই কি "পাপ নাশক" বলিয়া স্বীকার করা যায়? "নিষ্কাম" কিম্বা "সকাম" ভাবে কার্য্য করিলেই কি কেহ পাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন? ভারত, ত দীর্ঘকাল হইতে পাপ-নাশকের জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এখনও "আমাতে পাপ নাই" এ কথা বলিতে পারিয়াছেন কি? উত্তরে বলিব, কদাচ নহে।

(৩) মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সুতরাং বলবান শয়তান শত্রুর হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না। বাস্তবিক পাপের দণ্ড, বল, ও ফল, এই তিন বিপদ হইতে আমাদের মুক্তিলাভ আবশ্যক নয় কি? ধন্য ঈশ্বর, তাঁহার নির্দ্ধারিত ত্রাণোপায় দ্বারা এই ত্রিবিধ মুক্তি সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে। এবং সেই মুক্তির মূল ঈশ্বরের প্রেম; যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মহেশ্বর তিনি প্রথমে আমাদিগকে ঘৃণা করিয়াছিলেন বলিয়া যীশু আপনার সাধিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই ঘৃণা প্রেমে পরিণত করিয়াছেন এমন নহে, বরং ঈশ্বর আমাদিগকে অসীমরূপে প্রেম করিয়াছেন বলিয়াই আপন প্রিয়তম পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে জগতে পাঠাইয়াছিলেন; এইখানেই খ্রীষ্টীয়দর্শন ও ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়াছে, এইখানেই ঈশ্বরের অসীম প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে; "যাঁহারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে বাসনা করেন তাঁহারা এইখানে আসিয়া আমোদ ও আনন্দ করুক; যাঁহারা ঈশ্বর সাধিত চিরস্থায়ী পরিত্রাণ ভালবাসে, তাঁহারা সতত বলুক ঈশ্বর মহিমান্বিত হউন"; এইখানেই দয়া ও সত্য, ধার্ম্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিয়াছে" এবং একসঙ্গে মিলিয়া মহানন্দের সহিত মুক্তির কথা ঘোষণা করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ "ধর্ম্মবিজ্ঞানের" মধ্যে ভারতীয় দর্শনের অনেক উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন; মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়

"Lectures on Hindu Philosophy" গ্রন্থে, এবং পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহোদয় তাঁহার "জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকের "মুক্তি" প্রবন্ধে অনেক বিষয় দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাদের একজনও খ্রীষ্টীয় দর্শন স্পর্শ করেন নাই, ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমার নিজের কথা এই যে, ভারতীয় দর্শনগুলি সবিশেষ ধীরতা সহকারে আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় যে অনেক চিন্তা, বিচার, জ্ঞান, গবেষণা এবং মৌলিকাতার আধার হইলেও সেই সেই দর্শনের মধ্যে কি এক অসম্পূর্ণতা, কোন্ অভাব রহিয়াগিয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় দর্শন এমন কতকগুলি সত্যউপাদান, অক্ষয়, বিষয়, এবং অপূর্ব্ব বস্তুর সংযোগ বা মিলন করিয়া দিয়াছেন, যাহার ফল স্থিতিস্থাপকের ন্যায়; এবং সমগ্র ভারত সেই সদ্বস্তুর প্রমাণের রসাস্বাদন করিতে পারেন এবং তাহার ফলে ভারতীয় দর্শনের অসম্পূর্ণর অংগুলি খ্রীষ্টীয়দর্শন দ্বারা অতি বিষদভাবে প্রমাণ সহ পূরণ করিয়া দিয়াছেন। প্রাচ্যের বহু প্রাচীন, বহু যুগের অন্ধতামিশ্র ভেদ করিয়া, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যুগ সহস্রের সঞ্চিত কুসংস্কার ও অনাচার ভেদ করিয়া খ্রীষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র সকলের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করিতেছে, এই দর্শনকে গ্রহণ কিম্বা বিচার করিয়া দেখার পক্ষে আজও প্রাচ্যের কোন পিপাসা হইতেছে না; অথচ ইহার ন্যায় ধ্রুব সত্যও আর নাই। অসতর্কেরা যতকাল এই সত্যকে বুঝিয়া লইবার জন্য চেষ্টা যত্ন না করিবেন ততকাল ভারতীয় দর্শনে ঐ অসম্পূর্ণতা থাকিবেই থাকিবে ইহা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি। যাহারা ঐশ্বরিক জ্ঞান ও তত্বাবলিতে জলাঞ্জলি দেয়, যাহারা আপনাদের সম্মুখে মিথ্যা আবরণ রাখিয়া, সত্যকে অগ্রাহ্য করেন; তাহাদের শিক্ষা পূর্ণ না হইয়া অপুর্ণই হইবে; ইহা'ত সকলেই স্বীকার করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে দার্শনিক সাধু পৌলের উক্তি যথার্থই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাঠক! আপনারা রোমীয় পত্রের ১ম অধ্যায়

১৮—২৫ পদ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিচার করিবেন। ঐহিকের বিবেচনায় দেবমূর্ত্তি না থাকিলে উপাসনা ও ধর্ম্ম উভয়ই একেবারে অন্তর্হিত হয়; ইহা একটা মারাত্মক ধারণা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মুক্তিতত্ত্বে বিশেষ পার্থক্য স্থল।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মে ও দর্শনের প্রধান উক্তি এই যে "খ্রীষ্ট আমাদের প্রকৃত স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া কেবল পাপ বিনা অন্য তাবৎ বিষয়ে আমাদের সদৃশীকৃত হইয়াছিলেন এবং শরীর ও আত্মা উভয়েতে তিনি পাপশূন্য ছিলেন। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন বলিয়া, তৎকৃত প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ এবং সার্থক বলিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত আর কোন মনুষ্যই পাপশূন্য নহে।" "এবং কেবল খ্রীষ্টের নাম দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্তব্য;" খ্রীষ্টীয় দর্শন মুক্তিতত্ত্বে এই কথা স্বীকার করায় হিন্দুদর্শনের সহিত, বা অপর ধর্ম্মের সহিত মারামাত্মক পার্থক্য রহিয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি প্রভু যীশুর এই বাক্যে—"আমিই পথ, ও সত্য ও জীবন"—ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিত্রাণের উপায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। এবং "অন্য কাহারও নিকট পরিত্রাণ নাই, কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।" এই বাক্যে সাধু পিতর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। এই কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্ট বিনা আর কাহারও নিকট পরিত্রাণ নাই, সুতরাং যাহাদের নিকট সুসমাচার প্রচারিত হয়, সুসমাচার গ্রাহ্য করাই তাহাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান কালের হিন্দু পণ্ডিতগণ আপনাদের শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক লইয়া বলেন যে, নদী যে দিক দিয়া প্রবাহিত হউন না কেন, পরিণামে তাঁহাকে সাগরে সঙ্গত হইতেই হইবে; সেইরূপ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম পালন করে, সেই ব্যক্তি তাহাতেই মুক্তিলাভে সক্ষম হইবে।

অনেক অজ্ঞ মুশলমানেও ঐরূপ কথা বলে। কিন্তু হিন্দুদের এই মত তাহাদের নিজ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেননা লেখা আছে, "হরের্ণাম হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা, পুনশ্চ "ত্বমেকা গতির্দ্দেবি, নিস্তারনৌকে, নমস্তে জগত্তারিণি, ত্রাহি দুর্গে।" অর্থাৎ "কলিতে হরিণাম ব্যতীত আর গতি নাই।" "ত্রাণ নৌকা-রূপিণী দেবি, তুমিই একমাত্র গতি, জগত্তারিণি, তোমাকে প্রণাম, দুর্গে ত্রাণ কর।" আর মুশলমানদের কোরাণ পৌত্তলিকতার উপর একেবারেই খড়্গহস্ত। ফলতঃ, যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে।

মনুষ্য পাপ করিয়াছে, আর ঐ পাপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, সুতরাং অধমর্ণকে যেমন উত্তমর্ণের নিদেশানুসারে চলিতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর নিরূপিত উপায় না হইলে মনুষ্যের নিস্তার নাই। ঐ উপায় ঈশ্বর নিরূপিত বলিয়া এক এবং সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বরের একত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আবার ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাঁহার বাক্যে প্রকাশিত, অতএব যাঁহাতে ভ্রান্তি, অশুচিতা ও স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়, বা যাহার এক বাক্য অন্যের বিপরীত, তাহাকে ঈশ্বরের বাক্য বলা যাইতে পারে কি? এ স্থলে উত্তরে বলিতে হইবে কদাচ নহে, কারণ ঈশ্বর আত্মবিরোধী বা মিথ্যাভাষী নহেন।

হিন্দুদর্শন সত্য ও মুক্তিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে বাহির হইয়া সুসমাচারের নিকট অকৃতকার্য্য হইয়াছে। মেধাশক্তির বলে কেহ সত্যতথ্য নির্ণয় করিতে পারে না। যদি কেহ মনে করে যে, জ্ঞানের সাহায্যে সত্যতথ্য নির্ণয় করা যায়, তবে ইহা ভ্রান্ত ধারণা। একটী বিষয় পূর্ণরূপে বুঝিতে গেলে সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক বিষয় অপর বিষয়গুলির সহিত সংযুক্ত এবং ইহার কোন একটী বুঝিতে গেলে অপর

গুলির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। এই স্থানেই সত্যের নিকট প্রণত হইয়া আমাদিগকে বিশ্বাসের মার্গে চলিতে হয়। হিন্দু-দর্শনের মধ্যে এইস্থলে পার্থক্য দেখা যায়। লোকে স্বীকার করে যে শত শত বৎসর ধরিয়া দর্শনের কোনই উন্নতি দেখা যাইতেছে না। সেই সকল পুরাতন সমস্যার ও সেই পুরাতন সমাধানেরই পুনরুক্তি, কেবল নূতনাকারে ও নূতন বাক্যালঙ্কারে ব্যক্ত হইতেছে। আমাদের দেশের কলুর বলদের চক্ষে ঠুলি পরাইয়া (চক্ষু বাঁধিয়া) সারাদিন ঘানির চারিধারে ঘুরাণ হয়। সন্ধ্যায় যখন তাহার চক্ষু হইতে আবরণ খুলিয়া লওয়া হয় তখন সে দেখে কি যে, সে কেবল ঘানির চারিধারেই ঘুরিয়াছে যাত্রায় কিছুই অগ্রসর হয় নাই ; তবে কার্য্যের মধ্যে কিছু তৈল বাহির হইয়াছে। দার্শনিকগণ শত শত বৎসর যাত্রা করিয়াও তাহাদের চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে নাই। তবে এস্থান ওস্থান হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া তাহারা যেন কিছু তৈল বাহির করিয়াছে, আর ইহাই তাহারা পরে তাহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য জীবনের শুষ্কতা দূরীকরণে সেই তৈল যথেষ্ট নহে। অগ্রসর হইতে হইলে বিশ্বাস এবং আত্মজ্ঞানের আবশ্যক, দর্শন তাহা পারে না ; আমাদের জ্ঞান যতই বিস্তৃত হউক না কেন, উহার সীমা আছে। জ্ঞানলিপ্সা দূর হইতেছে না দেখিয়া কোন কোন দার্শনিক আত্ম-হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে। এম্‌পিডক্লিস্ (Empedocles) স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষা না করিয়া দেবতাদিগের সহবাসে জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার লালসায় এট্‌না আগ্নেয়গিরির মুখে ঝাঁপ দিয়াছিল। এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত জোয়ার ভাটার অদ্ভুত গতির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। ইহারা প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দ লাভই আত্মার লক্ষ্য। কোন প্রকার অন্যায় উপায়ে (অর্থাৎ পাপে) উহা লাভ করিবার চেষ্টা করিলে আত্মার সেই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা নষ্ট হয়। সেই আনন্দ উপভোগের শক্তির অবহেলা করিলে বা উহার অপব্যবহার করিলে

উহা নষ্ট হয়। কারণ ঈশ্বর তাঁহার প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই এই সকল শক্তি, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও আনন্দ করিবার ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন আমরা তাঁহার (খ্রীষ্টের) সহভাগিতায় অনন্ত সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হই। আর ইহাই পরিত্রাণ। অহঙ্কার পাপ, কারণ অহঙ্কারী ব্যক্তি বাস্তবিক যাহা নহে আপনাকে তাহাই মনে করে, আর সেই কারণ সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঁঞ্চিত হয় ও পাপে পড়িয়া প্রাণ হারায়। মিথ্যা পাপ, কারণ ইহা সত্যের বিরুদ্ধ। মিথ্যাবাদীর উপর মিথ্যার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তারিত হওয়ায় সে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সে নিজকেও প্রবঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে। সে নিজের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় সমূহকেও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম ও অনুগ্রহে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে, ইহাতে সে তাহার আধ্যাত্মিক জীবন ও ঈশ্বরের মহা আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়। লোভ পাপ, কারণ লোভীব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া সৃষ্ট বস্তুতে তৃপ্তি অনুসন্ধান করে। ব্যভিচার পাপ, কারণ ব্যভিচারী পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবন ও পবিত্রতা নষ্ট করে। চুরি পাপ, কারণ চোর অপরের উপার্জ্জিত বস্তু বলপূর্ব্বক হরণ করে। অপরের ক্ষতিতে সে আনন্দ অন্বেষণ করে, অতএব ইহা আবশ্যক যে এই সকল ও অন্যান্য পাপের জন্য আমরা অনুতাপ করি ও পরিত্রাণ পাই। বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলেন যে "নৈসর্গিক নির্ব্বাচন" অনুসারে যোগ্যতমই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে কিন্তু ইহা অপেক্ষা মহত্তর সত্য আছে এবং তাহা লক্ষ লক্ষ মানব জীবনের পরিবর্ত্তনে প্রমাণিত হইতেছে, সেই সত্য এই যে, ঐশ্বরিক নির্ব্বাচনে অযোগ্যই (পাপী) টিকে। মদ্যপায়ী ব্যভিচারী, নর-ঘাতক ও দস্যু পাপের ও যন্ত্রণার অতি নীচ গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইয়া নবজীবনের আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন সেই যীশুখ্রীষ্টেই এই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম তীম ১; ১৫)

যীশুর দাবীর যথার্থতার একটি তাৎপর্য্য এই যে, যীশু একেবারে নিষ্পাপ ছিলেন, কেবল নিষ্পাপ ব্যক্তিই পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা-শীলতার জামিন্ হইতে পারেন. পরিত্রাণ যাহাকে বলে, তাহা যথার্থ বিষয় হইলে অবশ্য এমন প্রাণকর্ত্তার দ্বারা সম্পন্ন হইবে, যাঁহার পরিত্রাণ পাইবার প্রয়োজন নাই, খ্রীষ্ট, পিতা ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্যদের কাছে দয়া ও পাপক্ষমা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার (খ্রীষ্টের) সমস্ত কার্য্য, দৃষ্টিপাত, কথা ও প্রার্থনায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ পাইত, অধিকন্তু যীশুর ক্রুশের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই যাহা আমাদের ও অন্যান্য মনুষ্যের পক্ষে যারপর নাই আনন্দজনক ও অমূল্য। আমরা এমন প্রেমের পরিচয় পাই, যাহা আমরা নিজগুণে কখনই লাভ করিতে পারিতাম না এবং যাহার পরিশোধ করিতে আমরা একেবারে অসমর্থ। ঐ প্রেম আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাদের পাপভার লইয়া যায়। তাহা আত্মোৎসর্গের দ্বারা আমাদের পাপ দূরীভূত করে। এই সত্য উপলব্ধি ও গ্রহণই মৃতদের মধ্য হইতে জীবন লাভ বই আর কি?

বেদান্ত ও খ্রীষ্টীয় দর্শন এবং ধর্ম্ম।

বেদান্ত দর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন উভয়ের মধ্যে মুক্তিতত্ত্বে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বেদান্ত মতে মুক্তিতত্ত্ব "অবরোহ"† প্রথায়, এবং খ্রীষ্টীয়দর্শন * ও ধর্ম্মের মুক্তিতত্ত্ব "আরোহ" প্রথায় ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। "অবরোহ" প্রথা বলিলে আগে দেহ, মন ঠিক করিয়া আত্মার বিষয় ধ্যান বা চিন্তা কর; এবং "আরোহ" প্রথা বলিলে আত্মায় আরম্ভ ও আত্মায় শেষ করিতে

---

* "The christian conception of God is not abstract, but concrete, It is warm, personal, individual, definite, the christian sees God in the face of Jesus Christ. His characteristic attribute is love, and his appropriate name is Father." (See page 256, the Essence of Christianity)

† (মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ফেলোসিপের লেকচারে বলিয়াছেন আরোহ কি না, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন। অবরোহ কি না, পরলোক হইতে ইহলোকে গমন)।

হইবে। দার্শনিক সাধু পৌল গালাতীয় পত্রের ৩; ৪ পদে এই কথা বলিয়াছেন—"তোমরা কি এমন অবোধ? আত্মাতে আরম্ভ করিয়া এখন কি মাংসে সমাপ্ত করিতেছ?' 'মৃত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়, তাঁহার রচিত 'কর্ম্মকথা' নামক গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় "আরোহ" এবং "অবরোহ" এই দুই প্রক্রিয়ার ফল পৃথকরূপে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে উভয় প্রথায় ফল পাওয়া যাইবে এইটি স্বীকার করিয়াছেন —খ্রীষ্টীয় দর্শন বেদান্তের ঐ ফল লাভ অঙ্গীকার করেন নাই।

মুক্তির এই বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করিয়া আমাদিগের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত আচার্য্য W. H. G. Holmes M. A. মহোদয় "The Epistle to the Hebrews" নামক পত্রের ১০০ পৃষ্ঠায় "Additional Note on Salvation" স্তবকে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Salvation. "The difference between the Hindu Conception of "salvation" and the christian Conception is vital. Hinduism is familiar with a word which is generally translated "Salvation" (Moksha), but so wide is the separation between the idea of Christian and Hindu "Salvation" that in translating the New Testament into Sanskrit languages, a new term has had to be used ; the use of "Moksha" and its derivatives would create confusion and insert error. To the Hindu the highest goal, the supreme end, is release from existence itself. It is not merely release from a particular form or many forms of existence, which comes by death or innumerable deaths, but it is release from being. It may be attained by "Knowledge", for existence

is the realm of ignorance. This "Knowledge" consists in the removal of all desire and the annihilation of the consciousness of plurality. It is the destruction of that self-Consciousness which is regarded as nothing but delusion, and which is the root of all suffering. It is thus the exact antithesis of Christian salvation. Christ offers salvation unto life, "I am come that they may have life and have it abundantly," Hinduism offers salvation from life. This conception of "salvation" necessarily affects the Hindu conception of sin, or perhaps we should say that it is not sin, as the New Testament understands sin, from which salvation is sought. Sin is not the real evil, it is not the vice of the will so much as the mistake of the intellect. It is not even "selfishness" but rather "selfness". Sin thus regarded has a great deal to do with destiny but little to do with character, The conception of an atonement for sin is outside the range of Hindu thought. That which the author of this Epistle puts in the forefront as the characteristic work of the Son ("making purification of sins" 1. 3) is to Hinduism in what are called its higher forms, unthinkable, as infringing on the law of Karma from which no emancipation is possible At-one-ment, indeed, comes at the end of all by the annihilation of selfness", but it cannot come at any point on the way to be the power by which man, inwardly purified and

rendered holy, is brought into union with God. Throughout the Epistle to the Hebrews runs the thought of holiness as the means by which man comes into the Presence of God. and to this holiness he cannot attain of himself. All the ceremonial cleansings of Judaism bore witness to his aspirations to be clean, and so to be at one with God. All the elaborate system of sacrifices bore witness to the truth that there was to be an adequate Sacrifice for sin.

The more popular forms of Hinduism are a revolt against the doctrines of the law of Karma with its exclusion of forgiveness. They indeed make forgiveness, judged from a spiritual point of view, cheap and easy. To bathe in Ganges water at the time of a particular conjunction of the moon and stars, to breathe your last breath in Benares, to utter the name of God even by mistake at the moment of decease, in these and other ways forgiveness of sins may be purchased, but the very revolt of human nature, knowing its needs, against a barren philosophy, bears witness to the provision of the true method of purification.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দুঃখবাদ ও সুখলাভ। দণ্ড ও পুরস্কার।

প্রত্যেক দর্শনের ভিত্তি দুঃখবাদ। ভারতীয় সকল দর্শনকারকেরই মতে সংসার দুঃখের আলয়, সংসারে যতটুকু সুখ আছে, তাহা যে শুধু ক্ষণস্থায়ী এমন নহে, তাহা দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র। সে সুখে জীব (মনুষ্য)

কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, তাই সে দুঃখনাশের জন্য নানা উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন তদ্দ্বারা সে সংসার দুঃখের আক্রমণ এড়াইতে পারে না, অথচ, দুঃখনাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত, দুঃখহানিই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেই দুঃখহানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্যই দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে, এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখনাশে। সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সকলের নির্দ্ধারিত উপায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার দুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের মতে পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়। দর্শন শাস্ত্রে তাই পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় পদার্থের স্বরূপতত্ত্ব অবগত করাইয়া চিরসুখ লাভের অর্থাৎ মোক্ষের পথ নির্ণীত হইয়াছে। সে হিসাবে হিন্দুদর্শন শাস্ত্র-সমূহ জ্ঞান গবেষণার উৎসস্থানীয় বটে, তবে দর্শন শাস্ত্র সমূহের উদ্ভাবিত সুখ সাধনের উপায় পরম্পরার সহিত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের নৈকট্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না।

এ স্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি জাগতিক সুখের, যতই ব্যাখ্যা, যতই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ কর না কেন—আমি বলিব তাহা "অসারের অসার।" "মানুষ যদি ব্রহ্মাণ্ড লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়" অর্থাৎ চিরসুখে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হইল বলিতে হইবে? উত্তরে বলিব কদাচ নহে! এই সকল চিন্তা করিয়া একজন দেশীয় ভাবুক বলিয়া গিয়াছেন—"চিরসুখ একমাত্র প্রেমিকের মনে, আর আছে প্রাণেশের (ঈশ্বরের) নিত্যনিকেতনে।" ভাবুক যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, ইহার সহিত মতবিরোধ নাই। তবে এমন কোন অবস্থা কাল বা সময় ছিল, যে কালে জীব (মনুষ্য) আনন্দময়ের আনন্দ, সুখ, শান্তি উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সুখের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন নাই। তবে শাস্ত্রে দেখা যায় যে, এই চির আনন্দ, চিরসুখ, আদি মিথুন রক্ষা করিতে

পারেন নাই ; সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে এমন একটা কিছু উপসর্গ দেখা গিয়াছিল যাহার ফলে কালিমার রেখাপাত, দুঃখ, মনস্তাপ, ও বিলাপের সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই, তবে যে নাস্তিক, সংশয়বাদী অবিশ্বাসী কি শূন্যবাদী তাহাদের সহিত আমাদের কোন তর্ক নাই। জীব অর্থাৎ মনুষ্যকে ঐ পূর্ব্বসুখ পুনঃ প্রদানের জন্য খ্রীষ্টীয়দর্শনের আবির্ভাব, ইহা উদ্দেশ্যবিহীন কি অর্থশূন্য দর্শন নহে, মানুষ দুঃখ, পাপ ইত্যাদি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যে চিরসুখ লাভের আকাঙ্খা করে তাহার পূর্ণ বিকাশ ও ফল খ্রীষ্টীয়দর্শনে বর্ণে বর্ণে প্রকটিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমরাও ঐ বিমল সুখ লাভের আকাঙ্খা তবে কি না ইহা আমাদের নিজ ধার্ম্মিকতার উপর কিংবা বলের উপর নির্ভর করে না। খ্রীষ্টীয় দর্শন চিরসুখলাভের যে পন্থাগুলি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সেই পন্থা বা উপায়গুলি যদি ভারতীয় হিন্দুদার্শনিকগণ বুঝিবার জন্য যত্ন করেন তাহা হইলে কদাচ বিরোধ ঘটিবে না, ইহা আমি সাহস সহকারে বলিবই বলিব। আমরা চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের ন্যায় সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে পারি না, বস্তুতঃ যে হিতবাদে আন্তরিক সুখের এবং অধিকাংশ মনুষ্যের সুখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও আমরা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ভাবি না। আমাদিগের বিবেচনা এই যে আমরা কেবল জাগতিক সুখভোগ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই ; সুখ যেমন আমাদের একটি লক্ষ্য, তেমনি আমাদিগের আরও দুইটী মহৎ লক্ষ্য আছে, "সত্য" ও "স্বাধীনতা"। আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, আমাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছাও আছে, ভোগশক্তি যেমন সুখ চায়, জ্ঞান তেমনি সত্য চায়, ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা চায় ; ভক্ষ্য, পেয় এবং পরিধেয়ের পরিপাট্যে ভোগশক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি সত্য বিনা ম্লান হইবে। ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন ও ক্ষমতা বিস্তার ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবে, বুদ্ধি সত্য পাইলে এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা পাইলে সুখ জন্মে যথার্থ, কিন্তু যে কেবল সুখের জন্য সত্যের বা স্বাধীনতার অনুসরণ করে আমরা

বুঝি যে তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্য এবং স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা চায় তাহার লক্ষ্যের ন্যায় মহৎ নহে। আমরা এস্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যখন হিন্দুদর্শন খ্রীঃসাধিত চিরস্থায়ী বিমল সুখলাভের জন্যে এই সত্যকেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়াইবে তখন সকল বাধা অপসারিত হইবে এবং বিরোধের কোন হেতু থাকিবে না। আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে এই বিমল-সুখের অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত বা ক্ষয় হইবে না। জগতের সকলেই ঐ সুখ লাভ করিতে চাহেন কিন্তু প্রকৃত "পথটি" অবলম্বন করিতে কাতর হন; ইহা তাহাদিগের দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছু নহে, ইহাদিগের ভাব ও যুক্তি এই—"বিলাতে যাইব, কিন্তু জাহাজে আরোহণ করিব না।" এইরূপ ধারণা যাহারা পোষণ করেন, তাহাদের চিরসুখ-লাভের আশা কোথায়?

দুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা উচিত কি না তাহা লইয়া তর্ক করিতেছি না, জগতে অনেক ধার্ম্মিক পুরুষও দুঃখ (পাপ) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সুখ বলিতে কেবল ইহকালের সুখ বুঝাইবে, না—পরকালের সুখও বুঝাইবে। আমরা বুঝি কেবল পরকালের সুখ, এবং হিন্দুদর্শনের ঐ দিকে লক্ষ্য; কিন্তু চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের সুখ। পরকাল অসম্ভব। জার্ম্মানের চার্ব্বাক দার্শনিক পণ্ডিত "নিচের" মতও এদেশের চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের ন্যায়; নিচে,—বলেন, কেবল জাগতিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব যে প্রকারে পার জাগতিক সুখ সঞ্চয় কর। আমরা চার্ব্বাক নহি, আমরা পরকালে নিত্যসুখের আকাঙ্ক্ষা করি। আজ কাল যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না, কেননা দুঃখের ক্ষয় সাধন ও সুখের বর্দ্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য; দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত' অভিব্যক্তি। দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না, অভিব্যক্তি যখন ঘটিতেছে, তখন দুঃখ

আছে বৈ কি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য Peter Green "The Problem of evil" নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে দুঃখের নানা কারণ দেখাইয়াছেন ঐ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম অধ্যায়গুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দুঃখ ও তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। একালের দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার (জন্ম ১৭৮৮ এবং মৃত্যু ১৮৬০) এবং ভণহার্টমম্যান্ অগ্রণী। তাঁহারা আবার ইহাও বলিয়া গিয়াছেন—"সুখের আশা নাই, সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর"; আমরা *কিন্তু এমতে স্থির থাকিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মবাদী মোরেষ্টীয় মীথা বলেন "পাপই দুঃখ ভোগের মূল কারণ; তিনি লোকদের সামাজিক পাপেরই অধিকতর উল্লেখ করেন"। আবার দার্শনিক সাধু পৌলের ভাষায় দেখা যায় যে (রোমীয় ৮; ২৭) সমগ্র সৃষ্টির পাপ-পীড়িত জীব (মনুষ্য) মাত্রকেই দুঃখাধীনের অবস্থায় লক্ষ্য করা হইয়াছে; সুতরাং দুঃখের (পাপের) অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি না; এবং তৎসঙ্গে একথাও বলিব যে ঈশ্বর পাপের বা মন্দের কারণ হইতেই পারে না।

আর এক কথা এই—"Passimism" আসিয়া মাথা নাড়িয়া বলেন যে, "One that regards every thing in the world as radically bad," এই কথাটা জোর পূর্ব্বক মানিয়া লইতে মন রাজি হয় না।

* প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ত্ববেত্তাও প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, শারীরিক (অর্থাৎ বাহ্য বা আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মনের সুখ শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক) সুখ শ্রেষ্ঠ, (Republic book IX) সার কথা আত্মবুদ্ধি প্রসাদ হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগম্য সুখকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দকেই ভারতের শাস্ত্রকারগণ শ্রেষ্ঠসুখ বলিয়া মানেন, এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত সকলেই পাইতে পারে এবং সকলেরই তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই এদেশের হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। আমার মনে হয় গীতাতে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে---"নির্ব্বাণের শান্তি" (গীতা ২। ৭১। ৬। ২৮। ১২। ১২। ১৮ ৬২। দেখ) অর্থাৎ পরম শান্তি এবং ইহাই স্থিত প্রজ্ঞের ব্রাহ্মী অবস্থার চরম সুখ।

"লিব্নিজের" কিন্তু ঐ মত দেখা যায়, সাধু পোল ইহা স্বীকার করেন নাই বরং এই কথা বলিয়াছেন যে "Fruit of the Spirit is joy." অতএব আমরা নিশ্চয়ই ঘোষণা করিব যে "Passimism is not true." আবার "Optimism doctrine" আর এক পা অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলেন—"That every thing is for the best." এই যে "Best," ইহা এক সময় ছিল বটে; তারপর এই "Best" মলিনতায় (আত্মার যাবতীয় মালিন্যে) পর্য্যবেশিত হইয়া যায়, একথা বলিলে দোষ বর্ত্তে না।

"সুখ" শব্দে কেবল যে নিম্নপর্য্যায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখই বুঝিতে হইবে এমন কোন আইন বা নিয়ম নাই। "সুখ" শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে ধর্ম্মজগতে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিতে বাধা কি আছে? ঐ অর্থেই মানুষ আশস্ত ও প্রত্যাশায় স্থির থাকিবে। বুদ্ধ, শোপেনহাওয়ার, লক্, লিব্নিজ, ভণ্হার্টম্যান্, ইহাদিগের শিষ্যগুলী মনুষ্যজীবনের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশাকে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের এমন কি উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন? এস্থলে খ্রীষ্টীয় দর্শন উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ দিয়া বলিতেছে যে মনুষ্যের চিরসুখলাভের উপায় আছে, জীব (মনুষ্য) যদি সেই উপায়টী গ্রহণ করে। এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্ব্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল, এই দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ও শিক্ষার ভিত্তি ছিল—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধ কি দুঃখের (পাপের) হানি করিতে পারিয়াছিলেন? কামনা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে। বুদ্ধদেব, আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করেন নাই, তিনি দুঃখ বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিরসুখ লাভের পন্থাটী প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এখন আর একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে—এই প্রকৃতিপুঞ্জকে

বিকৃত অর্থাৎ মলিন ভাবে সাজাইল কে? প্রকৃতির বিকারই যদি দুঃখের কারণ হয়, তবে জগতে এই দুঃখের মুলোৎপাদক কোথায়? ইহার উত্তর দান কালে, বিদ্রূপাত্মকভাবে পাঁচ জনে, পাঁচ কথা বলেন, ও তুমুল কোলাহল করেন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া নাস্তিক সমাজে তীব্র কোলাহল চলিতেছে বটে, কিন্তু এই প্রশ্নের যেখানে সম্যক সমাধান হইয়াছে সেখানে তাহারা পৌঁছিতে সম্মত হন না। (পাঠক ইচ্ছা করিলে পণ্ডিত Hastings Rashdall মহোদয় কৃত "Theory of good and evil" নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে "Good and evil" এই দুইটির অবস্থার বিষয় বুঝিয়া লইতে আর সন্দেহ থাকে না) কাজেই আমাদিগকে বলিতে হয় যে তাঁহারা দুঃখোৎপত্তির হেতু নির্ণয়ে অসমর্থ; কারণ তাঁহারা নিজেদের মধ্য হইতে একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন না; অথচ আমরা দুঃখের যে কারণ দেখাই তাহাও স্বীকার করিতে রাজি হয় না এইখানে একটা বিরোধ ঘটিয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দর্শন দুঃখোৎপত্তির যে কারণ প্রদর্শন করেন, জগৎ তাহা জানে; সে কারণ, জগতের সম্মুখে, নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। সেইটীর মূলাকর্ষণ করিলেই সত্যের স্তরে আসিতেই হইবে। এবং উহা স্বীকার করিয়া লইলে আর কোন গোলই থাকে না। আবার প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যময় তবে জগতে কুৎসিতের, মন্দের, পাপের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তবে জগতে দুঃখ কেন? আমাদিগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতগণ বহু বৎসর পূর্ব্বে এ প্রশ্নের সমাধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মস্তিষ্কেও এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ইহা কিছু নূতন নহে। জগতের বাল্য ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে সৃষ্টির ষষ্ঠ কল্প পর্য্যন্ত এই সাক্ষ্য আছে যথা—"ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।" তবে জিজ্ঞাসা এই যে এই "উত্তমে", অধমতা, মলিনতা, কুশ্রী, দুঃখ, দোষ ইত্যাদি সব আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তর আছে। ঈশ্বর যিনি, তিনি "মন্দের ঈশ্বর নন।" মানুষ (জীব)

"সৃষ্টিকর্ত্তার অবাধ্যতা প্রযুক্ত" দুঃখাধীন হইয়াছে। এই স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা স্বীকার না করিলে দুঃখবাদীদিগের কোন মূল্যই থাকে না। ঐ সংজ্ঞার মধ্যে দুঃখের সমস্তই হেতু স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে; যদিও সংসারের সকল দুঃখের হেতু নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হয়, তাহা হইলেও মূল বিষয়টীতে সন্দেহ নাই। ঐ মূল বিষয়টীকে বিশ্লেষণ কর; দেখিবে, দুঃখোৎপত্তির সকল ধারা পর্য্যায়ক্রমে বাহির হইবে। আর উহা যদি অস্বীকার কর তাহা হইলে তোমরা যাহাকে ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক বলিতেছ তাহা টীকে কৈ? সুতরাং জগতকে স্বীকার করিতেই হইবে যে জীব (মনুষ্য) "আজ্ঞালঙ্ঘন" এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া "দুঃখের অধীন হইয়াছে।" অতএব "জীবের পতন" স্বীকার না করিলে আর কোন সদুত্তর নাই এবং কেহ দিতেও পারিবে না।

পুনশ্চ, খ্রীষ্টীয় দর্শনে ইহাও প্রকটিত হইয়াছে যে, যে স্থান হইতে দুঃখোৎপত্তি হইয়াছে সেই স্থান হইতে অপবর্গের পথও উন্মুক্ত হইয়াছে; ফলতঃ একদিকে আদমের পাপের ফল যেমন স্বীকার্য্য, অপরদিকে যীশু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতার ফল মনুষ্যের প্রত্যাশার অমোঘ উপায়, তাহা না মানিলে জীবের কোন ভরসাই থাকে না এবং ঈশ্বরের প্রেমও পরাজিত হয়; সুতরাং আমাদিগের এই সদুত্তর স্বীকার করিয়া লইলে সংশয়বাদীদিগের কোন সন্দেহই থাকে না, এবং হিন্দুদর্শনের একটি প্রতিবন্ধকজনক শিক্ষা অপসারিত হয়। ইহাতেও যদি হিন্দুদার্শনিক পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস স্থাপন করিতে সন্দেহ বা ভয় হয় তাহা হইলে রোমীয় পত্রের ৯, ১০ ও ১১ এই তিন অধ্যায় পাঠ করুন। এই তিনটী অধ্যায়কে "Paul's philosophy of history" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ "মনুষ্যের পতনে ঈশ্বরের দোষ নাই।"

পাপের গুরুত্ব ও অনিষ্টকারিতা বিষয়ে আমাদিগের যথোচিত বোধ নাই। আমরা কেবল তখনি পাপ করিতে পারি যখন আমরা ইচ্ছা করি। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে কার্য্য, তাহাই পাপ; এক প্রকার রোগ, অপরাধ ও অশুচিতা পাপের প্রকৃতির ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা। পাপের

বিষয়ে বাইবেলের ধারণাও' আমাদিগের চিন্তাতীত, আবার অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিবিষয়ক ধারণা আরো চমৎকার। নানাবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি স্ফটিক পুষ্পপাত্র মাটিতে ফেলিয়া দিলে ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড হয়, কেহ কি আবার তাহা জুড়িয়া সেই ছিন্নভিন্ন পুষ্পসৌরভ সংগ্রহ করতঃ পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি করিয়া রাখিতে পারে? পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও পূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখাইয়া কি নির্ম্মাণকর্ত্তার নিপুণতার ও কল্পনা শক্তির পরিচয় দিতে পারে? কিন্তু মনুষ্যজাতির পতনের সহিত তুলনা করিলে পুষ্পপাত্র ভঞ্জন অতি সামান্য বিষয়—সেই পতনে মনুষ্যের বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন, অন্তকরণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন, সংবেদ দোষভারগ্রস্ত, ইচ্ছা পাপের পরবশ, চিন্তাশক্তি ভ্রষ্ট, এবং তাহার আত্মা, প্রাণ ও মনোবৃত্তি সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে মানুষ আজ্ঞা লঙ্ঘন ও পাপহেতু এমন মরিয়া গিয়াছে যে, অন্তর বাহির সর্ব্বাঙ্গ পাপের অধিকৃত, অথচ বাইবেলরূপ গৃহের ভিত্তিস্বরূপ "আদিপুস্তক" হইতে সর্ব্বোচ্চতম চূড়া "প্রকাশিত বাক্য" পর্য্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্তির ভাব সর্ব্বত্র দেদীপ্যমাত্র। আহা! সেই মুক্তির উপায়ই বা কি চমৎকার! পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমা দত্ত হওয়াতে আমাদিগের আত্মা তুষার অপেক্ষাও শুভ্র। (গীত ৫১; ৭) শত্রু সম্মিলিত (কল ১; ২১) ও ঈশ্বরের পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত (রোমীয় ৮; ১৫) দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত (রোমীয় ৮; ১) ও স্বর্গরাজ্য মুক্ত (প্রে, ক্রি, ৭; ৫৬) হৃদয় পরিবর্ত্তিত (প্রে; ক্রি; ১৫; ৯) ইচ্ছা স্বাধীন, মন আলোকিত হইয়াছে (ইব্রীয় ৮; ১০) সংক্ষেপতঃ, যে স্থানে দুঃখের ও পাপের বাহুল্য হইল সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল। (রোমীয় ৫; ২০) খ্রীষ্টীয় দর্শন ব্যতীত আর কোথাও কি এরূপ হৃদয়গ্রাহী চমৎকার শিক্ষা, ভাব, ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়? খ্রীষ্টীয় দর্শন আমাদিগের সম্মুখে এইভাবে প্রাঞ্জল ও আশাজনক ব্যাখ্যা প্রদান না করিলে, মানুষের কল্পনা পথেও, ইহা কখনও আসিত না এবং "Obedience to God by Imitation of Christ" এ কথা বলিলে কোন দোষ বর্ত্তে না। সে দয়ার প্রাচুর্য্যে

আমরা যে কেবল আদিকালীন পরম দেশ ও আদমের অপতন অবস্থা ইত্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নহে, বরং যাহা হারাইয়াছিলাম, তাহার অধিক লাভ করিয়াছি এবং সৃষ্টিকালে আদমের যে অবস্থা ছিল তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছি; খ্রীষ্টীয়দর্শন ও ধর্ম্মের ইহাই একটি প্রধান গৌরবজনক বিষয়। যদিও হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে "খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যায় নে ন চ, পাপকৃন্মুচ্যতে * পাপাৎ তথা দানেন চাপদি"—এই কথা পাওয়া যায় কিন্তু ইহা দুঃখ পাপ মোচনের উপযুক্ত নহে। ঋষিগণ পন্থা আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায় আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বর তাঁহার জীবগণের আচরণের দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মিশ্রিতরূপে তাহাদিগকে সুখী ও দুঃখী করেন না কেন? কেন তিনি তাহাদের নিজ কার্য্যের সহায়তা ব্যতীত তাহাদিগকে সুখী করেন না, এবং যাহাতে তাহারা দুঃখী না হয় তাহা করেন না কেন? ঈদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা একটি পৃথক বিষয়। বোধ হয় এ বিষয়ের প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে মিশ্রিত সুখ দুঃখ ভোগ করা অসম্ভাবনা থাকিতে পারে। অথবা বোধ হয়, বর্ত্তমানে যে পরিমাণে সুখোৎপত্তি হইতেছে তাহা অপেক্ষা অল্পতর সুখোৎপত্তি হইবে বলিয়া ঈশ্বর মিশ্রিতভাবে সুখ দুঃখ বন্দোবস্ত করেন নাই; অথবা বোধ হয়, সুখোৎপত্তি করাই ঐশ্বরিক উত্তমতার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য না হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসী, সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তিকেই সুখী করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে। বোধ হয় একজন অসীম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহার জীবগণকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে সম্বন্ধ রাখিয়াছেন ও তাঁহার নিজের সহিত তাঁহার জীবগণের যে সম্পর্ক আছে তাহারা যে তদনুসারে আচার ব্যবহার করে, ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

* ইহার ইংরাজী অনূদিত অংশ এইরূপ যথা—*i. e.* 'a sinner get rid of his sins, (i) By Expressing it to others. (ii) By Repentance. (iii) By Prayers. (iv) By Studing (Religious) etc. (v) By Practising Charity.

আবার তাঁহার সহিত তাহাদের যে সম্পর্ক আছে, তাহা তাহাদের অস্তিত্বকালে তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ; কেননা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও প্রয়োজনীয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, বোধ হয় একজন অসীম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তাঁহার সৃষ্টির সুখোৎপাদক বলিয়া এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠার স্বাভাবিক গৌরব আছে বলিয়া তিনি তাঁহার নৈতিক জীবগণের এই নৈতিক ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন। অথবা ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও এইরূপে শাসন করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অথবা, যেমন অন্ধের পক্ষে বর্ণানুভব করা অসম্ভব, তেমনি এ বিষয়ে অসম্ভব। কিন্তু সে যাহাই হউক, অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা সকলেই নিশ্চয় জ্ঞাত আছে যে, ঈশ্বরের সাধারণ শাসনপ্রণালী এইরূপ যে, তিনি আমাদিগকে অগ্রেই জানাইয়া দেন, অথবা তিনি আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, আমরা পূর্ব্ব হইতেই অল্প বা অধিক স্পষ্টরূপে হউক দেখিতে পাই যে, যদি আমরা এইরূপ এইরূপ কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরা এইরূপ এইরূপ সুখভোগ করিব, আর যদি এইরূপ এইরূপ কার্য্য করি তাহা হইলে আমরা এইরূপ এইরূপ দুঃখভোগ করিব। সুতরাং ঐ সকল সুখ-দুঃখকে আমাদের নিজ নিজ কার্য্যের ফল বলিতে হইবে, কেননা ঈশ্বরের শাসন প্রণালীতে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে এবং যাহাতে তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারি তিনি আমাদিগকে এরূপ মনোবৃত্তিও দিয়াছেন। পুনশ্চ, কর্ম্মের জন্য দণ্ড ও পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে যাহা প্রমাণ পাই তাহাও এস্থলে ব্যাখ্যাত হইতেছে :—"মনুষ্যগণকে তাহাদের কর্ম্মের জন্য কেবল দণ্ড ও পুরস্কার দিলেই নৈতিক শাসন হয় না। অতি নিষ্ঠুর ও উপদ্রবকারী ব্যক্তি তাহা করিতে পারে ; কিন্তু ধার্ম্মিককে পুরস্কার করা ও দুষ্টকে দণ্ড দেওয়াই নৈতিক শাসন, অর্থাৎ মনুষ্যগণের সকলকে কর্ম্মানুসারে পুরস্কার ও দণ্ড দেওয়াকেই নৈতিক শাসন বলে।

আবার বুদ্ধিমান জীবগণ সম্বন্ধে তাহাদের স্ব স্ব দোষ গুণের প্রকৃত পরিমাণানুসারে দণ্ড ও পুরস্কার করিলে তবেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্দ্দোষ নৈতিক শাসন হয়। কোন কোন ব্যক্তি মনে করে যে, অবিমিশ্র অনিয়ন্ত্রিত উপচিকীর্ষাই পরমেশ্বরের একমাত্র চরিত্র, অর্থাৎ তাঁহার জীবগণের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাদিগকে কেবল সুখী করাই তাঁহার ইচ্ছা। এস্থলে স্বাকার করা গেল যেন উপচিকীর্ষাই ঈশ্বরের একমাত্র চরিত্র; তাহা হইলে উপচিকীর্ষাকে প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত করা ব্যতীত সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা তাঁহার নিকট কিছুই নহে। এক্ষণে, যাবৎ উহা প্রমাণ করিতে না পারা যায়, তাবৎ এরূপ বলা উচিত হয় না; কেননা ঈদৃশ একটি গুরুতর বিষয়ে আমাদের সতর্কতার সহিত ও সম্মান পূর্ব্বক কথা কহা কর্ত্তব্য। আর ইহা প্রমাণ করিতে পারা যাউক বা না যাউক, এখানে তাহা আন্দোলন করা যাইতেছে না, কিন্তু জগতের গঠন ও আচরণে—নৈতিক শাসন ও তাহার একজন ন্যায়বান শাসনকর্ত্তা স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় কি না, তাহাই অনুসন্ধান করা' যাউক। বিশ্ব মধ্যে সম্ভবতঃ এরূপ জীবগণ থাকিতে পারে, যাহাদের নিকট ঈশ্বর আপনাকে এই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও রমণীয় চরিত্রে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি আমাদের নিকট আপনাকে ন্যায়বান শাসনকর্ত্তা স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন; কেননা আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে দেখিতে পাই যে, তিনি (ঈশ্বর) আমাদের উপর প্রভুর ন্যায় শাসন কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, কারণ তিনি আমাদিগকে আমাদের কর্ম্মের জন্য দণ্ড ও পুরস্কার দিয়া থাকেন"। সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল প্রকৃতিতে অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতিতে দেখিতেছি যে, সুখও আছে, দুঃখও আছে; মঙ্গলও আছে, অমঙ্গলও আছে। ইহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা নিরর্থক। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যতটুকু দুঃখের স্পর্শ থাকিলে সুখের স্ফুর্ত্তি হয়। যতটুকু অমঙ্গলের সংঘর্ষে মঙ্গলের অভিব্যক্তি হয়, এখানে ততটুকুই দুঃখ আছে, ততটুকুই অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি অপূর্ণ বলিয়াই তো এখানে সুখের

সঙ্গে দুঃখ আছে, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল মিশ্রিত থাকে। প্রকৃতিতে যদি দুঃখ না থাকিত, অমঙ্গলের ছায়া যদি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতে না পারিত, তাহা হইলে প্রকৃতির ক্রোড়েই জাত ও লালিত-পালিত প্রত্যেক মানবাত্মাও এক একটী পূর্ণমঙ্গল পরব্রহ্ম হইত; তাহা হইলে সুখ-দুঃখময় মঙ্গল-অমঙ্গলময় এই সৃষ্টির অস্তিত্বই থাকিত না নিঃসন্দেহ। প্রকৃতির প্রত্যেক অংশ এবং প্রত্যেক মানবাত্মা পরব্রহ্ম হইলে কি অবস্থা হইত, তাহা আমাদের বোধের অতীত। আর জগৎ কেবলই দুঃখেরও আধার নহে। জগৎ যদি সুখ ও মঙ্গলের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া কেবল দুঃখেরই আধার হইত, তাহা হইলে প্রকৃতিতে জীবনরক্ষার জন্যে এত চেষ্টা দেখা যাইত না; সকলেই তো সেই জীবনব্যাপী দুর্ব্বিষহ দুঃখযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুরই আশ্রয় লইতে সহজেই অগ্রসর হইত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মৃত্যুর আশ্রয় লইতে ছুটিবার পরিবর্ত্তে, ক্ষুদ্রতম হইতে শ্রেষ্ঠতম পর্য্যন্ত জীবজন্তুমাত্রেই মৃত্যু হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা চরিত্র করে।

দুঃখ বা অমঙ্গল অস্বীকার করিবার চেষ্টা বৃথা। ভগবান যখন পূর্ণমঙ্গল, তখন তাঁহার রাজ্যে যে দুঃখ বা অমঙ্গল বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে, অনেক ভক্তিমান ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। প্রকৃতি অপূর্ণ বলিয়াই জগতে সুখের সঙ্গে দুঃখ আছে, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল আছে, এই সহজ যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা নানাবিধ দার্শনিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, জগতে দুঃখ বা অমঙ্গল বলিয়াই কোন কিছু নাই—সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়ই এক সমান, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন। কিন্তু ইহা তো সর্ব্ববাদ-সম্মত যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে শত দার্শনিক যুক্তিতর্ক, সহস্র অনুমান এবং লক্ষ আগম প্রমাণও ব্যর্থ। দুঃখ ও অমঙ্গল প্রত্যক্ষ দেখিলেও জগতে তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কতদূর সঙ্গত বা ইহাতে প্রকৃত লাভ কি তাহা জানি না। এরূপ চেষ্টার প্রকৃত মূল্যই

বা কি? কাহারও সুখসম্পদ বা কল্যাণ লাভ হইলে কি লোকে বলিবে যে, সে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে বা তাহার অমঙ্গল ঘটিতেছে? অথবা সে দুঃখকষ্ট ও তজ্জনিত নিরানন্দ ভোগ করিতে থাকিলে কি লোকে বলিতে পারে যে, সে সুখের সাগরে ভাসমান হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে? প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া লোকের ঘরের প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত হইলে কি লোকদিগকে বলপূর্ব্বক বলাইতে পারা যায় তাহাদের ঘরে অন্নসংস্থান নাই এবং তাহারা অনাহারে শুকাইয়া মরিতেছে, কারণ দার্শনিক যুক্তিতর্কের বলে হয়তো প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অন্নসংস্থান ও অন্নের অভাব, উভয়ই এক, আহার ও অনাহার উভয়ই এক ও অভিন্ন? মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবু কি জোর করিয়া সেই সকল মৃত গ্রামবাসীদিগকে জীবিত বলিতে হইবে, কারণ দার্শনিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে, জানি না, কিন্তু হয়তো জীবন ও মরণকে এক সমান প্রমাণ করিলেও করা যাইতে পারে? অপূর্ণতার কারণেই যখন জগতে সুখের সঙ্গে দুঃখ থাকিবেই মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল থাকিবেই, তখন নিরর্থক দার্শনিক গোলোকধাঁধায় প্রবেশ করিয়া কোনই লাভ নাই; বৃথা কল্পনারাজ্যে উড়িয়া ঈশ্বরনিরূপণে উদ্যত হইয়া অসত্যের অন্ধকারে আপনাকে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিলে লাভের পরিবর্ত্তে সমূহ অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। "Sin is the chief cause of our sorrow on earth"—এ কথা আজও কেহ খণ্ডন করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় দর্শনের এই সংজ্ঞা একটী খাঁটি ও অখণ্ডনীয় দাবী স্বরূপ হইয়া আছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব।

আমরা এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এমন প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিব না, যাহা পাঠকদিগের অকাট্য বোধ হইবে, কারণ ধর্ম্মজগতে অকাট্য প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব।

খ্রীষ্টীয় দর্শন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে কেন? ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিবার জন্য পাশ্চাত্য জগতের খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন আমি তাঁহাদিগেরই ব্যাখ্যা নিষ্কাষণ করিয়া এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। এই বিষয়টীর মধ্যে সাতটী অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস সত্যধর্ম্মের এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ।

(২) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যীশু খ্রীষ্টের নিজ বিশ্বাস কিরূপ।

(৩) বিবেকের দংশন।

(৪) যীশুর দ্বারা বিস্তার ও প্রভাব।

(৫) প্রার্থনা ও অভিজ্ঞতা।

(৬) ব্যক্তিত্ব অসীম হইতে পারে কি?

(৭) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যের ধর্ম্মবিশ্বাস।

আমরা সম্প্রতি কেবল ইহাই দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি যে, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাতে বিজয়ী হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ব্যক্তি-বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার উপর বিশ্বাস করা আবশ্যক। অধিকন্তু, যাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি-জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্ব স্ব ধারণার পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে, আমরা পাঠকদের নিকট তাহার কয়েকটি কারণ প্রদর্শন করিব। আমরা যদি একদিকে দেখাইতে পারি যে, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যদের বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও মূল্যবান্ এবং অন্যদিকে আবার তৎসম্বন্ধী প্রধান প্রধান আপত্তিগুলির খণ্ডন করিতে পারি, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইব, আমরা এই স্থানে ইহার অধিক কিছু করিবার চেষ্টা করিব না।

(১) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস সত্যধর্ম্মের এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ কি না?

আমরা একণে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইলাম:—ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস-সম্বন্ধে আমাদের প্রথম মন্তব্য এই যে, আমরা যদি ঐ বিশ্বাস সম্পন্ন না হই—যদি ঈশ্বরকে আপনাদের ব্যক্তিগত পিতা বলিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার উপর পুত্রে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে, তেমনই বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের কাছে সত্য-ধর্ম্মের তেজঃ নষ্ট হইয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে মনুষ্যেরা পাপক্ষমা, অনন্ত-জীবন প্রভৃতির সম্বন্ধে অমূল্য শিক্ষা পাইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের ফলে তাহারা মনুষ্য ও মানব-সমাজের বিষয়ে যারপরনাই সুন্দর ভাববিশিষ্ট হইয়াছে। যেই আমরা পিতা—ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করিতে নিরস্ত হই, অমনি পাপক্ষমা, অনন্তজীবন প্রভৃতিতেও আমাদের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া যায়। মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা নিশ্চিত-রূপে বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার ফলে মনুষ্যেরা যে পরিমাণে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাস করে, সেই পরিমাণে আপনাদের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বিরত হয়। মনুষ্যেরা যদি একবার এই ধারণাতে উপনীত হয় যে, যে শক্তি বিশ্বে কার্য্য করিতেছে, তাহা অন্ধ, মূক ও বধির তাহা হইলে আর আপনাদিগকে ঠিক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিবে না,—তাহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগকে প্রকৃতির অঙ্গমাত্র মনে করিবে। তাহারা আপনাদের বিবেচনায় এমন কোন প্রকাণ্ড নির্জ্জীব ও আত্মাহীন যন্ত্রের চক্র সদৃশ হইবে, যাহার তোড়জোড়, ব্যবহৃত হইবার পর, অব্যবহার্য্য ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইব যে, যে স্থানে মনুষ্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই স্থানে মানব-

স্বভাবের সম্বন্ধে অনুপযুক্ত বা নিরাশ ভাব প্রচলিত হইয়াছে। সে স্থলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, "স্বর্গস্থ পিতা আছেন কি না" ?—এই প্রশ্নটী সমস্ত মানবজীবনের পক্ষে যারপরনাই গুরুতর। ঐ প্রশ্নটীর যথার্থ উত্তরের উপর কেবল আমাদের নিজ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা নয়—মানবজাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্য উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের আশা ভরসার সফলতাও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গস্বরূপ, অল্প লোকেই সম্ভবতঃ তাহা অস্বীকার করিবে বটে, তবু কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এতদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে আমরা সহজে এই ধারণাতে উপনীত হইব যে, যাহারা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত পিতৃত্বের সম্বন্ধে উদাসীন, তাহাদের ধর্ম্ম ও যীশু-খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ও শিক্ষার মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। যে ধর্ম্মের তিনি কেন্দ্রস্থল, তাহা মনঃকল্পিত দর্শনশাস্ত্র নহে। ঐ ধর্ম্ম আবার নৈতিক পদ্ধতি বা রস-বিন্যাসংক্রান্ত স্বপ্নমাত্র নহে। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং দর্শন উভয়ের দ্বারা এমন বুঝায়, যাহা ঈশ্বরের সহভাগিতায় যাপিত হইয়া থাকে এবং ঐতিহাসিক সত্যসমূহের উপরে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে এইদুইটী কথা স্মরণে রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়ঃ—(১) খ্রীষ্টধর্ম্ম যীশুর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। (২) খ্রীষ্টধর্ম্ম এমন একটি জীবন-পদ্ধতি, যাহা ঈশ্বরের সংসর্গে বা সহভাগিতায় যাপিত হয়। উল্লিখিত সত্যদ্বয় স্মরণে রাখিলে আমরা কখনই মনে করিতে পারি না যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক তাহাতে তত আসে যায় না, কেননা ঐ বিশ্বাস খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে। আমরা এখন যাহা বলিলাম, তাহার সত্যতা প্রদর্শন করিবার জন্য অন্যান্য গুরুতর ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ করিব, যাহাতে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষভাবে সপ্রকাশ হয়।

(২) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যীশুর নিজ বিশ্বাস কিরূপ

আমরা যদি যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র ও শিক্ষা উপলব্ধ করিতে ইচ্ছা করি,

তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বর সম্বন্ধী মনোভাবের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। সুসমাচার পড়িতে আরম্ভ করিলেই, পাঠকের নিকট যীশুর পিতা—ঈশ্বর বিষয়ক অপূর্ব্ব জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের প্রথমভাগ পড়িয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, তিনি বাল্যেও আপন পিতার প্রসঙ্গ করিতেন এবং ঐ বৃত্তান্তের শেষভাগ পড়িয়া আমরা তাঁহাকে মৃত্যুকালে পিতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে দেখি। তিনি যাবজ্জীবন অপূর্ব্বপরিমাণে পিতার সান্নিধ্য—অনুভব ও সহভাগিতা—উপভোগ করিতেন। তিনি প্রেম, বিশ্বাস, ও আশাসহকারে ঈশ্বরের সংসর্গে থাকিতেন; ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ও কার্য্য সাধন তাঁহার খাদ্যস্বরূপ ছিল। প্রার্থনা যীশুর আধ্যাত্মিক জীবনের শ্বাসবায়ু সদৃশ ছিল। পাপী মনুষ্যদের নিকট পিতাকে প্রকাশ করা তাঁহার জীবনোদ্দেশ্য ছিল। তিনি এমনভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবন ধারণ করিতেন, যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়াছি"। মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁহার আশা ভরসা কেবল ঈশ্বরের প্রেম ও দয়ার উপরেই নির্ভর করিত। অবশেষে তিনি যেন পিতার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। যীশু খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমরা যেন আপনাদিগকে আপনারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, ঈশ্বর যদি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট না হন, তবে যীশুর জীবন বৃত্তান্তের অর্থ কি? যীশুর জীবন কাহিনী হইতে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতা ঈশ্বরের কথা বহিষ্কৃত করিলে যার-পর-নাই শোচনীয় ভ্রান্ত ধারণা ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যাঁহারা যীশু খ্রীষ্টের পরিচয় প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কি এক-মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কথিত সহভাগিতা যথার্থ ব্যাপার ছিল না, তিনি কেবল মনে মনে আপনার সহিত আপনিই কথোপকথন করিয়া আপনাকে ভুলাইতেন? তিনি যখন আপন জীবনের শেষে বলিলেন, "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা

সমর্পণ করি," তখন কি তিনি কেবল শূন্যকেই সম্বোধন করিলেন? যীশু যুগে যুগে মনুষ্যদের উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রভাব কি তদ্রূপ আত্মপ্রবঞ্চনার উপর স্থাপিত হইতে পারিত? ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি অসঙ্গত ও নিষ্প্রয়োজনই ছিল, তাহা হইলে যীশু অতি বিষমভাবে আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন।

উপরন্তু আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, সেকালের হউন বা একালের হউন, মহান বিশ্বাসি মাত্রেই ঈশ্বরের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সংসর্গে কালযাপন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কি না, তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একেবারে অসঙ্গত ও নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। এই বিষয়ে তাঁহাদের মনে লেশ মাত্র সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের বন্ধুত্ব উপভোগ করিয়াছেন। আমরা কোন বন্ধুর বিষয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি না, তিনি কি একজন ব্যক্তি? ঈশ্বর বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার বন্ধুস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন না। যাহারা যে পরিমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য অনুভব করে, তাহারা সেই পরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করে। পক্ষান্তরে মনুষ্যেরা যখন আর পূর্ব্বের মত ঈশ্বরের প্রকৃতত্ব ও সান্নিধ্য অনুভব করে না, তখনই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ চাহিতে আরম্ভ করে। খ্রীষ্টীয় দর্শন ও বাইবেলে আমরা এমন ঈশ্বর ভক্তদের পরিচয় প্রাপ্ত হই, যাঁহারা বিশ্বাসে শিশুবৎ ছিলেন। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া জানিয়া, তাঁহারা একেবারে সরলভাবে তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং বাইবেল পাঠ করিবার সময়ে আমাদের বোধ হয়, যেন ঈশ্বর কোমল, সরল ও ব্যক্তিগত প্রেমের সহিত মনুষ্যদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন, এবং

অন্যদিকে আবার তাঁহার বিশ্বস্ত প্রেমিকগণ ঐশ্বরিক প্রেমের উপযুক্ত ভাবে প্রতিদান করিতেছেন।

(৩) বিবেকের দংশন।

ঈশ্বরের ব্যক্তিতে আমাদের বিশ্বাস এমন একটি মনঃপ্রবৃত্তির দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, যথাসম্ভব বিকাশ হইলে পর, যাহাকে সচরাচর অদ্বৈতবাদ বলে। মনুষ্যমাত্রেরই উক্ত প্রবৃত্তি বা প্রলোভন জন্মিয়া থাকে। যাহার জীবনে ঐ প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, সে উত্তম জীবন-পদ্ধতি বা আপন জীবন সম্বন্ধী দায়িত্বের বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতে ভাল বাসে। যে পথ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও প্রতিবন্ধকবিহীন, উক্ত ব্যক্তি সেই পথে চলিতে ভাল বাসে। যাহারা এই প্রকার জীবন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের তত সহজে আধ্যাত্মিক জাগরণ হয় না। পক্ষান্তরে, যখন তাহারা আপনাদের জ্ঞাতসারে কোন বিষম কু-কার্য্য করে, তখন তাহাদের চেতনা লাভ করিবার সম্ভাবনা হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যখন আমাদের জীবনে কোন অসামান্য দুর্ঘটনা ঘটে—যখন আমরা কোন ভয়ানক কু কার্য্য করি, তখন আমরা চেতনা লাভ করি; তখন আমরা যার পর নাই স্পষ্টভাবে আপনাদের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের অনুভব ও উপলব্ধি করি। আমরা তখন বেশ বুঝিতে পারি যে, আমরাই একপক্ষে আছি এবং অন্য পক্ষে—আমাদের কু-কার্য্যের বিপক্ষেই, হইতেছেন ঈশ্বর। তিনি আমাদের কু-কার্য্য দেখিয়াছেন; তাঁহার রব আমাদের সংবেদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে মনুষ্য স্বকৃত পাপের যেন সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যে বিবেকের দ্বারা দংশিত হইয়া আপন কু-কার্য্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, সে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে পারে না যে, ঈশ্বর ও তাহার মধ্যে পার্থক্য নাই—উভয়েই এক। সেস্থলে সে বিনা তর্কে এই ধারণাতে উপনীত হয় যে, সে ঈশ্বর হইতে

পৃথক। বিবেককে বলি দিতে পারিলে আমরা হয়ত এমন নানাবিধ সহজ ও সন্তোষজনক যুক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব, যাহা অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিবে। তাহা হইলে সকলই ঈশ্বর হইবে। তাঁহা ছাড়া আর কাহারও বা কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না। মানব হৃদয়ের যথার্থতা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্ত্তী প্রভেদ, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যস্থ পার্থক্য প্রভৃতি নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে, যদি আমরা বিবেককে কথা কহিতে দিই, তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, কারণ তাহা হইলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, মানুষের নৈতিক ব্যবস্থা হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা, কাজেই সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া, আমরা তাঁহার সংসর্গ-স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছি।

(৪) যীশুর দ্বারা বিস্তার ও প্রভাব।

যাঁহারা যীশুকে আপন আপন হৃদয় ও জীবনের উপর প্রভাব-বিস্তার করিতে দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঐ প্রভাবের সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি জানিতে পারিব? তাঁহারা নিঃসন্দেহে আমাদিগকে এই কথা বলিবেন যে, তাঁহারা যীশুর সম্বন্ধে দুইটী চমৎকার সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াছেন।

(ক) তাঁহারা তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সংস্কারবিশিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্রতা চমৎকাররূপে তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে তাঁহাদের এমন বোধ হইয়াছে যে, যীশুর পবিত্রতা অমেয় ও তাঁহাদের বোধাতীত, তাহাতে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে মহত্তর।

(খ) তাঁহারা যীশুর প্রেম সম্বন্ধী অপূর্ব্ব সংস্কার বিশিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন যে, যীশু তাঁহাদের প্রত্যেককে খুঁজিতেছেন। তাঁহার প্রেম এমন চমৎকার যে, যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা তাঁহার

বশীভূত হয়, সেই পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। আমরা যখন এইরূপে যীশুর সংসর্গে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করি, তখন হঠাৎ বা ক্রমশঃ এই ধারণাতে উপনীত হই যে, তাঁহার কথা, ও কার্য্যকলাপে এমন কিছু সপ্রকাশ হইতেছে, যাহা যীশুর বর্ত্তমানতার অপেক্ষা মহত্তর—যাহার মহত্ত্ব অসীম। আমরা যীশুতে এমন শক্তিকে সপ্রকাশ হইতে দেখি, যাহা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া অপূর্ব্ব প্রকারে আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে। এক্ষণে আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, সেই সত্তা—সেই শক্তি কে বা কি? আমরা তাহার কি নাম রাখিব? ইহার উত্তর দিতেছি—সেই সত্তা ও শক্তি যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহা যীশুর নিখুঁত পবিত্রতা, প্রেম ও সত্যের মধ্য দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এবং ঐ গুণগুলিকে কোন ব্যক্তির গুণ ভাবিতে না পারিলে ঐ গুণগুলির কোন বোধগম্য অর্থই নাই। অধিকন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, সরল ও নম্রভাবে সেই সত্তা ও শক্তির উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিলেই আমরা যথার্থই সত্য অবগত হইব, যারপরনাই তৃপ্তিকর বিশ্রাম পাইব এবং এমন শক্তি, আনন্দ ও স্বাধীনতা লাভ করিব, যাহা নিরুপমভাবে জগতের উপকারে আসিবে। সেস্থলে আমরা কি উপরিলিখিত প্রশ্নের এই উত্তর দিতে বাধ্য হই না যে, যে সত্তা ও শক্তির কথা হইতেছে, তাহা ঈশ্বর সেই সজীব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতা ঈশ্বর, যীশু যাঁহার প্রিয়পুত্র ছিলেন? যে ঈশ্বরকে যীশু আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—যে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের জীবনে আমাদের নিকট সপ্রকাশ হইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ঈশ্বর। যীশু যাঁহাকে আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাকে আমরা অন্য কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিতে পারি না। যে আত্মা যীশুর চক্ষুর্দ্বয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনি এমন ব্যক্তি, যাঁহাকে আমরা জানিতে ও প্রেম করিতে পারি। ইহাই খ্রীষ্টীয় দর্শনের ভাষ্যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

(৫) প্রার্থনা ও অভিজ্ঞতা।

যাহারা আদৌ প্রার্থনা করে না, তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য এই স্থানে কোন কার্য্যে লাগিবে না।* প্রার্থনা যাহাতে সত্য অর্থসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য একপক্ষে মনুষ্য এবং অন্যপক্ষে ঈশ্বর থাকা চাই। যখন জীবৎ ঈশ্বর ও সজীব মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত সহভাগিতা স্থাপিত হয়, তখনই প্রার্থনা সম্ভবপর হয়। যতদূর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার জো নাই। যদি এমন কেহ বর্ত্তমান না থাকে, যে আমাদের কথা শুনিয়া আমাদিগকে উত্তর দিতে সমর্থ, তবে আমাদের সেই কথার কি অর্থ হইবে? কোনই অর্থ হইবে না। অধিকন্তু যাঁহারা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা, স্পষ্টভাবে হউক, কিংবা অস্পষ্টভাবেই হউক, বুঝিতে পারেন যে, আর একজন ব্যক্তি তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক যেন তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করাইতেছেন। কেহ যেন তাঁহাদের উপর হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে ত্রুটি-বোধ-সঞ্চার ও বিশ্বাসোৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ বটে, কিন্তু তাঁহারা অন্ততঃ এই ধারণাতে উপনীত হইয়াছেন, যে, যদিও পিতা আপন সন্তান-সন্ততির অভাব সকল জানেন, তথাপি তাঁহাকে সেই সমস্ত অভাব জানানো তাহাদের পক্ষে ভাল। প্রার্থনা, তাহা হইলে, কৃত্রিম ও অসার কার্য্যমাত্র নহে, বরং সজীব ঈশ্বরের সহিত যথার্থ কথোপকথন বা সহভাগিতাস্থাপন। যখন আমরা প্রার্থনায় রত হই, তখন ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমরা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি যে, তিনি আমাদিগকে আপনার সহভাগিতায় আকর্ষণপূর্ব্বক আপন বুদ্ধি ও প্রেমানুসারে, যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা যোগাইয়া দিতেছেন।

* See the present Controversy on prayer—by F. R. Montgomery Hitchcock, M.A. B.D.

তদ্রূপ ঈশ্বর—যে ঈশ্বরের সহভাগিতা আমরা প্রার্থনায় উপভোগ করিয়া থাকি, বাস্তবিকই যথার্থ ব্যক্তি, নতুবা ব্যক্তিশব্দের কোনও অর্থ নাই। যে লোক ঈশ্বরকে যথার্থ ব্যক্তি বলিয়া না জানে তাহার অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিবার অধিকার নাই। যাহারা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন-ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, তাহাদের পক্ষে অলৌকিক কার্য্য একেবারে অর্থশূন্য ব্যাপার। খ্রীষ্টীয় দর্শন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রয়োগ করেন তাহা খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়াই নানা জনে নানা প্রকারে তর্ক করেন। সে তর্ক এই ব্যাখ্যার কাছে নিষ্ফল হইয়াছে।

(৬) ব্যক্তিত্ব অসীম হইতে পারে কি?

লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রধান বা সারবত্তী আপত্তি এই যে, ঈশ্বর ব্যক্তি হইতে পারেন না; কারণ ব্যক্তিমাত্রেই সসীম। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু, তিনি যে, যথার্থ ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের বিবেচনায় ব্যক্তিত্ব এমন একটি ধারণা, যে ধারণা ঈশ্বরের সম্বন্ধে করিতে পারা যায় না। তদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিত্ব সসীম বটে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা যে, নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের সম্বন্ধেও খাটিবে, ইহা কোন মতে বলিতে পারা যায় না। বাহিরের বস্তুব্যূহের ও অন্যান্য মনুষ্যের সংস্পর্শেই আমরা আপনাদের ব্যক্তিত্ব অবগত হই। ঐ সংস্পর্শ ভিন্ন আমরা চিন্তা বা অনুভব করিতে পারিতাম না, আমাদের মানসিক জীবন আদৌ সম্ভবিত না। মনুষ্যেরা, তাহা হইলে, কেবল অপর বস্তু ও মনুষ্যদের সংস্পর্শেই আপনাদের ব্যক্তিত্ব অবগত হয়; ইহাতে তাহাদের সসীমতা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের এই প্রয়োজনীয় কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, উল্লিখিত সংস্পর্শ আমাদিগকে ব্যক্তি করে না, বরং আমাদের কাছে আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশই করে।

আমরা যে, অপর বস্তু ও প্রাণীদের সংস্পর্শের ফলে ব্যক্তি হইয়া উঠি, তাহা নহে, বরং আমরা যে, যথার্থ ব্যক্তি, ইহা সেই সংস্পর্শের দ্বারা আমাদের নিকট সপ্রকাশ হয়। ঈশ্বরের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি স্বয়ং আপন জীবনের আকর, তাঁহার জীবন আর কাহারও উপর নির্ভর করে না—আর কাহারও নিকট হইতে উৎপন্ন হয় না। সেস্থলে, তিনি যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তজ্জন্য তাঁহার আমাদের ন্যায় বাহিরের জগতের প্রয়োজন নাই। তিনি আপনি সজ্ঞান, তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার জ্ঞান সসীম নহে। ফলতঃ সসীমতা বা সান্ততা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ নহে, বরং আমাদের বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বেরই বিশেষত্ব মাত্র। আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই সসীম। যদি আমাদের স্বভাব নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হইত, তাহা হইলে আমরা এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইতে পারিতাম, যে ব্যক্তিত্ব সসীম নহে—অসীম। আমরাই সান্ত বলিয়া, আমাদের ব্যক্তিত্বও সান্ত, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কি বলিতে পারি যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইলে ঈশ্বরও সসীম হইবেন? আমরা তাহা কোন মতে বলিতে পারি না। যাহা আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য, তাহা, সম্ভবতঃ, ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য নহে। যদি আমরা বলি যে, শিব (ঈশ্বর) অশিব, তাহা হইলে আমাদের নিজের কথায় নিজেই কাটা যাইব, কারণ শিব ও অশিব পরস্পরবিরুদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বরত্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিকূল নহে, বরং আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, একমাত্র ঈশ্বরই ব্যক্তিত্বের নিরঞ্জন নিদর্শন। কেহ কেহ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে মনুষ্যের বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি করেন, কিন্তু এই আপত্তি তেমন গুরুতর নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের মানসিক জীবন আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত বলিয়া, আমরা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। যখন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন, তখন আমাদের যেমন হয়, তাঁহারও মনে কি তেমনই কোন প্রকার চিন্তা, মনোভাব বা সঙ্কল্প প্রভৃতির উদয় হয়? এ

বিষয়ে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে কি কোন সাদৃশ্য আছে? এই প্রকার প্রশ্নের আমরা এইমাত্র উত্তর করিতে পারি যে, আমরা জানি না। ঐশ্বরিক মন কেমন করিয়া কার্য্য করে, ইহা আমরা অবগত নহি। পক্ষান্তরে আমাদের এই প্রয়োজনীয় কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত, তাহা আমাদের বোধাতীত বলিয়াই তাহাকে আমরা মিথ্যা-বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করি কোন্ ন্যায়ে? এই জগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধী এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের বুদ্ধির অতীত, তথাপি আমরা সেই সমস্ত তত্ত্ব গ্রহণ ও বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। মনুষ্যের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা বলি না যে, মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। ঐ প্রকারে ঈশ্বরের মানসিক জীবন আমাদের বুদ্ধির অতীত বটে, কিন্তু ঐ জীবনের প্রকৃত তত্ত্বে অবিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আমাদের বুদ্ধির অতীত হইলেও যথার্থ হইতে পারে।

(৭) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিশ্বাস।

মনুষ্যদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের অর্থ কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যাহাতে অপ্রকৃততা হইতে রক্ষা পায়—তিনি যাহাতে আমাদের নিকট অযথার্থ, মনঃকল্পিত বিবরমাত্র বলিয়া প্রত্যক্ষ না হন, তজ্জন্য তাঁহাকে ব্যক্তি জ্ঞান করা আবশ্যক। সত্য বটে, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাবিশিষ্ট হওয়া বড় কঠিন, কারণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। তথাপি আমরা অন্ততঃ ইহাই সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, যাঁহারা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অন্যমতাবলম্বী লোকদের অপেক্ষা সত্য জ্ঞান লাভ করেন। এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকিলে, আমরা যেন আপনাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আমরা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে আর বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহাহইলে ঐশ্বরিক প্রেমের কথা

আমাদের পক্ষে কি প্রকার সার্থক হইবে? আমরা বলিয়া থাকি যে, ঈশ্বর প্রেম, তিনি আমাদিগকে প্রেম করেন; কিন্তু ঈশ্বর যদি যথার্থ ব্যক্তি না হন তবে ঐ কথার মর্ম্মার্থ কি ব্যর্থ হইবে না? হইবে বৈ কি। যীশু আমাদের অন্তরে যে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তাঁহার সহায়ে আমরা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া স্বর্গস্থ পিতাকে যেন দেখিতে পাই। আমরা কি এমন পিতাকে কল্পনা করিতে পারি, যিনি ব্যক্তিত্ববিহীন? আমরা কি বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহি যে, পিতা যিনি, তিনি অবশ্যই যথার্থ ব্যক্তি? বাইবেলের লেখকগণ কখনই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে, তাহাতে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন তাঁহারা "জীবন্ত ঈশ্বরের" কথা বলেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের বিশ্বাস স্পষ্টভাবে সপ্রকাশ হয়। তাঁহাদের ঐ বিশ্বাসের মূল হেতু কি? তাঁহারা কেমন করিয়া এই ধারণাতে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর "জীবন্ত"—যথার্থ ব্যক্তি? তাঁহারা তাঁহাব মহৎ ত্রাণকার্য্যসমূহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমরা এমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারি না, যিনি কোন কার্য্য করেন না। আমাদের একটী স্বাভাবিক মনোভাব এই যে, কেবল জীবং ঈশ্বরই আমাদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। আমরা যাহাতে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস-পূর্ব্বক আন্তরিক তৃপ্তি লাভ করি, তজ্জন্য আমাদের এমন ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, যিনি কার্য্য করেন, পরিত্রাণ করেন, এবং রাজত্ব করেন। এই প্রকার ঈশ্বরই যীশুখ্রীষ্টে "সপ্রকাশ" হইয়াছেন। যীশুর জীবন, মৃত্যু, বিজয় ও মনুষ্যদের ত্রাণসাধিকা শক্তিতে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখীন হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে সচেষ্ট হন, এবং আমরা যীশুখ্রীষ্টেরই মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের গৌরব দেখিয়া তাঁহাকে আমাদের ব্যক্তিগত পিতা বলিয়া জানিতে পারি।" (Professor, H. R. Mackintosh—(of New College Edinburgh প্রণীত "Studies in Christian Truth" এবং J. R. Illingworth, M. A. মহোদয় কৃত

"Personality Human and Divine" নামক সুবিখ্যাত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। (১)

(১) Foot-note—The essentially social nature of personality is admirably analysed in W. Richmond's Essay on Personality, of which the following two passages are to our point:—"It is the individuality of personal life which marks the characteristically modern idea of a person, as, e. g., when we speak of personal sympathy, of personal antipathy, of personal affection, of personal religion. All these emotions are eminently personal in the sense that they are eminently individual. They intensify the sense of individual life. They are keen, vivid, emphatically accented moments of individual existence, But on a moment's consideration it is plain that in such cases as these, what evokes and intensifies the personal life of the individual person is some relation to a person other than Himself. Personal religion is perhaps the most suggestive instance. There is no stronger case of the use of the word 'personal" to indicate what is genuinely and thoroughly spontaneous, inward, individual. Personal religion emphatically means the religion which is one's own There is, in fact, no religion in which men have claimed so decidedly to call their souls their own. And yet it is just in regard to their own relation to a person other than themselves that they make the claim. It is in regard to faith, the dependence of the soul on God ; to believe the formulation of the soul's own knowledge of God to love, the devotion of the soul to God. The only quarrel of the champions of personal religion with the Ecclesiastical system from which they wished to make good their escape, has been that by these systems the spiritual relationship and communion between the soul and God had been obscured and clogged. Religion is here conceived as a relation between the personal being of God and the personal being of man; and the complaint is that, God being shut off the personal life of man is impoverished and starved. The closer consideration, indeed, of this and similar uses of the word would suggest the hypothesis that the word "personal" is only rightly applied to any feeling of the individual, when the feeling is a consciousness of relation to another person"—Wilfred Richmond, An Essay on Personality; ii, 18.

"When Christian theology conceives God as a Personal Being, it does not conceives God as a Person. Personality attaches to God not as one person, but as three. God is one, individual, in the sense that

পঞ্চদশ অধ্যায়।

* মায়াবাদ ও পরিণামবাদ।

বেদান্ত মায়াবাদ, অর্থাৎ বেদান্ত বলে যে, জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, সূর্য্যচন্দ্র, তরুলতা প্রভৃতি যাহা "আছে" বলিয়া আমরা মনে করি, বাস্তবিক তাহা কিছুমাত্র নাই, সে সব অলীক; আমরা নিদ্রিতাবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেইরূপ এক প্রকার স্বপ্ন দেখি মাত্র। উভয় প্রকার স্বপ্নই মিথ্যা। আমরা মায়াকে যতই প্রশংসা করি না কেন, মায়ারচিত অনুকরণ যে অনুকরণমাত্র, তাহা যে মূল বা স্থায়ী পদার্থ নহে, তাহা যে অলীক ও মিথ্যা, ইহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হই না।

He is whole, complete in Himself, but, as it has been said, "whereas each human individual being has one personality, the Divine Being has three," (Newman, Arians, Appendix, p 439)

His unity is a unity of persons, and it is as a unity of persons, and as a unity of persons only, that personality is conceived to be the Supreme Reality Personality, in the form in which it is supposed to be most intensely and unmistakably real, is a communion, a fellowship of Persons, a communion of will and character, a communion of intelligence and mind, a communion of love, implying that each person is, in these various places or aspects of personal life, capable of complete communion with others.

"And it is further to be observed that the person thus conceived is definitely conceived as an object of knowledge. The purpose of theology

* পণ্ডিত George Thibault তাঁহার কৃত ইংরাজি রামানুজ টীকায় মায়াবাদীর মায়াবাদ অতি বিশদ ও পরিষ্কার রূপে খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর কি কখন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া সুখী হন? তিনি স্বয়ং পুণ্যের আধার হইয়া "নিজের আমোদ হেতু ও ক্রীড়াচ্ছলে" সমগ্র মনুষ্য জাতিকে সুদক্ষ যাদুকরের ন্যায় সর্ব্বদাই প্রবঞ্চিত করিতেছেন; এরূপ চিন্তাকে কি মনে স্থান দান করিতে পারা যায়? মায়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ কল্পনা মাত্র এবং স্বাভাবিক জ্ঞান ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যদি মায়া স্বীকার করি তবে আমি আমার পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মায়াবাদীদিগের ব্যাখ্যায় নাই। পুনশ্চ, শ্রীভাষ্যে গঙ্গাধর মায়াবাদের বিরুদ্ধে বহুল তর্ক শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এতাবত, যাহা সত্য না হইয়াও সত্যের মত দেখায়, যাহা সত্যের ভ্রম জন্মায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক মিথ্যা বা অলীক, তাহাও ক্রমশঃ মায়া শব্দের বাচ্য হইয়াছে। মায়া এক প্রকার মিথ্যা আকৃতি মাত্র, তাহা যেরূপ দেখায়, প্রকৃত সেরূপ নহে, তাহা মনে কেবল ভ্রম জন্মায়।

---

in this region was to define the personality of God as known ; not to describe His operations on the will, or to shadow forth the meaning of religious emotion, but definitely to answer the question what God is. The personality, that is, which we have described, had the definiteness of conception which belongs to an idea of what is conceived actually to exist. The question of theology was, what is God ? And the answer was, God is a fellowship, a communion of persons.—(The Doctrine of the Trinity. Illustrative Notes. page 254–256 by J. R. Illingworth M A. D. D. দ্রষ্টব্য)

আচার্য্য Illingworth কৃত "Personality Human and Divine" আর একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক ধর্ম্ম ও দর্শনের সমন্বয়ে "Personality' সম্বন্ধে যাহা নোট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Personality the ultimate reality, "There is nothing else except itself, by which we can understand or explain personality............The word suggest, not so much the presence of intelligence, will, etc., but more eminently the fact of being a centre to which the Universe of being appears in relation, a distinct centre of being a subject, whereof reason, affection, will, consciousness itself, are so many—(not separate parts, but)—several aspects or activities.........Consciousness is not the ultimate fact in man expect when it is tacitly taken as equivalent to self-consciousness, the realization of his own personality.

Not the fact that he thinks, but the fact that he is that of which thought-capacity is an aspect or corollary, is the primary datum of all knowledge and thought. He thinks, indeed, likes, wills, acts ; but that central fact of which these all are but so many partial aspects is the fact that he is a self.........Personality, involving, as necessary qualities of its being, reason, will, love, is incomparably the highest phenomenon known to experience, and as such has to be related with whatever is above it and below it by any philosophy based on experience" (R.

সাংখ্য প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ সাংখ্য বলে না জগৎ ভ্রান্তিজ্ঞানমাত্র; সূর্য্য-চন্দ্র, তরুলতা প্রভৃতি যাহা আছে বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক তাহা সকলই আছে, তাহা মিথ্যা নহে, তাহা প্রকৃত; নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে ও জাগ্রৎ অবস্থায় জ্ঞানে মহৎ প্রভেদ; উভয়ই তুল্য অলীক নহে।

C. Moberly, Church Congress, 1891) "This self-personality, like all other simple and immediate presentations is indefinable, but it is so, because it is superior to defination. It can be analysed into no simpler elements, for it is itself the simplest of all ; it can be made no clearer by description or comparison, for it is revealed to us in all the clearness of an original intuition, of which description and comparison can furnish only faint and partial resemblances" (Mansel, Prolegomena, Logica) "The cogito of Descartes is not designed to express the phenomena of reflection alone, but is co-extensive with the entire consciousness. This is expressly affirmed in the principia, P. I 9......the dictum, thus extended, may perhaps be advantageous modified by disengaging the essential from the accidental features of consciousness, but its main principle remains unshaken ; namely, that our conception of real existence, as distinguished from appearance, is derived from, and depends upon, the distinction between the one conscious subject and the several objects of which he is conscious. The rejection of consciousness, as the primary constituent of substantive existence, constitutes Spinoza's point of departure from the principles of Descartes, and at the same time, the fundamental error of his system." (Mansel, Bampt. Lec. 3, Note 25).

"When Descartes took his cogito ergo sum as alone certain, and provisionally regarded the existence of the world as problematical, he really discovered the essential and only right starting-point of all philosophy, and at the same time its true foundation. This foundation is essentially and inevitably the subjective, the individual consciousness. For this alone is and remains immediate ; everything else, whatever it may be, is mediated and conditioned through it, and is therefore dependent upon it." (Schopenhauer, World as Will and Idea, Bk. I. Chap. I, E. T.)

See also Momerie, Personality the Beginning and End of Metaphysics.

† সাংখ্যেরা "মায়া" শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন নাই, না করিয়া ভালই করিয়াছেন। রূপক মূলক শব্দ তর্কশাস্ত্রে বড়ই অনর্থের মূল। তাঁহারা "মায়াময়" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্যক্ত" এই শব্দ ব্যবহার করেন। বেদান্তী যখন বলেন, এই সংসার "মায়াময়", সাংখ্য তখন বলেন ইহা "ব্যক্ত"। এই পর্য্যন্ত উভয়ের অর্থ অনেকটা সমান; উভয়েই সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বেদান্তীর ন্যায় সাংখ্য তাদৃশ সংসারকে অলীক বা ভ্রম জ্ঞান বলিতে চান না; তিনি অলীকের পরিবর্ত্তে বলেন ক্ষণিক; ভ্রম জ্ঞানের পরিবর্ত্তে বলেন তাহা প্রকৃতির লিঙ্গ, বা পরিচায়ক চিহ্ন। যে সূর্য্যকে আমরা দেখিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা যদিও প্রকৃতির বা প্রকৃত সূর্য্য নয়, তত্রাচ তাহা অলীক নহে, তাহাও এক প্রকার পদার্থ, তবে তাহা ক্ষণিক; এবং তাহাতে প্রকৃত সূর্য্য কিরূপ; তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের স্থান এই যে, বেদান্তে বলে "মায়াব" অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের পশ্চাতে "ঈশ্বর" নহে, "প্রকৃতি"। সংসারের জ্ঞানকে বেদান্তে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজত জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা রজ্জু আছে, এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে, তদ্বৎ সংসারের স্থানে যে একটা কিছু আছে তাহা বেদান্ত অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন; এবং সেই একটা কিছুকে বলেন, ইহা ঈশ্বর। সাংখ্যেরা সেই একটা কিছুকে ঈশ্বর বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। তাদৃশ ঈশ্বর তাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা কেবল অব্যক্ত বলিয়াই ক্ষান্ত; ইহাতে তাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

সংক্ষেপে মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদে সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই প্রতীয়মান সংসারকে জ্ঞানের পরিণাম বলিয়া অঙ্গীকার করেন; এবং প্রভেদ এই যে, সেই প্রতীয়মানের মূলে যে পদার্থ আছে, তাহাকে মায়াবাদে বলে, ঈশ্বর,

† যুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল; এম, এ, সি, এস, মহোদয় তাঁহার কৃত সাংখ্য দর্শন (দ্বিতীয় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিবাদে বলে প্রকৃতি। ঈশ্বর চৈতন্যময়, প্রকৃতি জড়; ঈশ্বর এক ও অখণ্ড, প্রকৃতি বহু ও খণ্ডিত; ঈশ্বর নির্গুণ বা গৌণ পদার্থে অবিভাজ্য, প্রকৃতি সগুণ বা গৌণ পদার্থে বিভাজ্য। পরস্পরের মধ্যে এই যে অনৈক্য তাহা সামঞ্জস্যের অতীত; যিনি সাংখ্যের প্রকৃতিবাদকে অঙ্গীকার করিবেন তিনি আর বেদান্তের মায়াবাদ অঙ্গীকার করিতে পারেন না; করিলে পরস্পরের বিরুদ্ধ মতের অবলম্বন করা হয়। ব্রহ্ম যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎরূপে প্রকাশ পান, সে শক্তি কীদৃশী? সে শক্তি কি প্রকৃত বস্তু উৎপাদন করে, অথবা আপাত, অপার প্রাতিভাসিক বস্তু উৎপাদন করে? অন্য কথায় বলিতে গেলে,—সে শক্তি দ্বারা কি ব্রহ্ম আপনাতে প্রকৃত পরিবর্ত্তন, প্রকৃত ভেদ উৎপাদন করেন, অথবা আপনি অভেদ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আপাত দৃশ্যমান কল্পিত ব্যাপার সংঘটিত করেন, আপনাকে পরিবর্ত্তিত, ভিন্নবৎ দেখান? পারিভাষিক শব্দে বলিতে গেলে,—সে শক্তি পরিণাম শক্তি কি "মায়াশক্তি?"—"বিকারশক্তি", কি "বিবর্ত্তনশক্তি"? জগতের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্মকে "সবিশেষ" বলা উচিত, অথবা সে সম্বন্ধ মায়িক বলিয়া, তিনি "নির্ব্বিশেষ"? তিনি জগৎবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে "বিশিষ্টা-দ্বৈত" বলা উচিত অথবা জগৎমায়িক বলিয়া তিনি "বিশুদ্ধাদ্বৈত"?

উপরে যে মতভেদ উক্ত হইল, তাহা কেবল উপনিষদের ব্যাখ্যা জনিত। এই মতভেদ কি উপনিষদে আছে? তদুত্তরে বলিব যে উপ-নিষদে নাই। তবে এই মতভেদের কারণ কি? উপনিষদে স্বীকৃত ব্রহ্মশক্তিকে বিশেষভাবে বর্ণিত ও নির্দ্দেশিত করিতে যাইয়াই এই ভেদ ঘটিয়াছে। তবে কি শ্রুতি প্রমাণে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না? ইহার এক উত্তর বাহির করা যাইতে পারে, উভয়শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারিগণই আপন আপন মতের পক্ষে বহুল উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করেন, কিন্তু এই সকল বাক্যের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন, কাজেই শ্রুতি প্রমাণে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। এক শ্রুতির ব্যাখ্যায়ই

যখন মতভেদ দৃষ্ট হয় তখন সূক্ষ্মতর যৌক্তিক প্রমাণ সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ হইবারই সম্ভাবনা। যাহা হউক উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই অতি প্রাচীনকাল হইতে আগত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদের এবং মহাত্মা রামানুজস্বামী পরিণামবাদের, প্রধান আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত। শঙ্কর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ও রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, সুতরাং শঙ্কর রামানুজকে জানিতেন না। কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে পরিণামবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। তাহাতেই বোঝা যায় তাঁহার সময়ে পরিণামবাদ প্রচারিত ছিল। শঙ্করের লেখার ভাবে বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বেই মায়াবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই মত কত দূর প্রাচীন তাহা বলা যায় না। শারীরক-সূত্রে ইহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কেবল শাঙ্কর ভাষ্যেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। যাহা হউক, শারীরক-সূত্রে যদি মায়াবাদ স্পষ্ট-ভাবে না থাকে, তাহাতে রামানুজের মতও পূর্ণভাবে নাই। তবে, মোটের উপর এই কথা বলা যায়, যে মায়াবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদ প্রাচীণতর। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক; কারণ, মায়াবাদ পরিণামবাদ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। মানব বুদ্ধির পক্ষে সূক্ষ্মের ভাবনার পূর্ব্বে স্থূলের ভাবনাই স্বাভাবিক।

সাংখ্য ও বেদান্তে এখন যেমন বিশেষ প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমন প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল না। এই প্রভেদ অনেক পরিমাণে মায়াবাদের কৃত। পূর্ব্বে এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন যাঁহারা সাংখ্য ও বেদান্তে বিরোধ স্বীকার করিতেন না। হিন্দুদিগের পুরাণাদি নানা শাস্ত্রগ্রন্থে সাংখ্য বেদান্তের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে এই সামঞ্জস্য দার্শনিকভাবে দেখাইয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিকে যদি ব্রহ্মাধীনা শক্তিরূপে স্বীকার করা যায়, এই শক্তিজাত ব্যাপারসমূহকে প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক না বলিয়া পারমার্থিক, প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, সাংখ্যের নির্ম্মল শুদ্ধ আত্মাকে বহু না বলিয়া

যদি এক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবেই সাংখ্য বেদান্তে মৌলিক একত্ব সাধিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, সূত্রকারকে একপ্রকার পরিণামবাদীই বলিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই, উপনিষদে মায়াবাদ আছে কি না? সূত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতি সম্বন্ধে তাহাই বলা যায়— শ্রুতিতে স্পষ্ট মায়াবাদ নাই সুতরাং এক অর্থে ইহাকে পরিণামবাদী বলা যায়। কিন্তু শ্রুতি ও সূত্র উভয়েতেই মায়াবাদ স্পষ্টরূপে না থাকিলেও বীজাকারে আছে এবং সূত্র অপেক্ষা বরং শ্রুতিতে এই বীজ অপেক্ষাকৃত স্ফুটতর। মায়াবাদীও ব্রহ্মকে মায়াধীন মনে করেন না, জীবকেই মায়াধীন বলেন। দ্বাদশখানি উপনিষদের মধ্যে একাদশখানিতে একটী স্থল ব্যতীত কুত্রাপি "মায়া" শব্দের উল্লেখ নাই। সেই স্থলটী একটী ঋক্, সে স্থলে উক্ত 'মায়া' মায়াবাদের মায়া নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "মায়া", 'মায়ী', 'জাল', 'জালবান', প্রভৃতি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শব্দগুলির উল্লেখ ছাড়া আর কোন বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরের সৃষ্টিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব অপর উপনিষদুক্ত মত হইতে বিভিন্ন নহে। শঙ্কর ও তৎশিষ্য-গণের বিকশিত মায়াবাদ যেমন একাদশ উপনিষদে নাই, তেমনি শ্বেতা-শ্বতরেও নাই। বরং ব্রহ্মের সগুণভাব যাহাকে মায়াবাদিগণ বিশেষ যত্নসহকারে নির্গুণ ভাব হইতে পৃথক করেন ও নিম্নতর স্থান দেন, এবং যাহা উক্ত একাদশ উপনিষদের সকল স্থলে পরিস্ফুট নহে, তাহা শ্বেতাশ্বতরে অতীব উজ্জ্বল এবং নির্গুণ ভাবের সহিত প্রায় অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব স্বীকার করিয়াও শ্বেতাশ্বতর স্পষ্টতঃই ব্রহ্মকে স্রষ্টা, নিয়ন্তা, মঙ্গলময়, অভয়দাতা, মোক্ষহেতু প্রভৃতি সগুণভাবে ভাবিতেই অধিক ভালবাসেন। সুতরাং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌কেও উত্তর-কালে বিকশিত মায়াবাদের আকার বলা যাইতে পারে না। আমরা এপর্য্যন্ত প্রাচ্যের মায়াবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম; এইবার পাশ্চাত্যের "মায়াবাদ ও Idealism" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্যের মায়াবাদ ও Idealism.

পাশ্চাত্যের মায়াবাদ ও Idealism সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, হেগেলের (Hegel) মতবাদের আলোচনা আবশ্যক। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলেই বুঝা যাইবে, হেগেলের Idealism ও মায়াবাদ এক জিনিষ নহে। দার্শনিক আর্ডম্যান (Erdmann) হেগেলের মতবাদকে Panlogism (Panlogismus) এবং রোসেন ক্রাঞ্জ "Philosophy of Spirit" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হেগেলের মতে চৈতন্যই (Spirit) সকল এবং সকলই চৈতন্য। তাঁহার মতে Idea বা Logos বিষয় ও বিষয়ীর একত্ব। অহং ও ইদং এই দুয়ের একত্বই Idea of Logos. (Logos or idea is the unity of Subjectivity and Objectivity) এই Logos বা পুরুষোত্তম জাগতিক সৃষ্টির এবং শৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ বা শীর্ষ Principal. তাঁহার মতে সত্য অখণ্ড, সত্য কখনই খণ্ডিত নহে। (truth can never be particular but must always be totality)। বিচার চিন্তার সমষ্টি মাত্র, বিচারই আমাদের জীবনের মৌলিক নিয়ম। এক কথায় চিন্তা বা বিচারই আমাদের জীবন। প্রত্যেক ব্যক্তি এক সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যষ্টি চিন্তা এক সমষ্টি চিন্তার অন্তর্নিবিষ্ট। যখন চিন্তার সত্যোপলব্ধি হয়, তখনই আমাদের অন্তর্নিহিত জীবনসত্তার বিকাশ হয় (immediate Expression of the innermost life of Existence)। যখন আমরা সত্তার বিষয় চিন্তা করি, তখন সত্তাই আমাদের ভিতরে চিন্তা করে (when we think, Existence thinks in us)। প্রত্যেক ধারণা সীমাবদ্ধ, কোনও বিশেষ ধারণাই সম্পূর্ণ জীবনটী প্রকাশ করিতে পারে না। চিন্তা করিতে গেলেই ধারণাকে নিরসন করিতে হয়। নিষেধের (negation) উদয় অবশ্যম্ভাবী। নিষেধ হইতে অন্য একটী বাস্তব (Positive) ধারণার উদয় হয়; নিষেধও (negation) সসীম, এবং সসীম বলিয়াই মিথ্যা।

হেগেল, তৎপ্রণীত (Logic) লজিকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"In this way the system of concepts has to form itself and to complete itself in a ceaseless, pure progression —free from any accretion from without," অর্থাৎ এইরূপে ধারণা-শৃঙ্খলা গঠিত বা উদ্ভূত হয় এবং অবাধিত ও অনিয়ন্ত্রিত ক্রমিকতায় পরিসমাপ্তি লাভ করে; বাহির হইতে কোনরূপ সংযোগ বৃদ্ধি হয় না। সকল ধারণা হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ধারণার বিষয় "সত্ত্বা", এই সতের ধারণার সহিত অসতের ধারণা অবশ্যম্ভাবী। কারণ যাহার আধেয় নির্দ্দেশ নাই, এরূপ বিশেষ-বর্জ্জিত সত্ত্বা প্রকৃত প্রস্তাবে অসত্ত্বা, এই দুইটী ধারণাকে একত্র করিয়া আমরা উৎপত্তির ধারণা করিতে পারি। উৎপত্তি বা জাতি (Becoming) সৎ ও অসৎ (being and not being) এই উভয়। জাতির অর্থ অবস্থান্তর পরিণাম। আমাদের চিন্তার ভিতরে সত্ত্বা নিহিত রহিয়াছে। সে সত্ত্বা আমাদের অন্তরে যে সুরে, যে তানে বাজিতেছে, সর্ব্বত্রই সেই সুরে সেই তানে বাজিতেছে। প্রত্যেক সসীম কার্য্য নিজস্ব সসীমতার জন্যই অসীমতার নির্দ্দেশ করে। ইহা পরিপূর্ণ বস্তুর অংশমাত্র। (it is but a moment in the one great whole)। হেগেল, বাহিরের বিচারেও দেখিতে পাইয়াছেন যে, বিপরীত বস্তুদ্বয় একত্বে পরিণত হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ একে পর্য্যবসিত হয়। মনে পরস্পর বিপরীত ভাবের প্রভাব একই প্রকার হয় (অতি সুখ ও অতি দুঃখের প্রভাব একই প্রকার)। ইহাকে Psychological effect of Contrast বলা যাইতে পারে। হেগেল শক্তির প্রবাহ এবং কৃত কর্ম্মের ফল-প্রবাহ (Conservation of force and worth) স্বীকার করিয়াছেন। বৃক্ষ জন্মিতে বীজের নাশ হইলেও, বৃক্ষ বীজের সার-ভূত সত্ত্বা সকলই বিদ্যমান। জাগতিক আত্মার অন্তঃকরণে সকল করিব।হিয়াছে। সকল বস্তুর স্মরণ হয়। বিশ্বব্যাপ্ত অন্তঃকরণে

(Spirit) সকল বস্তুই আছে। ধ্বংস বা প্রলয়ের অর্থ বাহ্যাকার পরিত্যাগ মাত্র। সত্ত্বা বা সার বস্তুর ধ্বংস নাই; কেবল বস্তুর আবির্ভাব —তিরোভাব হয়। হেগেলের মতে The Idea বা আধ্যাত্মিক Principleই সকল সত্ত্বার অন্তর্নিহিত—সত্ত্বা (the innermost Essence). ইহাই প্রকৃতির অন্তরালের প্রকৃত স্বরূপ (Existence)।

ক্যাণ্টের সমন্বয় (Synthesis), হেগেলের নিকট "world principle" হইয়াছে। বিষয় ও বিষয়ীর একত্বই নিরঙ্কুশ বা অখণ্ড চৈতন্য। ইহাই আধ্যাত্মিক' জীবনের সমষ্টি (the totality of the spiritual life of Existence) হেগেলের ভাষায় বলিতে গেলে "The Spirit in its Community !" শিল্প (Art) ধর্ম্ম (Religion) এবং দর্শন (Speculative philosophy) সমষ্টি-চৈতন্যের (absolute mind) রূপ (Forms) আর্ট প্রভৃতি মানবীয় চেষ্টার ফল হইলেও, ইহারা সমষ্টি-চৈতন্যের স্বরূপ (life-forms of world spirit)। ইহাই দার্শনিক হেগেলের মতের সারাংশ। এই মতের পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাই, রামানুজের মতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শঙ্কর-প্রতিপাদিত বৈদিক মায়াবাদের সহিত কোনও সাদৃশ্য নাই। বিষয় ও বিষয়ীর একত্ব স্বীকার করায় সগুণ, সবিশেষভাব স্বীকৃত হইয়াছে। রামানুজও সগুণভাব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে সগুণ ভাবমায়িক; উহার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। রামানুজ চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই পদার্থত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। চিৎ জীব, অচিৎ বা জড়, পুরুষোত্তমের পরিণাম মাত্র; পুরুষোত্তমই জীব ও জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। রামানুজ পরিণামবাদী, দার্শনিক হেগেলও পরিণামবাদী। হেগেল পুরুষোত্তম বা সমষ্টি-চৈতন্য (absolute spirit) হইতে পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী, বিবর্ত্তবাদই মায়াবাদ। ক্যাণ্টের Thing-in-itselfই হেগেলের world-spirit, ক্যাণ্টের অব্যক্ত প্রকৃতিই হেগেলের বিশ্বমনোময়ী প্রকৃতি। হেগেলের

জগৎ মনোময় বা বিজ্ঞানময়। তাঁহার মতে "Nature is in itself rational, and Knowledge has to apprehend the reason actually present in it."

হেগেলের জগৎবিজ্ঞানে; ক্যাণ্টের প্রকৃতি অব্যক্ত;—তিনি তাহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। হেগেল সেই প্রকৃতিকে বিজ্ঞান প্রবাহ (Spiritual) বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে প্রকৃতি—মিথ্যা বা মায়া। তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, সুতরাং হেগেলের বিজ্ঞান-(Idealism) ও শঙ্করের প্রতিপাদিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ এক জিনিষ নহে। হেগেলের মত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়; পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু সমকালে একবস্তুতে পরিণত হইতে পারে না। জল ঠাণ্ডা ও গরম একই কালে একই অবস্থায় সম্ভব নহে। সুখ দুঃখ উভয়ই জড়বস্তু, উভয়ের মূল এক; ইহারা বিপরীত বস্তু বা ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিরুদ্ধ নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি একই সংস্কারের অভিব্যক্তি,—কেবল বিষয়ের তারতম্যে একই সংস্কার দুইভাবে অভিব্যক্ত হয়। বিষয়ের ভেদে সুখই দুঃখ হয় এবং দুঃখই সুখ হয়; অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তনে, কালের সামান্য গতিতে সুখই দুঃখাকারে পরিণত হয়। সুখ দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্ত জড়। সুখ দুঃখ উভয়ই জড়াত্মক; কেবল অভিব্যক্তির পৃথকত্ব। এই বিপরীত বস্তু একেতে অন্বিত হইতে পারে, কিন্তু জড় ও চৈতন্যের স্বরূপ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এইরূপ বিরুদ্ধ বস্তু একেতে পরিণত হইতে পারে না। তাঁহার বিচারপদ্ধতিও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, নিষেধের নিষেধে (by Negation of Negation) আমরা পূর্ব্বের অবস্থাই প্রাপ্ত হই। Not-A'র নিষেধে আমরা A প্রাপ্ত হই, কখনই B প্রাপ্ত হই না। Not-Being বা অসতের নিরসনে সৎ বস্তু প্রাপ্ত হই; সৎ ব্যতীত বস্বন্তর প্রাপ্ত হই না। চেতন বস্তুই চেতন ও জড়—ইহা কখনই সম্ভব নহে। জড় বস্তুর অন্তরালে যে চৈতন্য (Spirit) রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র সম। এই জড়বস্তুকে

উড়াইয়া দিবার যো নাই। পুরুষোত্তম চিৎ ও জড় এই উভয় ধর্ম্মাত্মক—ইহা কখনই বলা যায় না। চিৎ ও জড়ের মিলনে নূতন বস্তু কখনই হইতে পারে না, +(+৪)=৪। কখনই অন্য সংখ্যা হইতে পারে না। হেগেলের মতে শিল্প (Art), ধর্ম্ম (Religion) এবং দর্শন (Philosophy) পুরুষোত্তমের স্বরূপ বা রূপ। কিন্তু শাঙ্কর মতে এইগুলি অবিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। তাঁহার মতে জ্ঞান হইলেই বেদাদিও মিথ্যা। শঙ্করের মতে এই সকলই বিষয় (Object)। ইহারা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে,—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। শাঙ্কর মতে শিল্প প্রভৃতি দৃশ্য। হেগেলও আত্মা ও মনকে পৃথকরূপে দেখিতে পান নাই ;—তিনি "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন" রূপে দেখিয়াছেন। এই মৌলিক ভ্রান্তির উপরেই তাঁহার দর্শনের প্রতিষ্ঠা ; সুতরাং এইস্থলেও শাঙ্কর মতের সহিত হেগেলের মতের সাদৃশ্য নাই। হেগেল, বহির্জগৎকে মনোময় বলিয়াছেন ; কিন্তু মন যে মায়া, তাহা বলেন নাই। শাঙ্কর মতে বহির্জগৎ আপেক্ষিক সৎ। কেবল মনের সাহায্যে বহির্জগৎ উপলব্ধি করি। সেই মনই মায়া। যাহার সাহায্যে উপলব্ধি করি, তাহা মায়া হওয়াতেই জগৎ মায়াময়। হেগেল জ্ঞানের সবিকল্প ভাব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর মতে জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। হেগেলের মতে আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আছে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অধ্যাসের ফল। বিশেষতঃ, হেগেলের চৈতন্যও (Spirit) প্রকৃত প্রস্তাবে চিৎ ও জড়ের অর্থাৎ আত্মা ও মনের মিলন মাত্র। শঙ্করের মতে চিন্তা আত্মার স্বরূপ নহে,—আত্মা চিন্তার অতীত। চিন্তা বুদ্ধির ধর্ম্ম ; সুতরাং শাঙ্কর মতের সহিত হেগেলের মতের কোন সাদৃশ্য নাই।

দার্শনিক প্লেটো, ক্যাণ্ট ও হেগেল এই তিনজনই প্রধান বিজ্ঞানবাদী (Idealist)। দার্শনিক বার্কলির আইডিয়ালিজম্ (Idealism) ইহাদের Idealism হইতে পৃথক্। বার্কলির Idealismকে Empirical Idealism বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে বাহ্যশূন্যত্বই প্রতিপন্ন হয়।

তিনি বহির্জ্জগতের সত্বা স্বীকার করেন না। তাঁহার মত সর্ব্বশূন্যবাদের নামান্তর। বার্কলি জড়ের (Matter) অস্তিত্বই অস্বীকার করেন (Annihilates Materealism)। তাঁহার মতে ব্যাপক (Universal) কোনও বস্তু নাই। ব্যাপক (Abstract বা Universal) Ideaও নাই। সকল ধারণাই, এমন কি ঐন্দ্রিয়িক অনুভবজাত ধারণাও (Sensation) আমাদের মনের (Spirit) অবস্থা প্রকাশ করে (Express states of our spirits)। আইডিয়া সকল মনের কার্য্য। তাঁহার মতে আইডিয়াগুলি বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে না কিন্তু প্রত্যক্ষকারী বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে (Ideas do not express the nature of things, but relations to the percipient subject)। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কোনও উপপত্তি করা (Hypothesis) নিষ্প্রয়োজন। কারণ, যে সমস্ত বস্তুর সত্বা স্বীকৃত (Assumed) হয়, তাহাদের প্রকৃত স্বভাব সর্ব্বদাই অজ্ঞাত থাকে। নীল বা মধুর এইরূপ "আইডিয়া"গুলিতে বস্তুর প্রকৃত স্বভাব পরিজ্ঞান হয় না ; অতএব আমাদের নিকট এই বস্তুগুলির সত্বা নাই। Spirits ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সত্বা নাই। এই Spiritsগুলির কর্ত্তৃত্ব আছে। চিন্তা, ইচ্ছা ও ধারণা ইহাদের স্বভাব। বার্কলির মতে জগৎ কতকগুলি Spirit এবং তাহাদের Image বা Idea ছাড়া অন্য কিছুই নহে। বস্তু ও Idea উভয়ই বিজ্ঞানমাত্র (Rational beings)। জগৎ নাই, কেবল কতকগুলি বিজ্ঞান আছে। বার্কলির মতের সহিত বৌদ্ধ মতের সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ মতেও বহির্জগত শূন্য। কেবল বিজ্ঞানেরই অবস্থান স্বীকৃত। তবে বৌদ্ধেরা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী। আচার্য্য শঙ্কর বহির্জগতের সত্বা স্বীকার করিয়াছেন, ব্যবহারিক সত্বার অপহ্নব করেন নাই, জগতের উপলব্ধি হয়, অতএব জগতের ব্যবহারিক সত্বা আছে। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরসন করিয়াছেন। বার্কলির Ideas বহু ; Ideaগুলি বিজ্ঞান মাত্র। বার্কলির Ideaগুলিকে বুদ্ধি বলা যাইতে

পারে। শঙ্কর মতে ঐগুলি চিদাভাস; ঐগুলি অধ্যাসের ফল। বার্কলির Spiritও আত্মা ও বুদ্ধির তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বার্কলি জ্ঞানের অখণ্ডত্ব—একত্ব দূরে থাক, ব্যাপকত্বও স্বীকার করেন নাই, এ অংশেও শঙ্করের সহিত বার্কলির সাদৃশ্য নাই। ইউরোপে জড়বাদের (Materialism) বিপরীত মতকেই বিজ্ঞানবাদ (Idealism) বলে। এই Idealismকে আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানবাদ বা বৌদ্ধবাদ বলা যাইতে পারে, (অবশ্যই বৌদ্ধবাদ অর্থে বুদ্ধের মত গ্রহণ করিতে হইবে না; বুদ্ধ সম্বন্ধীয় বাদ—এই অর্থে বৌদ্ধবাদ বলা হইয়াছে)। ইউরোপের Pantheismর সহিতও অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য বা সাম্য নাই। কেহ কেহ বৈদিক অদ্বৈতবাদের সহিত বার্কলির মতের সাদৃশ্য দেখিতে পান। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। প্লেটো প্রভৃতির আলোচনায় দেখিতে পাইলাম, মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদ একই বস্তু নহে।

আচার্য্য শঙ্করের মত।

আচার্য্য শঙ্করের মতে জ্ঞান অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, সম, একরূপ ও নির্ব্বিকল্প। কেবল উপাধির যোগেই নানারূপ ও সবিকল্প বলিয়া বোধ হয়। উপাধির যোগেই সবিশেষরূপে প্রতিভাত হয়; জ্ঞানই বস্তু, অজ্ঞান মায়া মাত্র। অজ্ঞানের পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, কিন্তু জ্ঞানের কখনও বাধ হয় না। অজ্ঞান বাধিত হয়। জ্ঞান অবাধিত, অজ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া মিথ্যা, অজ্ঞানকে সৎ বলা যায় না, জ্ঞানকে অসৎ বলা যায় না, সদসৎ বলা যায় না, কারণ, একই বস্তু সমকালে সদসৎ হইতে পারে না। বস্তু আছে ও নাই, ইহা অসম্ভব। অতএব অজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলিতে হইবে, অজ্ঞানের নির্ব্বচন অসম্ভব কিন্তু অজ্ঞান সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ; উহা পরিগ্রহ Assume করিতে হয় না, বস্তু বলিতে একমাত্র জ্ঞানকেই বলা যাইতে পারে, জ্ঞানই সৎ। অনেকে বলিয়া থাকেন

যে অধ্যাত্ম-বিচার ব্যতীত শঙ্কর মত অনুধাবন অসম্ভব—আমি কিন্তু এ কথায় তত রাজি হই না। বাহিরের ব্যাপারে দেখিতে পাই, প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলেই ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয় হইলেই ভ্রম নিরস্ত হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান কোথায় লুকাইল? অবশ্যই বলিতে পারি না যে, অজ্ঞান জ্ঞানে লুকাইল। অজ্ঞানের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? যদি বল জ্ঞান হইতে,—আমরা বলিব তাহা অসম্ভব। কারণ, জ্ঞান হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞান যদি অজ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—জ্ঞান অজ্ঞানের নিমিত্ত-কারণ কি উপাদান-কারণ? যদি বল, উপাদান কারণ, তাহা হইলে বলিব, কারণের গুণ কার্য্যে থাকিবে। কিন্তু অজ্ঞানে জ্ঞান নাই; অতএব উপাদান-কারণ হইতে পারে না। যদি বল নিমিত্ত কারণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—জ্ঞান কি উপাদান হইতে অজ্ঞানকে সৃষ্টি করিল? এরূপ কোনও উপাদান অবশ্যই নাই। জ্ঞান অজ্ঞানকে তৈয়ারী করে নাই—ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ; সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানের নিমিত্ত কারণ নহে। পক্ষান্তরে অজ্ঞানের আদি কি? উত্তরে বলিতে হইবে অজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানের আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব অজ্ঞানকে অনাদি বলিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তিতে অজ্ঞান থাকে না। আদি নাই অন্ত আছে, এরূপ অজ্ঞানকে বস্তু বলা যাইতে পারে না। একেবারে অবস্তুও বলা যায় না, সুতরাং ইহাকে "যৎকিঞ্চিৎ" এই মাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা নগণ্য (Negligible quantity)। বহির্বিষয়ক জ্ঞানে দেখিতে পাই, বিষয়গুলি বহু। কিন্তু মূল জ্ঞান এক। বাহিরের বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে মনে গৃহীত হয়। বুদ্ধি বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে। আন্তরিক অবস্থার নানাত্বেও বুদ্ধির নানাত্ব প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই নানাত্বের মূলে আমি-বোধ এক ও সম। ইহাতে নানাত্ব নাই। কেন নানাত্ব নাই তাহার উত্তর শঙ্কর দেন নাই। অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন হইলেও আমি বোধ কখনই বিলুপ্ত হয় না।

"আমি বোধ" এবং "আমি"।

আমি-বোধ এবং আমি একই বস্তু ইহা স্বীকার করিলে অন্যায় হয় না। অবশ্যই আমি-বোধ বলিলেও বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্য বোধ হয়। যখন আমার বুদ্ধি বলি, তখন বুঝিতে হইবে, আমি বুদ্ধি হইতে পৃথক; কারণ, আমার বস্তু আমা হইতে পৃথক। আমি বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। এখন দেখিতে হইবে আমি কি? আমি আছি (আত্মা) এ সম্বন্ধে কোনও সংশয়, সন্দেহ, মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান নাই। আমি আছি—অতএব আমি সৎ। আমি-বোধ ও আমি এক; অতএব আমি চিৎ বা জ্ঞান। এ স্থলে একটা কথা উত্থাপিত হইতে পারে—আমি আমাকে জানি; সুতরাং "আমি" জ্ঞানের বিষয়ীভূত। আমরা বলিব, ইহা হইতে পারে না; কারণ, আমি বিষয়ী, বিষয়ী কখনও বিষয় হইতে পারে না; দ্রষ্টা কখন দৃশ্য হইতে পারে না। আমাকে আমি জানি—ইহার অর্থ আমি। আমিকে জানা ও আমি—একই বস্তু। জ্ঞান কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। মানুষ নিজের মাথায় চাপিতে পারে না। আমি বিষয়ী—আমি কখনই বিষয় হইতে পারি না। এ স্থলে আরও একটা বিষয় বিবেচ্য। জগতে দেখিতে পাই, একটা জিনিষ প্রকাশ্য, এবং অন্য ইহাকে প্রকাশ করে। প্রকাশের প্রকাশান্তর নাই,—উহা স্বয়ং-প্রকাশ। চেতন জড়কে প্রকাশ করে, চেতন স্বয়ং-প্রকাশ। জড় চেতনকে প্রকাশ করে না,—চেতনই জড়কে প্রকাশ করিয়া আত্ম-প্রকাশিত হয়। চেতন প্রকাশক; জড় প্রকাশ্য। আত্ম বা আমি প্রকাশক, কারণ আমি চেতন। জড় বস্তু প্রকাশ্য। প্রকাশ্য বস্তু দৃশ্য; দৃশ্য বস্তুই জড়। জ্ঞানই প্রকাশক,—জ্ঞান অজ্ঞানকে প্রকাশ করে; জ্ঞান কিন্তু অজ্ঞানের কারণ নহে। জ্ঞানই সর্ব্ববিভাষক,—দৃশ্য বস্তু মাত্রকেই জ্ঞান প্রকাশ করে। জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশান্তরের বা জ্ঞানান্তরের আবশ্যকতা নাই। আত্মা অতএব জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ং-প্রকাশ। আত্মা বা আমি এক। কারণ,

জগতে সকলেই আপনাকে "আমি" বলিয়া জানে। আমিত্ব সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

আমি এবং মন।

বহির্জ্জগৎ বাদ দিয়া এখন মনোরাজ্যের বিচার আবশ্যক। আমাদের যত ব্যবহার, তাহাতে দেখিতে পাই, আমি এবং মন এই দুইটী জিনিষ আছে। (মন বলিতে এস্থলে সমগ্র অন্তঃকরণকে ধরিতে হইবে, বুদ্ধি মন বিশেষ মাত্র) আমি মন হইতে পৃথক। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক। সম্মোহন বলে কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিলাম, তাহাকে বলিলাম, তোমার নাম রমেশ। অবশ্যই তাহার প্রকৃত নাম বিরাজ। বিরাজ নামে ডাকিলে সে উত্তর দিবে না,—রমেশ বলিয়া ডাক দিলে সে উত্তর দিবে, কিন্তু এ অবস্থায় তাহার মন অন্যরূপ হইলেও, আমি-বোধ স্থিরতর আছে। আমি-বোধের কোনও বিপর্য্যয় হয় নাই। অতএব মন ও আমি এক বস্তু নহি। মন আমা হইতে পৃথক।

বেদান্তে মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমাদের উত্তর।

বেদান্তের মতে কেবল ভগবান সত্য আর সকলই মায়া। মানুষের অজ্ঞানতার নিমিত্ত সে ঈশ্বর হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও মানব আত্মা ও ঈশ্বর এক। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ভগবানও মায়ার অধীন। এমতাবস্থায় তিনি আর ভগবান থাকিতে পারেন না। অবশ্যই ভগবান মায়ার অধীন নহেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। বেদান্তবাদীরা বলেন যে, সমাধিতে ভক্ত জ্ঞানের সাহায্যে মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারে। এখন এই প্রশ্ন উঠে—যদি সকলই মায়া হয় তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া জানিব যে, ভক্ত সমাধি অবস্থায় যে জ্ঞান পায় তাহাও মায়া নহে? বেদান্ত যাহা বলে তাহা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মানিতে হইবে যে মানুষের সদৃশ হওয়ায় ভগবানও ক্রমোন্নতির অধীন হইয়া পড়েন এবং মায়া ও বস্তুর পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন মায়া ভগবানে যদি এরূপ কার্য্য না করে তাহা হইলে বেদান্তবাদীদিগকে আমাদের জিজ্ঞাস্য, মায়ার আদির কারণ কি? কোন্ কর্ম্মের ফলে আমরা মায়া-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি? এবং মায়ার উদ্দেশ্য ও ইহার চরম লক্ষ্যই বা কি? ইহা সত্য যে ভগবান সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্ববিষয় ভগবানে আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভগবান সর্ব্ববস্তু নহেন এবং সর্ব্ববস্তুও ভগবান নহে। যাহারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একই ভাবে তাহারা বিপদ্ধ পথে গমন করেন। এইখানে খ্রীষ্টীয় দর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনেরপার্থক্য দেখা যায়। হিন্দু মাত্রেই যে অদ্বৈতবাদী তাহা নয়, দৃষ্টান্তস্থলে রামানুজের ভক্তিতত্ত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শিক্ষা ভারতভূমে প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদমূলক শিক্ষা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের খ্রীষ্টভক্তগণ ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানগুলির পক্ষপাতী হইলেও তাহারা আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মের উপরই বেশী জোর দেন। অদ্বৈতবাদের যে অংশে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার নৈকট্য সূচিত হয় তাহাই সাধু সুন্দর সিংহের উপদেশের মৌলিক বিষয়। হিন্দু ও মুসলমানগণ ঈশ্বরবাদী অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করেন। সমুদ্র মধ্যে নদীর বিলোপ সাধনের ন্যায় ঈশ্বরে মানবাত্মার বিলোপ সাধনরূপ ভ্রান্তশিক্ষা অদ্বৈত মতে বদ্ধমূল হইয়া আছে; প্রকৃত শিক্ষা এই ঈশ্বরে অবস্থিতি করা; দার্শনিক সাধু পৌল বলেন "যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়, আমার নিজের ধার্ম্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়।" ইহাকেই ঈশ্বরে অবস্থিতি করা বলে, কিন্তু ঈশ্বরে মানবের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়া নয়। হিন্দুগণ সাধারণতঃ সাধু যোহনের সুসমাচার পড়িতে ভাল বাসেন, ঐ সুসমাচারের ১৭ অঃ ২১ পদে—"আমি তোমাতে ও তুমি আমাতে" এই

বাক্যটী তাহাদের বড়ই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মায়াবাদ তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হওয়াতে তাহারা বড়ই গণ্ডগোলে পতিত হন। পিতার (ঈশ্বরের) সহিত প্রভু যীশুর একত্ব এবং আমাদের সহিত প্রভু যীশুর একত্ব বিভিন্ন বিষয়। জ্যোতিঃ সূর্য্য এবং সূর্য্য জ্যোতিঃ; উত্তাপ সূর্য্য এবং সূর্য্য উত্তাপ, তাই বলিয়া উত্তাপকে জ্যোতিঃ বলা যায় না।

প্রভু যীশু জগতের জ্যোতিঃ এবং পবিত্র আত্মা জগতের উত্তাপ, তাই বলিয়া প্রভু যীশু পবিত্র আত্মা নহেন। ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে যে বিষয়ের প্রভেদ আছে, মায়াবাদ তাহা গোলমাল করিয়া দেওয়াতে মূল বিষয়টী উপেক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে ভোগ করিতে হইলে মানবাত্মাকে তাঁহা হইতে পৃথক থাকিতে হইবে। জিহ্বা পৃথক বস্তু বলিয়াই মিষ্টান্ন ভোগ করিতে সক্ষম হয়। আমরা যদি ঈশ্বর হই তাহা হইলে পূজার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, মায়াবাদে পাপ পুণ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং নীতি হীনতার দিকে স্বতঃ আকৃষ্ট। সাধু সুন্দর সিংহ যখন ইউরোপে ছিলেন, সেই সময় ব্যারণ ভন্‌হিউগেল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "মায়াবাদ" আপনার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি।" তদুত্তরে তিনি বলেন—খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রথমাবস্থায় মায়াবাদের দিকে আমার কিছু কিছু টান ছিল, এবং আমি মনে করিতাম যে, যে আশ্চর্য্য শান্তি আমি অনুভব করি তাহা সম্ভবতঃ আমার ঈশ্বর-হওন বা ঈশ্বরের অংশ-হওন-সম্ভূত। কিন্তু দুইটী কারণে আমার এই ভ্রম অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ— যোগাভ্যাসকালে আমি ঐ শান্তি অনুভব করি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ—ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া আমি কখন কখন নিরাশ ও অবসন্ন বোধ করিতাম।"

আমরা এক্ষণে মায়াবাদের ভ্রম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া শেষ করিতে চাই, "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল" তাঁহার পুস্তকের (Examination of Hamilton, Chap. XII and the following Appendix) তৃতীয় সংস্করণে তিনি আত্মা সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদে

বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।" মায়াবাদ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিত—জ্ঞানের স্থায়িত্ব স্বীকার করে না। আত্মা যে সর্ব্বদাই জ্ঞানযুক্ত থাকে, উপাধিযুক্ত বা সগুণ থাকে, মায়াবাদ তাহা স্বীকার করে না। কোন কোন মায়াবাদ স্বীকার করে যে আত্মা জাগরণ, স্বপ্ন, বা সুষুপ্তি কোন কালেই আত্মজ্ঞানচ্যুত হয় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানের সহিত যে বিষয়জ্ঞান অচ্ছেদ্য, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়জ্ঞানও যে আত্মাতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, মায়াবাদ তাহা স্বীকার করে না।

মায়াবাদের মূল কথা কি? তাহা এই—আত্মাতে যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হয় ততক্ষণ আত্মা উপাধিযুক্ত, কিন্তু এই সোপাধিকত্ব, এই উপাধি-যুক্ত অবস্থা, যে আত্মার মূল প্রকৃতি নহে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহ অস্থায়ী, যতক্ষণ চক্ষু মেলিয়া থাকি ততক্ষণই দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই উহা বিলীন হইয়া যায়। তেমনি যতক্ষণ শুনি ততক্ষণই শব্দের অস্তিত্ব, যতক্ষণ স্পর্শ করি ততক্ষণই স্পৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহ অস্থায়ী—কাল প্রবাহে নিয়ত প্রবাহিত। ইন্দ্রিয় ক্রিয়া বন্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গোচর জগতের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? তখন কেবল নিত্য বস্তু নিরুপাধিক আত্মা বর্ত্তমান থাকে। আপত্তিকারী বলিতে পারেন যে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ হইলেও জগৎ আত্মার স্মৃতির বিষয়রূপে—অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়-রূপে বর্ত্তমান থাকে। কৈ? তারই বা প্রমাণ কোথায়?' স্মৃতিও ত আত্মার একটি অস্থায়ী অবস্থামাত্র, যাহা কিছু জানি সবই কি সকল সময়ে স্মরণ থাকে? ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞানের ন্যায় স্মৃতি-ঘটিত জ্ঞানও প্রবাহশীল। তারপর নিদ্রার অবস্থার ত কথাই নাই। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়জ্ঞান বরং কিছু থাকে, সুষুপ্তির অবস্থায় বিষয়জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হয়। তখন কেবল আত্মার আত্মজ্ঞান মাত্র থাকে, কোন বিষয়জ্ঞান থাকে না। যদি বল বিষয়জ্ঞান না থাকিলে আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না, তবে মানিলাম যেন তখন এক আধ বিন্দু বিষয়জ্ঞানও থাকে, কিন্তু তাহাতে তোমার এই

বিচিত্র জগতের স্থায়িত্ব সপ্রমাণ হইল কৈ? যদি বল জীবাত্মা জগৎ বিস্মৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বিস্মৃত হন না, তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদাই বিচিত্রতাপূর্ণ,—তবে ইহার উত্তর এই যে এই বিচিত্র জ্ঞানশালী উপাধি-যুক্ত পরমাত্মার প্রমাণ কোথায়? আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি। আত্ম-জ্ঞান দ্বারা একটি নির্বিষয় নিরুপাধিক নিত্য আত্মার প্রমাণ পাইতেছি; এই নিরুপাধিক আত্মাই বিশ্বের বীজ। মায়াবাদের যুক্তি গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহার আপাত যৌক্তিকতার ভিতরে গভীর অযৌক্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দর্শনের সাহায্যে এই অযৌক্তিকতা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব। আত্মজ্ঞানই যে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু মায়াবাদী আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীভাষ্যে গঙ্গাধর মায়াবাদের বিরুদ্ধে বহুলতর্ক ও শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন কথা এই যে বিষয়জ্ঞানশূন্য আত্মজ্ঞান যখন আমরা জানিও না ভাবিতেও পারি না, পরন্তু ইহা যখন একটা অসঙ্গত স্ববিরোধী ব্যাপার, তখন ইহার অস্তিত্বও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা জানা যায় না, ভাবা যায় না, যাহা অসঙ্গত স্ববিরোধী, তাহা যে কেহ প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করে তাহাও হইতে পারে না; সুতরাং আমরা লৌকিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের বিষয়ীভূত যে সকল অসার কথার-কথা সম্বন্ধে মায়াবাদে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, ইহাও (মায়াবাদ) সেরূপ একটা অসার কথার-কথা মাত্র। মায়াবাদের ভ্রম আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি। প্রকৃতিবাদের "অজানা জানা বস্তু", "অননুভূয় অনুভব", "অজ্ঞেয়কারণ" অর্থাৎ "অজ্ঞেয় জ্ঞেয় বস্তু" যে শ্রেণীর বস্তু, মায়াবাদের "নির্বিষয়জ্ঞান", ও "বিষয়জ্ঞান-শূন্য বিষয়ীও" সেই শ্রেণীর বস্তু। কেবল বিষয় বা কেবল বিষয়ী, কেবল জ্ঞেয় বা কেবল জ্ঞাতা, প্রকৃত বস্তু নহে, দ্বৈতাদ্বৈত ভাব-সম্পন্ন, ভেদাভেদ স্বভাব বিষয়-বিষয়ীরূপী জ্ঞানবস্তুই একমাত্র প্রকৃত বস্তু। (See Ferriers Institutes of Metaphysics, Sec. III. Ontology, and Cairds Hegel, Chaps. 7 & 8).

যে মায়াবাদ নির্বিষয় জ্ঞানে বিশ্বাস করে, সেই মায়াবাদের ভ্রম আমরা বুঝিতে পারিলাম। এখন যে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে যে আত্মা সময়ে সময়ে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে এবং যায়, সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয় জ্ঞান-বিরহিত হইতে পারে এবং হয়। এই মায়াবাদের ভ্রম বুঝিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না। মায়াবাদের বিপক্ষে প্রথম বক্তব্য এই :— আত্মা জ্ঞানরূপেই প্রকাশিত হয়, জ্ঞানরূপী বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া জানি ও আত্মা বলি, আত্মা বলিতেই আমরা জ্ঞানময় বস্তু বুঝি, অজ্ঞান আত্মা অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানবস্তু একটা স্ববিরোধী অসঙ্গত কথার কথা মাত্র। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সকল স্ববিরোধী অসম্ভব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, এই বিষয়টা কোন অংশেই উহাদের অপেক্ষা কম অসম্ভব নহে। জ্ঞানরূপেই যাহার প্রকাশ, জ্ঞানরূপেই যাহার পরিচয়, জ্ঞানরূপী বলিয়াই যাহাকে আত্মা বলি, জ্ঞানেই যাহার আত্মত্ব, জ্ঞানেই যাহার জীবন, সে জ্ঞান-বিরহিত হইলে তাহার আর রহিল কি? তখন সে আছে, এই কথা বল কেন? লক্ষণশূন্য বস্তুর বস্তুত্ব কোথায়? বস্তুর বস্তুত্ব যাহাতে, তাহা হারাইলে বস্তুর আর থাকে কি? জ্ঞানরূপী আত্মা জ্ঞান বিরহিত হইলে তাহার আর থাকে কি? কিছুই থাকে না। জ্ঞানই যাহার লক্ষণ, জ্ঞানই যাহার জীবন, তাহার পক্ষে জ্ঞানশূন্য হওয়া আর মরিয়া যাওয়া একই কথা। মায়াবাদের বিপক্ষে দ্বিতীয় বক্তব্য এই :—যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বীকারই করা যায় যে জ্ঞানশূন্য হইলেও আত্মার কিছু থাকে,—একটা নির্গুণ সত্তামাত্র থাকে, ইহাতেও মায়াবাদীর বিশেষ লাভ হয় না। আমরা মায়াবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই নির্গুণ সত্তাকে জড় না বলিয়া আত্মা বল কেন? আত্মা চৈতন্যহীন হইলে জড়ের সঙ্গে ইহার কি প্রভেদ থাকে? মায়াবাদী মনে করেন যে এই নির্গুণ সত্তাই আবার জ্ঞানবান হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে তিনি জড় না বলিয়া আত্মা বলেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব, যাহা একবার অজ্ঞান হইল,

নিজের সমস্ত জ্ঞান হারাইল, তাহা আর কখনও হারান জ্ঞান পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারে না। মায়াবাদী হয়ত' বলিবেন, যাহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় ঘটিতেছে তুমি তাহাই অসম্ভব বলিতেছ। আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি আমরা নিদ্রাকালে সমুদয় জ্ঞান—বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান সমস্ত—হারাইয়া আবার জাগরণকালে সমুদায় ফিরাইয়া পাইতেছি। আত্মা একবার অজ্ঞান হইয়াও যে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, একবার নিরুপাধিক হইয়াও যে পুনরায় সোপাধিক হইতে পারে, উপরি-উক্ত প্রমাণের ন্যায় এই কথার উজ্জ্বলতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? মায়াবাদীর যুক্তি এই।

আমরা এই যুক্তির আর এক দিক হইতে ভ্রম দেখাইতেছি; আমরা দেখাইতেছি, মায়াবাদী যে অভিজ্ঞতার দোহাই দেন সে অভিজ্ঞতার অর্থ তিনি কত কম বুঝেন। আমি আমার সম্মুখস্থ দোয়াত, কলম, কাগজ, টেব্‌ল প্রভৃতির জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী আত্মজ্ঞানকে হারাইয়া নিদ্রিত হইলাম। জ্ঞানগুলি একেবারেই গেল, কেননা জ্ঞাতা অজ্ঞান হইলে জ্ঞান আর কোথায় থাকিবে? আমার জীবনের সারভূত যে আত্মবস্তু তাহা একটা শূন্য ভাণ্ডস্বরূপ হইয়া পড়িয়া রহিল। যথাসময়ে জাগ্রত হইলাম, জাগ্রত হইয়া আবার এই দোয়াত, কলম, কাগজ ও টেব্‌লের জ্ঞান এবং আমার আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম; আমার স্মরণ হইল যে এই দোয়াত প্রভৃতিকে আমি নিদ্রার পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম, এবং যে আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম—সেই আমিই ইহাদিগকে এখন জানিতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জ্ঞান একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল, ভাণ্ড শূন্য করিয়া শুকাইয়া গিয়াছিল, সে জ্ঞান আবার আসিল কিরূপে। মায়াবাদীর কাছে জ্ঞান স্থায়ী বস্তু নহে, জ্ঞান অস্থায়ী বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র। এখন দেখুন, পূর্ব্বকার জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বকার বিজ্ঞান-প্রবাহ নিদ্রাকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা আর কিছু ফিরিয়া আসিতে পারে না; এখন যাহা আসিবে তাহা নূতন বিজ্ঞান। এখন যে কতকগুলি নূতন বিজ্ঞান

হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু নূতন বিজ্ঞানের সঙ্গে কতকগুলি পুরাতন বিজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত। নূতন বিজ্ঞানের সহিত পুরাতন বিজ্ঞানের সাদৃশ্যজ্ঞান, যাহাতে পূর্ব্বদৃষ্ট দোয়াত কলম প্রভৃতিকে এখন চিনিতে পারিতেছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার জ্ঞাতাকে এখনকার জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি, এই সকল জ্ঞান নিশ্চয়ই পুরাতন জ্ঞান। এই পুরাতন জ্ঞান কেমন করিয়া আসিল? যে আত্মা আত্মজ্ঞান ও সমুদয় বিষয়জ্ঞান হারাইয়া শূন্য ভাণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, তাহার পক্ষে এখন সমুদায় জ্ঞানই নূতন জ্ঞান বলিয়া বোধ হইবার কথা। যার পক্ষে পুরাতন বিনষ্ট হইয়াছিল, তার কাছে আর পুরাতন আসিতে পারে না। পুরাতন জ্ঞান আবার যে আসিয়াছে, ইহাতে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে পুরাতন জ্ঞান বিনষ্ট হয় নাই; বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান কিছুই বিনষ্ট হয় নাই, আত্মা, শূন্য ভাণ্ডের ন্যায় হয় নাই; আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের নিত্য সাথী বিষয়জ্ঞান কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। এই অখণ্ড জ্ঞানবস্তু সুষুপ্তিকালে ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না বটে, কিন্তু সেই সময়েও ইহা অক্ষুণ্ণ রূপে বর্ত্তমান থাকে; বর্ত্তমান না থাকিলে ইহা পুনরায় ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হইতে পারে না। আশা করি এখন পাঠক মায়াবাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। মায়াবাদী ও বিজ্ঞানবাদী "ভাবযোগ" কথাটার বড়ই বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা "ভাবযোগ" কথাটা ভাল বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা মনে করেন যে একটা বিস্মৃতিশীল নিদ্রাশীল মনেও ভাবযোগ সম্ভব এবং এই ভাবযোগই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কারণ। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুল। যে ক্ষণে ক্ষণে ভাব সমূহ ভুলিয়া যায়, একবারে হারাইয়া ফেলে, আত্মজ্ঞানকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাহার পক্ষে আবার ভাবযোগ কি? যে ক্ষণে ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ভাবশূন্য হইয়া যায়, তাহাতে ভাবগুলি কিরূপে সংযুক্ত থাকিবে? একটি চিরজাগ্রত চিরস্মৃতিশীল আত্মাতে জ্ঞানের বিষয়গুলি চির-সংযুক্ত না থাকিলে এবং এই চিরজাগ্রত আত্মা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানরূপে প্রাণরূপে প্রকাশিত না হইলে

স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, এই সমুদয় কিছুই সম্ভব নহে। (See Cairds Philosophy of Kant (old Edition) P. 285. P. 452. and sundry other places. Also শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।২।৩১)।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ব্রহ্মা।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ব্রহ্মা, এই তিন শব্দের কিরূপ ব্যাখ্যা হিন্দুদর্শনে স্থান পাইয়াছে তাহা এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদিগের অন্যায় হইবে না। কোন উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ভাবকে "অপরব্রহ্ম", "কার্য্য-ব্রহ্ম", "হিরণ্যগর্ভ", এবং কোথাও বা 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। এই ভেদ "ব্রহ্মসূত্রেও" স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার শ্রুতি বা সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভেদ ভাষ্যকার শঙ্কর কৃত। শঙ্কর ব্রহ্মের জগদতীত, নিরবচ্ছিন্ন অভেদ ভাবকে "ব্রহ্ম" বা "পরব্রহ্ম" এবং তাঁহার জগৎকর্ত্তৃ ভাবকে "পরমেশ্বর" বা "ঈশ্বর" বলেন, এবং কার্য্যরূপী জ্ঞান-শক্ত্যধিষ্ঠিত জগতকে "হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা" বলেন। 'ব্রহ্ম' ও 'পরমেশ্বরের' প্রভেদ যে কার্য্যকালে তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করিতে পারেন, তাহা নহে, অনেক স্থলেই তিনি এই দুই শব্দ ঠিক এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রভেদটা তাঁহার দার্শনিক মতের অন্তর্গত। যাহা হউক তাঁহার মতে পরমেশ্বর মায়াশক্তির অধীন নহেন, তিনি মায়ার পরিচালক, সুতরাং তিনি মায়াশক্তিজাত বস্তুসমূহের ন্যায় আপাত বস্তু নহেন, মিথ্যা বস্তু নহেন। পরন্তু মায়াশক্তি যখন নিত্য, ব্রহ্ম যখন কখনই মায়াশক্তি বর্জ্জিত নহেন, প্রলয়কালেও নহেন, তখন ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ অনেকটাই তাত্ত্বিক ভেদ মাত্র, মৌলিক ভেদ নহে।

যাহা হউক ভাষ্যকার রামানুজ এই ভেদ স্বীকার করেন না, এমন কি ব্রহ্মকে "নির্গুণ" বলিতেও তাঁহার আপত্তি। তাঁহার এই মত কিয়ৎ পরিমাণে শ্রুতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমেশ্বরের ভেদ না করাতে তিনি শ্রুতি ও সূত্রের ভাবই রক্ষা করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে

শঙ্কর কৃত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ কোন কোন বৈদান্তিক দ্বারা অনেক পরিমাণে অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে মায়াধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে অতি নিম্নস্থান দিয়াছেন, এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ মত বা ব্যবহার শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্যকার সকলেরই অভিপ্রায় বিরুদ্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। আমরা এস্থলে ব্রহ্মের উপরি-উক্ত নানা ভাব সম্বন্ধে শঙ্কর কৃত উপনিষদ ভাষ্য হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া এই পরিশিষ্ট শেষ করিব। ঐতরেয় উপনিষদ তৃতীয়াধ্যায়, তৃতীয় শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন:—"ব্রহ্ম সমুদয় উপাধিভেদ বর্জ্জিত, সৎ, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক, অদ্বিতীয়, তাঁহাকে সর্ব্ববিশেষ বর্জ্জিত, সমুদয় শব্দ ও প্রত্যয়ের অগোচর বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞারূপ উপাধি সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্বসাধারণ অব্যক্ত জগদ্বীজ প্রবর্ত্তকরূপে নিয়ন্তৃত্ববশতঃ অন্তর্যামী নাম প্রাপ্ত হন। তিনিই জগদ্বীজভূত বুদ্ধি-অভিমানীরূপে হিরণ্যগর্ভ নাম প্রাপ্ত হন। তিনিই তদন্তরস্থিত অণ্ডোদ্ভূত প্রথম শরীরোপাধিযুক্ত হইয়া বিরাট্ প্রজাপতি নাম প্রাপ্ত হন"।

দেহাত্মবাদ ও দেবতাবাদ।

দেহাত্মবাদ ও দেবতাবাদ বলিলে কি বুঝায়? এস্থলে সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, আমরা সকল দেহাত্মবাদ বা নাস্তিক্যবাদকে এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারি। জাগতিক জড় পদার্থ সকলের জাগতিক শক্তি অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মে মিশ্রণের ও পরস্পরের উপর ক্রিয়ার ফলে জন্ম ও জীবন। বৃহস্পতি—চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক পজিটিভিষ্ট, এগ্নষ্টিক প্রভৃতি নাস্তিকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত—যদিও অবান্তর বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। ইহাদের মতে জ্ঞান শারীরিক জড় উপাদানেরই বিকার, যেমন মাদকতা চিনি, গুড়, চাউল প্রভৃতি জড় পদার্থের বিকার; সুতরাং দেহ

ভিন্ন পৃথক আত্মা বা জীব নাই। দেহ ধ্বংস হইলেই সব ধ্বংস হইয়া গেল। ইহলোকই সব—পরলোক বলিয়া কিছু নাই। পাপ—পুণ্য কিছু নাই। নীতি কেবল ইহকালের ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুব্যবস্থা ও সুবিধার জন্য। ইহাকে দেহাত্মবাদ বলে। এখন আর কেহ এই মতের পোষক নহেন। বর্ত্তমান বিচার ফলে পণ্ডিতগণ ও প্রাচীন ঋষিবর্গ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে জ্ঞান কখনও জড়ের বিকার হইতে পারে না; সুতরাং জ্ঞান জড় হইতে ভিন্ন। জড় জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়, জ্ঞান অনুভব ও শাসনের বিষয় হয়। অনুভব জড়ের পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস হইলে জ্ঞানের ধ্বংস হয় না; সুতরাং দেহের ধ্বংস হইলে দেহের অনুভাবক জ্ঞানের অর্থাৎ জীবের ধ্বংস হয় না। ইহকালের পর পরকালে সে থাকে। পুনশ্চ, জড় মাত্রই জ্ঞান দ্বারা চালিত হয়; সুতরাং জগতে যেখানে যত ব্যষ্টি ও সমষ্টি জড় আছে সকলেরই পরিচালক বা শাসক জ্ঞান আছে। এইরূপে সূর্য্যের শাসক সূর্য্যদেবতা, চন্দ্রের শাসক চন্দ্র-দেবতা, বায়ুর শাসক বায়ুদেবতা, জলের শাসক জলদেবতা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে অসংখ্য দেবতাবাদ এদেশে মধ্যম শ্রেণীর ঋষিগণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইতেছে দেবতাবাদ। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে, এই দেবতা-বাদের বহু স্তর আছে। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এবং একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কালের মনোবিকাশ অনুসারে এই দেবতাবাদ অতি মূঢ়ভাব হইতে বহু-মার্জ্জিত ভাব পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছে। এ দেশের অতি প্রাচীনকালের যাগযজ্ঞাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যাগযজ্ঞাদি, গ্রীস ও রোম দেশের প্রাচীন জুপিটর প্রভৃতি দেবতার পূজা, প্রাচীন মিশরবাসীদিগের আসিরিস্, আইসিস্ প্রভৃতির পূজা, এসাইরিয়া, বাবিলোনিয়া দেশের প্রাচীনকালের অসুরাদি দেবতার অর্চ্চনা, প্রাচীনকালের ইহুদিদিগের মলক প্রভৃতি দেবতার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া অসভ্য জাতিদিগের সূর্য্য, চন্দ্র, ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা পর্য্যন্ত এই দেবতাবাদের অন্তর্গত হইয়াছে। এই ভারতীয় আর্য্য-

ভূমিতে দেবতাবাদ যত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আর কুত্রাপি তাহা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে আর এক শ্রেণীর মুনিগণ নির্ণয় করিলেন যে, সমগ্র জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পালয়িতা, শাসয়িতা ও সংহর্ত্তা। এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী জগতের জীবরূপী ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলির প্রভু—পিতা *।

হৃদয়ের পবিত্রতা, সর্ব্বভূতে দয়া; অহিংসা, প্রেম, ইহকালের ভোগ-বিরক্তি প্রভৃতি তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করিবার প্রধান উপকরণ এবং এই সকল সদ্গুণের অভ্যাসেই জীবের (মনুষ্যের) প্রকৃত কল্যাণ। এই সকল সদ্গুণে ভূষিত হইলে ও আন্তরিক ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে এই ঈশ্বরকে ভাবনা করিলে জীব অনন্তকালের জন্য তাঁহার সন্নিধানে বাস করিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করে। ইহাই ঈশ্বরবাদ নামে কথিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মে ও মুসলমান ধর্ম্মে দেবতাবাদকে একেবারে নিরাশ করিয়া ঈশ্বর-বাদ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশে স্পষ্টতঃ দেবতাবাদকে নিরাশ না করিয়াই ঈশ্বরবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরবাদ রক্ষা করিতে হইলে দেবতাবাদের নিরাশ করাই মঙ্গলজনক। প্রাচীন যুগে ঈশ্বরবাদ ছিল এবং তাহার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক শ্লেজেল স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "ভারতের প্রাচীন অধিবাসীগণই যে সর্ব্বপ্রথমে সত্যস্বরূপ একেশ্বরের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা কোন মতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মনুষ্যের ভাষায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন উচ্চ ভাব প্রকাশ হইতে পারে, তাঁহাদের প্রাচীন গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে"। একা শ্লেজেল নহেন, যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

* "ও" পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি"। "অর্থাৎ তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দাও। তোমাকে নমস্কার, আমাকে হিংসা করিও না, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর"। যজুর্ব্বেদ।

আচার্য্য ওয়ার্ড (Ward) খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"হিন্দুগণ যে একেশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, ইহা ধ্রুব সত্য। "একমেবাদ্বিতীয়ম" বাক্যই তাঁহাদের একেশ্বরবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন"।

তিনি ও তাঁহার শক্তির মধ্যে প্রভেদ অপরিহার্য্য, এবং এই প্রভেদের ফল এই দাঁড়ায় যে পরমেশ্বর স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের অতীত, কিন্তু তাঁহার শক্তি এই গুণত্রয়যুক্ত। "ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, অথবা উভয়ই"?—এই প্রশ্নের অর্থ কি তাহা এখন বোঝা যাইতেছে। প্রশ্নের উত্তর কিরূপ হইবে, তাহারও বোধ হয় কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরান্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। শক্তি ও শক্তিমানের; জগৎ ও ব্রহ্মের, সম্বন্ধ যতদূর সম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এরূপ বোঝা হইতেই কেবল বর্ত্তমান প্রশ্নের উত্তর বাহির হইতে পারে। "এই সম্বন্ধ কিছুই বুঝি না" এই কথা বলা নিরর্থক। কিছুই যদি না বুঝ তবে বিশ্বাস কর কিরূপে? কর্ত্তা ও কর্ম্মের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে কর্ত্তায় বিশ্বাস করা অসম্ভব। আধার আধেয়ের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে আধারে বিশ্বাস করা অসম্ভব। জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কিছু না বুঝিলে ঈশ্বরকে জগদাধার ও জগৎকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসই অসম্ভব। বুঝিবার উপায় জ্ঞান গৃহের চাবি, আমাদের হস্তেই রহিয়াছে। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এই জ্ঞাতৃরূপ প্রকাশ হইতে আমরা জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহার এই সাক্ষাৎ প্রকাশ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি তিনি অন্যত্র কি ভাবে প্রকাশিত। তিনি আমাদের অভিজ্ঞতায় কর্ত্তৃরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃরূপ প্রকাশ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি তিনি অন্যত্র কি ভাবে কর্ত্তৃরূপে প্রকাশিত; আমরা দেখিতে পাইতেছি জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের সম্বন্ধ,

কর্ত্তা কর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের সম্বন্ধ এমন ঘনিষ্ঠ যে জ্ঞেয়ের পক্ষে জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। জ্ঞেয় বস্তু কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়, এবং কেবল জ্ঞেয়রূপেই ইহার অস্তিত্ব চিন্তা ও বিশ্বাস করা যায়।

ইহার থাকা, আর জ্ঞানে থাকা, একই কথা। জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত না করিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন লক্ষণই করা যায় না। অতএব বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। ইহা জ্ঞানের অধীন, জ্ঞাতার অধীন। ইহা যে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিঃ ইহার নিজস্ব নহে, ইহা পরের বস্তু। অপর দিকে জ্ঞাতাও জ্ঞানেই প্রকাশিত, জ্ঞানের কর্ত্তারূপে প্রকাশিত, কিন্তু এই জ্ঞানজ্যোতিঃ অন্য হইতে প্রাপ্ত নহে, ইহা ইহার নিজস্ব বস্তু, ইহার নিজ স্বরূপ, ইহা ইহার নিজ জ্যোতিতে নিজের নিকট প্রকাশিত। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইলেও এই সম্বন্ধের দুই দিক্ কিন্তু সমান নহে। বিষয়ী স্পষ্টতঃই বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই; বিষয় পরার্থ, বিষয়ী স্বার্থ। বিষয় পরাধীন, বিষয়ী স্বাধীন। বিষয় অন্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত, বিষয়ী নিজ জ্যোতিতে প্রকাশিত, স্বয়ংপ্রভ। সুতরাং বিষয় বিষয়ীর অধীন বটে, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে না যে বিষয়ীও বিষয়ের অধীন। বিষয়ীর এমন একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাব আছে যাহা বিষয়ের অধীন নহে। বিষয় ব্যতীত বিষয় জ্ঞান হয় না, ইহাতে আর সন্দেহ কি, বিষয়জ্ঞান নিশ্চয়ই বিষয়-সাপেক্ষ; কিন্তু বিষয়ী বিষয়-জ্ঞানে আবদ্ধ নহে; সে যে কেবল বিষয়কে জানে তাহা নহে, সে আপনাকেও জানে এবং আপনাকে জানে বলিয়াই বিষয়কে জানে। আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্নরূপে, বিষয়ের বিপরীত স্বভাবযুক্ত বলিয়াই জানে। যে রকম জ্ঞানই হউক, জ্ঞান ব্যাপারটাই এমন যে জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, বিপরীত স্বভাব সম্পন্ন বলিয়া না জানিলে, জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্।

আমি এই পুস্তিকা খানিকে জানিতেছি। ইহাকে জানিতে গিয়া আমি আপনাকে ইহার জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি। ইহা জ্ঞানের অধীন সন্দেহ নাই। ইহাকে কেবল জ্ঞেয় বলিয়াই ভাবা ও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু আমি ইহার অধীন, এই কথা বলিতে পারি না। বলিতে পারি না কেবল এই অর্থে নয়, যে আমি ইহা ছাড়া আরও অনেক বস্তু জানি, কিন্তু আরও গভীর অর্থে। আমি ইহার অধীন হইলে ইহাকে জানিতেই পারিতাম না। আমি ইহার অধীন হইলে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদই করিতে পারিতাম না, আর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদ না হইলে জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। আমি আপনাকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতেছি। ইহা দেশে আবদ্ধ, আমি দেশে আবদ্ধ নাই। ইহা খণ্ডশীল, আমি অখণ্ড। ইহা নানা পরিবর্ত্তনশীল, আমি সেই সকল পরিবর্ত্তনের সাক্ষী অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানবস্তু। দেশগত জগৎ সম্বন্ধে যেমন, কালগত জগৎ সম্বন্ধেও তেমনই। আমি ঘটনাকে জানিতে গিয়া আপনাকে ঘটনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানি। ঘটনা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ঘটনার অধীন নহি। আমি ঘটনার অধীন হইলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতাম, ঘটনাকে জানিতে পারিতাম না। এই যে শব্দ-পরম্পরা আমি উৎপাদন করিতেছি, ইহা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ইহার অধীন নহি, আমি ইহার অধীন হইলে ইহা উৎপাদনও করিতে পারিতাম না, শুনিতেও পাইতাম না। দেশ কাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সংখ্যা ও পরিমাণ সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক। আমি সম্মুখস্থ বহু বস্তু জানিতেছি। আমি এই সকলের ন্যায় বহু হইলে আর এই সকলকে বহু বলিয়া জানিতে পারিতাম না। বহু বস্তুকে বহু বলিয়া জানিতে হইলে জ্ঞাতাকে এক হওয়া চাই, অর্থাৎ বহুত্বের অতীত হওয়া চাই। তেমনি ছোট ও বড় বস্তুকে ছোট ও বড় বলিয়া জানিতে হইলে, অর্থাৎ ছোট ও বড়কে পরস্পর তুলনা করিতে হইলে উভয়ের অতীত হওয়া চাই। যে তুলিত বস্তুর অধীন সে তুলনায় অক্ষম।

ব্রহ্ম কি অর্থে নির্গুণ ?

আমরা এস্থলে ভারতীয় দর্শন হইতে "ব্রহ্ম কি অর্থে নির্গুণ" তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণ সমূহ ব্রহ্মের আশ্রিত, ব্রহ্মের সহিত সংবদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণের অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন। তাঁহার মূল স্বরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক, বা তামসিক কিছুই নহে। তিনি গুণত্রয়ের অতীত বলিয়াই গুণত্রয়কে আশ্রয় দিতে পারিয়াছেন। তিনি গুণের অধীন হইলে, তাঁহার মূলস্বরূপ গুণযুক্ত হইলে, তিনি গুণের আশ্রয়, গুণের অবভাসক, গুণের পোষণকর্ত্তা হইতে পারিতেন না। তিনি গুণের আশ্রয় ও পোষক বলিয়াই গুণাতীত, নির্গুণ। সত্ত্বগুণের কার্য্য বুদ্ধিরূপ সসীমাধারে জ্ঞান ও আনন্দ প্রতিবিম্বিত করা। এই প্রতিবিম্ব সম্ভব হইতে গেলে অপ্রতিবিম্বিত স্বয়ংপ্রভ স্বপ্রতিষ্ঠিত মূল জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক, অর্থাৎ এমন জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক যাহার উপর সত্ত্বগুণের অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূল জ্ঞান ও আনন্দকে সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে না, সগুণ বলা যাইতে পারে না, তাহা নির্গুণ। তেমনি রজোগুণাত্মিকা আসক্তি, বিরক্তি ও তজ্জনিত কর্ম্মবন্ধন সম্ভব হইতে গেলে এই সমুদায়ের মূলে অনাসক্ত, অবিরক্ত ও কর্ম্মবন্ধনের অতীত আত্মা থাকা আবশ্যক। মূলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমাত্মা না থাকিলে অপবিত্রতা ও বন্ধনের কোন অর্থই থাকিতে পারে না, সুতরাং রজোগুণের আশ্রয় যিনি তিনি রজোগুণের অতীত, বিরজঃ, নির্গুণ। পুনশ্চ, তমোগুণের কার্য্য অজ্ঞান এবং মোহ ও, কেবল জ্ঞানের সত্তাই সত্তাবান্। জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানকে অজ্ঞানাত্মক ও মোহাত্মক বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান ও সুখ তমোগুণের অতীত, অতমঃ নির্গুণ। এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মের মূল স্বভাব, অনন্ত, অনবচ্ছিন্ন, গুণত্রয়ের অতীত অর্থাৎ নির্গুণ। কিন্তু ব্রহ্মের মূল স্বরূপ গুণস্পর্শের

অতীত হইলেও ব্রহ্ম গুণের সহিত অসংযুক্ত নহেন। তিনি যখন গুণের আশ্রয়, গুণের—অবভাসক, গুণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কার্য্যও করিতে পারে না, গুণ যখন তাঁহারই শক্তির বিকার, তখন তাহাকে আর কি রূপে গুণের সহিত অসম্পর্কিত বলা যায়? তাঁহার সত্তা, তাঁহার চিৎ বা জ্ঞান এবং তাঁহার আনন্দ, তাঁহার সৎচিৎ ও আনন্দাত্মকস্বরূপ, যাহা তিন ভাবে বর্ণিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে একই—সেই মূল স্বরূপ গুণাতীত নির্গুণ হইলেও যখন ইহার আশ্রয়ে গুণাত্মক কার্য্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কার্য্য ঘটিতেছে, তখন এই কার্য্যকে তাঁহারই কার্য্য বলিতে হইতেছে, এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ মূলস্বরূপ অবিকার্য্য, নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহাকে এক অর্থে সক্রিয়, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল বলিতে হইতেছে অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহাকে স্বরূপের দিক্ হইতে নির্গুণ বলিয়াও শক্তির দিক্ হইতে সগুণ বলিতে হইতেছে। সগুণ অর্থগুণের সহিত বর্ত্তমান,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সহিত সংযুক্ত। ব্রহ্মের এই যে, দুই ভাব, স্বরূপ আর শক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ভাব, এই দুয়ের কোনটীই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু যখন নাই, বস্তু মাত্রেই যখন ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তিরূপী ব্রহ্মই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ ধারণ করিয়া প্রতিভাত হন, গুণাত্মক বিবিধ বস্তুরূপে পরিণত হন। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, এবং সমগ্র জগৎ এই শক্তিরূপী ব্রহ্মের পরিণাম, রূপ বা মূর্ত্তি। যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ জানেন না, পরম্পরা প্রাপ্ত, অপরীক্ষিত, অচিন্তিত বিশ্বাসই যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, তাঁহারা স্বভাবতঃই এরূপ ভাষায় আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা জগৎকে ঐশী শক্তির পরিণাম, ঐশী শক্তির রূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ ভাষা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ব্রহ্ম যদি নির্গুণ সগুণ উভয়ই

হইলেন, তবে হিন্দুশাস্ত্রে সগুণের উপর নিগুর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে কেন? উপরিউক্ত আলোচনার পর এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহা দেখা যাউক—নিগুর্ণভাব স্বরূপাত্মক, সগুণভাব শক্ত্যাত্মক। স্বরূপ ও শক্তির প্রভেদ ও তারতম্য উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বরূপ অসীম, কিন্তু শক্তির সীমা অনির্দ্দেশ্য অভাবনীয় হইলেও শক্তিকে ঠিক অসীম বলা যায় না। ইহাকে অসীম বলিতে হইলে এই "অনির্দ্দেশ্য", "অভাবনীয়" অর্থেই অসীম বলা যায়। ইহার সহিত দেশ, কাল, সংখ্যা, ও পরিমাণের নিত্য সম্বন্ধ। এই সকল গুণ যখন প্রকৃতার্থে অসীম নহে, তখন শক্তিও প্রকৃতার্থে অসীম নহে। কার্য্য দ্বারাই শক্তি অনুমিত হয়, কার্য্য না ভাবিয়া শক্তি ভাবা যায় না। কার্য্য আছে বলিয়াই ভাবিতে হয় শক্তি আছে। কিন্তু কার্য্যের পরিমাণ অনির্দ্দেশ্যরূপে বৃহৎ হইলেও ইহার প্রকৃতিতেই সসীম ভাব বর্ত্তমান, সুতরাং শক্তির ভিতরেও এই সসীম ভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্ত্তমান। নিগুর্ণ ও সগুণের তারতম্য এস্থলে। যাহা হউক সগুণ ভাবনা, সগুণ সাধনা, কোন প্রকারেই অগ্রাহ্য নহে। ইহা সাধনার প্রশস্ত পথ। যাঁহারা নিগুর্ণ ভাবের একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও সগুণ ভাবনাকে একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া ইহাকে নিগুর্ণ সাধনার সোপান রূপে গ্রহণ করেন।

এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বচন ও ব্যাখ্যা কি?

আমরা প্রথমতঃ সাংখ্যসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখি:—প্রকৃতি ও গুণত্রয় সম্বন্ধে ৫৯ সূত্রে লিখিত আছে যথা—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" বিষয়াধ্যায়, অর্থাৎ "সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এবং ১২৫ সূত্রে "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্"—অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণ ত্রয়ের বিধর্ম্মিতা অর্থাৎ প্রভেদ বুঝিতে হইবে।"

গুণত্রয় সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার বর্ণনা।

১৪দশ অধ্যায়; ৫—১৩ পদ—"হে মহাবাহো, প্রকৃতি-সম্ভূত সত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণ আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। হে অনঘ, তন্মধ্যে নির্ম্মলত্ববশতঃ প্রকাশক ও দুঃখ-শূন্য সত্বগুণ আত্মাকে সুখ ও জ্ঞানের সহিত আবদ্ধ করে। হে কৌন্তেয়, রজঃ গুণকে তৃষ্ণা ও আসক্তি-সম্ভূত এবং রাগাত্মক বলিয়া জানিবে, উহা আত্মাকে কর্ম্মের সহিত আবদ্ধ করে। হে ভারত, তমঃ গুণকে অজ্ঞানজাত ও সকল আত্মার মোহনকর বলিয়া জানিবে; উহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার সহিত আবদ্ধ করে। হে ভারত, সত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্ম্মে আসক্ত করে, পক্ষান্তরে, তমোগুণ জ্ঞান আবৃত করিয়া প্রমাদে আসক্ত করে। হে ভারত, সত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়, রজঃ সত্ব ও তমোগুণকে এবং তমঃ সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া উত্থিত হয়। যখন এই দেহের সমুদয় ইন্দ্রিয়-দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে, তখন জানিবে সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ, রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মাড়ম্বর, অসম ও স্পৃহা, এই সমুদয় জন্মে। হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ এই সমুদয় জন্মে।"

শঙ্কর শারীরক সূত্র-ভাষ্য।

প্রথম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ৩ সূত্র—"প্রধানবাদী সাংখ্য বেদান্তবাদীকে 'তোমরাও ত শক্তি মানিতে গিয়া প্রধানবাদ মানিলে' এই কথা বলাতে, শঙ্কর বলিতেছেন,—"যদি আমরা জগতের কোন স্বতন্ত্র প্রাগবস্থাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তবে আমাদের উপর প্রধানকারণবাদ (অর্থাৎ স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক শক্তি মানা) আরোপিত হইতে পারিত। কিন্তু আমরা জগতের এই প্রাগবস্থাকে পরমেশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকার করি, স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না। ইহা (অর্থাৎ এই মূল শক্তি) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ, ইহা ব্যতীত পরমেশ্বরের স্রষ্টত্ব

সিদ্ধ হয় না, কেন না তাঁহার শক্তি না থাকিলে তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। সেই মায়া বা অধ্যাস শক্তি অব্যক্তা, কারণ পরমেশ্বরের সহিত উহার একত্ব বা ভিন্নত্ব কিছুই নিরূপণ করা যায় না।" ব্রহ্মের স্বরূপ ভাব ও শক্তিভাব, নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন:—"দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপবিকার—ভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতম্"—অর্থাৎ "ব্রহ্মকে দ্বিরূপে জানা যায়, নামরূপ বিকার-ভেদোপাধি বিশিষ্ট এবং তদ্বিপরীত—সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত।"

তৎপর এই দ্বিভাব সম্বন্ধে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ হইতে বহুতর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি। ...যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষতারতম্যাদাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্যৈক রূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ শ্রূয়তে।" শঙ্করভাষ্য ১।১।১১। অর্থাৎ "এইরূপ সহস্র সহস্র বাক্য বিদ্যাবিদ্যাবিষয় ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপিতা দেখাইতেছে। ...যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় ভূতে প্রচ্ছন্ন, তথাপি, আত্মা কূটস্থ, নিত্য, একরূপ হইলেও, চিত্তোপাধিবিশেষের তারতম্য বশতঃ উত্তরোত্তর আবিষ্কৃত হওয়াতে তিনি শ্রুতিতে তারতম্যযুক্ত নানা ঐশ্বর্য্য শক্তিসম্পন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন।" ত্রিগুণাত্মক, নামরূপাত্মক জগৎ যে বীজাকারে নিত্যকালই পরমেশ্বরে বর্তমান থাকে, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতারকথনও হানি হয় না, এই কথা শঙ্কর চতুর্থ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে অতি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"কর্ম্মাপেক্ষায়াস্তু ব্রহ্মণ ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম যৎপ্রাগুৎপত্তেরীশ্বর জ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম-নির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। যৎপ্রসাদাদ্ধি যোগিনামপ্যতীতা নাগত বিষয়ং প্রত্যক্ষ জ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টি স্থিতির সংহৃতি বিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি।" অর্থাৎ "সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানের কর্ম্ম অর্থাৎ

বিষয় না থাকাতে ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞাত হইলেন''—এই প্রশ্ন উঠাতে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ছিলেন। তারপর বলিয়াছেন, "পক্ষান্তরে জ্ঞানের জন্য যদি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে তাহাহইলে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়িণী শ্রুতিসমূহ কাজে কাজেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম কি, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় হয়? হিন্দু ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, সেই কর্ম্ম নাম ও রূপ, যাহাকে ঈশ্বরের সহিত এক ও বলা যায় না, ভিন্নও বলা যায় না, এবং যাহা ব্যক্ত হয় নাই অথচ ব্যক্ত হইতে উন্মুখ। যাঁহার প্রসাদে যোগীদের পর্য্যন্ত অতীত ও অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া যোগশাস্ত্রবিদেরা বলেন, সেই নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক নিত্যজ্ঞান আছে, এই বিষয় কি আর বলিতে হইবে?''

ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে, ৪—৫ পদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাব বর্ণিত আছে। যথা—"ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই আমার ভিন্না অষ্টধা প্রকৃতি। হে মহাবাহো, এই প্রকৃতি অপরা, ইহা হইতে ভিন্না যে আমার পরা প্রকৃতি, তাহার বিষয় শুন,—যাহা বীজরূপ হইয়াছে এবং যদ্দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে।"

পুনশ্চ, ১৩ অধ্যায় ১৪, ১৫, ১৬, ও ১৭ পদে উক্ত হইয়াছে যথা—"ব্রহ্ম সমুদায় ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, তিনি নির্লিপ্ত, গুণের পোষক, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। তিনি ভূত সমূহের বাহিরে আছেন, ভিতরেও আছেন। তিনি চর অথচ অচর; সূক্ষ্মত্ব বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরে অথচ নিকটে আছেন। তিনি ভূত সমূহে অবিভক্ত-রূপে অথচ বিভক্তের ন্যায় হইয়া আছেন; তিনি ভূতের ভর্ত্তারূপে জ্ঞেয়, তিনি প্রভবকারী ও গ্রাসকারী। তিনি জ্যোতিষ্মৎ বস্তু সমূহেরও জ্যোতিঃ, তিনি অজ্ঞান অর্থাৎ জড়ের অতীত বলিয়া উক্ত হন; তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য ও সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।'' আমরা এ পর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ, নির্গুণ ব্রহ্মের সকল ব্যাখ্যাই আলোচনা করিলাম। ঈশাদি

দশোপনিষদে "সগুণ, নিগুর্ণ" শব্দদ্বয় নাই, কিন্তু শব্দদ্বয়ের ভাব যাহা, তাহা স্পষ্টরূপেই দশোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটী গুরুতর বিষয় উত্থাপিত হয়; ঈশ্বর কি নির্গুণ? অনেক হিন্দুর বিশ্বাস ঈশ্বর নিগুর্ণ। তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আমি মৃত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ- উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি "কৃষ্ণচরিত্রে" বলেন, "আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন; আমি পণ্ডিতও নহি ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারে না; কেননা মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুর্ণ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি না, কেননা তাহা বুঝিতে আমাদের শক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে, যে ঈশ্বর নিগুর্ণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি ইহা অনিশ্চিত। 'চতুষ্কোণ গোলক' বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু 'চতুষ্কোণ গোলক' মানে' ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার এতকাল পরে নিগুর্ণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণের অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর "(Something Higher Personality)" তাহাতে আসিয়া পড়িলেন। অতএব আইস আমরাও নিগুর্ণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। যাঁহারা নিগুর্ণ ঈশ্বরবাদী, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের গুণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান, ঈশ্বরের গুণ ও কার্য্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের পরিচয় লাভ করিবার উপায় তাঁহাদের নাই। আর এই বিশাল বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার কার্য্য ও সদভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে না পারেন তাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তি ও অনুশীলনবৃত্তি যে মৃত তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। সরল অনুসন্ধায়ী সুসৃষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণরাজীর সন্দর্শন না করিয়া থাকিতে

পারেন না। আর যতই সৃষ্টিকার্য্য আলোচনা ও সৃষ্টিকর্ত্তার গুণরাজী ধ্যান করা যায়, ততই হৃদয় প্রশস্ত ও ধর্ম্মবৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক উন্নতিকর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। মানব সৃষ্টি আলোচনায় যে সকল ঐশ্বরিক গুণের আভাস পাইয়া থাকেন, খ্রীষ্টের কার্য্য ও চরিত্র আলোচনায় তদপেক্ষা পরিস্ফুটভাবে ঐশ্বরিক গুণরাজির উপলব্ধি করিতে পারেন। কি নির্গুণ-বাদী আর কি সগুণবাদী আমরা সকলকে বিশেষতঃ নির্গুণবাদীদিগকে খ্রীষ্টের চরিত্র ও কার্য্য বিশেষভাবে আলোচনা ও অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

ষোড়শ অধ্যায়।

পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? অর্থাৎ মানবাত্মার পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করা সম্ভব কি না তদ্বিষয়ক আলোচনা।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর নানা প্রদেশে দেহান্তরবাদ-মত এক প্রকারে না এক প্রকারে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীস দেশে এই মত "Metempsychosis" নামে অভিহিত হইত, যাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ "Transmigration," এই শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মার পরিভ্রমণ বা বিচরণ বুঝায়। ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে এক সময়ে প্রাচীন মিশর দেশে এই মত প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত হইয়াছিল। গ্রীস দেশে বল, আর মিশর দেশেই বল, এই ভারতবর্ষে এই মত যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেরূপ আর কোন দেশেই হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতম দেশ-সমূহের দার্শনিক পণ্ডিতগণ, হয় গৌণভাবে না হয় প্রত্যক্ষভাবে, ইহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের নিকট ইহা এত স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, সাধারণ লোকে ইহা আর তর্কের বিষয়

মনে করে না। তাহারা যেমন আপনাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তেমনই ইহজগতের পর তাহাদের কর্ম্মানুসারে যে নানা দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, ইহাতেও বিশ্বাস করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, ইহজন্মের কর্ম্মফলে তাহারা হয় উন্নতির পথে, নয় অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আর ইহকালের পর আপনাদের কর্ম্মানুসারে হয় শ্রেষ্ঠ, নয় নিকৃষ্ট দেহ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে কত যে দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। ভারতের হিন্দু ব্যাখ্যা-কারগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা ইহজীবনে কেবল ধর্ম্মের পথে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং যাবতীয় ইতর কামনা একেবারে দমন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর বহু জন্মের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা একেবারে পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যাইবেন। তাঁহাদের আর নিজেদের ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিবে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ মিলন হইয়া যাইবে। স্রোতঃস্বতী যেমন পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত একেবারে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। তখন দৃশ্যতঃ দুই বিভিন্ন সত্তা একই সত্তাতে পরিণত হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকে যে এই মত মানিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ ন্যায়, সাংখ্য, ও বেদান্তের মত এই যে, মৃত লোকের আত্মা হয় স্বর্গে, নয় নরকে গিয়া আপনাদের কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। ইহাতেও তাহাদের পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ নিঃশেষিত হয় না। তাহারা আবার পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের উপযুক্ত দেহ গ্রহণ করে। এবারে তাহারা যে নূতন অবস্থার অধীন হয়, আর তাহার অধীন হইয়া যে নূতন কর্ম্মরূপ ফল প্রসব করে, সেই কর্ম্ম দ্বারা তাহারা পরবর্ত্তী জীবনের দেহ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হয়। এইরূপে তাহারা দেবতা, মনুষ্য কিম্বা ইতর জন্তুর দেহ অবলম্বন করে, আর যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, সে অবস্থায় থাকে। আবার পুনঃসৃষ্টি হইলে পর তাহাদের

আবির্ভাব হইবে। আবার বিনাশ, আবার সৃষ্টি, কিন্তু কেহই অদৃষ্টের হাত এড়াইতে পারে না। এই কর্ম্মফল, এই অদৃষ্টের প্রতাপ চিন্তা করিয়া আমাদের দেশের দার্শনিকগণ অস্তিত্ব ও সুখভোগ মাত্রকেই গুরুভার স্বরূপ বোধ করিয়াছিলেন। আমরা যদি বাস্তবিক হিন্দু দার্শনিকগণের শিক্ষানুসারে জন্মান্তর মানি, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কর্ম্মফলে আমরা অদৃষ্টের ক্রিয়ার সামগ্রী হই, যদি কঠিন, সহানুভূতিবিহীন, নির্ম্মম, ব্যক্তিত্ববিহীন অদৃষ্টই আমাদের চালক হয়, আমাদের বিবেক বিচার যদি কোন কার্য্যেরই না হয়, তাহা হইলে কে না এমন অবস্থাকে ভারবহ মনে করিবে? কে না মনে করিবে যে, জন্ম না হইলেই ভাল হইত? কে না অদৃষ্টের হস্ত হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিত? যাঁহারা বলেন যে, ইহজন্মের পর জন্মান্তর হইবে, তাঁহারা ইহাও বলেন যে, এই জন্মের পূর্ব্বেও আমাদের বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের অস্তিত্ব ছিল, পরেও অস্তিত্ব থাকিবে। তাঁহারা বলেন যে, যদি পূর্ব্বে আমাদের জন্ম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে এত পার্থক্য এবং এত ভেদাভেদ কেন? যখন এই ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাঁহাদের মতে জীবজন্তু সকল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে মাত্র। বিচিত্র রহস্যময় আমাদের পৃথিবী, অবস্থাবৈষম্য একটী দুর্জ্জয় রহস্য, এই রহস্য দেখিয়া হিন্দুরা পূর্ব্ব জন্মের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তবে জন্মান্তরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা সেই বস্তুকে পুনরুত্থান নামে অভিহিত করি। এবম্বিধ চিন্তানিচয় পৃথিবীর জাতিবৃন্দের মনোরাজ্যে বিচিত্র মতসম্ভার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং কোন কোন জাতি মৃত্যু প্রহেলিকা ও বৈষম্য সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া "জন্মান্তরবাদের" প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে মানবজাতির তিনটী আদিম বিশ্বাস হইতে জন্মান্তরবাদের প্রথম উৎপত্তি। সেই তিনটী বিষয় এই :—

(১) জড়দেহ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, মানবের "আত্মা" বলিয়া এরূপ একটা বস্তু আছে, আর তাহা মৃত্যুর পরে এ দেহ হইতে প্রস্থান করে।

(২) অন্যান্য ইতর প্রাণীবৃন্দের এমন কি তরুলতার পর্য্যন্ত "আত্মা" আছে, এবং তাহাদেরও চৈতন্য সুখ দুঃখানুভোগ করিতে পারে। এরূপ প্রমাণ এখন সাধারণ সমীপে গ্রাহ্য হইয়াছে এবং বিখ্যাত ডাক্তার বসু মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞানে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন।

(৩) আত্মা এক জড়দেহ হইতে অন্য জড়দেহে যাইতে পারে।

ভারতীয় জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহার প্রচলন। কিন্তু ইহার প্রথম প্রচারেরকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বৈদিক ধর্ম্মে ইহার খুব কম নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু উপনিষদ হইতে ইহার আরম্ভ দেখা যায়। মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৪৯র্থ শ্লোক—"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ"। এই (তরু লতাদি) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অধর্ম্মজনিত বহুবিধ তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং ইহাদের অন্তরে সুখদুঃখানুভোগক্ষম চৈতন্যও আছে। মনুসংহিতার ১২ অধ্যায় ৬১—৬৯ শ্লোক পর্য্যন্ত নানাবিধ চৌর্য্যের বিভিন্ন পশু পক্ষীতে জন্মান্তর গ্রহণের শাস্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—দুগ্ধচোর কাক, স্বর্ণচোর মুষিক, দধিচোর বালক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। অমর কবি কালীদাসের "কুমার সম্ভবেও" আছে, যথা—"স্থিরোপদেসুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা" ১ম সর্গ ৩০ শ্লোক। পূর্ব্ব জন্মাভ্যস্ত বিদ্যা উপদেশ সময়ে স্থিরোপদেশা পার্ব্বতীর মনে উদিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে অতিন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন ইহা সম্ভবপর বলিয়া

বোধ হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মে "আত্মারই" অস্তিত্ব নাই, অতএব আত্মার জন্মান্তরও বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। তাহাদের জন্মান্তরবাদ একটু বিভিন্ন। তাহাদের মতে মানবের মৃত্যুর পর তাহার কর্ম্মবস্তুটি রহিয়া যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে তাহা জন্মজন্মান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অবশেষে কোন মহাত্মার হৃদয়ে জীবনের স্পৃহা সম্পূর্ণ বিলীন হয়, আর সেই বিশিষ্ট জন্মসমূহের শেষ হয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বীজের উপমা জন্মান্তরবাদেও প্রযুক্ত হইয়াছে; জন্মান্তরবাদ বুদ্ধের দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নাই। তিনি উহা বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জন্মান্তর বলিতে আপনারা (পাঠকবর্গ) একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ বুঝিবেন না, বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ এক বিচিত্র তত্ত্ব। ইহা বলিতেছে যে— 'ক'এর কর্ম্মফলে 'খ' জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু 'ক' ও 'খ' দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ 'ক' যদি মৃত্যুকালে তৃষ্ণা ও উপাদান জয় করিতে না পারিয়া থাকে তবে তাহার মরণান্তে অন্য নামরূপ বা পঞ্চ স্কন্ধে উৎপন্ন হইবে কিন্তু দ্বিতীয় নামরূপ প্রথম নামরূপের অনুবৃত্তি নহে। (মিলিন্দা প্রশ্ন ২।২।৬) বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বীজের উপমা দ্বারা সমস্যাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একজন একটা আম খাইয়া তাহার বীজ মাটিতে পুতিয়া রাখিল তাহা হইতে একটী আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদান করিল। সেই ফলগুলি হইতে কত বৃক্ষ প্রসূত হইল। এই প্রকারে অনন্ত ধারায় বৃক্ষ ও ফলের পর্য্যায় চলিতে লাগিল। সংসার বা জন্মান্তর ঠিক এইরূপ (মিলিন্দ—পঞ্হো ৩।৬।৯) ইহাই বুদ্ধের জন্মান্তর ব্যাখ্যা।

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিত-দিগের মত ও সময়।

(১) গ্রীক জন্মান্তরবাদ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন যে, গ্রীক জন্মান্তরবাদ মিশর হইতে গৃহীত। হোমর জন্মান্তরবাদী ছিলেন না।

গ্রীসে পীথাগোরস সর্ব্ব প্রথম পুনর্জ্জন্মবাদ প্রচার করেন। প্লেটো ফাইডোনে (২৫ অধ্যায়) লিখিয়াছেন—"আমাদের একটী প্রাচীন মত মনে পড়িয়াছে এই মতে মানবাত্মা ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে বর্ত্তমান থাকে এবং পরলোক হইতে আবার ইহলোকে আইসে ও মৃত হইতে জন্মগ্রহণ করে। প্লেটো ইহাকে তাহার আত্মতত্বের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া গ্রীক জাতির পরলোকবাদকে পূর্ণ পরিণতি দান করিয়াছেন। তাঁহার সাধারণতন্ত্র গ্রন্থে "ঈর" (Er) নামক এক বিখ্যাত পুরুষের একটী উপাখ্যান আছে, তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মা বরুণপুত্র ভৃগুর মত পরলোকে যাহা দর্শন করিয়াছিল তাহার সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল। ঈরের আত্মা অপর বহু আত্মার সহিত একটা ছায়াময় স্থানে উপনীত হইল। তথায় পৃথিবীতে দুইটী ও তাহার ঠিক বিপরীত দিকে স্বর্গে দুইটী গহ্বর আছে। গহ্বরগুলির মধ্যস্থ ভূখণ্ডে বিচারকগণ সমাসীন থাকিয়া প্রেতগণের বিচার করিতেছেন। পুণ্যবান আত্মা সকল দক্ষিণদিকের পথে স্বর্গে যাইতেছে। পাপিগণ বামদিকের পথে ধরণীর গহ্বরে অবতরণ করিতেছে।...বিচারকগণের আদেশে "ঈর" তথায় অবস্থান করিয়া সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

পুনশ্চ প্লেটো ফাইডোনের ৩১ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, পাপকর্ম্মা মানুষ যে রিপুর পরবশ, জন্মান্তরে সে তদনুরূপ পশুর দেহ ধারণ করে, যেমন কামুক ও লোভী গর্দ্দভের এবং অন্যায়চারী পরস্বপহারী বৃক, শ্যেন, বা চিলের রূপ প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকী উপনিষদেও ঠিক ঐ মত দেখা যায় যথা :—"স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দ্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বা হন্তো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম"। সেই আত্মা প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে কীট বা পতঙ্গ বা পক্ষী বা শার্দ্দূল বা সিংহ বা মৎস্য বা কম্বুক বা পুরুষরূপে ঐ সকল প্রাণীর কিম্বা অন্য জঙ্গমের দেহে জন্ম গ্রহণ করে। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গুহ মহাশয় এম, এ, প্রণীত) সক্রেটীস, ২য় খণ্ড—৩১০—৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু পণ্ডিত Henry Stuart বলেন,—"আমরা জানি

না, কিরূপে গ্রীক জন্মান্তরবাদের প্রথম উৎপত্তি। এক সময় লোকে যে বিশ্বাস করিত ইহা মিশর হইতে আসিয়াছে তাহা সম্ভব নহে এবং ভারতবর্ষ হইতে আসাও অসম্ভব—"We don't know exactly, how the doctrine of Metempsychosis first arose in Greece ; it cannot as was once supposed to have been borrowed from Egypt, and is not likely to have come from India—Encyclopaedia Britannica, 11th edition.

(২) Pindar (পিণ্ডার)

ইহাঁর মত এই যে, অন্ততঃ তিনটি জন্ম অতিবাহিত না হইলে—পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি নাই। দার্শনিক Empedocles তরুলতার পর্য্যন্ত জন্মান্তর মানিয়া লইয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্লেটো একাধিকবার দেহান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন।

(৩) মিশরের জন্মান্তর বাদ।

হেরোডোটস্ লিখিয়াছেন, "মিশরের লোকে আত্মার অমরত্ব মানিয়া লয়, আর বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর-মুহূর্ত্তেই মানবাত্মা জীবদেহান্তরে প্রবেশ করে। সেই জীবের মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার জীবদেহান্তরে প্রবেশ করে। এইরূপে তিন সহস্র বৎসরে জল, স্থল, ও অন্তরীক্ষের সমস্ত প্রাণীর দেহ পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মানব দেহ ধারণ করে"। (Herodotus, Rawlinson ; trans. Vol. 11 P. 195) কিন্তু Mr. Stuart বলেন যে—"মিশরে প্রকৃত কোন জন্মান্তরবাদ ছিল না, হেরোডোটাস ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শুধু একটা বিশ্বাস ছিল যে, কোন কোন বিশিষ্ট আত্মা পরলোকে ইচ্ছামত কোন পুষ্প বা পক্ষী বিশেষের রূপ ধারণ করিতে পারিত।

Ency Brit. 11th Edi—"Till full investigation of Egyptian records put us in possession of the facts, it was supposed that the Egyptians believed in Metempsychosis

and Herodotus explicitly credits them with it. We now know that he was wrong. All that they believed was that certain privileged souls might in the other world be able to assume certain forms at pleasure those of a sparrow, hawk or a lilly, etc. Herodotus misunderstood the Egyptians to hold belief identical with those which were current in his days in Greece".

(৪) মুশলমান ধর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ।

যদিও প্রকৃত মুশলমানধর্ম্মে জন্মান্তরবাদের স্থান নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে Druses ও Nossirians সম্প্রদায় বিশ্বাস করিত যে সজ্জনের আত্মা মনুষ্যদেহে ও অসৎ আত্মা পশু দেহে প্রবেশ করে।

(৫) যিহুদীধর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ।

যিহুদী ধর্ম্মেও জন্মান্তরবাদের স্থান নাই। একথা কিন্তু আজ কাল অনেকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তবে কথন কথন লোকে বাইবেলের কোন কোন পদের বিকৃত অর্থ করিয়া জন্মান্তরবাদ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। এক হিসাবে বলিতে পারি যে তাহাদের অর্থগুলি এত বিকৃত নহে—যে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। সে অর্থগুলির মধ্যেও কিছু না কিছু সত্য উপলব্ধি হয়। সুতরাং যাহারা জন্মান্তরবাদ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন তাহাদিগকে অযথা দোষারোপ করিলে কি ফল? তন্মধ্যে একটী পদের উল্লেখ অনেকে করিয়া থাকেন—"তুমি মর্ত্ত্যকে ধূলিতে ফিরাইয়া থাক, বলিয়া থাক, মনুষ্য সন্তানেরা ফিরিয়া যাও"। কিন্তু এখানে "ফিরিয়া যাও" কথাটীর অর্থ পুনর্জ্জন্ম নহে। কিন্তু "ধূলায় ফিরিয়া যাও"। গীতসংহিতা ৯০; ৩ পদ দ্রষ্টব্য। মূলে একই শব্দ দুইবার পদের দুই অংশে ব্যবহৃত হইয়াছে। লুথার (Luther) তাঁহার অনূদিত অংশের সেই স্থানে দুইটী বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেন) এবং Basle বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক D. A. Bertholet এর

মতে সেই জন্যই অর্থ বিকৃতির সুযোগ ঘটিয়াছে লুথর লিখিয়াছেন:—
Thou callest mankind to return to dust and sayest Return ye children of the Earth," অর্থাৎ ধূলায় ফিরিয়া যাও। অধ্যাপকের মত, যে পদটীর দুইটী অংশ তুলনায় সমার্থক (Synonymous Parallelison) ব্যবহৃত হইয়াছে। আর প্রকৃতই উভয় অংশের সরল অর্থ, "ধূলার দেহ ধূলায় লীন হইবে।" আদি পুস্তক ৩ অধ্যায় ১৯ পদ দ্রষ্টব্য। তুমি ধূলি এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে। যীহুদীশাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষা, এই মর্ত্ত্য জীবনে ইহজীবনে কৃত কর্ম্মের পুরস্কার বা শাস্তিস্বরূপ সুখময় বা দুঃখময় আর একটী অনন্ত "জীবনের" নির্দ্দেশ করিতেছে।

(৬) খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম জগতে জন্মান্তরবাদ।

"রব্বি কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি না ইহার পিতামাতা, যাহাতে এ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে"? যোহন ৯; ২ পদ। এই পদটী অনেকে উল্লেখ করেন, ইহাতে অনুমিত হয়, যে তখনকার যিহুদীগণের মধ্যে জন্মান্তরবাদ অজ্ঞাত ছিল না, সে সময়ের যিহুদীধর্ম্ম যদিও আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল, তথাপি সমসাময়িক গ্রীসের প্রবল Intellectualism-এর প্রভাব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আর ইহা তখনকার গ্রীক্ জন্মান্তরবাদেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। যীশু খ্রীষ্টের বিবেচনায় শিষ্যদের এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত ছিল; প্রভু যীশু উত্তর দিলেন, "পাপ এ করিয়াছে কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু এই ব্যক্তিতে যেন ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয় এই জন্য এমন হইয়াছে। এস্থলে দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে; প্রথমতঃ পিতামাতার পাপ-প্রযুক্ত সন্তান অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের চরম উদ্দেশ্য এই ছিল যেন এই অন্ধেতে ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয়। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে খ্রীষ্টের কোন স্পষ্ট শিক্ষা নাই। কিন্তু নানা পদের বিকৃত ব্যাখ্যা

করিয়া ইহার সমর্থনের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র—এই কথা যাহারা বলেন তাহাদের সহিত আমার ঐক্যমত নাই, বস্তুতঃ ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করাও চলে না। খ্রীষ্টকে যখন শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "রব্বি কে পাপ করিয়াছে, এ ব্যক্তি, না ইহার পিতামাতা"? তখন যদি যীশু খ্রীষ্ট স্পষ্ট উত্তর দিয়া বলিতেন জন্মান্তর নাই, তাহা হইলে সকল সমস্যারই শেষ হইত। যাহা হউক নূতন নিয়মের শিক্ষাতে, পরজীবনের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও দ্বিতীয় জন্মের স্থান নাই। কিন্তু তাহাতে আমরা পরিপূর্ণতার এবং "অনন্ত জীবনের" সন্ধান পাই, যেখানে এই সসীম ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকল অপূর্ণতা, সকল ব্যর্থতা, অসীমের পূর্ণতায় সিদ্ধতায় রমণীয় হইয়া উঠিবে, যেখানে আমাদের জীবন-বীণার সমস্ত অসমাপ্ত রাগিণী একত্র হইয়া একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিবে।

কোন কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষ জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপে অরিজিনকে ধরা যাউক (জন্ম ১৮৫ ও মৃত্যু ২৫৪) ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খৃষ্টান দার্শনিক শিক্ষক ছিলেন। অরিজিন "জন্মান্তর (আত্মার পূর্ব্ব অবস্থান) বিশ্বাস করিতেন"। তাঁহার মৃত্যুর অনেককাল পরে খালসিডোণের সভা অরিজিনের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবিতাবস্থায় যে কেহ তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়না। আমার বিবেচনায় সেকালের ব্যক্তিগণ যে অরিজিনের মত বুঝিতে পরিয়াছিলেন এমন বিশ্বাস হয় না। "The Christian Platonists of Alexandria" নামক গ্রন্থের লেখক Charles Bigg, D. D মহোদয় ১৯৮ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখিয়াছেন—"Origin rejected the Platonic doctrine of Metempsychosis, but he adopted

that of pre-existence, and that which ascribes a soul to the stars. Both he found in Philo......He found them also in Scripture. Psalm 148,...3,—"Praise Him, all ye stars of light"; Job 25; 5. "The stars are not pure in his sight," Neither Jerome nor Augustine ventures to deny that the stars may have souls. Ambrosius agrees with Origen, and even Aquinas regards the question as open;......The great support of the pre-existence doctrine was John 9; 2. "Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind"? Jerome himself at one time held pre-existence. Augustine did not deny it, and down to the time of Gregory the Great the question remained undecided"... ...

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহোদয় C. I. E. দর্শনশাস্ত্রী, কাব্যরত্ন, এবং Hon. Fellow, Calcutta University, তাঁহার স্বরচিত জন্মান্তর শিক্ষা যখন "সম্মিলনীতে" প্রথম প্রচার হয় তখন খ্রীষ্টীয়ানপন্থীদিগের মধ্যে একটা হৈ চৈ বাধিয়াছিল। আমি তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ জন্মান্তরবাদের প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে পাঠ ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ প্রবন্ধগুলি যে সুদৃঢ় যুক্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিলে যে লোকে তাঁহাকে অ-খ্রীষ্টীয়ান মনে করিবে এরূপ ধারণা ভুল, এবং পোষণ করিলে কেহ আমাদিগকে যে "Heretical" আখ্যায় অভিহিত করিবে তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। এক সময় এরিয়সের মত ভ্রান্তপূর্ণ বলিয়া মণ্ডলীর পিতৃগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুইটি গৃক শব্দ (ইংকটাসিন্ ও ইক্‌টিস্তাটো) লইয়া ৩২৫ শালে নীস্ নগরে বাকযুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে এরিয়স্ পরাজিত হয়। কিন্তু তাহার বিচারফল তত দৃঢ় হয় নাই। এখন আবার এরিয়স্ অপেক্ষা

গুরুতর বিষয় সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রচার করিতেছেন, সে গুলি আর এখন ভ্রম প্রমাদ বলিয়া তত গ্রাহ্য করে না। এখন আর কেহ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহে। গৃক শব্দের এখন অনেক অর্থ পরিষ্কার হইতেছে ও ভবিষ্যতে আরও হইবে। অনন্ত দণ্ড, অনন্ত নরক, ইহা আর এখন বলা চলে না।

মার্চ্চ	সংখ্যা ১৯১৮	...	জন্মান্তরবাদ ও বিজ্ঞান।
এপ্রেল	„ „	...	জন্মান্তরবাদ ও পূর্ব্বপুরুষানুবৃত্তি।
মে	„ „	...	জন্মান্তরবাদ সত্য কেন ?
সেপ্‌টেম্বর	„ „	...	পূর্ব্বস্মৃতি ও জন্মান্তরবাদের প্রতিকূলতর্ক
অক্টোবর	„ „	...	জন্মান্তরবাদের প্রতিকূলতর্ক।

পাঠকবৃন্দ ইচ্ছা করিলে ঐ সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যিনি গভীর গবেষণা করিবেন তাঁহাকে অরিজিন, অাগষ্টিন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতবাদ স্বীকার করিতে হইবে। রায় বাহাদুর জন্মান্তরবাদ পোষণ করিয়া যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজেরই জ্ঞান ও গবেষণা প্রসূত। তিনি হিন্দুদিগের পুরাতন মত কিংবা প্রাচীন কোন খ্রীষ্টীয় মত বা পাশ্চাত্য লেখকের মত বণ্ডন করিয়া তাঁহার যুক্তি পোষণ করেন নাই। তাঁহার সমস্ত লেখাই নূতন ধরণের ও সিদ্ধান্ত ঐরূপ, এগুলি শ্রদ্ধা ও বিবেচনার সহিত পঠনীয়। তবে সকলকেই যে তাঁহার মত মানিয়া লইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। লোকে আমাকে ভাল বলুক আর মন্দ বলুক তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি কিন্তু প্রেত্যভাব যে একেবারে মিথ্যা—ইহার মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, এরূপ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। Dean (Inge) তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক পণ্ডিত এই মতবাদ মানিয়াছেন। আমাদের গোস্বামী এই "Pre-existence of Soul" স্বীকার করিলেই যে আমি হিন্দু হইয়া গেলাম তাহার কি কোন মানে আছে ?

হাক্সলির নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, ইনি উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক; বোধ হয় এই যুগের ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার "বিবর্ত্তবাদ ধর্ম্মনীতি" (Evolution and Ethics) গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—তরলমতি ভিন্ন অন্য কেহই জন্মান্তরবাদকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বিবর্ত্তনবাদের ন্যায় জন্মান্তরবাদও সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উপমান (Analogy) প্রমাণের দৃঢ় যুক্তির দ্বারা ইহারও সমর্থন করিতে পারা যায়।" হাক্সলি এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন (Evolution and Ethics, P 61, Edition of 1894) observes "None but very hasty thinkers will reject it on the ground of inherent absurdity. Like the doctrine of Evolution itself, that of transmigration has its roots in the world of reality, and it may claim such support as the great argument of "Analogy" is capable of supplying.

এ সম্বন্ধে আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ধৃত করিব। ইনি পোলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক লুটোশস্কি (Lutoslawski) ইনি প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের উপাসক ছিলেন, এবং হেকেল, বুকনার প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া জড়বাদের পক্ষপাতী হয়েন। পরে তিনি দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও তর্কবিদ্যার (Philosophy, Psychology and Logic) আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এখন তাঁহার নাম ইউরোপময় বিশ্রুত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—যাহার ফলে তিনি জড়বাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এই Conversion কাহিনী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Hibert journal-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি উহা এখানে আলোচ্য নহে। এই অধ্যাপক লুটোশস্কি বলেন যে, জন্মান্তরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় নাই (Absolute

certainty of his pre-existence and re-incarnation)। "এ বিষয়ে আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে, এই পৃথিবীতে এবার জন্ম ধারণের পূর্ব্বে আমি জন্মিয়াছিলাম এবং মৃত্যুর পর আবার জন্মাই। মানব জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা যতদিন না আমার আয়ত্ত হয়, ততদিন বার বার আমাকে এখানে আসিতে হইবে—স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-পরাধীন, নানা অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত মানুষের জ্ঞাতব্য আমাকে আত্মসাৎ করিতে হইবে, তবেই আমার নরজন্মের বিরাম হইবে। * আর একজন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করিব। ইনি কবি-সম্রাট গেটে (Goethe)। অনেকেই বোধহয় অবগত আছেন যে, গেটে একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সাহিত্যরথী (Most potent literary free of the 19th century)। এ হেন গেটের মত উপেক্ষণীয় নহে। গেটে এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এই যে, আমি এখন যেমন আছি এইরূপ সহস্রবার ছিলাম। আবার সহস্রবার এই পৃথিবীতে আসিব। (On the occasion of Weiland's funeral (Jan. 25. 1813) Goethe said to Folk—"I am sure that I, such as you see me here, have I lived a thousand times and I have to come again another thousand times."

প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে জন্মান্তরের স্থান নাই, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম যখন প্রাচীন যুগের অবস্থায় ছিল, যখন খ্রীষ্টীয় উপদেশকেরা যথার্থই খৃষ্ট-সেবকের

* I cannot give up my conviction of a previous existence on earth before my birth, and that I have the certainly to be born again after my death, until I have assimilated all human experience, having been many times male and female, wealthy and poor, free and enslaved generally having experienced all conditions of human condition.

পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং যখন তাঁহাদের নাম ছিল "Christian Fathers," তখন তাঁহারা স্পষ্টভাবে পুনর্জন্মের উপদেশ করিতেন জেরোম (Jerome), অরিজেন (Origen) প্রভৃতির রচনায় এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়—"Is it not more in conformity with reason that every soul for certain mysterious reasons (I speak now according to the opinion of Pythagoras and Plato and Empedocles, whom Celsus frequently names), is introduced into a body and introduced according to its deserts and former actions?—Origen, Contra Celscea, I, XXXII.

Jerome's letter to Aritus—"If we examine the case of Esau, we may find he was condemned because of his ancient sins in a worse course of life.

ইহার দার্শনিক যুক্তি।

ন্যায় দর্শনে জন্মান্তরের নাম "প্রেত্যভাব"। অর্থাৎ মরণের পর পুনর্জন্মকে প্রেত্যভাব বলে। এই দর্শনের তৃতীয় আহ্নিকে মহর্ষি গৌতম জন্মান্তরের সাধক যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন। এই সমস্ত যুক্তির সার দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম—সহজাত সংস্কার বা Instinct; দ্বিতীয় জন্মসিদ্ধ রাগ দ্বেষ। বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে Instinct বলে, নিম্নশ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর মধ্যে যাহা সদ্যোজাত শাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখা যায়, সেই Instinct বা সহজাত সংস্কারের নিদান কি? সদ্যোজাত হংস-শাবক সন্তরণ করিতে পারে। এ বিদ্যা সে কোথা হইতে শিখিল? সদ্যোজাত বানর শিশু প্রসূত হইয়াই বৃক্ষের ডাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। সে বিদ্যা সে কোথা হইতে শিখিল? Instinctএর স্বভাবই এই যে, ইহা শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না, প্রথমাবধি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে

ইংরাজী বিশ্বকোষ (Encyclopædia Britannica) হইতে পাদটীকায় একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, বিশ্বকোষের লেখক Instinctএর কয়েকটী উদাহরণ দিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সহজাত-সংস্কার-জনিত ব্যাপার শিক্ষা বা সাধন সাপেক্ষ নহে, উহা সাংসিদ্ধিক বা স্বয়ংসিদ্ধ। * তাহাই যদি হইল, তবে সহজাত সংস্কার কোথা হইতে আইসে? ন্যায়দর্শন বলেন যে, ইহা জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের অভ্যাসজনিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। দৃষ্টান্তস্বরূপে ন্যায়দর্শন সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যাভিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রেত্যাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ-ন্যায় সূত্র ৩।১।২১ অর্থাৎ "সদ্যোজাত বৎসের স্তন্যপানের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অভিলাষ ভিন্ন প্রবৃত্তি সম্ভবে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জাত মাত্র বৎসের স্তন্যপানে অভিলাষ রহিয়াছে। এইরূপ অভিলাষ, যে না পুনঃ পুনঃ স্তন্যপান করিয়াছে, তাহার সম্ভব নহে। সদ্যোজাত শিশু'ত ইহজন্মে স্তন্যপান করে নাই? অতএব বুঝিতে হইবে, সে জন্মান্তরে স্তন্যপান করিয়াছিল এবং সেই ভূতপূর্ব্ব শরীরে কৃত স্তন্যপানের অভ্যাস, যাহা সংস্কাররূপে সঞ্চিত ছিল, তাহাই ইহজন্মে জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তির আকারে প্রকাশিত হইতেছে।" ন্যায় দর্শন-প্রদর্শিত জন্মান্তরের সাধক দ্বিতীয় শ্রেণীর যুক্তি-প্রণালী এইরূপ। ন্যায়দর্শন বলেন, প্রত্যেক জীবের মধ্যে কতকগুলি জন্মসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ পরিদৃষ্ট হয়। এই রাগ দ্বেষের নিদান ইহজন্মের কোন ব্যাপার জনিত নহে, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, সহজাত; জীব ইহা সঙ্গে করিয়া আনে। ইহা যদি ঠিক্ হয়, তবে যখন সেই রাগ-দ্বেষ ইহজন্মের ব্যাপার-জনিত

* By the patient study of the behaviour of precocious young birds such as chicks, pheasants, ducklings and moor hens, it can be readily ascertained that such modes of activity as running, swimming, diving, preening the down, scratching the ground, pecking at small objects with the characteristic attitudes expressive of fear and anger are so far instinctive as to be definite on their first occurrence—they do not require to be learnt— Ency. Brit., 11th Edi. ; Vol , XIV, P. 649.

নহে, তখন ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কারের ফল। ন্যায়দর্শন বলেন, শিশু যে মন লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহা সাদা শ্লেট নহে, তাহাতে পূর্ব্বাবধি অনেকই রেখাপাত আছে। সেই রেখাগুলি জন্মসিদ্ধ রাগ-দ্বেষ। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ যুগের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান-বিদেরা "Tabula rasa"র মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই যে জন্মগত রাগ-দ্বেষ, এ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন তৃতীয় আহ্নিকের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ বলিতেছেন—"বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ"—৩।১।২৫ অর্থাৎ, "জীব রাগযুক্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে; জাত মাত্র জীবে রাগানুবন্ধ দৃষ্ট হয়। রাগ বা আশক্তির যোনি পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন। সেই বিষয়ের পূর্ব্বানুভব জন্মান্তরে গৃহীত শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই রাগানুবিদ্ধ আত্মা পূর্ব্ব শরীরে অনুভূত বিষয় সকলকে অনুস্মরণ করিয়াই তাহাতে রাগযুক্ত হয়।"

ন্যায়দর্শন এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—"সদ্যজাত শিশুর ইহজন্মে অননুভূত বিষয়েও হর্ষশোকভয় দৃষ্ট হয়। এই হর্ষশোকভয় অনুস্মরণ (স্মৃতি প্রবাহ) ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। অনুস্মরণ আবার পূর্ব্বাভ্যাস ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। যদি জন্মান্তর থাকে, তবেই পূর্ব্বাভ্যাস সম্ভব হয়—অন্যথা সম্ভব হয় না। সেই অভ্যাসের সংস্কার পূর্ব্বশরীর পাত হইলেও নষ্ট হয় না।" তবেই সিদ্ধ হইল যে, জন্মান্তরে জীব যে সকল বিষয় ভোগ করিয়াছিল,—তাহার সংস্কার সে স্মৃতিরূপে ইহজন্মে বহন করিতেছে এবং সেই অনুস্মরণ হইতে তাহার অননুভূত বিষয়েও হর্ষ শোক উৎপন্ন হয়। ন্যায়দর্শন এই ভাবে জন্মান্তরবাদ সিদ্ধ করিয়াছেন। সত্য বটে, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এই বৈষম্যের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ক্যাণ্ট, নিউম্যান প্রভৃতি যাঁহারা এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, যখন পুণ্যের ফলে সুখ ও পাপের ফলে দুঃখ—ইহাই জগতের নৈতিক ধারা, এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, পুণ্যবান অনেক সময় দুঃখী ও পাপী অনেক সময় সুখের অধিকারী এবং যখন জগতে জীবে

জীবে এত বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই পরলোকে ন্যায়বান বিধাতা এই বৈষম্যের সাম্য বিধান করিবেন, এই সুখ দুঃখের সামঞ্জস্য সাধন করিবেন।

অধ্যাপক বার্গসন এবং বিবর্ত্তনের ফল।

সুখের বিষয় পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে কেহ কেহ একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে অধ্যাপক বার্গসনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি বলিতেছেন, প্রাণীর যে প্রাণশক্তি (Life বা Elanvital), সেই প্রাণশক্তিই বিচিত্র শরীর নির্ম্মাণ করিতেছে। সমস্ত প্রাণিজগতে কোন এক সঙ্কল্পের ব্যাপার (Some thing of the psychological order) অনুস্যূত রহিয়াছে। কি নিম্ন প্রাণী, কি উচ্চ প্রাণী, সকলের মধ্যেই এই প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং ইহারই প্রেরণায় প্রাণিজগতে নব নব উপজাতি উৎপন্ন হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অধ্যাপক বার্গসন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, আমাদের চক্ষু এক অতি বিচিত্র যন্ত্র। ইহার অবয়ব-সংস্থান, সুকুমারতা, বৈচিত্র্য ও সুসঙ্গতি অতিশয় অদ্ভুত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সঞ্জাত প্রাণিশরীরের পরিবর্ত্তন বংশানুক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া যে এই বিচিত্র যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে। বার্গসন বলেন, মেরুদণ্ডশালী জন্তুর মধ্যে (যাহাকে Vertibrate Animal বলে) যেরূপ চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জীব কোন কোন Molluse জাতীয় প্রাণীর মধ্যেও ঠিক ঐ রকমের চক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে ঠিক এক ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং তাহার ফলে তাহাদের শরীর যন্ত্রের ঠিক্ একরূপ ক্রমবিকাশ হইয়া এক রকমের চক্ষু উপজাত হইল, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সেই জন্য বার্গসন বলেন, মানুষ যেমন করিয়া

অনুবীক্ষণ গড়িয়াছে, প্রাণ-শক্তি সেইরূপ করিয়াই চক্ষু যন্ত্র গড়িয়াছে। * ইহা সেই ভারতের প্রাচীন কথার প্রতিধ্বনি। যাহার কথা অনেক দিন পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "দর্শনায় চক্ষুঃ" অর্থাৎ জীবের দর্শন করিবার সঙ্কল্প হইল, তাহার ফলে চক্ষু উৎপন্ন হইল।

তাহাই যদি হইল, যদি দেহের পরিবর্ত্তন প্রাণশক্তির প্রেরণা ভিন্ন হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, যদি ঐ ব্যাপারের মধ্যে সংকল্প বা ঈক্ষণ (something of the psychological order) নিহিত রহিল, তবে আর বিবর্ত্তন দেহগত হইল কিরূপে? তবে ত ভারতের সেই প্রাচীন মতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল যে, দেহী ভিন্ন দেহ হয় না, অগ্রে বীজ পরে শরীর, অগ্রে ব্যাপার, তারপর ইন্দ্রিয়। (It takes a soul to move a body,—Mrs. Browning) এক কথায় বিবর্ত্তন দেহগত নহে, বীজগত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না; এই যে আকৃতির যদৃচ্ছাক্রমে স্বতঃসিদ্ধ (spontaneous) পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং সেই সকল পরিবর্ত্তন গুলির মধ্যে যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহাই টিকিয়া গিয়া বংশপরম্পরাক্রমে স্থায়ী হইল, সেই স্বতঃসিদ্ধ পরিবর্ত্তন কে ঘটাইল? বার্গসনের মতে প্রাণশক্তির প্রেরণা (Elan vital—যাহাকে তিনি the "thurst," the "go" of life বলিয়াছেন) ভারতের ভাষায় জীবের পরিস্পন্দ বলিতে হয়। সেই জন্য বিবর্ত্তনের এ দেশীয় নাম—ক্রমাভিব্যক্তি। যাহা জীবের মধ্যে অব্যক্ত ছিল, বিবর্ত্তনের ফলে তাহা অভিব্যক্ত হইল মাত্র। নূতন কোন কিছু বাহির হইতে আসিল না যাহা পূর্ব্বাবধিই ভিতরে ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল মাত্র। তবেই দাঁড়াইল যে, বিবর্ত্তন বাহিরের ব্যাপার নহে, অন্তরের বিকাশ। একথাও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে আরম্ভ

* Harmsworth's popular Science.

(১) এখানে "জাতি" অর্থে "জাত" নহে, "জাতি" অর্থে জন্ম। অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ আছে, সেই জাতিস্মর।

করিয়াছেন বিশেষতঃ একজন বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেল্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সকলের মধ্যে কলা বা অবয়বরূপে পূর্ব্বাবধি সমস্তই আছে। ইহার ফলে বিবর্ত্তনবাদে নূতন তথ্য সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল তাহাই প্রচুর। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে "জাতিস্মরের" (১) ইতিহাস আর উল্লেখ করিলাম না; পাঠক ইচ্ছা করিলে সার অলিভার লজের "Survival of man" নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

১৯২৭ সালের ২২শে জানুয়ারী, "The Epiphany" নামক সাপ্তাহিক পত্রে Mr. R. Palit, Reincarnation সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম, কেহ যদি তাঁহার মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।

REINCARNATION.

Reincarnation has often been confused with Transmigration and Metempsychosis in the East as well as in the West. The theories concerning re-birth of men in brute bodies are crude caricatures of the true conception. They represent the reality as absurdly as ordinary life in Europe and America illustrates the teachings of Jesus.

There are four objections to the idea of re-births:—

1. That we have no memory of past lives.
2. That it is unjust for us to receive now the results of forgotten deeds enacted long ago.
3. That heredity confutes it.
4. That it is an uncongenial doctrine.

Why do we not remember something of previous lives, if we have really been through them ?

The reason why there is no universal conviction from this ground seems to be that birth is so violent as to scatter all the details and leave only the net result. The real soul is so distinct from the material plane that we have difficulty in retaining many experiences of this life. Who recalls all his childhood? And has any one a memory of that most wonderful epoch, infancy. The great and good prelate, Frederick Christian Von Oetingen, of Wurtemberg, became in his old age a devout and innocent child, after a long life of usefulness. The profound scholar was stripped of his intellect and had entirely lost the memory of what he had read and written. Similar cases might be produced, where the spirits of strong men have been divested of a lifetime's memory in aged infancy, seeming to be a foretaste of the next existence. Professor William Knight writes in the fortnightly Review of 1878 regarding the memory of the past. "Memory of the details of the past is absolutely impossible. The power of the conservative faculty though relatively great is extremely limited."

But it has been shown that there are traces of former existence lingering in some memories. Sleep, somnambulism, trance and similar conditions open up a world of super-sensuous reality to illustrate how erroneous are our common notions of memory. Sir William Hamilton has collected a number of instances of such wonderful

revival of memory. Carpenter's Mental Physiology and Brodie's Psychological Inquiries mention several cases.

God's justice is vindicated by the undisturbed sway of the law of causation. If I suffer it must be for what I have done. Nature is the arena of infallible cause and effect, and there is no such absurdity in the universe as an effect without a responsible cause.

Reincarnation includes the facts of heredity by showing that the tendency of every organism to reproduce its own likeness groups together similar causes producing similar effects, in the same lines of physical relation. Instead of being content with the statement that heredity causes the resemblances of child to parent, reincarnation teaches that a similarity of ante-natal development has brought about the similarity of embodied characteristics.

The Jews generally adopted it after the Babylonian Captivity through the Pharisees, Philo of Alexandria and the doctors. Reincarnation has played an important part in the thought of Origin and several other leaders among the early Church Fathers. In the Seventeenth Century, Cambridge Platonists gave it wide acceptance. Scientists like Flammarion, Figuier and Brewster have earnestly advocated it.

Although most Christians are unaware of it, re-incarnation is strongly present in the Bible, chiefly in the form

of pre-existence. A sufficient evidence of the Biblical support of pre-existence is found in Solomon's Proverb viii. 22-31. Jeremiah hears Jehovah tell him. "Before I found thee in the belly I knew thee; and before thou camest thou out of the womb I sanctified thee." Jeremiah i. 5 "Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God and he shall go no more out." (Rev. iii 12.)

Pre-Existence of soul অস্বীকার করা যায় না। ইহা বাইবেলের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আদি পুস্তক ২৪ অধ্যায় ১৭-১৮ পদ, গীত সংহিতা ২১০; ৪ পদ, হিব্রীয় ৫; ৫-৬ পদ ও ৭ অধ্যায় ১-৩ পদ। এই বাক্যগুলির অবস্থা দেখিয়া Biblical Cyclopaedea (21, Edi.) গ্রন্থের লেখক John Eadie, D. D. L. L. D. মহোদয় "Melchizedek" সংজ্ঞার যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টই মল্কীষেদক। তিনি লিখিয়াছেন, "Thus acknowledged the dignity and Superiority of Melchizedek, surely Christ,......"It is ancient opinion, as Epiph. Heares, LXVII. testifies, that Melchizedek was the Son of God—i. e., the Logos; the same who appeared to Abraham and to the Patriarchs," etc.......

পুনশ্চ, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার কাল্মেট্ তাঁহার স্বরচিত বিব্লিকেল্ এন্সাইক্লোপিডীয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে "Melchisedec" সম্বন্ধে অনেক টীকা টিপ্পনী প্রদান করিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যথা—"That Melchisedec who appeared to Abraham, was

the Son of God, and that the patriarch worshipped him as the Messsiah."......আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিদিগের ঐ ব্যাখ্যায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। চিন্তা করিয়া দেখিলে Pre-Existence of soul স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাহারা অদার্শনিক খৃষ্টপন্থী, তাহারা ইহা মানিয়া লইতে ভয় করিবেন কিন্তু ভয়ের বা অবিশ্বাসের কোন কারণ লক্ষিত হয় না। চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বোধ হইবে। তবে যদি কোন পাঠক ইহা অমান্য করিতে চাহেন, তাহার সহিত আমার কোন তর্ক নাই। আমি কেবল প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতবাদ এস্থলে দেখাইলাম মাত্র।

Christianity before Christ; or, Prototypes of our faith and culture নামক গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত Charles J. Stone F. R. S L., F. R. Hist. S. তিনি ঐ গ্রন্থের "Salem and the previous Incarnation of the Divine in Melchizedek in the Bible" নামক নিবন্ধে যেরূপ যুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয় যে যীশু খ্রীষ্টই বাইবেলের মল্কীষেদক রূপে পুরাতন জগতে এক সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ভিন্ন ভিন্ন লেখকদিগের ভিন্ন মত দেখা যায় কিন্তু পণ্ডিত চার্লস নিজের মতই বলবৎরূপে দেখাইয়াছেন তাঁহার প্রমাণ অমান্য করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

(৭) জেলার।

জেলার জন্মান্তরবাদকে রূপকভাবে লইয়া আর এক অভিনব ছাঁচে ঢালিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নরাধম ব্যক্তির স্বভাব পশুর ন্যায় হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির আত্মার অবনতি হয় মাত্র, কিন্তু সে কখনও পশু হয় না।

(৮) ওর্‌ফিক্‌। *

ওরফিক্‌—ইহা গ্রীকদিগের একটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মমতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হইতে পৃথক হয়, আবার দেহে প্রবেশ করে এইরূপ আত্মা একবার আইসে ও একবার যায়, কিন্তু ইহাতেও মুক্তির কোন পথ বা আত্মার কোন উন্নতি হয় না দেখিয়া তাহারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে যমের দেবতার কাছে উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিলেই আত্মার উন্নতি ও অপবর্গ (মুক্তি) সাধিত হয়।

(৯) ফাইলো।

ফাইলো,—জন্মান্তরে বিশ্বাসবাদ ছিলেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করেন নাই।

(১০) কাবালা

আচার্য্য John Hunt, D. D. মহোদয় কাবালা গ্রন্থের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যথা—"The Cabbala is the secret tradition of the Jews, which explains the hidden mean-

* Dean—W. R Inge, C. V. O, D. D. তাঁহার স্বরচিত The philosophy of Plotinus নামক গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণে "cosmology" নিবন্ধে orphic doctrine সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছেন—"This was an orphic doctrine. The wheel of birth is governed by the circling of the heavens. The Soul, caught in the circle, passes through various forms, now man, now beast, now plant. The cycle consists of ten thousand solar years; at the end of each cycle the Soul may escape from its captivity, and a new world—order begins. This theory is a conflation of the old belief in reincarnation with the Babylonian astronomy, which taught that after long intervals the stars all come back to their original positions.

ing of the Scriptures, and contains the true esoteric doctrine of Rabbinical Judaism. The origin of the Cabbala is unknown. The present collection of books which profess to unfold it are supposed to have originated about the first or second century of the Christian era ; but concerning the age of the doctrines contained in them we know nothing, The mystical Rabbis ascribe the Cabbala to the angel Razael, the reputed teacher of Adam, and say that the angel gave Adam the Cabbala as his lesson book in paradise, Form him it descended to generation after generation. Noah read it in the ark, Abraham treasured it up in his tent ; and through Jacob it was bequeathed to the chosen people. It was the charter of the national wisdom ; their secret masonic symbol. By its instruction Moses brought the Jews out of Egypt, and by its cunning wisdom Solomon built the temple without the sound of a hammer. That the collection of the books which we possess is the original Cabbala may be true, though its wisdom much resembles that of the schools of Alexandria."......মোট কথা এই ইহা য়িহুদীদিগের একটী প্রাচীন পরম্পরাগত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও কিয়ৎ-পরিমাণে ইহাতে দর্শনের ব্যাখ্যাও দেখা যায়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) Creation, (২) Brightness, রব্বি আকিবা এবং রব্বি শিমোণ বেন গোখাই (১০০—২০০ খ্রীঃ অঃ) এই রব্বিদ্বয় উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন এবং ১৩০০ খ্রীঃ অব্দে মোজেস্ ড-লিয়ন্ ইহার অনেকাংশ পরিবর্তন করিয়া কাবালাকে অন্যরূপে দাঁড় করাইয়াছেন,

ইহার মধ্যে জন্মান্তর যে ভাবে স্থান পাইয়াছে তাহা কোন অংশই কাহারও পক্ষে রুচিকর নহে।

(১১) 'প্রজ্ঞা' গ্রন্থ

আপক্রিফার অন্তর্গত 'প্রজ্ঞা' নামক গ্রন্থের একস্থানে এই কথা পাওয়া যায় যথা—"In all ages entering into holy Souls. she maketh them friends of God and prophets." (Wisd. 7; 27.) শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পদের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যথা:—"এই অতুলিত চিৎশক্তি সকল কার্য্য সম্পাদনে পটু, ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া সমুদায় পদার্থকে নবীভূত করে; যুগে যুগে বিশুদ্ধ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহা মানবকে ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদিচ্ছা—বিঘোষক করিয়া তুলে"। আচার্য্য R. W. Churton, B. D. মহোদয়ের ঐ পদের ইংরাজি ব্যাখ্যা এই:—"This inspiration proceeds from one Spirit, yet it has power "over all things; it changes and renews everything, whilst it remains" itself unchanged; and throughout all generations it passes into holy "souls, and makes them friends of God and prophets." This is the work of the one Spirit in all His manifold operations (1 cor, 12; 11), to make all things new (Rev. 21; 5. 2 Cor. 5; 17) to renew the face of the earth (Ps. 104; 30) and also to give men new hearts (Ezek 11, 19-20.) By His inspiration Abraham, Moses, and the prophets attained to friendship with God, receiving His revelations, and conversing with Him in prayer (Exod. 33; 11) কেহ কেহ আবার এইরূপ বলেন যথা—"আমি পবিত্র ছিলাম, কলুষিত শরীরে প্রবেশ

করিয়াছি"। যাহা হউক সেই সময়কার য়িহুদী রব্বিরা জন্মান্তরবাদী ছিলেন, কোন কোন য়িহুদী শিক্ষকের এই সংস্কার ছিল যে গর্ভস্থ শিশুর পাপ করিবার সম্ভাবনা আছে। আবার কাহারও কাহারও এই ধারণা ছিল, যে শারীরিক দোষ জন্মের পরবর্তী ভাবী পাপের দণ্ডস্বরূপ।

(১২) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী Gnostic ধর্ম্ম সম্প্রদায়, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে Manichaeon সম্প্রদায় জন্মান্তর মানিত। ষোড়শ শতাব্দীতে দার্শনিক ব্রুনো; (১৫৪৮—১৬০০) লিখিয়াছেন :—"And back to the seed flies the spirit but thence again re-enters the world eternal and ageless. And this is death to mortals. Since in their folly they know not the light to which we hasten." আত্মা বীজে বিলীন হয়, আবার তথা হইতে—বয়ঃসীমাহীন পৃথিবীতে প্রবেশ করে। আর ইহাই মর্ত্ত্যের মৃত্যু। কারণ তাহারা অজ্ঞতা হেতু জানে না যে, কি জ্যোতির্ম্মলাভিমুখে তাহারা চির অগ্রসর।

(১৩) সপ্তদশ শতাব্দীতে—Franciscus Mercurius Helmont (১৬১৮—১৬৯৯) জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন।

(১৪) অষ্টাদশ শতাব্দীতে—Leichtenburg (১৭৪২—১৭৯৯) বলেন, "আমি যে এই জন্মের পূর্ব্বে একবার মরিয়াছিলেন, তাহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

(১৫) Lessing—১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ লেখক লেসিং এই মতের সমর্থন করেন।

(১৬) Herder—১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে Herder তাঁহার জন্মান্তরবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"To purify the heart, and to enno-

ble the soul and all it instincts and desires this seems to me the true palingenesis of the present life, after which there certainly awaits us a higher and brighter Metempsychosis, but one of which we know nothing. "হৃদয়ের পবিত্রতা, আর আত্মার ও তৎসম্বন্ধীয় বাসনা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছাই আমার মতে বর্ত্তমান জীবনের প্রকৃত পুনর্জ্জন্ম এবং পরেও আমাদের "অজ্ঞাত" উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, জন্মান্তর আছে।

(১৭) Schopenhauner ১৭৮৮—১৭৬০। উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী শোপেনোয়ার জন্মান্তরবাদের অনুকূলে অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং কোন কোন সমালোচক বলেন, যে তিনি প্রকৃতই জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিতেন। তিনি জন্মান্তরবাদকে— "Most admirale statement of theory in mythical form', বলিয়াছেন। তাঁহার "Die well also wille and vorstellung," "the world as will and as Idea (Translated by R. B, Haldane and J. Kemp) নামক গ্রন্থে মৃত্যু ও নব ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Every new born being enters its new Existence Joyously and enjoys it as a gift, but there is and can be no gift in question, His new life is bought by the age and death of an organism that has lived its span but contains the indestructible germs from which new life springs, The old and the new are one being. To show the link connecting them would be the solve a very difficult problem," প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি, তাহার নূতন জীবন একটা দান স্বরূপ ভাবিয়া, সানন্দে তাহাতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে দানের কোন কথাই হইতে পারে

না। তাহার নূতন জীবন জন্য একটী "জীবনের" জরা ও মৃত্যু দ্বারা ক্রীত, যে জীবনের আয়ু যদিও সমাপ্ত তথাপি তাহাতেই নবজীবনের উদ্ভাবক অমর বীজাঙ্কুর বর্ত্তমান। পুরাতন ও নবীন একই ব্যক্তি। কি যে সম্বন্ধ শৃঙ্খলে উভয়ে বিজড়িত তাহা দেখান অতি দুরূহ সমস্যা।

(১৮) বর্ত্তমানকালে, জন্মান্তরবাদ, আধুনিক "Theosophist" সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মমত। তাঁহাদের মতে জন্মান্তরবাদই বর্ত্তমান কালের সমস্যা সমূহ সমাধান করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কেহ কেহ বলেন জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি সংশয়বাদে কিন্তু একথা মানিয়া লইতে পারা যায় কি না তাহাতে সন্দেহ হয়। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে (১৫০০ খৃঃ পূঃ) "আর্য্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আচার ব্যবহার হেলন্, ইটালী, কেলট, জারমান এবং শ্লাভদেশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহারের ন্যায় ছিল। তাঁহাদের প্রভাব তখনও এদেশে তেমন ভাবে সঞ্চারিত হয় নাই। তখন আদিম দ্রাবিড়দিগের ভাষা, ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি উন্নত হইতেছিল। পরে আর্য্যগণ আসিয়া তাঁহাদের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং এই সময় হইতে দ্রাবিড়দিগের অনেক কথা আর্য্যভাষার মধ্যে আসিয়াছিল; দ্রাবিড়দিগের বহু দেব দেবীর নাম, কাহিনী প্রভৃতি আর্য্যেরা গ্রহণ করেন, এমন কি অনেক সময়ে তাহাদের মতবাদকেও মানিয়া লইতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে,—আত্মার যোনি ভ্রমণ (Transmigration of Soul) সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বিশেষরূপে উল্লেখ না থাকিলেও আর্য্যেরা দ্রাবিড়দিগের নিকট ইহা গ্রহণ করেন। দ্রাবিড়দিগের দেব-দেবীর নামও যে আর্য্যেরা ব্যবহার করিতেন তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দ্রাবিড়দের পর্ব্বতের দেবতাকে আর্য্যেরা "রুদ্র" (Red god) বলিতেন। এই "রুদ্রের" নাম তামিল ভাষায়, শিবন (লোহিত) এবং শেম্বু (তাম্র) ঐ শব্দদ্বয় হইতেই "শিব" এবং "শম্ভু" শব্দের উৎপত্তি। অতঃপর পৌরাণিক যেযু আর্য্যেরা "রুদ্র" "শিব" অথবা "মহাদেব" বলিয়া এক

দেবতা আছেন, এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন"। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৯২৭।)

Indian philosophy নামক গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক S. Radhakrisnna মহোদয় Transition to the Upanishads-"Eschatology" নিবন্ধে (১৩৫ পৃষ্ঠায়) এই কথা লিখিয়াছেন যথা—"The Brahmanas contain all the suggestions necessary for the development of the doctrine of re-birth. Thay are however, only suggestions while individual immortality is the main tendency. It is left for the Upanishads to systematise these suggestions into the doctrine of re-birth. While the conceptions of Karma and re-birth are unquestionably the work of the Aryan mind, it need not be denied that the suggestions may have come from the aborigines, who believed that after death their souls lived in animal bodies."

(১৯) *দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতা নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চত্য" নামক গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই :—পূর্ব্বজন্ম সত্য হইলেও মানবাত্মা যে নানা নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সপ্রমাণ হয় না। মানবাত্মারই উচ্চ নীচ অসংখ্য সোপান, অসংখ্য অবস্থা পরম্পরা থাকিতে পারে যাহার ভিতর দিয়া ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোনি ভ্রমণ যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতে পারি না। মানবের জ্ঞান ও বিশেষ বিশেষ নিকৃষ্ট জন্তুর জ্ঞানে অনতিক্রমনীয় প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীব পরম্পরাকে দাঁড় করাইলে সেই অনতিক্রমনীয় প্রভেদ লক্ষিত হইবে কি না সন্দেহ।

বিজ্ঞান যেন ক্রমশঃ আমাদের সংস্কারগত ভেদজ্ঞানকে দূর করিয়া দিতেছে। কোন কোন উচ্চতর মানবেতর জন্তুর মধ্যে (১) এমন গভীর ও মধুর সামাজিক ভাব এবং উন্নতিশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি মানবের পক্ষেই দুর্লভ পরোপকার প্রবণতা, স্বার্থহীনতা ও অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপের ভাব পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সকল জন্তুর ক্রমোন্নতি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, শরীর ও আত্মার পরস্পর নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও ইহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ এখনও এত দুর্ব্বোধ রহিয়াছে

(১) প্রেত্যভাব—মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতদ্রূপ জন্মমরণ প্রবাহের নাম প্রেত্যভাব। ইহার অপর নাম প্রবৃত্তি নির্ব্বন্ধ। জীব বিশেষের স্বভাব ও কর্ম্ম বিশেষ পূর্ব্ব জন্ম থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডার শিশুর পলায়ন বৃত্তান্ত ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই পূর্ব্বজন্মের প্রতি অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। বিশেষতঃ খড়্গী পশুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, জন্মান্তর আছে। কেবল আমরা বলি না, অনেক পশুতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, গণ্ডারী শাবক প্রসব করিয়া কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া থাকে, যখন সে সন্তানের গাত্র লেহন করিতে যায়, তখন আর তাহাকে দেখিতে পায় না, কারণ এই যে গণ্ডার শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে। ৫।৭ দিন পর আবার উভয়ে উভয়ের অন্বেষণ করিয়া একত্রিত হয়। এই বৃত্তান্ত দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমাণ করেন যে, স্বভাবের সামর্থেই হউক, আর ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলেই হউক, আর জন্মান্তরীয় সংস্কারের বলেই হউক, গণ্ডার শিশু বুঝিতে পারে আমার মা আমাকে লেহন করিবে, করিলে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইবে। পাছে মা গা চাটে সেই ভয়ে গণ্ডার শাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পলায়ন করে, পরে গাত্র চর্ম্ম ৫।৭ দিনে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া লয়। বস্তুতঃই গণ্ডারীর জিহ্বায় এত ধার যে, বৃক্ষ লেহন করিলে বৃক্ষের ত্বক্ উঠিয়া যায়। গণ্ডার পশুর এই অদ্ভুত স্বভাব পূর্ব্বজন্ম থাকার অনুমাপক। পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে গণ্ডার পশু কদাচ ঐ স্বভাব পাইত না। এইরূপ এইরূপ এত উদাহরণ বিদ্যমান আছে যে, সে সকলের রহস্য চিন্তা করিলে স্থির বুদ্ধি মনুষ্যমাত্রেই জন্মান্তর বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। সাংখ্যদর্শন পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ প্রণীত চতুর্থ সংস্করণ ২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে জন্মান্তর ও যোনি ভ্রমণ যদি সত্যও হয়, তথাপি বলিতে হইবে যে, কি প্রণালীতে এক দেহযুক্ত আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ লাভ করে, কি নিয়মে নিম্ন যোনিস্থ আত্মা উচ্চতর শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত বিষয় এখনও গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। একটী কথা আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কোন আত্মা একবার মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া; মানবের জটিল ও উন্নত মনোবৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে পুনরায় কোন নিকৃষ্ট জন্তুর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ আত্যন্তিক অধোগতি প্রাপ্তির উপযুক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা মানবাত্মার পক্ষে ঘটা আমরা অসম্ভব মনে করি, এবং বোধ হয় প্রাণী বিজ্ঞানেও এরূপ পশ্চাদ্‌গামী বিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

(১০) পারস্য দেশের "Mystic" কবি জালাল উদ্দিন রুমীও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মান্তর সমর্থন করিয়াছেন। পারসিকদের ধর্ম্মশাস্ত্র "দেসাত্তির" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মানুষ ইহজীবনে যে দুঃখ ও শোক অনুভব করে, তাহার কারণ পূর্ব্বদেহকৃত বাক্য বা কর্ম্ম। ন্যায়পর বিধাতা এইরূপে তাহাদের শাস্তি বিধান করেন। ইহাদিগের মধ্যে একটী ধ্যানী সাধক সম্প্রদায় আছে, ইহাদিগকে সুফী বলে। ইহারা মুসলমান বৈদান্তিক। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপদেশ প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য জালালুদ্দিন রুমী। তিনি তাঁহার "মেসন্নাভি" গ্রন্থে জীবের বিবর্ত্তন অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীব প্রথমে স্থাবর হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সেখান হইতে বিবর্ত্তন গতিতে সে উদ্ভিদ হয়। বহুযুগ উদ্ভিদ্ দেহে অবস্থান করিয়া পরে পশু যোনিতে প্রবেশ করে। পশু হইতে বিবর্ত্তন গতিতে সে মানব হয়, কিন্তু এইখানেই তাহার ঊর্দ্ধগতি স্থগিত হয় না। মানব ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দেবতা হয়। কিন্তু দেবত্বই মানবের চরম নহে; সর্ব্বশেষে সে ভগবানের সহিত মিলিত হয়; তখন তাহার

যে মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পনারও অতীত। (Jalal-uddin Rumi's Masnavi. IV) Anti-Christ নামক গ্রন্থের লেখক Nietzche (নীচে) স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া জন্মান্তরে বিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের বাহ্য ঘটনা ও অবস্থার বিষয় তত মনোযোগ করেন নাই; Nietzche এক প্রকার Agnostic ভাবাপন্ন ছিলেন। ("গীতা রহস্য অথবা কর্ম্ম যোগশাস্ত্র গ্রন্থের" ২৬৯ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। লেখক স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর Nietzche's Eternal Recurrence গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে পাকা নিরীশ্বরবাদী জর্ম্মান নীচেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত জন্মান্তর রহস্যের অনুকূল অর্থাৎ অনুরক্ত তর্ক ও ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের মতামত প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে যাঁহারা জন্মান্তরবাদী নহেন তাঁহাদের যুক্তিতর্ক প্রকাশ করিব পাঠকবর্গ স্ব স্ব চিন্তায় বিচার করিয়া লইবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—তবে কি জগতে ঘোর বৈষম্যের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইবে? খ্রীষ্টধর্ম্ম আসিয়া ইহার উত্তর দিতেছে "না"। কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে স্বর্ণাক্ষরে এই শিক্ষা রহিয়াছে যে, মনুষ্য ইহসংসারে পরীক্ষার অবস্থায় রহিয়াছে। সে যে নানা ঘটনা ও অবস্থা দ্বারা বেষ্টিত, তাহাতেই তাহার চরিত্র সংগঠিত হইতেছে। নানা বাহ্য ঘটনা ও অবস্থার উপর তাহার চরিত্র সংগঠনের নির্ভর করে।

প্রাক্তন স্মৃতি (ফাইডোন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ, সক্রেটীসের শিক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড) প্রাক্তন স্মৃতির মতানুসারে আত্মা দেহ ধারণের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু সংবাদিতা যে যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং হয় আত্মা সংবাদিতা নহে, না হয় আত্মার দেহ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে প্লেটোর জ্ঞান ছিল না। সিম্মিয়াস স্বীকার করিলেন যে প্রাক্তন স্মৃতিবাদ অকাট্য যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

বৈষম্যের অবস্থা ও বিশপ বটলার মহোদয়ের উত্তর।

জগদ্বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় দার্শনিক পণ্ডিত বিশপ বটলার মহোদয় বলেন,—অনেকসময়ে এই পৃথিবীতেই আমরা যেরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাহায্যে ধর্ম্মজীবন গঠন করি, তাহারই ফলস্বরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করি। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়াই, ধর্ম্মাচারীদের পক্ষে অনেক মঙ্গলের কারণ হয়। আর অধর্ম্ম, অধর্ম্ম বলিয়াই, অধর্ম্মাচারীদের পক্ষে অনেক অসুবিধা ও অমঙ্গলের কারণ হয়। সচরাচর এইরূপই হইয়া থাকে, ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল মনে প্রতিভাত হয়। অধর্ম্মাচরণ করিলে মনে এক প্রকার আত্মগ্লানির উদ্রেক হয়। আমরা ইহজীবনে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করি, তাহা অনেক সময়ে আমাদের নিজের উপরেই নির্ভর করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসারে যাহাদিগকে সৌভাগ্যশালী বলা যায়, যাহারা এক সময়ে না এক সময়ে আপনাদের সময় ও শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা পরিশ্রমী, কার্য্যক্ষম ও সৎ। যাহাদিগকে লোকে দুর্ভাগা বলে, তাহারা সময়ের সৎব্যবহার করে নাই, আলস্য পরতন্ত্র হইয়া জীবন কাটাইয়াছে, মনুষ্যের সহিত কেবল অসৎ ব্যবহারই করিয়াছে। এ সকল লোক যে ইহজগতে দুর্ভাগ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? "অনেক সময়ে মনুষ্যকে আপন কর্ম্মদোষেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যখন মনুষ্যের নানা অবস্থা সম্বন্ধে দৃশ্যকারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অদৃশ্য কারণ নির্দ্দেশ করিবার হেতু কি? আমি একথা বলি না যে, পৃথিবীর নানা প্রকার বৈষম্যের প্রকৃত কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। অনেক বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক দুরূহ ও কঠিন সমস্যা আছে, যাহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সে সকলের কারণ আমাদের জ্ঞানাতীত, আর সেই সকল, ঈশ্বর আমাদিগের হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া যে আপনার মহতী ও মঙ্গলময়ী

ইচ্ছা সাধন করিতেছেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিলেই যে, সংসারের নানা বৈষম্যের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, তাহা আমরা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম হেতু আমাদের নানা বৈষম্য হইয়াছে যদি বলি, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উত্থিত হইবে, পূর্ব্বজন্মের পূর্ব্বে আবার জন্ম হইয়াছিল এবং জন্মান্তর স্বাকার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর আদি অন্ত নাই; তাহা হইলে একটী দুরূহ বিষয়ের সমস্যা করিতে গিয়া আরো কতকগুলি দুরূহ বিষয় উত্থাপিত হয়।

"অদৃষ্টের হস্ত এড়াইয়া যদি আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা মানি, তাহা হইলে অনেকগুলি দুরূহ বিষয়ের হস্ত এড়াইতে সক্ষম হইব। ভাবী পুরস্কার ও দণ্ডের অবস্থা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে'ও অনেক গোল মিটিয়া যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, যেন আমরা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া পরকালের জন্য প্রস্তুত হই। ভবিষ্যত জীবনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহারা ইহজগতে দুঃখ ভোগ করে, পূর্ব্বজন্মের পাপ বিষয়ে নির্দ্দেশ করিয়া অযথারূপে তাহাদের দুঃখ বাড়াইবার আবশ্যকতা কি? তাহাদিগকে বৃথা নিরাশাপঙ্কে ফেলিলে লাভ কি? যাহারা দুঃখভোগ করে, তাহাদিগকে কেন বুঝাইয়া দেও না যে, তাহাদের দুঃখভোগে কোন ভাবী মঙ্গল সাধিত হইতেছে, এবং আরো উপযুক্তরূপে ভাবী ও নিত্য জীবনের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছে? অনেক সাধু'ও এই জগতে নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া আপনাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা রাজর্ষি দায়ুদের ন্যায় বলিতে পারিয়াছেন, "দুঃখার্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি পথভ্রান্ত হইতাম, কিন্তু এখন তোমার বাক্য পালন করিতেছি"। বিশপ বটলার মহোদয় বলিয়াছেন "যে ধর্ম্ম এ জগতেই অনেক সময়ে প্রবল হয়। যদিও সময়ে সময়ে নানা দুর্ঘটনা বশতঃ ইহার

শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না, তথাচ ভবিষ্যতে ইহা আপনার শক্তি আরো যে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবে, এবং পুরস্কৃত হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্ম এ জগতে নিপীড়িত, অপমানিত, উপেক্ষিত ও তিরস্কৃত হইতে পারে, কিন্তু অনন্তকালে ইহার শক্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের সুবিধা আরো দেদীপ্যমান হইবে, এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র আরো উপযোগী হইবে। যে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধক, ইহজগতে ধর্ম্মের গতি ও বিস্তৃতির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে, সেই সকল বাধা ও প্রতিবন্ধক অপনোদিত হইলে ধর্ম্মের শক্তি আরও যে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

জন্মান্তর সম্বন্ধে অপর পক্ষের উক্তি

(১) "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক গ্রন্থের লেখক আমার একজন পরিচিত বন্ধু (শ্রীযুক্ত ক্ষীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ) তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি— "দুঃখ বা অমঙ্গলের প্রকৃত মূল কারণ বা উদ্দেশ্য না বুঝিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল প্রভৃতি কূটতর্কের অবতারণ করিলেও কোন লাভ দেখি না এবং তাহাতে দুঃখ বা অমঙ্গল কিরূপে নিরস্ত হইবে তাহাও বুঝি না।"

(২) "প্রকৃত-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের লেখক—শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী। লেখক মহাশয় একজন প্রবীন চিন্তাশীল ব্যক্তি; "জগতে একজন সুখী ও একজন দুঃখী দেখা যায় কেন?" এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মনুষ্য মধ্যে কেহ সুখী কেহ দুঃখী, এক জন রাজা একজন প্রজা, একজন রোগী একজন সুস্থকায়, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব দেখা যাইতেছে। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং অপক্ষপাতী; তাঁহার দৃষ্টিতে অমঙ্গল এবং পক্ষপাত কি জন্য বিচরণ করিতেছে? ইহার কারণ কেহ কেহ বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল বলিয়া অবধারণ করে।

পূর্ব্বজন্ম কল্পনা মাত্র। পূর্ব্ব জন্মে কে কোথায় ছিল ও কি কার্য্য করিয়া কে জীবন শেষ করিয়াছিল তাহার লেশমাত্রও কোন ব্যক্তির স্মরণ করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার বয়স্ক লোক, জ্ঞান বুদ্ধির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, অজ্ঞান শিশু হইয়া, মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রভাব কি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে? তিনি কি এক বস্তু ভগ্ন না করিয়া অন্য বস্তু গঠন করিতে অক্ষম? তিনি কি নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন না যে এক বস্তুই পুনঃ পুনঃ অপরাপর রূপে গঠন করিয়া তাঁহার অসীম শক্তিকে খাট করিবেন? এ জন্য জন্মান্তরের কথা অলীক ও কল্পনা মাত্র।" (প্রকৃত-তত্ত্ব ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৩) শ্রীনীলকান্ত সিংহ রায় মহাশয়, "তাঁহার পাগল গুরুর পাগল চেলা" নামক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় জন্মান্তর সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তিনি বলেন—"এই মিশ্রণ বা জন্মান্তররূপ পরিণতি যে কি প্রণালী অনুসারে সাধিত হয়, তাহা একেবারে নরজ্ঞানের অতীত।"

জন্মান্তরের অনুকূলে ও প্রতিকূলে নানা ব্যক্তির নানাবিধ মত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল মতেরই সম্যক আলোচনা করা এস্থলে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অনেকে জন্মান্তরবাদকে নানাভাবে রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত করিয়া কেহ বা বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টা করেন। কেহ বা ধর্ম্মমতের উপর সংস্থাপিত করিয়া প্রচলন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু সকল মতের মূল্য সমান নহে। আমরা এস্থলে জন্মান্তরের বিপক্ষে যাঁহারা কথা বলেন তাঁহাদিগের মত বা তর্ক কি তাহাই আলোচনা করিব। "মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" এই কথা গীতায় প্রসিদ্ধ আছে। এই যে মত,—যাহাতে জীবাত্মাকে তাহার

সুকৃতির দুষ্কৃতির ফলভোগের জন্য বার বার দেহ ধারণ করিতে হয় তাহা বাস্তবিক সত্য কি না এবং ইহার জ্ঞানগত কোন ভিত্তি, আছে কি না, তাহা দেখা যাক :—এখন দেখা যাউক আত্মা (১) বস্তুটা কি? আত্মা বলিলে আমরা কি বুঝি? আত্মা বলিলেই আমরা জ্ঞানবস্তু বুঝি। জ্ঞান ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবে না। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞান কাহার? আমার, আমিই আত্মা। আত্মার স্বরূপই জ্ঞান। (২) আমরা বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে নিয়ত যাহা কিছু জানিতেছি তাহা জ্ঞানের দ্বারাই জানিতেছি; এই জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। যেমন কেন্দ্রহীন বৃত্ত অসম্ভব, তেমনি জ্ঞানহীন আত্মাও অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞান ও আত্মা এস্থলে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—জ্ঞানই আত্মার অস্তিত্ব। সুতরাং জ্ঞানে যাহা না থাকে তাহা আত্মাতে থাকে না। "আমি" এই কথার অস্তিত্বই জ্ঞানে। আমি আমাকে জানিতেছি এই যে জানা, ইহাই জ্ঞান। আমাকে ভুলিয়া অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান ভুলিয়া আমার অস্তিত্ব অসম্ভব। অপর প্রীতি ও ইচ্ছা আত্মার অন্য যে দুই স্বরূপ আছে তাহা এই জ্ঞান স্বরূপকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আত্মা জ্ঞানমূলক বস্তু; সুতরাং তাহার পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে দেহ ধারণ করা সম্ভব হইলে অবশ্য তাহা জ্ঞানগত হইবে। "আমি পূর্ব্বে ছিলাম" অথচ তাহা আমার জ্ঞানে নাই অর্থাৎ তাহা আমি জানি না,—ইহা অসম্ভব কথা। আমি পূর্ব্বে ছিলাম কিন্তু "আমি পূর্ব্বে ছিলাম" এ জ্ঞান আমার নাই, ইহা স্ববিরোধী। কে বলিতেছে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম? জ্ঞান,—কিন্তু সে জ্ঞানই আমার নাই অর্থাৎ জানিতেছি না যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম। কেহ হয়ত আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে যখন আমাদের ইহ জন্মেরই অনেক কথা স্মরণ থাকে না তখন যে এরূপ দেহ পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ

(১) এ স্থলে জীবাত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে আত্মা শব্দ ব্যবহার করিলাম।

(২) বহির্জগত, অন্তর্জগত প্রভৃতি শব্দ লৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

থাকিবে তাহা কে বলিল ? স্মরণ না থাকিতেও পারে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে পূর্ব্বজন্মের সকল কথা স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে ছিলাম ইহা স্মরণ না থাকিলে আমি কি সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিব যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম। পূর্ব্বজন্মের যে আমি, ইহজন্মের সেই একই আমি ; অথচ সেই "একই আমির" অস্তিত্ব জ্ঞাপক জ্ঞান আমার নাই ; ইহাতে পূর্ব্বজন্মের "আমির" ও ইহজন্মের "আমির" একতা রহিল কোথায় ? অপরদিকে বাল্যকালের যে আমি, যৌবনকালের সেই আমি, আবার বৃদ্ধকালেও সেই আমি,—এই আমিত্ব জ্ঞানের মধ্যে একটী অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানগত যোগসূত্র রহিয়াছে বলিয়াই উক্ত অবস্থাত্রয়ের "একই আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম ইত্যাদি আত্মার যত জন্মই হউক না কেন, আমি যে থাকিব—আমার একত্বের প্রমাণ জ্ঞানগত যোগ যে থাকিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দেহ পরিবর্ত্তনের সহিত যদি এই আমিত্ব জ্ঞান লোপ পায়, অর্থাৎ "আমি ছিলাম" এই জ্ঞান আমার না থাকে, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বজন্মের যে আমি পরজন্মের সেই আমি—এই "এক আমি" কি করিয়া সম্ভব হয় ? তাই বলি আমিত্ব জ্ঞান ব্যতীত যখন আমার অস্তিত্ব সম্ভবে না—বর্ত্তমান দেহ পাইবার পূর্ব্বে "আমি ছিলাম" এই জ্ঞান যখন আমার নাই তখন আমার পূর্ব্বজন্ম যে ছিল তাহা কি করিয়া স্বীকার করিতে পারি ? অতএব বলা বাহুল্য যে অবস্থা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও এক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানধারা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ব্যতীত যখন এক আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবে না, তখন কোন আত্মার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে একত্ববোধক কোন জ্ঞানযোগ নাই অথচ তাহার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম,—ইহা স্বীকার করা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সম্ভবতঃ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার স্বকৃত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন যথা—"যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীট যোনীতে অথবা মনুষ্য যোনীতে

জন্মগ্রহণ করিবে, এই মত পরকাল বিষয়ক হিন্দুধর্ম্মমতের নিকৃষ্ট অংশ।" আবার চার্ব্বাক, তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে এই প্রশ্ন করিয়া রাখিয়াছেন—"যদি আত্মার দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধু বান্ধবের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় না আইসে কেন?" জন্মান্তরবাদীরা চার্ব্বাকের এই প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।

এখন হয়ত কেহ আমাদিগকে বলিতে পারেন যে জ্ঞানই যদি আত্মা হয়, আর আত্মজ্ঞান ব্যতীত যদি এক আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তবে আমি যখন ভ্রূণদেহ মধ্যে ছিলাম, পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম এবং তাহার পরেও কতকদিন পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্বের জ্ঞানগত কোন প্রমাণ অর্থাৎ আত্মবোধ না হইবার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে মাতৃ-গর্ভে আত্মা কি নিয়মে কোন্ সময়ে ভ্রূণের সহিত যোগ হয় তাহা জানি না, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই শরীরের সহিত আত্মা অঙ্কুরাবস্থায় থাকে, তখন তাহার (আত্মার) বিকাশ না হওয়ায় তৎসাময়িক কোন প্রকার জ্ঞান স্মরণ হয় না; কিন্তু একবার জ্ঞানের বিকাশ হইলে তাহা আর নির্ব্বাণ হয় না, তাহা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকে। পুনশ্চ, যদি কেহ বলেন যে, আচ্ছা; জ্ঞানের বিকাশ হইলে তাহা আর নির্ব্বাণ হয় না মানিলাম, কিন্তু মনুষ্যের মৃত্যু সময় যখন সে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে তখন তাহার জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান থাকে না কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মা যখন দেহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয় তখন দেহের দ্বারায় আত্মার কার্য্য বরং প্রকাশ না হওয়াই সম্ভব। আমরা মৃত্যুমুখ ব্যক্তির দেহ দেখিয়া ভাবি যে তাহার আত্মজ্ঞান নাই কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ ভাবা আমাদের ভ্রম। কারণ যখন দেহ হইতে আত্মা আপন যোগ ক্রমে ক্রমে শিথিল করিতে থাকে, তখন শরীরের নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হয়, পরে সম্পূর্ণরূপে আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহের অজ্ঞান অবস্থায় যে আত্মজ্ঞান থাকে না তাহা নহে,

সাধারণ লোকে দেহ ও আত্মাকে এক বলিয়া ভাবে বলিয়াই এইরূপ মনে করে। পূর্ব্বজন্ম থাকিলে ও পূর্ব্বজন্মের পাপ ও পুণ্য কার্য্যের জন্য দণ্ড ও পুরস্কার ইহজন্মে ভোগ করিতে হইলে আমাদের অবশ্য স্মরণ হইত, অথবা অবশ্য জানিতে পারিতাম যে কি পাপ কার্য্যের জন্য দণ্ড ও কি পুণ্য কার্য্যের জন্য পুরস্কার পাইতেছি। পাপ কি?—না যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী অর্থাৎ অন্যায় কার্য্য। তাহার জন্য তিনি দণ্ড দেন কেন? না,—তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য দণ্ড দেন। আমরা প্রলোভনে পড়িয়া মোহাসক্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করি, তিনি সেই কার্য্য হইতে আমাদিগকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে—তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যে লওয়াইবার জন্যে। পুণ্য কি?—না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা অর্থাৎ ন্যায় কার্য্য; তাহার জন্য তিনি পুরস্কার দেন কেন?—না,—আমাদিগকে সেই কার্য্য—তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিবার উৎসাহ দিবার জন্য। ঈশ্বর আমাদিগের ন্যায়বান পিতা, তাঁহার রাজ্যে কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সেই জন্য তিনি আমাকে দণ্ড দিতেছেন, অথচ কি অন্যায় কার্য্যের জন্য সেই দণ্ড দিতেছেন তাহা আমাকে জানিতে দেন না—ইহা কি সম্ভব? অন্যায় কার্য্যের জন্য আমাদিগকে দণ্ড দিবার তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে আমরা তাঁহার অনুগত হইয়া কার্য্য করি। সুতরাং যে কার্য্যটা অন্যায়, যাহা করাতে আমাকে তাহা হইতে বিরত করিবার জন্য দণ্ড দিতেছেন, সে কার্য্যটা অন্যায় বলিয়া আমাকে জানিতে না দিলে আমি কি প্রকারে তাহা হইতে সংশোধিত হইব? আমাকে অন্যায় বলিয়া জানিতে দেন নাই অথচ তাহার জন্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন ইহা ন্যায়বান পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল যে ন্যায়বান পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয় তাহা নহে, এই পৃথিবীর সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যেরাও এরূপ করে না। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক, কি ব্যক্তিগত, যখন

কোন ব্যক্তিকে তাহার কোন অন্যায়ের জন্য দণ্ড দেয় তখন তাহারা কি দোষের জন্য দণ্ড দিতেছে; তাহা অগ্রে তাহাকে জানিতে দিয়া, পরে সেই অন্যায়ের সংশোধনের জন্য তাহার দণ্ড বিধান করে। তাই বলি যখন সামান্য ক্ষুদ্র জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্য অন্যায়কারি ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে গিয়া অগ্রে তাহার দোষ তাহাকে জানাইয়া দিয়া পরে সংশোধনের জন্য তাহাকে দণ্ড দেয়, তখন যে পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ন্যায়বান পরমেশ্বর আমাদিগকে,—পূর্ব্বজন্ম থাকিলে তদ্‌কৃত অপরাধের দণ্ড ইহজন্মে দিতেছেন অথচ তাহা কি অপরাধের জন্য জানাইয়া দিতেছেন না,—ইহা, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারে? এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে আমরা ইহজন্মেই এমন অনেক পাপ ও পুণ্যকার্য্য করিয়াছি যাহার দণ্ড ও পুরস্কার ভোগ করিতেছি অথচ তাহা কি পাপ কার্য্যের জন্য দণ্ড ও কি পুণ্য কার্য্যের জন্য পুরস্কার জানিতে পারি নাই, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল আমাদের অনবধানতা, অর্থাৎ আমরা মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখি না বলিয়াই এইরূপ বোধ হয়। বাস্তবিক একটু সূক্ষ্মভাবে আত্ম-দৃষ্টি করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। পুনশ্চ কেহ বলিতে পারেন যে যেমন ইহজন্মের পাপ ও পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার অনবধানতা বশতঃ বুঝিতে পারি না, পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধেও ত সেইরূপ হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যদিও অনবধানতা বশতঃ ইহজন্মের পাপ পুণ্যের, দণ্ড ও পুরস্কার অনেক সময় বুঝিতে পারি না, কিন্তু তথাপি আমরা এমন একটা কার্য্য কারণ শৃঙ্খল অনুভব করি যে, যাহাতে আমারি পাপ ও পুণ্যের জন্য দণ্ড ও পুরস্কার পাইতেছি। কিন্তু পূর্ব্বজন্ম থাকিলে, তাহার সহিত ইহজন্মের এমন কোনও কার্য্য কারণ শৃঙ্খল দেখা যায় না যে, তদ্দ্বারায় পূর্ব্বজন্মের ফলাফল ইহজন্মে ভোগ করিতেছি বলিয়া অনুভব করিতে পারি। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের ফলাফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়,—ইহা কল্পনা করা নিতান্ত স্থূলদর্শীতার পরিচয় মাত্র।

পূর্ব্বজন্মবাদীদিগের প্রধান যুক্তি এই যে যদি পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফলাফল ইহজন্মে ভোগ করিতে না হয় তবে পৃথিবীতে মানবের সুখ দুঃখের এত অসামঞ্জস্য কেন? কেহ রাশি রাশি ধনের অধিকারী হইয়া ত্রিতল গৃহে বাস করিতেছে, কাহারও সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একমুষ্টি অন্ন যোটে না। কেহ খুব বুদ্ধিমান হইয়া—পণ্ডিত হইয়া মহা যশস্বী হইতেছে, কেহ বা মুর্খ হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। কেহ সবল সুস্থকায় হইয়া, মহা সুখে বিচরণ করিতেছে, আর কেহ বা জন্মান্ধ হইয়া,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হীন হইয়া চিররুগ্নাবস্থায় অশেষ দুঃখ-ভোগ কারতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার কারণ কি? ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে প্রথমে পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত দণ্ড ও পুরস্কার কি ও সুখ দুঃখই বা কি তাহা অগ্রে দেখা যাউক। পাপ ও পুণ্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে পাপ পুণ্যের মূল কোথায় ও ইহাদিগের জন্য প্রকৃত দণ্ড ও পুরস্কার কি প্রকারে হয় তাহাই বলিব। পাপ পুণ্যের মূল বাহিরে নহে কিন্তু অন্তরে। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইহারা পাপ পুণ্য করে না, আত্মাই করে। আত্মাধীন ইচ্ছাই কার্য্যের কারণ। সেই ইচ্ছা ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুগত হইলে পুণ্য ও অননুগত হইলে পাপ হয়। সুতরাং পাপ পুণ্যের মূল অন্তরে, ইহাদের জন্য দণ্ড ও পুরস্কার অন্তরেই ভোগ করিতে হয়।

এই সুখ, দুঃখ কি? এবং ইহাদের অবস্থিতি কোথায়? এই প্রশ্নের একটা উত্তর বাহির করা যায়। সুখ দুঃখ মনের অবস্থা, ইহাদের অবস্থিতি মনে। মনেতেই ইহাদের ভিত্তি। এই বহির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, ধন, মান, সম্পদ প্রভৃতি যাহা কিছু জানিতেছি তাহা সকলই মনের দ্বারায় জানিতেছি। মনই এই সমস্ত বস্তু বা ভাবের আধার, আমাদিগের মন যদি না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কোন বস্তু বা ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য আমার নিকট সম্ভব হইত না। সুতরাং

মনই এই সমস্ত ব্যাপারজনিত সুখ দুঃখের কারণ। এই সুখ দুঃখ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন,—বাল্যকালে যে সকল বস্তুকে (পুতুল, লাল কাপড় ইত্যাদি) মূল্যবান মনে করিতাম, যাহাদিগকে লইয়া মহাসুখ অনুভব করিতাম, এখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অসার বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন ধন, মান, সম্পদ প্রভৃতিকে মূল্যবান ও সুখের কারণ মনে করি। কিন্তু যতই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতে থাকিবে,—যতই আত্মবোধ হইতে থাকিবে ততই আবার ঐ সমস্ত বস্তুকে তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত সুখের জন্য অন্তরের দিকে ধাবিত হইতে হইবে। অপর দিকে, যেমন নিদ্রাকালীন স্বপ্নাবস্থায় কত কি স্বপ্নে দেখি, আবার তাহা তৎসময় সত্য মনে করিয়া তদ্দ্বারায় সুখ দুঃখও অনুভব করি, কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিলে সকলি ফাঁকা বলিয়া বোধ হয়। ঠিক সেইরূপ বাহিরের নানাপ্রকার ঘটনা আমাদের চঞ্চল মনের উপর দিয়া নদী স্রোতের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হওয়া বশতঃ আমাদের অজ্ঞান মন মোহাবস্থায় তদ্দ্বারায় সুখ দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত অসার বলিয়া প্রতীতি হয়। পক্ষান্তরে দেখুন পৃথিবীর ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, সুস্থ, রুগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি কোন ব্যক্তিই আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করে না, কেহই আপনার অবস্থাতে সুখী বা সন্তুষ্ট নহে। কেবল আত্মতত্ত্বদর্শী সংযতমনা ব্যক্তিই প্রকৃত সুখ অনুভব করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। সেইজন্যই বলি যে বহির্জগতের কোন বস্তুই সুখ দুঃখের কারণ নহে। অজ্ঞানতা প্রসূত মনের অবস্থাই সুখ দুঃখের কারণ। অতএব পৃথিবীতে অসার সুখ দুঃখের অসামঞ্জস্য দেখিয়া তাহার কারণ পূর্ব্বজন্মের পাপ ও পুণ্যের ফলাফল ভোগ,—ইহা কল্পনা করা কেবল অজ্ঞানতা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জগতের এরূপ অসামঞ্জস্যের কোন কি কারণ নাই? অবশ্য ইহার কারণ আছে? ইহার প্রধান কারণ পিতা-মাতার বিবেচনার ক্রটী। ২য়, তাহার নিজের বিবেচনার ক্রটী। অন্ধ,

খঞ্জ, রুগ্ন, নির্বোধ, বুদ্ধিমান প্রভৃতি সন্তান পিতামাতার দোষেই হয়। সন্তান উৎপাদনকালীন পিতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেরূপ থাকে স্রষ্টার নিয়মানুসারে সন্তানেরও শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সেইরূপ হয়। তৎপরে যে দীর্ঘকাল, সন্তান মাতার গর্ভে থাকিয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, সেই সময়ে মাতার তৎসাময়িক শারীরিক ও মানসিক অবস্থানুসারে সন্তানের শরীর ও মন গঠন হয়। ইহা পৃথিবীর সকল দেশেরই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপে এস্থলে মহাভারতের কথা উল্লেখ করিতেছি (ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ও পাণ্ডুর শারীরিক ব্যাধিযুক্ত হইয়া জন্ম হইবার কারণ তাঁহাদের উৎপন্নকালীন মাতার অবস্থা বিশেষে হইয়াছিল, ইহা মহাভারতে পাওয়া যায়) সেইজন্যই পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ ও মূর্খের সন্তান পণ্ডিত, সাধুর সন্তান অসাধু ও অসাধুর সন্তান সাধু, দুর্ব্বলের সন্তান বলবান ও বলবানের সন্তান দুর্ব্বল ও অন্ধ খঞ্জ ইত্যাদি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আমরা সচরাচর স্বচক্ষে তাহা দেখিতেছি। তৎপরে বাল্যাবস্থায় পিতা-মাতার বা অভিভাবকের শিক্ষার অভাবে ও অন্য নানাপ্রকারে সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা হয় না। ২য়,—সে নিজে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গদোষে প্রলোভনে পড়িয়া নানাপ্রকার অসৎ কর্ম্ম করে এবং সেই কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সংসারের বিষয় বৈভব উত্তরাধিকার সত্ত্বে প্রাপ্ত বা আত্ম চেষ্টায় হইয়া থাকে। এখানে পাঠক হয়ত বলিবেন যে, পিতামাতার বিবেচনার ত্রুটীতে সন্তান বেচারী কষ্ট পাইল কেন? সে কি দোষ করিল যে, পিতামাতার পাপের জন্য তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, বিধাতার সৃষ্টির এই রূপই নিয়ম। তিনি এই নিয়মেই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার সৃষ্টির এইরূপ নিয়ম হইলেও ইহা দ্বারায় (বাহিরের এই সমস্ত অসামঞ্জস্যের দ্বারায়) কেহই প্রকৃত সুখ বা উন্নতি হইতে

বঞ্চিত হইবে না। (১) স্বামী বিবেকানন্দ, টমাস্ একুইনাস্, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, "প্রেত্যভাব বা নির্ব্বন্ধ" সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল যুক্তির নিকট বিরুদ্ধবাদীর প্রমাণ স্থান পায় না। যাঁহারা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না, এবং

(১)"ধর্ম্মবিজ্ঞান" নামক গ্রন্থের লেখক স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যথা—মন, অহং জ্ঞান, মস্তিষ্ককেন্দ্র বা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ এই কয়েকটা লইয়া সূক্ষ্ম শরীর অথবা খ্রীষ্টীয় দর্শনে যাহাকে মানবের "আধ্যাত্মিকদেহ" বলে, তাহা গঠিত। এই দেহেরই পুরস্কার বা দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, ইহারই বারবার জন্ম হয়, কারণ আমরা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা যাওয়া অসম্ভব। গতি অর্থে যাওয়া আসা, আর যাহা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে তাহা কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরই আসে যায়।" ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

A. History of Indian Philosophy নামক গ্রন্থের লেখক S N Das Gupta M. A. Ph. D., তিনি Doctrine of Transmigration সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের সানুকূলে যে ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া কেবল অধ্যাপক Deussen মহোদয়ের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি :—"Deussen says that the meaning of the whole is that the soul on the way of the gods reaches regious of ever-increasing light, in which is consentrated all that is bright and radiant as stations on the way to Brahman the "light of lights" (jyotisam -Jyotih) Page 54.

দেহান্তর গ্রহণমতে পাপ পুণ্যের পুরস্কার পাইবার জন্য বার বার শরীর ধারণ করা আবশ্যক। এই মতে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে যাহার সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণ উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই গভীর সত্যটি পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সেই সত্য বিষয়টি হইতেছে "পুনরুত্থান"। পুনরুত্থান সম্বন্ধে যে সত্য শিক্ষা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কোন প্রকার নৈতিক অসংলগ্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের প্রাদুর্ভাব নাই, তাহাতে একটি ঐশিক গুণ পরিহার করিয়া আর একটির প্রাদুর্ভাব সমর্থন করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় শিক্ষায় আমরা জ্ঞাত হই যে, এই মর্ত্ত্যশরীর অমরত্বের আকার ধারণ করিয়া সেই মনুষ্য আত্মার আধার হইবে। যে আত্মা হয় ভাল নয় মন্দ কার্য্য দ্বারা আপন চরিত্র পৃথিবীতে সংগঠন করিয়াছে।

আমাদের মৃত্যুজনিত পরিবর্ত্তন বড় গুরুতর ব্যাপার। পারলৌকিক জীবনের প্রণালী যাহাই হউক না কেন, সে অন্ততঃ ইহাই নিশ্চয় করিয়া জানে যে, যাহারা ঐ জীবনের জন্য যথোচিত আয়োজন করে না, তাহাদের আশা-ভরসা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেহই ইহজীবনে ফিরিয়া আসিয়া স্বকীয় ভুল-ভ্রান্তি শুধরাইবার সুযোগ পায় না।

খণ্ডন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের যুক্তি যে অতি লঘু তাহা সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত একুইনাস্ জন্মান্তর স্বীকার করিয়াছেন। (History of philosophy by Ueberweg. Vol. I. Page 449 দ্রষ্টব্য) লেখক বলেন Thomas Aquinas accepts the Aristotelian definition of the soul as the entelechy of the body......

(৪) A Manual of Modern Scholastic Philosophy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক আচার্য্য C. Mercier ও T. L. Parker, M. A. মহোদয়দ্বয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিচার করিয়া দেখা ভাল। উক্ত গ্রন্থের ৩২৫—৩২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে দুইটী নিবন্ধে অর্থাৎ "Length of the time of trial ; Reincarnations and Metempsychosis. এবং Natural need of a Resurrection." এই দুইটী স্থানের ভাষ্য পৃথকরূপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Man's probation or the time of the trial of his free-will must some time have an end, for if it lasted for ever his natural aspiration for happpiness would be vain and the sanction attached to the performance of duty an illusion. Yet it seems difficult to demonstrate by unaided reason that the end of his probation will necessarily coincide with the last moment of this life, and this explains why some people imagine that the soul passes through a more or less lengthy series of existences, or successive re-incarnations in which it is able to become more perfect. This theory of metempsychosis, provided it allows that the soul retains through its the successive re-incarnations the cons-

ciousness of its own personality, and that the series at some time will have an end, cannot be shown by reason alone, we think, either to be impossible or even to be false. All that can be said is that there is not a single positive argument in its favour, and that our present ignorance of any previous existence is a strong presumption against plurality of existences in the future."

Natural need of a Resurrection বলিলে কি বুঝায়? "A resurrection of the human compound is necessary, we think, for the complete happiness of the soul in its future life ; and therefore we say that resurrection is something natural, not in the sense that the soul will by its nature have the power of re-fashioning a new body for itself after death, but in the sense that the formation of a reward body by the almighty power of God is required for the perfect happiness of the rational soul. It must be understood, then, that there is no question here of the resurrection that Faith assures us, takes place in conditions of glory, but simply of a resurrection of some sort, of a reunion of soul and body.

The proof that a resurrection in the sense explained is a natural necessity rests on the fact that the imagination, and therefore the organized body, is a natural help for the soul in its spiritual activity. For, from, this it follows that the normal exercise of the soul's activity requires the co-operation of the organism and

that the Soul when separated from the body is in a state of relative inferiority that is incompatible with the requirements of its perfect happiness. It is true that the body is not essential for the soul to act ; for, being spiritual, the rational soul can exist without a body, it can share the conditions of existence enjoyed by pure spirits and receive from them or from God its ideas —or rather, its conceptual determinants, species intelligibiles—which in the present life are obtained by the co-operation of the senses. Yet, although it is intrinsically possible, the state that this separation entails is nevertheless an inferior one to the state of union. For the spirit-world, the world of the pure-intelligible is beyond the natural faculties of the human soul, and consequently, unless God gives a supernatural support to which it has no natural claim, the soul cannot rise to an apprehension of such objects. To use a metaphore of Aristotle's, in the presence of purely immaterial things the soul is like some bird of the night in face of the sun ; far from being illumined by the pure light it is dazzled, for its eye is adapted to distinguish truth that is tempered by the shadows of matter. The object that is best suited to the imperfect conditions of our feeble intelligence is what is knowable through the medium of the senses, the intelligible presented in the sensible. Hence the soul's natural activity can be most perfectly

exercised only when the soul is united to the body; and therefore a (1) resurrection or reunion with the body is natural to man."

(১) ঋগ্বেদে পুনরুত্থানের একটা প্রতিচ্ছায়ার আভাষ পাওয়া যায় তাহা যে একেবারে মিথ্যা বা কল্পনা এরূপ কথা বলা যায় না। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের এবং পঞ্চম ঋকেও পুনরুত্থানের বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা মনুষ্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, পশুদের নহে। সেই ঋকে প্রকাশ মৃত ব্যক্তির অগ্নিসৎকার শেষ হইয়াছে, তাহার পর তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যথা ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।" উদ্ধৃত চিহ্নান্তর্গত অংশ ঋকের যে অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম উহাতে স্পষ্ট করিয়া "পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত" হওয়ার বিষয় লিখিত আছে। সজীবত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন অর্থাৎ বিচারার্থে প্রস্তুত থাকিবেন—এই অর্থই উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত সূক্তের পঞ্চম ঋকেও পুনরুত্থানের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সেই ঋকের কিয়দংশ—"ইহার (মৃতের) যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে জাতবেদা! সে পুনরুত্থানের শরীর লাভ করুক।" যিহুদীগণ বলিয়াছেন—শরীরের "লুজ" নামক অংশ মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে এবং তাহা হইতে নর দেহ উত্থিত হয়। ঋগ্বেদের পুনরুত্থান যে ভাবে বহুযুগ হইতে পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে তাহার পূর্ণ বিকশ ও সফলতা নূতন নিয়মে দেখা যায়। এই পুনরুত্থান অগ্রাহ্য করিলে—একটী মহা সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দার্শনিক সাধু পৌলের পুনরুত্থান ব্যাপার লইয়া এথেন্সবাসীদিগের সহিত ঘোরতর বাগযুদ্ধ হইয়াছিল। (পৃথিবীর ইতিহাস তৃতীয়খণ্ড ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দার্শনিক পণ্ডিত কেয়ার্ড ইহাকে গৌরবান্বিত বিষয় বলিয়াছেন। পুনরুত্থান অস্বীকার করা যায় না। যে সকল পণ্ডিত ইহাকে অলীক বলেন তাঁহাদের সকল মত Dr. J. ORR. চূর্ণ, বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে ইউরোপ খণ্ডের প্রটেষ্টান্ মণ্ডলীর কোন কোন শিক্ষক খৃষ্টের অলৌকিক জন্ম, প্রায়শ্চিত্ত, ও পুনরুত্থানের বিষয় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে সকল যুক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাঁহারা শাস্ত্রবাণী অপেক্ষা যুক্তির আশ্রয়কে প্রিয়জ্ঞান করেন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার শক্তিকে কে পরাভব করিতে পারিয়াছে? তাঁহার ইচ্ছা ও কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন্ শক্তি দণ্ডায়মান হইতে পারে? ঐশী-বিজ্ঞান-মালার পদে মনুষ্যকৃত বিজ্ঞান আপনা হইতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে নাকি?

(৫) Dialogues on the Hindu philosophy নামক গ্রন্থের লেখক আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "Doctrine of transmigration" সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Very strange self-contradiction !" Said I, "Is it not possible to reconcile the two passages ?" "That," replied Satyakama, "must be left to the deplomatic abilities of friend Tarkakama." Tarkakama said nothing We waited a minute or two to hear how he would reconcile such a seeming contradiction. At length Agamika asked, whether by arguing against the soul's pre-existence, his friend meant to deny its eternity both ways, and pronounce it to be perishable with the body. "Most certainly, not," replied Satyaka'ma. "The soul, though it had a beginning, as indeed all creatures must have, is imperishable. That whatever had a beginning must have an end, may be a favourite theory with some philosophers ; but they can never prove it. The soul may be immortal without being eternal. The greek philosopher who argued for its pre-existence, in order to prove its immortality, had given reasons for the latter which did not depend on the former, and which human nature cannot gainsay. "Good hope have I," said he, "that something is in reserve for the dead, and that (as I said long ago) the good shall fare far better than the bad."

"This," continued Satyakama, "together with the soul's essential independence of the body, which he also asserts afterwards, ought to convince the incredulous that there is another and a better world reserved for us, where our soul's aspirations will find their corresponding objects, and where that which we now but partially understand will be clearly apprehended. Do not think, Agamika, that I deny the future glories of the soul. I have reasons for believing in them, still higher than the teaching of mere philosophy,—on which we may converse some other day. I believe that the righteous will meet with rewards in another state of which the present world can afford but faintest fore-shadowings. It is the supposition of a previous life, and the consequences deduced from it, that I protest against Those consequences I have already mentioned in detail, and I may add that as a further corollary from the theory of the soul's pre-existence, our philosophers also held the doctrine of its successive transmigrations. The Nyaya, Sankhya, and Vedanta equally teach that the souls of the deceased remove for a time to heaven or hell, to receive the due rewards of their actions. Those rewards do not however exhaust their merit or demerit, which still adheres to them, "as greasy substance stick to the pot, even after it has been emptied" (Vedanta Sutra, Com. III. 1, 8). They accordingly return, and are again born with such bodies as

are suitable to their previous lives. The new circumstances in which they appear, and the new works which are developed in them, influence their destinies in the next succeeding age. In this manner their souls transmigrate, as gods, men, or animals, until the dissolution of the world, which again is followed by a second creation and by their re-appearance agreeably to their previous works. This succession of creations and births, in which the events of each cycle are regulated by those of its predecessor, is considered by our philosophers an intolerable evil. They were thoroughly disgusted with this idea of a puppet life, in which rational beings were irrevocably committed to conditions and impulses, not according to their own will, but as they were by the verdict of adrishta, declared to have merited them, by reason of works of which they were not themselves conscious, and hence they looked upon existence as a burden, and enjoyment itself as a task. To a certain extent I cannot help sympathising with them. If indeed we were subject to the sort of transmigrations taught in the Brahminical philosophy; in our circumstances were so fixed by the events of a previous life, that we were mere toys for the sport of Fate; if a hard, unsympathising, impersonal, adrishta must necessarily govern our deliberations, and, in a manner, supersede our judgments, then no man of any energy could submit to such an

infliction. Bitter complaints would escape the lips of the most forbearing. All would naturally wish they had never been born. No wonder, then, that existence should be considered an evil, and that men should pant for Mukti, or release from this servile bondage to adrishta."......

(৬) The Six Systems of Indian Philosophy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক Right Hon. Professor Max Muller, K M. ১০৪ পৃষ্ঠায় "Metempsychosis—Samsara" নিবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বিবেচ্য—"The best known of these ideas, which belong to India rather than to any individual philosopher, is that which is known under the name of Metempsychosis This is a Greek word, like Metensomatosis, but without any literary authority in Greek, It corresponds in meaning to the Sanskrit Samsara, and is rendered in German by Seelenwanderung. To a Hindu the idea that the souls of men migrated after death into new bodies of living beings, of animals, nay, even of plants, is so self-evident that it was hardly ever questioned. We never meet with any attempt at proving or disproving it among the prominent writers of ancient or modern times. As early as the period of the Upanishads we hear of human souls being reborn both in animal and in vegetable bodies. In Greece the same opinion was held by Empedocles; but whether he borrowed this idea from the Egyptians, as is commonly supposed to have been

the case, or whether Pythagoras and his teacher Pherecydes learnt it in India, is a question still hotly discussed. To me it seems that such a theory was so natural that it might perfectly well have arisen independently among different races. Among the Aryan races, Italian, Celtic, and Scythic or Hyperborean tribes are mentioned as having entertained a faith in Metempsychosis, nay, traces of it have lately been discovered even among the uncivilised inhabitants of America, Africa, and Eastern Asia. And why not? In India certainly it developed spontaneously; and if this was so in India, why not in other countries, particularly, among races belonging to the same linguistic stock? It should be remembered, however, that some systems, particularly the Samkhya—philosophy, do not admit what we commonly understand by Seelenwanderung. If we translate the Samkhya Purusha by Soul instead of Self, it is not the Purusha that migrates, but the Sukshma—sarira, (সূক্ষ্মশরীর) the subtile body. The Self remains always intact, a mere looker-on, and its highest purpose is this recognition that it is above and apart from anything that has sprung from Prakriti or nature."

(৭) কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে সাধু সুন্দরসিংহ বলেন, "যে যেমন বোনে সে সেরকম কাটবে" এত ঠিক ; তবে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় শিক্ষার প্রভেদটা এই, "খ্রীষ্টীয়ান কর্ম্ম করে মুক্ত হয়ে, আর হিন্দু কর্ম্ম করে মুক্ত হবার জন্য।" জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সাধু বলেন, হিন্দু শিক্ষানুসারে ঈশ্বরের

আত্মা ও মানুষের আত্মা অনাদিকাল থেকেই আছে। আচ্ছা, এতগুলো জন্ম জন্মান্তরের পরেও যদি মোক্ষ-প্রাপ্তি হলো না তবে কখনও যে হবে তার নিশ্চয়তা কি? আর এক কারণ,—গত জন্মের পাপ পুণ্যের কোন স্মৃতি তো নেই—তবে তার ফলাফল ভোগে লাভটা কি? জন্মান্তরবাদ যদি সত্য বলে মানতে হয় তবে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে এই বিশ্ব সৃষ্টির মূলেই হচ্ছে পাপ।

(৮) দ্বিতীয় শমূয়েল পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে দায়ূদ রাজার একটি গুরুতর পাপ ও দণ্ডের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে ঊরিয়ের স্ত্রীর গর্ভজাত দায়ূদের পুত্র প্রাণত্যাগ করিলে পর রাজর্ষি দায়ূদ বলিয়াছিলেন—"আমি কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি? আমি তাহার কাছে যাইব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।" Dr. A. F. Kirkpatrick, D. D. Dean of Ely এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"I shall go to him. Cp. Gen 37, 35; A belief in the continued existence of the soul after death in a state of consciousness is necessarily implied though not expressly stated; but how far this falls short of the Christian hope of the Resurrection of the Body, and the Life everlasting."

(৯) সাধু পৌলের ভাষায় বলিতে হয় যে, "মনুষ্যের একবার মৃত্যু ও তৎপর বিচার নিরূপিত আছে। এখানে জন্মান্তরবাদের কোন চিহ্ন সূচিত হয় নাই।

(১০) পণ্ডিতপ্রবর Dean (Inge) মহোদয় তাঁহার কৃত Philosophy of Plotinus নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে জন্মান্তরবাদের সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। তিনি অনেক মতামত দেখিয়া এইরূপ বিচার করিয়াছেন, যথা—"I shall not flolow the fashion and discuss the survivals of totemism

in civilised religions. Researches into the psychology of the savage are interesting to the anthropologist, and would have some importance to the student of comparative religion, if we could have any confidence that European travellers can ever really understand the mentality of primitive races. But the Platonist and Aristotelian can have no sympathy with attempts to poise a pyramid on its apex For us the nature of religion is what it may grow into ; and our starting-point, if we turn to history, must be the conceptions of early civilised races. In this case we begin with Egypt, from which, according to the tradition of antiquity, Pythagoras, derived his doctrine. In Egypt the theory of transmigration united the belief in retribution after death withthe old popular notion that human souls can enter into the bodies of lower animals. The Egyptian doctrine differed from the Indian in three ways ; it is only the wicked who are doomed by the Egyptian theory to transmigration ; the soul ultimately returns into human form ; and, though there is no escape from the cycle when once it has started, the soul may gain deliverance after returning to human form, (Jevons, Introduction to the History of Religion. P. 317)

In India, good and bad alike transmigrate ; and there is no deliverance from rebirths ....Empedocles, repeating perhaps the teaching of Pythagoras himself, says that the cause of transmigration is Sin, that the term of

it is 30,000 years, and that finally the soul will become a god, which indeed it has always been. Pindar, another good witness to early Pythagorean teaching, holds that only the bad are condemned to transmigration, the good being admitted to a state of happiness in a place which was variously described as the sky, the air, Elysium, or Olympus The doctrine of transmigration offers us "Chains of personalities linked together by impersonal transitions." (Bosanquet, Value and Destiny of the Individual, P 267.) Nothing survives except the bare being of the soul, and, we may add, its liabilities But Plato does not hold the doctrine in an uncompromising form ; Souls do not all drink enough of the waters of Lethe to forget everything; the importance of "recollection" in his writings is well known. Leibnitz thought that 'immortality without recollection is ethically quite useless,' and may others profess that such an immortality would have no attractions for them. But others would be satisfied to know that they will live on in the great spiritual interests with which they identified themselves ; they could say with Browning, "Other tasks in other lives, God willing." It is not continuity of consciousness which they prize, but perpetuity of life amid the eternal ideas.

The doctrine has found many supporters in modern timese. The philosophy of Krause is on this and some

other ·ıbjects of special value to a Neoplatonist. Pfleide‿r, who writes most sympathetically about Krause, thus sums up his views about the life of the soul. (philosophy of Religion, Vol. 2) "Man's whole vocation is ·eness to God in this life, or the unfolding of his godlike essence in his own distinctive way as an independe active being, according to his three faculties, true knowing; blessed feeling, and holy willing and doing. That man r .y know himself aright it is first of all necessary that he should disting‿uish aright what he is as spirit and what he is as body, and how these two are related to each other. As spirit, man knows himself in the light of his knowle dge of God to be an eternal, unborn, and immortal rati‿onal being, destined to fulfil in infinite time his divine destiny as a finite spirit an infinite number of times in an infinite number of periods or life-centres. The souls of men upon the earth are the spirits living together on the earth with individual bodily natures ; they form a part of the infinite spirit-realm of the universe, which suffers neither increase nor diminution, but lives in and with God as an eternally perfect organism of all the infinite number of spirits. Each separate spirit enters by union with a body upon one of its infinite number of life-periods, develops itself to its maturity, and then declines to the point of returning to its unity in God. But this death of one life-course

is at the same time a beginning, a second birth into a new life-course." The doctrine of reincarnation was taught by the Manicheans and Cathari, by Giordano Bruno and the theosophist Van Helmont. Swedenborg believed that men who lead bestial lives will be reincarnated in the forms of the animals which they resembled in character. Goethe and Lichtenberg dallied with the idea of transmigration more or less seriously; Hume declared that metempsychosis is the only doctrine of the kind worthy of attention by a philosopher; Lessing speaks respectfully of it, without being himself a believer; the friends of Lavater at Copenhagen taught the doctrine, quite in the manner of Pythagoras, but with extravagancies of their own. Lavater himself had been king Josiah, Joseph of Arimathaea, and Zwingli. The apostle Peter had come to life again as Prince Karl of Hesse Schopenhauer says of metempsychosis, "Never will a myth be more closely connected with philosophical truth" Ibsen and Maeterlinck are more recent supporters of the belief. (Fourier thought that the souls of planets will be reincarnated, like those of individuals. Leroux is another Frenchman who has held the doctrine)

Plotinus, as we have seen, says that the true awakening of the soul is the awakening from the body, not with the body. Successive reincarnations are like one

dream after another, or sleep in different beds. It is a universal law that the soul after death goes where it has longed to be ; it "goes to its own place," as was said of Judas "Particular souls are in different conditions. Soul, as Plato says, wanders over the whole heaven in various forms. These forms are the sensitive, the rational, and even the vegetative......The dominating part of the soul fills the function which belongs to it ; the other parts remain inactive and external. In man the inferior parts do not rule, but they are present; however, it is not always the highest part which rules ; the lower parts also have their place. All parts work together, but it is the best part which determines our Form as man. When the soul leaves the body, it becomes that faculty which it has developed most. That is why we ought to flee to the higher, so as not to fall into the life of the senses, through association with sense-images, nor into the vegetative life, through abandoning ourselves to the pleasures of uncleanness and greediness ; we must rise to the universal soul, to spirit, to God. Those who have exercised their human faculties are born again as men ; those who have lived, only the life of the senses, as lower animales. The choleric become wild beasts, with bodies suitable to their character ; the lustful and greedy become lascivious and greedy quadrupeds. The merely stupid become plants ;

they have lived like vegetables in this life, and have prepared themselves only to be turned into trees. Those who have been too fond of music, but otherwise have lived pure, become singing birds ; unreasonable tyrants, if they have no other vice, are changed into eagles Dreamy speculators who occupy themselves with high things above their capacities become high-flying-birds. The man who has practised the civic virtues becomes a man again ; or if he has been indifferently successful in this pursuit, he is reborn as a social animal, a bee for instance. (It is the worst souls which are punished for their good by their daemon.)

Plotinus is obviously trying his hand at a Platonic myth is this passage, and he seems, for once, to be slightly amused at the picture which he is drawing. In another passage he shows how distributive justice may be exercised among those who are reincarnated as men. Cruel masters become slaves ; those who have misused their wealth become paupers. The murderer is murdered himself ; the ravisher is reborn as a woman and suffers the same fate. As for the souls which have freed themselves from the contamination of the flesh, they dwell "where is reality and true being and the divine, in God ; such a soul as we have described will dwell with these and in God. If you ask where they will be, you must ask where the spiritual world is ;

and you will not find it with your eyes." It is plain I think, that Plotinus does not take the doctrine of re-incarnation very seriously, as scientific truth. He is inconsistent. Sometimes he speaks of a purgatory for disembodied souls; sometimes the bad (as we have seen) are reborn as lower animals, and sometimes retribution in kind falls upon them in their next life as human beings. Porphyry and Iamblichus both refuse to believe that human souls are ever sent to inhabit the bodies of beasts and birds; and these two do not contradict Plotinus lightly. The fact is that Plotinus is not vitally interested either in the question of individual survival in time, or in that of rewards and punishments. As Dr. McTaggart says (Hegelian Cosmology, P. 6) of Hegel "he never attached much importance to the question whether spirit was eternally manifested in the same persons, or in a succession of different persons" Dr. McTaggart adds that "no philosophy can be justified in treating this question as insignificant." * But perhaps Plotinus and Hegel would agree in answering that it is not so much insignificant as meaningless.

Dr. McTaggart is a strong believer in reincarnation, and his chapter on "Human Immortality" is very instructive. In comparing the philosophy of Lotze with that of Hegel, he blames the former for making his God "something, higher than the world of plurality, and

therefore something more than the unity of that plurality.......... There is no logical equality between the unity which is Lotze's God and the plurality which is his world. The plurality is dependent on the unity, but not the unity on the plurality. The only existence of the world is in God, but God's only existence is not in the world.* No clearer statement of the fundamental difference between Hegel and Plotinus could be made. The view of Plotinus is precisely that which Dr. McTaggart blames in Lotze. Dr. McTaggart proceeds to say that on this theory any demonstration of immortality is quite impossible. That is to say, unless I am as necessary to God as God is to me, there can be no guarantee that I have any permanent place in the scheme of existence. We have already seen how Plotinus would answer this. Souls have real being; but their being is derived, like the light of the moon. They are not constituent factors of God, or of the Absolute, but are created by Him. It is an essential attribute of God that He should create, but His creatures are not parts of His being. Souls are indestructible and immortal because they possess (gr—ousia,) there is a qualitative difference between creatures that have (gr—ousia) and those that have it not. But the empirical self, about whose survival we are unduly anxious, is a compound which includes perishable elements. And this composite

character is found all through nature ; even trees have a share in soul, in true being and in immortality. Our immortal part undoubtedly pre-existed, as truly as it will survive, but the true history of a soul is not what Aristotle calls an episodic drama, a series of stories disconnected from each other, or only united by "Karma" The true life of the soul is not in time at all Dr. McTaggart says that "the relations between selves are the only timeless reality." Plotinus would certainly not admit that relations can be more real than the things which they relate; and he would also deny that souls find themselves only in the interplay with other souls. On the contrary, it is only in self—transcendence that the individual finds himself ; and he is united to his fellows not directly but through their common relationship to God, Dr. McTaggart asks, "How could the individual develop in time, if an ultimate element of his nature was destined not to recur in time ?" But what ground have we for supposing that the destiny of the individual is to "develop in time," beyond the span of a single life ? It is a pure assumption, like the unscientific belief in the perpetual progress of the race, so popular in the last century.

But a Neoplatonist might arrive at reincarnation by another road Since the nature of spiritual beings is always to create, is not the Orphic aspiration to escape from the "grievous circle" after all a little impious ? Must not work which, means activity in time, be its eternal destiny ? The active West, on the whole, sympathises with Tennyson's "Give her the wages of going on and not to die." Why should not

the "saved" soul "go forth on adventures brave and new?"* The Orphic and Indian doctrine of release seems to be condemned by the Neoplatonic philosophy, when it has the courage to follow its own path. The beatified soul has its citizenship in heaven, but it must continue always to produce its like on the stage of time. In what sense these successive products of its activity are continuous or identical with each other is a question which we must leave to those whom it interests. To us their only unity is in the source from which they flow, and in the end to which they aspire.

---

* Sallustius......raises this point, and Proclus......says that every soul must descend at least once in every cosmic cycle.

Books for Study & consultation.

Rev. T. E Slater—Transmigration & Karma.

B. L. Chandra, Rai Bahadur—Janmantar and connected Dogmas examined in the light of Reason & Holy scripture.

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মানার্থক সদস্য, দর্শনশাস্ত্রী ও কাব্যরত্ন Rai Bahadur G C. Ghosh, C. I. E মহোদয় কৃত "প্রব্রজ্যা গান" নামক সুবিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের "পূর্ব্বাবস্থিতি" "আত্মার প্রব্রজ্যা," এবং "পরাবস্থিতি" এই তিনটী চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Rev. W Hooper—Transmigration.

Geo. J. Dann—The Transmigration of Souls,

Rev. W. Mc Culloch—জন্মান্তরবাদ

Pundit—C. R. Srinivasa Sastrigal—On Creation & Transmigration.

Rev. J. Robson—Hinduism and its Relations to Christianity (Hindu doctrine, Transmigration. Page 253)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত—জন্মান্তর রহস্য (অষ্টম সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত—কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর

Dean—Inge, The philosophy of Plotinus, vol. II. Transmigration of Soul (page 29-36)

J. N. Farquhar—The Crown of Hinduism গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় "The Eternal & Moral order" দ্রষ্টব্য।

দেবযান ও পিতৃযান।

(ক) পরিচ্ছেদ।

পঞ্চালাধিপতি জৈবলি অর্থাৎ জীবলের পুত্র মহারাজ প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কুমার, পিতা তোমাকে অনুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত করিয়াছেন ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি।" রাজা বলিলেন, "তুমি কি অবগত আছ যে, এই লোক হইতে প্রজারা উর্দ্ধে কোথায় গমন করে ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমি ইহা অবগত নহি।" রাজা বলিলেন, "প্রজারা এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া কিরূপে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা জান কি" ? শ্বেতকেতু বলিলেন, "না, তাহা জানি না।" রাজা বলিলেন, "পরলোক গমনের দুইটি মার্গ বা পথ আছে—দেবযান ও পিতৃযাণ। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা দেবযানে, কেবল কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা পিতৃযানে গমন করেন। পরলোকগমনের পথ কিছু দূর পর্য্যন্ত একরূপ থাকিয়া পরে দেবযান ও পিতৃযানরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানী ও কর্ম্মী ইহারা প্রথমত এক পথে এক সঙ্গে গমন করিয়া পরে পৃথক পৃথক পথে গমন করেন। এই দেবযান ও পিতৃযানের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ ইতরেতর বিয়োগস্থান। যে স্থানে উভয় পথ পৃথক্ হইয়াছে, তাহা কি তুমি অবগত আছ ?" শ্বেতকেতু বলিলেন "না, আমি তাহা অবগত নহি।" রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনবরত বহু লোক ইহলোক হইতে পরলোকে যাইতেছে, ইহাতে এই পরলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, তাহা কি তুমি অবগত আছ ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "তাহাও আমি অবগত নহি।" রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জল কিরূপে পঞ্চমী আহুতিতে—পুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হয়, তাহা জান ?" উত্তর হইল, "না, তাহাও জানি না।" শ্বেতকেতুর সকল উত্তরই হইল "না আর না"। এইবার দেখা যাক দেবযান ও পিতৃযান ব্যাখ্যায় কি সত্য তথ্য পাওয়া যায়।

দেবযান ও পিতৃযান পথ।

দেবযান ও পিতৃযান পথ কি? ইহা লইয়াও ভারতীয় ভাষ্যকারগণ পরস্পর বিবদমান। অপিচ কেবল যে বিবদমান তাহাও নহে, অনেকেরই ধারণা ও সিদ্ধান্ত যে স্বর্গ ও নরকের ন্যায় উক্ত পথ দুইটীও পারলৌকিক। ফলতঃ যে পারলৌকিক পথ দিয়া মৃত পুণ্যাত্মারা পারলৌকিক স্বর্গে গমন করেন, উহার নাম "দেবযান" পথ এবং যে পারলৌকিক পথ দিয়া মৃতেরা পারলৌকিক পিতৃলোক (প্রেতলোক) বা পারলৌকিক নরকে গমন করিয়া থাকেন, উহার নাম "পিতৃযান" পথ।

ইহা কি সত্য সংবাদ?

ইহা কিন্তু প্রকৃত সংবাদ নহে। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের বহু ঋষি উক্ত ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত উভয় বেদে এরূপ বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বিবেকবান্ যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ কিছুতেই আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না। ঋগ্বেদের এক ঋষি বলিতেছেন যে— "পরং মৃত্যো অনু পরে হি পন্থাং যস্তে স্বেতরো দেবযানাং। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মা নঃ প্রজাং রিরিষো মোত বীরান্"। ১৮।১০ ম। "হে মৃত্যো যম! তোমার চক্ষু আছে, কর্ণও আছে, তুমি বধির নহ। তুমি দেবযান পথে স্বর্গে প্রবেশ করিও না, তোমার নিজের যে পথ আছে, সেই পথে যাতায়াত কর। তুমি আমাদিগের সন্তান-সন্ততি ও বীরগণকে হিংসা করিও না"। সুতরাং ঋষি এখানে "পিতৃযান" পথকেই যমালয়ে গমনের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফলতঃ ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। যখন যম ভৌম পিতৃলোকের রাজা, যখন মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, যম তাহাও জানিতেন না, ও অন্য কেহই জানিতে পারেন নাই, তখন পিতৃলোকের গমনের আবার একটা কি পারলৌকিক পথ থাকিতে পারে? ফলতঃ এই মন্ত্রটী প্রমাদসমাক্রান্ত—"প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্ব্যেভিঃ যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ। উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা,

যমং পশ্যাসি বরুণঞ্চ দেবম্”। ৭।১৪।১০ ম। “হে মৃত! যে পথে (পিতৃযাণ) আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথে গমন কর। তবে তুমি যমালয়ে যাইতে ভীত হইও না। তুমি তথায় যাইয়া দেখিবে যে যম ও বরুণ দেব, তথায় অন্ন ভোজনে হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন”।

পুনশ্চ—“সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেন। ৮। অর্থাৎ হে মৃত! তুমি যমালয়ে যাইয়া মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ এবং যমরাজের সহিত মিলিত হও”। অথর্ব্ববেদের ৭৬৫ পৃ ১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃ ৪র্থ খণ্ড, ২৩৫ ঐ। এই তিন স্থানের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক যে পিতৃযাণ ও দেবযান কি।

(১) যে ব্যক্তি দেববন্ধু ব্রাহ্মণের হিংসা করে, সে পিতৃযাণ লোক প্রাপ্ত হয় না। ইহার মূল তাৎপর্য্য ইহাই যে মৃত ব্যক্তিরা পিতৃযাণ পথে পরলোকে গমন করিয়া থাকে। পরন্তু ইহাও প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(২) হে সোমপায়ী পিতৃগণ! তোমরা গম্ভীর পিতৃযাণ পথে আগমন কর ও আমাদিগকে আয়ুঃ ও প্রজা দেও, এবং ধনজনে পরিপুষ্ট কর।

(৩) হে সোমপায়ী উপরত পিতৃগণ তোমরা গম্ভীর পিতৃযাণ পথে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কিন্তু মাস পূর্ণ হইলে আবার আমাদিগের গৃহে হবির্ভক্ষণার্থ ফিরিয়া আসিও এবং আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদি ও বীরযুক্ত দেখ।

ইহার তাৎপর্য্য কি ?

ইহার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ মরিয়া অতি ভীষণ পিতৃযাণ পথে পারলৌকিক পিতৃলোকে গমন করেন ও তাঁহারা তথা হইতে ঐ পথে ফিরিয়া আইসেন। ফলতঃ এ ধারণাও অন্ধবিশ্বাসমূলক ও অলীক এবং

ভিত্তিহীন। ফলতঃ যে প্রকার পূর্ব্ব নিবাসের কথা ভুলিয়া যাইয়া সকলে পিতৃভূমি স্বর্গকে পারলৌকিক প্রেতলোক বলিয়া ধারণা করেন, তদ্রূপ সেই ভৌম পিতৃলোক বা ভৌম স্বর্গে গমনের ভৌম পথকেও ঋষিরা প্রেতলোক বা স্বর্গগমনের পারলৌকিক কাল্পনিক পথ ভাবিয়া এই সকল প্রমাদপূর্ণ মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ কি পিতৃযাণ ও দেবযান পথ কি, তাহা অবগত আছেন? না, কেহই পিতৃযাণ পথ কি ও দেবযান পথই বা কি তাহা অবগত নহেন।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এখন আমরা আমাদিগের পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া এই বিষয় শেষ করিবার চেষ্টা করিব। এক সময়ে অরুণিতনয় শ্বেতকেতু পঞ্চালদিগের সভায় গমন করেন, তাঁহাকে জীবলতনয় প্রবাহণ পাঁচটী প্রশ্ন করেন কিন্তু শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেন নাই। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যে বৈদিক ও উপনিষদ্‌যুগের লোকেরা যে পরকালতত্ত্ব জানিতেন না, এবং দেবযান ও পিতৃযাণ পথের কথাও যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন উহা সত্য কি না? তবে একথা ঠিক যে প্রাথমিক যুগের বৈদিক ঋষিদিগের সকল কথাই মনে ছিল না। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে স্বর্গ ভৌম এবং উহাই আমাদিগের পূর্ব্বনিবাস বা পিতৃলোক এবং তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে ঐ সকল ভৌম স্বর্গ ও ভৌম পিতৃলোকে গমনের ভৌম পথের নামই দেবযান ও পিতৃযান পথ।

তবে দেবযান ও পিতৃযাণ বলিয়া পৃথক নাম হইল কেন?

ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে আদি স্তোই যেমন পিতৃলোক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল, তেমনই উহা দেবলোক স্বর্গ বলিয়াও পরিচিত ছিল। তজ্জন্য উক্ত পিতৃলোকে গমনের পথকে কেবল পিতৃযাণই বলা হইত।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত প্রত্নতত্ত্ব

বারিধির ব্যাখ্যা কি ?

(খ) পরিচ্ছেদ।

"স্বর্গ বা আদি জন্মভূমিতে গমনের পথের নামও যে 'পিতৃযাণ' তাহার কোনও প্রমাণ আছে ? অবশ্যই আছে—"কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ— আমি পিতৃলোকে গমনের একটা পথ (পিতৃযাণ) প্রস্তুত করিতেছি, যে পিতৃলোক স্বর্গ। পুনশ্চ ১৮৫ পৃ, ৪র্থ খণ্ড অথর্ব্ব—"আরোহত জনিত্রীং পিতৃযাণৈঃ" তোমরা পিতৃযাণপথে পূর্ব্ব জন্মভূমিতে আরোহণ কর। ইহার পরই—আমরা দেবত্ব হারাইয়া মনুষ্যে পরিণত হই (বস্তুতঃ আমরা সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ দেবতা, যজুর্ব্বেদীরা মনুষ্য, বাসুকী গোত্রের সর্পেরা দেবতা) ও আমাদিগের পিতৃলোকবাসী জ্ঞাতি দেবগণকে আরাধ্য দেবতা বলিয়া স্থির করি, তখন পিতৃভূমি 'দেবলোক' ও তথায় গমনের পথ 'পিতৃযাণ,' 'দেবযান' নাম প্রাপ্ত হয়। তৎপর দিবের উৎপত্তি হইলে উহাও যখন দেবলোক (দিবি দেবাঃ) ও স্বঃ বা স্বর্গনাম ধারণ করে এবং আদি স্বঃ দ্যো 'পিতা' বা 'পিতৃলোক' বলিয়া বিশেষিত হয়, তখন আমরা দিব পর্য্যন্ত প্রসারিত পথকে দেবযান বলিতে আরম্ভ করি, এবং দিব্ বা দ্যুলোকবাসীরা উত্তরকুরু হইতে যে নূতন পথ দিয়া পিতা বা পিতৃলোক দ্যোতে আগমন করিতেন, উহা 'পিতৃযাণ' নামে প্রখ্যাপিত হয়। কেননা তাঁহারা পিতৃলোক দ্যোকে পিতৃলোকই জানিতেন, দেবলোক বলিয়া অবগত ছিলেন না। তাই বায়ু পুরাণ বলিয়া গিয়াছেন যে—"পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ পন্থানৌ দক্ষিণোত্তরৌ।" ৮৬—১ অ। পিতৃগণ ও দেবগণের পথ—অর্থাৎ পিতৃযাণ ও দেবযান পথ দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রসারিত। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবযান পথ ও উত্তর ব্রহ্মলোক হইতে পিতৃলোক দ্যো পর্য্যন্ত বিস্তৃত পিতৃযাণ পথ।

শঙ্কর শিষ্য।

শঙ্করশিষ্যও ছান্দোগ্যোভাষ্যে বলিয়াছেন যে—"এষ দেবযানঃপন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাৎ বহিঃ। যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ"—ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ৩৫৭—৫৮ পৃ, মহেশপাল সংস্করণ। এই দেবযান পথ, ইহা ভারত হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা আর অণ্ডের বাহিরে যায় নাই। বেদও বলিয়াছেন, যে দেবযান পথ, পিতৃলোক স্বর্গ ও মাতৃভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত (১৫।৮৮।১০ ম) কৌষীতকী উপনিষদেও এই ভৌম দেবযানের কথা আছে। পণ্ডিত উমেশ বাবু তাঁহার "ভৌমকাণ্ডে" ইহার সবিস্তর বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।

ইহার আরও কি কিছু প্রমাণ আছে?

ভারত হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পথের নাম যে "দেবযান" ও ব্রহ্মলোক হইতে আদিস্বর্গ পিতৃলোক পর্য্যন্ত পথের নাম যে"পিতৃযাণ" পথ, ইহার অন্য কোন প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে, ভগবদ্‌গীতায় গ্রন্থকর্ত্তা পদ্মনাভ ঋষি বলিয়াছেন যে—"ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।" ৮ অঃ, ২৫ শ্লোক। "ধূম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মলোক হইতে দক্ষিণে পিতৃলোক পর্য্যন্ত যে পথ প্রসারিত, উহার নাম কৃষ্ণ পথ। লোক সকল ব্রহ্মলোক হইতে উক্ত কৃষ্ণপথে ছয়মাসে দক্ষিণে ভারতে আগমন করিয়া থাকেন। আর যোগিগণ কেহ কেহ চন্দ্রের জ্যোতিপথ পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় থাকিয়া যান।" ধূম ও রাত্রিজনপদের ভিতর দিয়া যেপথ ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু) হইতে পিতৃলোক দ্যো বা মঙ্গলীয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উহার নামই কৃষ্ণ পথ বা পিতৃযাণ পথ। শিষ্য বা শঙ্কর এই দুইটী অর্থাৎ ৮অঃ ২৪ ও ৮অঃ ২৫ গীতা বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব কলুষিত। আবার সায়ণ বা সায়ণের এক শিষ্যও পিতৃলোককে প্রেত লোক ঠাহরিয়া—এইরূপ মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৩০ পৃ, ৪র্থ খণ্ড অথর্ব্ববেদ—মৃত লোকেরা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধূমাদিমার্গে পিতৃলোকে যাইয়া সোমযাগাদিজনিত পুণ্যফল উপভোগ করেন—এই সায়ণব্যাখ্যাও অতীব অসাধু। ফলতঃ ধূম ও রাত্রি দুইটী ভৌম জনপদ, তদন্তর্গত পিতৃযাণপথও ভৌম, উহা যে পিতৃলোকে আগমন করা যায়, উহাও ভৌম বটে। সুতরাং উহা পারলৌকিক হয় কি প্রকারে? তবে সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, একজন সায়ণশিষ্য বা স্বয়ং সায়ণ, অথর্ব্ববেদের একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবযান ও পিতৃযাণসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব হৃদ্য হইয়াছে।

যথা—"দ্বিবিধো হি মার্গঃ—দেবযানঃ পিতৃযাণ ইতি। দেবলোকপ্রতিসাধন ভূতো দেবযানঃ, পিতৃলোকপ্রাপক ইতর।" ১৮৬ পৃ, ৫র্থ খণ্ড অথর্ব্ববেদ। তথাহি—পিতৃযাণং—পিতরো যেন মার্গেণ গচ্ছন্তি। ৭।২।১০ম। ইতি সায়ণঃ। যে পথে পিতৃগণ গমন করেন, উহা পিতৃযাণ।

হিন্দু দর্শন ফেলোশিপের লেক্‌চার ও পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত ফেলোশিপের লেক্‌চারে ৩২ পৃষ্ঠায় "দেবযান ও পিতৃযাণের" যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অসাধু। মানুষ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া দেবযান পথে স্বর্গে ও পিতৃযাণ পথে পিতৃলোকে যায়, ইহার মতন কদর্য্য ব্যাখ্যা আর হইতে পারে না।' মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর বহুবিলম্বে মৃতদেহ শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত হয়। সুতরাং অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর আত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়, এ কিরূপ কথা? আত্মাটা কি ততক্ষণ গাবগাছে বা তাল গাছে বসিয়া অপেক্ষা করে?

প্রকৃতার্থবাহিনী ও উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

"আমি শুনিয়াছি, স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটী পথ আছে—উহাদিগের একটীর নাম "দেবযান" ও অন্যটীর নাম "পিতৃযাণ"। এই

দুইটী পথ পিতৃলোকবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সত্যাদিলোকবাসী ব্রহ্মাদি দেবতা এবং মনুষ্যলোকবাসী মনুষ্যদিগের। এই দুইটী পথ দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দেবতা, পিতৃলোকবাসী, ও মনুষ্যেরা এবং অশ্বগবাদি পশু প্রভৃতি গমনাগমন করে। সুতরাং ইহা ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক পথ নহে। তবে ঋষি যে বলিয়াছেন এই দুইটী পথই পিতৃলোক ও মাতৃলোকের মধ্যে বিরাজমান ইহা ঠিক প্রকৃত তথ্য নহে। যে সময় দিব বা দেবলোকের (দ্যুলোকের) উৎপত্তি হয় নাই, তখন পিতা দ্যৌ ও মাতা পৃথিবীর মধ্যে যে পথ ছিল, উহাই দেবযান ও পিতৃযাণ নামে কথিত হইত। তাই বলা হইয়াছে "যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ"। কিন্তু ইহার বহুকাল পরে ভারত হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত যে পথ বিস্তৃত হয়, উহাই দেবযান এবং সত্যলোক হইতে ধূম ও রাত্রি লোকের ভিতর দিয়া পিতৃলোক দ্যো পর্য্যন্ত যে (স্বতন্ত্র পথ) বিস্তৃত উহাই "পিতৃযান" নাম ধারণ করে। ঋষি নিজে পথ না দেখাতেই তাঁহার বর্ণনা, ঠিক হয় নাই।"

"এখন পঠকগণ ভাবিয়া ও বিচার করিয়া দেখুন, যে পথে ভারতীয় বণিকেরা যাতায়াত করিয়া থাকেন, যে পথে দস্যুতস্কর ও ব্যাঘ্রভল্লুকাদি বিচরণ করে, যাহা জলে প্লাবিত হয় ও বরফে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেই দেবযান পথ সকল ভৌম কি পারলৌকিক, এবং এই পাদ্যগম্য স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ ভৌম কি পারলৌকিক। ফলতঃ মানুষ মরিয়া কি ভাবে কোথায় যায়, তাহা বেদ ও উপনিষদের ঋষিরাও অবগত নহেন। যদি মৃত ব্যক্তিদিগের তখনই পুনর্জ্জম না হয়, তাহাদিগের কোনও পারলৌকিক ওয়েটিংরুম থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগের আত্মা যে একা বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ছয় মাসে পরলোকে গমন করে, ইহাও বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহা হউক দেবযান পথ সকল যে ভৌম তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই। এবং যে পথ সকলের এক মাথা ভারতবর্ষের মাটিতে সংলগ্ন, তাহাদের অন্য মাথা যে কোনও পারলৌকিক

শূন্যসংস্থ স্বর্গলোক সংলগ্ন হইতে পারে না, তাহাও বোধ হয় সকলে প্রসন্ন বদনেই স্বীকার করিবেন।"

উপসংহারে বলা যায় জন্মান্তরের পরীক্ষা গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ এত বলবৎ যে কেবল তাহা লিখিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া দাঁড়ায়। অধ্যাপক লান্সলিনের অবলম্বিত প্রণালীর নাম "স্মৃতির প্রতিসরণ"। লান্সলিনের অধ্যবসায়ের ফলে অনুসন্ধান ও গবেষণার একটা নূতন দিক উৎঘাটিত করিয়াছেন এবং জন্মান্তরের স্বপক্ষে অনায়াসলভ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। এজন্য তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন। প্লোটাইনুস এবং ঈঞ্জে উভয়ে বেদান্তের মর্ম্ম পোষণ করেন বলিয়া মনে হয়। ঈঞ্জে (Inge) স্পষ্টই বলিয়াছেন— "The doctrine has found strong support in modern times, e. g. in Krause, Swedenborg, Lavater, Ibsen, Maeterlinck, Mc Taggart, Hume, Goethe, and Lessing speak of it with respect,

Dean, Inge ঐ গ্রন্থের Neopythagoreanism নামক নিবন্ধে আর এক স্থানে যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাও এস্থলে পাঠকদিগের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। "The original doctrine was that the soul of the race is reincarnated in each generation, passing through the "wheel" of alternate life and death for ever. This doctrine has no moral significance. But it soon came to be modified by another view, really quite distinct from it, according to which the soul falls through error from its state of purtiy, undergoes a long purification from its sins both here and in a purgatorial state hereafter, and at last returns to heaven. With this was combined the doctrine of transmigration or

rebirth, incorrectly called metempsychosis (Meten somatosis or palingenesia are the right words, since it is the bodies, not the souls, that are changed at rebirth.)

Thus the older idea was moralised, but at the same time changed, since now the individuality of the soul persists from one life to another. And since reincarnation is always for the sake of punishment or discipline, the "weary wheel" of existence is regarded as something to be escaped from, a notion which was far from the view of those who, like Heracleitus, maintained the older doctrine."...........

সপ্তদশ অধ্যায়।

দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত বলিলে কি বুঝায়? আমরা এই অধ্যায়ে উক্ত প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। জগতের আধাররূপী জ্ঞান বস্তু যে এক অখণ্ড, জীবের (মনুষ্যের) জ্ঞান যে সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানের অনুপ্রকাশ ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। এবং এই অদ্বিতীয় জ্ঞানে যে একটী চিরন্তন দ্বৈতভাব রহিয়াছে তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কোন ভিন্ন মত নাই।

দেশ একটি অনন্ত সংযোগের ব্যাপার। অনন্তরূপে বিভাজ্য অসীম অংশ সমূহের সংযোগেই দেশের অস্তিত্ব এবং এই সংযোগকারিণী শক্তি জ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এক জ্ঞানের সমক্ষে এক কালে বর্ত্তমান থাকাতেই ইহারা সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। এক জ্ঞানের সমক্ষে ইহাদের

বর্ত্তমান থাকার নামই ইহাদের সংযোগ। এই যে সংযোগের ব্যাপার দেশ, ইহা এক, অনন্ত। আমরা প্রত্যেকে এক কালে অতি ক্ষুদ্র দেশাংশ প্রত্যক্ষ করিতে পারি, এবং প্রত্যেকে এক কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশাংশ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষীভূত ক্ষুদ্র দেশাংশের বাহিরে আরো দেশ আছে অনন্ত দেশ আছে। দেশের জ্ঞান, দেশের চিন্তা, অপরিহার্য্য, দেশের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সীমার বাহিরে অনন্ত দেশ প্রসারিত। দেশ যেমন এক দিকে অনন্তরূপে বিভাজ্য, তেমনি ইহা অপরদিকে অনন্তরূপে সংযুজ্য (Infinitely addible.) দেশের সীমা আছে ইহা আমরা ভাবিতে পারি না। ইহা যে আমরা ভাবিতে পারি না তাহা আমাদের কোন মানসিক দুর্ব্বলতার ফল নহে; দেশ ব্যাপারটাই অনন্ত সংযোগের ব্যাপার। অনন্ত সংযোগের ব্যাপার ভিন্ন ইহার আর কোন অর্থই নাই। এই বিষয়টী এত সহজ ও পরিষ্কার যে এই বিষয় অধিক বলা আমাদের আবশ্যক বোধ হইতেছে না। পাঠকের ইচ্ছা হইলে ভাবিয়া দেখিতে পারেন দেশের সীমা ভাবিতে পারেন কি না। দেশের সীমা ভাবিতে গেলেই এই ভাবিতে হইবে যে অমুক স্থানে দেশ শেষ হইয়াছে, তাহার অপরদিকে আর দেশ নাই। কিন্তু ইহাতে দেশের সীমা ভাবা হইল না। এই "অপরদিকে" কথাটাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে কল্পিত সীমার বাহিরেও দেশ আছে। দেশের সীমা অসম্ভব, দেশের সীমা থাকা অর্থহীন অসম্ভব ব্যাপার। এই যে অনন্ত সংযোগের ব্যাপার দেশ, ইহাকে অনন্ত ভাবা যেমন অপরিহার্য্য, ইহাকে এক ভাবাও তেমনি অপরিহার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগেই,—একত্বেই দেশের অস্তিত্ব।

এই সকল অংশের পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে, পার্থক্য নাই। দেশের কোন অংশের সহিত অপর কোন অংশ বিযুক্ত থাকিতে পারে না। দেশের দুই ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরস্পর হইতে কোটী কোটী যোজন দূরবর্ত্তী হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দেশাংশ বা দেশাংশসমূহ

এই দুই অংশের সহিত ও পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া এই দূরবর্ত্তী অংশদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা প্রত্যেকে এককালে ভিন্ন ভিন্ন দেশাংশকে জানি বটে, কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। সমুদয় দেশ এক অখণ্ড অনন্ত মহা-দেশের অন্তর্গত। এই এক অখণ্ড অনন্ত মহাদেশকে জানিতে গিয়া আমরা ইহার আধাররূপে এক অনন্ত জ্ঞানকে—অর্থাৎ যাঁহাকে নিজ জ্ঞান, নিজ আত্মবস্তু বলি, সেই জ্ঞানকেই—অবগত হই। এই অনন্ত জ্ঞান-শক্তিই এই অনন্ত সংযোগ ব্যাপারের কারণ। দেশ এক অনন্ত, ইহার প্রকৃত অর্থ—তিনি এক অনন্ত। দেশের অনন্তত্ব ও তাঁহার অনন্তত্ব একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কালও যে এক অনন্ত, এবং এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তুই যে এই এক অনন্ত কাল-শৃঙ্খলের রচয়িত, তিনি যে নিত্য ত্রিকালজ্ঞ, এই সত্য সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কোন বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। তদ্রূপ পর-মেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা যে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ ইহা উভয় দর্শনে অর্থাৎ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে) স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা মায়িক লক্ষণ নহে।

এ স্থলে এ বিষয় আর কিছু বলিব না। আশা করি এখন দেশ কাল সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব ও অখণ্ডত্বের মূল প্রমাণ পাঠক কথঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। পাঠক দেখিবেন যে ঈশ্বরের নিত্যত্ব বুঝিতে হইলে যেমন অনন্তকালের অসংখ্য ঘটনা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কি অধিক সংখ্যক ঘটনা জানিবারও প্রয়োজন নাই, কাল ও অনিত্যতা ব্যাপারটা বুঝিলেই কালাতীত নিত্যবস্তুর ধারণা হয়, জ্ঞানবস্তু—আমাদের আত্মারূপী জ্ঞানবস্তু—যে নিত্য তাহা বোঝা যায়, তেমনি ঈশ্বর যে অনন্ত, সর্ব্বাধার, ইহা জানিতে ও বুঝিতে গেলে সর্ব্ব দেশস্থিতবস্তু জানিবার, এমন কি অধিক সংখ্যক বস্তু জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; দেশের প্রকৃতি জানিলেই দেশাতীত অনন্ত বস্তুর প্রকৃতি জানা যায়। দুটি দেশখণ্ডের সম্বন্ধ বুঝিলেই বোঝা যায় যে, যে

জ্ঞান এই দেশ দুইটীকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা দেশাতীত, এক, অখণ্ড, অনন্ত। যে আত্মা দুটি বস্তুকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জানে, সে অভিন্নভাবে উভয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান। ভেদটা আত্মার বাহিরে নহে, আত্মার ভিতরে। অভেদভাব মৌলিক, ভেদভাব অবান্তর। "এথা" ও "সেথা"কে যে জানে, সে "এথা" ও "সেথা" উভয়ে সমভাবে বিদ্যমান। "দূর" ও "নিকট"কে যে জানে সে "দূর" "নিকট" উভয়ে নির্ব্বিশেষভাবে বর্ত্তমান। ফলতঃ শরীরের পক্ষেই "দূর" "নিকট" অর্থযুক্ত আত্মার পক্ষে "দূর" "নিকট"-এর কোন অর্থ নাই; "দূর" ও "নিকট" উভয়ই সমান-ভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পাঠক দেখিবেন আমরা দেশকে জানিতে গিয়া দেশের জ্ঞাতাকে, দেশের আধারকে, দেশাতীত বলিয়া জানি; দেশের প্রকৃতিতে যে ভেদের ভাব, খণ্ডের ভাব, ব্যবধানের ভাব, বহুর ভাব আছে, তাহা জানিতে গিয়া দেশের আধার জ্ঞানবস্তুকে—যাকে নিজ জ্ঞানবস্তু বলি সেই জ্ঞানবস্তুকেই—অভেদ, অখণ্ড, অব্যবহিত ও এক বলিয়া জানি। এই দ্বিবিধ জ্ঞান এমনভাবে জড়িত যে ইহাদিগকে পৃথক করা যায় না। এই দুই শ্রেণীর তত্ত্ব—ভেদ ও অভেদ, দ্বৈত ও অদ্বৈত, খণ্ড ও অখণ্ড, ব্যবহিত ও অব্যবহিত, বহু ও এক—জ্ঞানের ভিতরে এমন ভাবে সংমিলিত, যে কেবল ইহাদের মিলনেই জ্ঞান সম্ভব, ইহাদের একটিকে ছাড়িলে আর জ্ঞান সম্ভব হয় না। ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত,—জ্ঞানের মৌলিক অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি। আমরা এ পর্য্যন্ত হিন্দুদর্শনের দিক হইতে উহার একটা ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম ইহার সহিত আর একটি বিষয় জড়িত আছে তাহা এই:—"ভেদের মূলে অভেদ"।

"ভেদের মূলে অভেদ" বলিলে কি বুঝায়? এবং আচার্য্য John Caird মহোদয়ের ব্যাখ্যা।

জ্ঞান বস্তুর মৌলিক একত্ব সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত প্রমাণ সকলের নিকট তৃপ্তিকর হইবে কি না, তাহাতে সন্দেহ। এই প্রমাণ বা ব্যাখ্যা সম্বন্ধে

আপত্তি আছে। স্বভাবতঃই এই আপত্তি উঠিবে যে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি জ্ঞান বহু, প্রত্যেক জীবের আত্মা পরস্পর হইতে ভিন্ন ও পৃথক; আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে জানিতেছি, বুঝিতেছি ও চিন্তা করিতেছি; এই স্পষ্ট পৃথকত্ব সত্ত্বে জ্ঞানের একত্বসম্বন্ধীয় প্রমাণ কি কেবল একটা দার্শনিক শিল্প-চাতুরী মাত্র নহে? আমাদের প্রত্যেকের মন ভিন্ন ভিন্ন। তবে আর এখন কিরূপে বলা হইতেছে যে একই জ্ঞানবস্তু প্রত্যেক জীবের জীবনাধাররূপে, প্রাণরূপে বর্ত্তমান? আমরা যথাসাধ্য এই আপত্তির উত্তর দিতেছি। আমরা প্রত্যেকে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানিতেছি, একের বিজ্ঞান যে অপরের বিজ্ঞান নহে, একের স্মৃতি যে অপরের স্মৃতি নহে, এক জনের কার্য্য যে আর একজনের কার্য্য নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের এই অসংখ্য বিচিত্রতা অস্বীকার করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; ইহা অস্বীকার করা কেবল নিতান্ত নির্ব্বোধ বা অন্ধ লোকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখাইতেছি যে এই অসংখ্য বিচিত্রতার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য একতা রহিয়াছে। জীবের মন বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু পরস্পরের সহিত অসংযুক্ত নহে; সমুদায়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগ, এক আশ্চর্য্য একতা, রহিয়াছে। সমুদায়ের মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান, কেবল এই তত্ত্বই এই একতার একমাত্র ব্যাখ্যা। জীবাত্মা সকল যদি পরস্পর হইতে পৃথক পৃথক হইত, তবে ইহা নিশ্চয় যে কোন আত্মা কোন আত্মাকে জানিতে পারিত না, কোন আত্মার সঙ্গে অপর কোন আত্মার কোন প্রকার যোগ সম্ভব হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি জীবজগতের মধ্যে আশ্চর্য্য যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞানে, ভাবে, কার্য্যে, জীবসকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। আমার ও আমার সম্মুখস্থ বন্ধুর জীবনের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু যদি মূলে এক না হইত, তবে তিনি যে আছেন, আমি তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারিতাম না। তাহার অস্তিত্বের কল্পনা পর্য্যন্ত আমার মনে উঠিত না; আমি আমার নির্জ্জন ও অর্গলবদ্ধ জীবন-গৃহে আবদ্ধ থাকিতাম, আমার ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা

সমূহই আমার জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হইত। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমি তাঁহাকে জানিতেছি, তাঁহার মন বুদ্ধি ও আমার মন বুদ্ধি ভিন্ন হইলেও আমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য জ্ঞানের যোগ চলিতেছে। আমি যে কেবল তাঁহার অস্তিত্ব জানিতেছি তাহা নহে, তাঁহার ও আমার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের বিনিময় চলিতেছে। আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি তিনি তাহা জানিতেছেন, বুঝিতেছেন। তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন, আমি তাহা জানিতেছি, বুঝিতেছি, উভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি ভাবের কোলাকুলি চলিতেছে। এই সমুদায় ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতেছে? আমি বাক্য উচ্চারণ করিতে গিয়া যে প্রয়াস করিতেছি. সেই প্রয়াস আমার ব্যক্তিগত কার্য্য। এই প্রয়াসের ফলরূপে আমি যে শব্দ শুনিলাম, সেই শব্দও আমার ব্যক্তিগত মনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান। আমার বন্ধুর মন আমার ইচ্ছার করতলস্থ নহে, অথচ কি নিগূঢ় উপায়ে আমার প্রয়াসকে উপলক্ষ করিয়াই আমার অনুভূত শব্দের অনুরূপ শব্দ তাঁহারও মনে উৎপন্ন হইল এবং আমি যে অর্থ বুঝিলাম তিনিও সেই অর্থই বুঝিলেন, আমার মনে সুখ দুঃখাদি যে ভাবের উদয় হইল, তাঁহার মনেও সেই ভাবের উদয় হইল! আত্মায় আত্মায় এই যে যোগ, এই যে চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, ইহার আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ইহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই যে সংযুক্ত আত্মাদ্বয়ের মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ বলিলেই এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায় যাহা সংযুক্ত বস্তু সমূহের মধ্যে সাধারণ। আমার মনের চিন্তা, আমার মনের ভাব, যখন অন্যের চিন্তা, অন্যের ভাব হইয়া উঠিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে উভয় মনের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু একই। একই জ্ঞান-শক্তি উভয়ের জীবনের মূলে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়কে একসূত্রে বন্ধন করিতেছে, উভয়কে একতালে নৃত্য করাইতেছে। হয় বলিতে হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন মনের মধ্যে কোন যোগ নাই কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যেকে কেবল আপনাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, জগতের বিচিত্র আধ্যাত্মিক

সম্বন্ধনিচয় অসার মায়ামাত্র, নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে একই অনন্ত জ্ঞান-বস্তু, এক অনন্ত পরমাত্মা, প্রত্যেক আত্মার প্রাণরূপে, প্রত্যেক মনের চিন্তা ও ভাবের সাধারণ কারণরূপে, বর্তমান থাকিয়া এই অসংখ্য বিচিত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-লীলা রচনা করিতেছেন। এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয় পাঠক যতই ভাবিবেন ততই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং ততই এই মহান্ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে যে জগতের কোটী কোটী বিচিত্রতার মূলে একই জ্ঞান-বস্তু বর্তমান থাকিয়া সমুদায় বিচিত্রতা, সমুদায় দেশ, সমুদায় কালকে একসূত্রে বন্ধন করিতেছেন। এই আধ্যাত্মিক যোগ কেবল পরস্পরের সম্মুখস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে; ইহা দেশের ব্যবধান মানে না, কালের ব্যবধান মানে না। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠা—নিবাসী ঋষি এমার্সন যে চিন্তা করিয়াছিলেন আমি সেই চিন্তার অংশভাগী হইতেছি। তাঁহার মানসিক কার্য্য ও আমার মানসিক কার্য্য সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আমাদের উভয়ের চিন্তা মূলে এক। ইংলণ্ডের কবি টেনিসন্ যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া গান করিয়াছেন, সেই ভাবের তরঙ্গ আমার প্রাণে আসিয়া লাগিতেছে; আমার প্রাণ সেই তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার হৃদয় ও আমার হৃদয়ের যোগ নিঃসন্দেহ। যে ঈশ্বর স্তোত্রে অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষির হৃদয় ভাবে মগ্ন হইয়াছিল, সেই স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া আমার হৃদয় ভাবে আপ্লুত হইতেছে; আমি তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইতেছি। এইরূপে বুদ্ধের গভীর যোগ ও ত্যাগ, যীশুর জ্বলন্ত বিশ্বাস, দয়া, প্রেম ও ত্যাগস্বীকার, প্লেটোর গভীর জ্ঞান, চৈতন্যের উচ্ছ্বসিত ভক্তি, আমার প্রাণের সমক্ষে আসিয়া আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে, আমাকে এই সকল দেশকালে অতি দূরবর্ত্তী মহাত্মাদিগের সহিত গাঢ় যোগে আবদ্ধ করিতেছে। হয় এই সকল সম্বন্ধ মিথ্যা, অর্থহীন; আর যদি তাহা না হয়, এই সকল সম্বন্ধ যদি কোন অর্থে প্রকৃত সম্বন্ধ হয়, এই সকল সম্বন্ধের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত যে এক,

অখণ্ড, সর্ব্বদেশব্যাপী সর্ব্বজীবের প্রাণরূপী পরম জ্ঞানই এই সমুদায় সম্বন্ধের একমাত্র ব্যাখ্যা, একমাত্র কারণ।

এই সত্যের আর এক দিক আছে, যাহার আধুনিক ব্যাখ্যার দিকে হিন্দু লেখকগণ বড়ই ঝুঁকিয়াছেন, তাহা এই—একদিকে আমি দেশকালে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবমাত্র, আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আমি এককালে দেশ ও কালের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র জানিতে পারি এবং আমার সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় বোধের বিষয় আমার ব্যক্তিগত বিজ্ঞান-নিচয় মাত্র। অথচ অপর দিকে আমিই আবার অনন্ত দেশ কালকে জানিতেছি। অনন্ত দেশকালের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব আমি জানি না, সত্য বটে, কিন্তু এক অর্থে,—একটী প্রকৃত অর্থে,—আমি অনন্ত দেশ কালকে জানিতেছি। বিশেষ বিশেষ দেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু, বিশেষ বিশেষ কালের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ঘটনা, এই সমস্ত আমি সমগ্ররূপে জানি না সত্য বটে, এই সমস্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত হয় না সত্য বটে, কিন্তু দেশকাল-সম্বন্ধীয় সাধারণ তত্ত্ব, যাহা সমুদায় জ্ঞানের মূলতত্ত্ব, যে সকল তত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়, সেই সকল তত্ত্ব আমি পরিষ্কাররূপে জানিতেছি। দেশ যে এক ও অনন্ত, ঘটনা-প্রবাহ যে অনন্ত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা যে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং জ্ঞানের একতাই যে সমুদায় সম্বন্ধের কারণ, এই সমুদায় অনতিক্রমণীয় মূলতত্ত্ব আমি নিশ্চয়রূপে জানিতেছি। এই সমস্ত মূলতত্ত্ব সমুদয় জ্ঞানের অপরিহার্য্য প্রকরণ। সুতরাং বিশেষ বিশেষ উপকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান যতই কেন ভিন্ন হউক না, বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্ঞান যতই ভিন্নরূপ ধারণ করুক না, জ্ঞানের সাধারণ আকার কি, প্রকরণ কি, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিতেছি। কেবল তাহাই নহে; আমি ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ভাব এবং ইচ্ছাও অনেক পরিমাণে জানিতেছি; প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ক্ষুদ্র দেশকালে আবদ্ধ হইয়াও বহু দূর দেশের এবং অতি প্রাচীন কালের তত্ত্ব অবগত হইতেছি। এতদ্বারা স্পষ্টই

বোঝা যাইতেছে যে আমারই মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের, সসীম ও অসীমের, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্বের, আশ্চর্য্য সম্মিলন রহিয়াছে। আমি এক দিকে ক্ষুদ্র, সসীম, ব্যক্তিগত, কিন্তু আমারই মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা মূলে অতি মহান্, অসীম ও বিশ্বজনীন।

সেই অসীম বস্তু আমার "উচ্চতর আমি" (Higherself) রূপে, আমার পরম আত্মারূপে, বর্ত্তমান থাকাতেই আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছি,—আমার ব্যক্তিগত জীবনের বহিরিস্থ তত্ত্ব সমুদয় অবগত হইতে পারিতেছি, অনতিক্রমণীয় বিশ্বজনীন সত্যের অধিকারী হইতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিতেছি। যে কেবল সসীম, কেবল ব্যক্তিগত, সে আর কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানা দূরে থাক্, সে তাহার নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব,—সে যে সসীম ও ব্যক্তিগত ইহাই—জানিতে পারে না। কিন্তু যে আপনাকে সসীম ও ব্যক্তিগত বলিয়া জানিয়াছে, সে এই জ্ঞানেই নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব অতিক্রম করিয়াছে। যে আপনার বাহিরে যাইতে পারে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অতিরিক্ত তত্ত্ব জানিতে পারে, অনতীক্রমণীয় সাধারণ বিশ্বজনীন সত্যের অধিকারী হইতে পারে, সে কেবল মাত্র সসীম নহে, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নহে; তাহার মধ্যে সসীম ও অসীম, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্ব, অচ্ছেদ্যভাবে বর্ত্তমান। আমরা একদিকে সসীম ও ব্যক্তিগত ইহা যতদূর সত্য, অপর দিকে ইহাও ততদূর সত্য যে আমাদের সসীম ও ব্যক্তিগত জীবনের আধার, কারণ ও আলোকরূপে অসীম ও বিশ্বজনীন জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বর্ত্তমান। জ্ঞানমাত্রেই এই চিরন্তন দ্বৈতাদ্বৈত ভাব। প্রত্যেক জীবাত্মাই সেই অনন্ত জ্যোতির প্রকাশে জ্যোতিষ্মান। (See Princi-

---

পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ কৃত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

W. N. Clarke. D. D. কৃত The Christian Doctrine of God.

pal John Caird's D. D. L. L. D. Introduction to the philosophy of Religion, the latter portions of chapters IV. and V and portions of chapter VIII.).

জীবাত্মা ও জড়—এই দুই শব্দের অর্থ

এই সংসারে জীবাত্মা শরীররূপ পিঞ্জরে আজন্ম বদ্ধ রহিয়াছেন। স্বরূপতঃ জীবাত্মা কি এ অনুসন্ধান বৃথা। কারণ জীবাত্মার স্বরূপ কোন প্রকারে বুদ্ধির গোচর হইতে পারে না। জীবাত্মার কেন? জড় পদার্থেরও কি স্বরূপ জানা যাইতে পারে? এই জগতের কোন বস্তুরই স্বরূপ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল গুণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গুণের আধার যে, সে যে কি পদার্থ, তাহা আমাদিগের জানিবার কোন উপায় নাই। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ বা স্পর্শ গুণ দ্বারা জড় পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে; কিন্তু যাহার সেই রূপ-রস-গন্ধ শব্দ বা স্পর্শ গুণ, তাহাকে আর আমরা কোন প্রকারে জানিতে পারিতেছি না এবং শরীর ইন্দ্রিয় যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্যান্ত আমরা তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিব না। ইহা সত্য যে যতদিন জীবাত্মা শরীরের মধ্যে বসতি করে এবং জ্ঞান লাভের নিমিত্তে যতদিন তাহার ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর থাকে ততদিন আর তাহার কোন বস্তুর গুণগত লক্ষণ ব্যতীত স্বরূপ-লক্ষণ জানিবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বরের যে আত্মা তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়; আর সৃষ্ট মনুষ্যদিগের যে পৃথক পৃথক আত্মা তাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। অসংখ্য জীবাত্মার আধার যেমন ভিন্ন ভিন্ন শরীর দেখা যাইতেছে, পরমাত্মার তদ্রূপ কোন আধার নাই; তিনি নিরাধার; তিনি অশরীরী। জ্ঞানের নিমিত্তে জীবাত্মা-দিগের যেমন ইন্দ্রিয় সকলের প্রতি নির্ভর করে, তদ্রূপ পরমাত্মার কোন ইন্দ্রিয় নাই এবং তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন না। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া স্বাভাবিকী এবং তিনি সমুদয় বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ এবং গুণগত লক্ষণ এক কালেই জানিতেছেন।

এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র, শরীর-রহিত, ইন্দ্রিয়-রহিত, জ্ঞান-স্বরূপ, নিত্য পরমাত্মা বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করিলেন, সেই প্রকার এই জগৎ উৎপন্ন হইল; তিনি জড় এবং চেতন উভয়েরই সৃষ্টি করিলেন। জড় পদার্থের মধ্যে সূর্য্য কি শ্রেষ্ঠ বস্তু। তদভাবে তিমিরাচ্ছন্ন এই জগতকে কে প্রকাশ করিত? যদি পরমাত্মা চৈতন্যের সৃষ্টি না করিতেন, যদি কোন একটিও জীবাত্মার সৃষ্টি না হইত, তবে কে এই মনোহর জগৎ উপভোগ করিত? সূর্য্যের উদয়াস্ত হইত, ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত, বৃক্ষ ফলবান হইত; কিন্তু কোন চক্ষু নাই যে সূর্য্যকে দর্শন করে, কোন রসনা নাই যে ফল আস্বাদন করে। সুতরাং জীবাত্মার অভাবে সৃষ্টি বিচিত্র হইয়াও নিরর্থক হইত। লোক সকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না; রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-বিশিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা দেখিতেছে, কিন্তু যে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ দেখিতেছে, তাঁহাকে তাহারা ভাবিয়া দেখে না। সর্ব্বদা কেবল বাহ্যবস্তুকে দেখিয়া, শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া লোকদিগের এমন সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তাহারা এমত কোন বস্তুর পৃথক সত্তারই অনুভব করিতে পারে না, যাহাতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই। রূপ-রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বিশিষ্ট যে বস্তু সে-ই বস্তু, তাহা ভিন্ন আর বস্তু নাই, এই তাহাদিগের নিশ্চয় বুদ্ধি। যখন প্রথম ইহা বুঝা যায় যে, যে রূপকে দেখিতেছে, যে রসকে আস্বাদন করিতেছে, যে গন্ধকে আঘ্রাণ করিতেছে, যে স্পর্শকে অনুভব করিতেছে, তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, তখন কি আশ্চর্য্য হইতে হয়। সুবোধ ব্যক্তিরা ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন যে, যে সকল বস্তুকে দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, সেই সকল বাহ্য বস্তু; আর যে দেখে, যে শুনে, যে স্পর্শ করে, যে আঘ্রাণ করে, যে আস্বাদন করে, কিন্তু যাহাকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না, আস্বাদন করা যায় না, সেই আমি—সেই জীবাত্মা।

দর্শন শাস্ত্রমতে "জীবাত্মা ও পরমাত্মা" এই দুই বস্তুর তাৎপর্য্য কি ?

আমি কি বস্তু, ইহা যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তবে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে আমি শরীর নহি ; কিন্তু আমি যে পদার্থ, সে এই শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী রহিয়াছে, তাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। জীবাত্মা জ্ঞান পদার্থ, শরীর জড় পদার্থ ; কিন্তু পরমেশ্বরের এই আশ্চার্য্য মহিমা যে, এমত দুই স্বভাবতঃ বিপরীত পদার্থকে তিনি একত্র বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বাইবেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও সেই প্রমাণ দেখিতে পাই। আকাশ মণ্ডলের বিস্তারকর্ত্তা, পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন কর্ত্তা, এবং মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মার উৎপাদন কর্ত্তা সদাপ্রভু"। সখরিয় ১২, ১। "যিনি আত্মা সকলের পিতা, আমরা কি অনেক গুণ অধিক পরিমাণে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করিব না ? "হে যাবতীয় শরীরস্থ আত্মার ঈশ্বর"। এই বাক্যগুলির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে বিপরীত পদার্থকে একত্র বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। এই প্রকার কত অসংখ্য জীবাত্মা আমাদিগের গোচর হইতেছে। যেমন পরমাণুর গণনা হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মারও গণনা হয় না। প্রতি শরীরে স্বতন্ত্ররূপে একটি একটি জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে সেই প্রাত জীবাত্মা "একএব" একই। জীবাত্মা যে আমিও সেই ; এক বস্তুর দুই নাম মাত্র। আমি শব্দে যে বস্তু বুঝায় জীবাত্মা শব্দে সেই বস্তুই বুঝায়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, যে আমি কখন দুই নহি, আমি একই ; অংশবিশিষ্ট নহি, সম্যকরূপে অংশ-বিহীন।

কোন জড় বস্তুকে এতাদৃশ অংশবিহীন বলা যায় না। অতি সূক্ষ্ম যে এক বিন্দু বালুকা তাহারও অনেক অংশ আছে। বস্তুর স্থানব্যাপ্তির নাম বিস্তার, জড় বস্তু মাত্রই স্থানব্যাপী, সুতরাং জড় বস্তু মাত্রেরই বিস্তার

অছে। যাহার বিস্তার আছে, তাহার অবশ্য অনেক অংশ আছে; এই হেতু জড় বস্তু মাত্রেরই অনেক অংশ আছে। অতএব অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইলও তাহার অবশ্য অংশ থাকিবে। তাহাব অবশ্য পূর্ব্ব অংশ, পশ্চিম অংশ উত্তর অংশ, দক্ষিণ অংশ থাকিবে; ঊর্দ্ধ দেশ থাকিবে, নিম্ন দেশ থাকিবে। কিন্তু পরমেশ্বর যে সকল জীবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকে যথার্থ একই পদার্থ, তাহাদের কোন অংশ কি ভাগ নাই, জীাত্মার ঊর্দ্ধভাগ নাই, অধোভাগও নাই, পূর্ব্বভাগ নাই, পশ্চিমভাগও নাই, উত্তরভাগ নাই, দক্ষিণভাগও নাই। জীবাত্মা সম্যকরূপে বিস্তৃত-বিহীনঅংশ-বিহীন, এবং "একএব" একই।

পরমাত্মা যিনি তিনি "একএবাদ্বিতীয়ঃ"। প্রতি জীবাত্মা যদিও এক তথাপি জীবাত্মার সংখ্যা অগণনীয়। এই এক পৃথিবীতে যে কত জীবাত্মা আছে, তাহার স'খ্যা কে করিতে পারে? এই পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের অন্তরে পৃথক পৃথক এক এক জীবাত্মা রহিয়াছে। পরমাত্মাও একই কিন্তু অধিক এই যে তাঁহার সমান আর দ্বিতীয় নাই। কোন এক জীবত্মার সমান যেমন অনেক জীবত্মা আছে, পরমাত্মার সমান আর দ্বিতীয় নাই। জড় হইতে জীবত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। জড় এবং জীবত্মা এত ভিন্ন যেমন অন্ধকার আর আলোক। এই দুই বস্তুতে কোন সমান গুণ নাই—এমত কোন গুণ নাই,—যাহা এই দুই বস্তুতেই আছে—যাহা এই দুই বস্তুতে সমান। জড়তে যে সকল গুণ আছে, তাহা জীবত্মাতে নাই; জীবাত্মাতে যে সকল গুণ আছে, তাহা জড়তে নাই। জড়ের প্রধান গুণ যে বিস্তৃতি, তা৷ জীবত্মাতে নাই; জীবত্মার প্রধান গুণ যে জ্ঞান, তাহা জড়েতে নাই; জড়, হইতে জীবত্মা এত ভিন্ন। আবার জড় হইতে জীবত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে জীবত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়। এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র তিনি ছিলেন, দ্বিতীয় আর কোন বস্তু ছিল না। তাঁহার কেহ

সমান ছিল না, তাঁহা হইতে কেহ অধিক ছিল না, তাঁহা হইতে কেহ অল্পও ছিল না। পূর্ব্বে যখন এই জগৎ কিছুই ছিল না, তখন কেবল তিনি মাত্র ছিলেন, অন্য কোন বস্তু ছিল না। তিনি কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রবাণীও সাক্ষ্য দিতেছে যে "যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই"।

পূর্ণানন্দ পরমব্রহ্ম! তাঁহার আনন্দ আমরা কি প্রকারে অনুভব করিব। সে আনন্দ কোন্ আনন্দের সহিত তুলনা হইতে পারে? তিনি আনন্দের সাগর; সে আনন্দের ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার আনন্দ আপনি নিত্য উপভোগ করিতেছেন, আপনার আনন্দে আপনি নিত্য পূর্ণ রহিয়াছেন। সেই প্রেমাস্পদ পরম পবিত্র পুরুষ সংকল্প করিলেন, যে আমি আমার প্রীতিপাত্র জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ বিতরণ করিব; জগতে সুখ বিস্তার করিবেন, এই উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টি করিলেন। বিবিধ সুখের অধিকারী করিয়া তিনি জীবাত্মাসকল সৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের বাসস্থাননিমিত্তে এই ভূরাদি লোকসকল নির্ম্মিত হইল, এবং তাহাদিগের কর্ম্মের নিমিত্তে তদুপযোগী দেহ সকলের বিধান হইল।

ঈশ্বর জগতের আদি ও সৃষ্টিকর্ত্তা।

এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল মাত্র তিনি ছিলেন, দ্বিতীয় আর বস্তু ছিল না। তিনি অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই জগতে কত পদার্থ আছে তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এই পৃথিবীতেই যত পদার্থ আছে, তাহা কি অদ্যাপি নিরূপিত হইয়াছে, না কোনকালে নিঃশেষে নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা আছে? আবার এক এক পদার্থ অসংখ্য অণুরাশির সমষ্টি। এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রচুর পদার্থ সকল, এই যে অগণনীয় অণু সকল এ সকল কি

কখন নিত্য বস্তু হইতে পারে? যদি এক অণুর সহিত দ্বিতীয় অণুর কোন সম্বন্ধ না থাকিত—যদি তাহাদিগের পরস্পর সংযোগ দ্বারা কোন প্রয়োজন উদ্ধার না হইত, তবে অণুসকল যে অনাদি কাল পর্য্যন্ত আছে, ইহা স্বীকার করাও যাইতে পারিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরস্পর সকল অণুর সহিত সকল অণুর সংযোগ রহিয়াছে—যখন তাহাদিগের পরস্পর সংযোগ দ্বারা সকল প্রয়োজন উদ্ধার হইতেছে, তখন সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে কোন বিজ্ঞানবান্ পুরুষ দ্বারা যে এই সকল বস্তু হইয়াছে ইহারই প্রমাণ হইতেছে।

প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তু দেখিবামাত্র বোধহয়, যে, সে সকল অবশ্য কোন জ্ঞানবান পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও আমাদিগের কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইতে না পারে, তথাপি সেই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেখিলেই প্রমাণ হইবে যে, আমাদিগের অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট পুরুষ আমাদিগের প্রয়োজন জানিয়া, সেই সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্তে অন্নের নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই যে তাহা আপনা আপনি নিত্য থাকিবে, এমন কখন হইতে পারে না। তিনি (ঈশ্বর) থাকাতেই এই প্রমাণ হইতেছে, যে আমাদিগের সমুদয় প্রয়োজন জানেন, এমত কোন অতি শক্তিমান মহান্ পুরুষ আছেন, যিনি আমাদের হিতের নিমিত্তে এই অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রয়োজন বিজ্ঞানবান্ পুরুষ সেই অন্নকে প্রচুর করিবার নিমিত্তে ফল শস্যকেই ফল শস্যের বীজ করিয়াছেন। এক ফলের বীজ হইতে কত ফল উৎপন্ন হইতেছে, এক শস্য হইতে কত শস্য উৎপন্ন হইতেছে। প্রতি ফল শস্যকে প্রচুর ফল শস্যের উৎপত্তির বীজ করিয়া তিনি কি আশ্চর্য্য রূপে এই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে মনুষ্য কখন বীজ নির্ম্মাণ করিতে পারে না, এই নিমিত্তে যে সেই বীজ নিত্যকাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহা কখন স্বীকার করা যায়

না। কিন্তু কোন প্রয়োজন—বিজ্ঞানবান্ অতি-শক্তি পুরুষ সেই বীজ আমাদের জীবন ধারণার্থে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ হয়। কিন্তু শস্যের বীজ থাকিলে কি হইবে? পৃথিবীকে পরিষ্কার ও খনন ও পরিপাটী না করিলে প্রচুর শস্য কদাপি লাভ হইতে পারে না। অতএব পৃথিবীকে পরিষ্কার করিবার—শস্যক্ষেত্রের উপযুক্ত করিবার খনিত্র কুদ্দাল হলাদি নির্ম্মাণ জন্য লৌহ প্রভৃতি যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাহা সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ পুরুষ অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এক লৌহ দ্বারা কত উপকার হইতেছে, তাহা দ্বারা হলাদি নির্ম্মিত হইয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। তাহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া আত্মরক্ষা হইতেছে, তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট সমুদ্রপোত নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য বিস্তার হইতেছে। এমত প্রয়োজনীয় লৌহ স্বতঃ নিত্যকাল রহিয়াছে, এমত নহে, কিন্তু কোন বিচিত্র-শক্তি পুরুষ আমাদের প্রয়োজন জানিয়া ইহা অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার যত বস্তুদ্বারা প্রাণিদিগের প্রয়োজন সাধন হয়, সকলই সেই এক প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ পুরুষের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; কেবল একমাত্র তিনি ছিলেন, তিনিই এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্নেরও সৃষ্টি করিলেন এবং আত্মারও সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই জগতের কেবল নির্ম্মাণকর্ত্তা নহেন, কিন্তু ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাও বটেন। এই অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তার পূর্ব্বে আর কেহ নাই, যে তাঁহার এই জগৎ রচনার জন্য তদুপযুক্ত বস্তু সকল তদ্দ্বারা অগ্রেই সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যেমন স্বর্ণকার ও লৌহকার প্রভৃতির কর্ম্মের জন্য জগদীশ্বর স্বর্ণ ও লৌহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তেমন তাঁহার উপরে আর কেহ নাই, যে সেই পুরুষ তাঁহার এই জগৎ রচনা কার্য্যের উদ্দেশে তদুপযুক্ত বস্তু সকল অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিবেন। একমাত্র তিনিই কেবল ছিলেন, তাঁহার জনকও নাই, তাঁহার সহায়ও নাই, তাঁহার সমানও নাই, তাঁহার অধিকও নাই। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিলেন, সেই সৃষ্টিকার্য্যে যে

সকল উপযুক্ত পদার্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন, তাহার জন্য সংকল্প করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই সকল উৎপন্ন হইল, এবং তিনি তদ্দ্বারা এই জগৎ-সংসার রচনা করিলেন। তিনি একমাত্র নিষ্কল, তিনি নিত্য, তিনি অনাদি অনন্ত, তিনিই একাকী অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই আপনার স্বাভাবিক বিচিত্র জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়ার দ্বারা এই আশ্চর্য্য অনুপম জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ইহাই সিদ্ধ, ইহাই সত্য।

ঈশ্বর সত্যসংকল্প, নির্ব্বিকার, অভ্রান্ত ও আনন্দস্বরূপ।

পরমাত্মা সত্য-কাম সত্যসঙ্কল্প, তিনি যাহা কামনা করেন, যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ হয়, কদাপি তাহা ব্যর্থ হয় না। তিনি এই জগৎ-সংসার রচনার নিমিত্তে পরমাণুরাশির সঙ্কল্প করিলেন, রাশি রাশি পরমাণু উৎপন্ন হইল; (হিতোপদেশ ৮; ২৬ পদ দ্রষ্টব্য)।

তিনি জীবাত্মা সমূহের সঙ্কল্প করিলেন, সমূহ জীবাত্মা উৎপন্ন হইল। তিনি পরমাণু সকলেতে যে যে স্বভাব ও নিয়ম সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহাই তাহাতে সংস্থাপিত হইল, তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাতে যে প্রকার বৃত্তি ও প্রকৃতি নিয়োগ করিতে অভিপ্রায় করিলেন, তাহাই তাহাতে যুক্ত হইল। তাঁহার সংস্থাপিত নিয়মানুসারে শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাঁহারই নিয়মানুসারে শরীরের সহিত জীবাত্মার বিয়োগ হইতেছে।

ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া কেহ কেহ এই প্রকার বিবেচনা করেন, যে তিনি আপনি এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। পরমাত্মা (ঈশ্বর) যিনি তিনি বিকার বিহীন, তাঁহার পরিণাম কি প্রকারে হইতে পারে? ইহা কি কখন বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের গ্রাহ্য হইতে পারে, যে তিনি স্বয়ং বায়ু হইয়াছেন, জল হইয়াছেন, তেজ হইয়াছেন, পৃথিবী হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং প্রতি শরীরে পৃথক পৃথক জীবাত্মা হইয়া সাংসারিক বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন,—কখন

মোহ বিশিষ্ট হইতেছেন, কখন পাপাচরণ করিতেছেন, কখন সাধু হইতেছেন, কখন অসাধু হইতেছেন। যে সকল অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা পরমাত্মাকে উপাদান কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাঁহারা পরমাত্মাতে আরোপিত উক্ত দোষ খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে উপাদান কারণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন,—পরিণাম উপাদান আর বিবর্ত্ত উপাদান।

"সতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিকারইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিবর্ত্তইত্যুদাহৃতঃ।"

স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিকারী বা পরিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডের পরিণামে ঘট হয়, দুগ্ধের পরিণামে দধি হয়, আর এই প্রকার স্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কারণেতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা বিবর্ত্ত উপাদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা যদি ঈশ্বরকে এইরূপ বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলেন, তবে তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু এই বক্তব্য থাকে, যে তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলা কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। তাহাদিগের প্রতি আমাদের স্থূল জিজ্ঞাস্য এই, যে পরমাত্মা এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন কি ইহা হইতে পৃথক আছেন? তাঁহারা ইহা বলিতে কখনই সাহসী হয়েন না, যে পরমাত্মা এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও এই অভিপ্রায় যে তিনি (ঈশ্বর) ইহা হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্তই আছেন। তবে তাঁহারা কেবল বিবর্ত্ত উপাদান প্রভৃতি শব্দেতে আচ্ছন্ন হইয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন মাত্র, তাহাতে সত্যের জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইলে আর সে আচ্ছন্নতা থাকে না। এই সত্য, যে তিনি এই মহৎ বিস্তীর্ণ পরম সুন্দর জগৎ-কৌশল রচনার নিমিত্তে আপনার নির্ব্বিকার স্বরূপকে বিকৃত না করিয়া কেবল আপনার সংকল্প মাত্রে তাহার উপাদান কারণ জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি

সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জগতের একমাত্র নিমিত্ত কারণ, ইহার উপাদান কারণ তিনি স্বয়ং কদাপি নহেন।

বাস্তবিক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা যেমন পরমাত্মার পরিণাম স্বীকার করেন না, তদ্রূপ এই জগৎ যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই জগৎ-কৌশলকে এক মহা ভ্রম-দৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মতে এই জগতে একটি মাত্র বস্তু আছেন, তিনি পরমাত্মা ; তদ্ভিন্ন সৃষ্ট কি নিত্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই ; তবে যে এই সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই এক বস্তুতে এই সকল অবস্তুর ভ্রম হইতেছে। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, যে রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম দ্বিতীয় এক পুরুষের হয়, সেই বস্তুতে অবস্তুর ভ্রম কাহার হইতেছে? এক বস্তু মাত্র পরমাত্মা আছেন, সৃষ্ট কি নিত্য যদি আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, তবে বলিতে হইবে, যে সেই পরমাত্মারই এই জগৎরূপে ভ্রম হইতেছে এবং তিনি এই মহাভ্রমে ভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ পাইতেছেন ইহা হইতে যুক্তিহীন কথা আর কি আছে? অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদিগের যুক্তির এই দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে এক জড় উপাধি শব্দ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে তপ্ত লৌহ যেমন অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্য বিশিষ্ট যে জড় উপাধি, সেই এই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই এই নানাবিধ সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে তাঁহাদিগের এ উপাধিশব্দ কল্পনা করা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জগৎকে নিরাশ করিতে কল্পিত উপাধির কি ক্ষমতা? তাঁহারা জড় উপাধিকে লৌহপিণ্ডের সহিত আর ব্রহ্ম চৈতন্যকে অগ্নির সহিত দৃষ্টান্ত দেন। তাঁহারা এই বৃথা দৃষ্টান্ত দ্বারাও আপনাদিগের মত রক্ষা করিতে পারেন না। যেহেতু যেমন বাস্তবিক লৌহপিণ্ড কোন প্রকারেই কিছু দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সেই লৌহপিণ্ডেতে যে অগ্নি আছে, সেই কেবল অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে ;

তদ্রূপ কল্পিত উপাধি যে জড়বস্তু, তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না কিন্তু তাহাতে যদি চৈতন্য উপহিত থাকে তবে তাহারই সত্য কি মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে এবং সুখ দুঃখের ভোক্তা তিনিই হইতে পারেন। জড় বস্তুর সত্যাসত্যের জ্ঞান, সুখ-দুঃখের অনুভব কি প্রকারে হইবে? অগ্নি লৌহ-পিণ্ডেতেই থাকুক, কিংবা সে পৃথকই থাকুক, যাহা কিছু দগ্ধ হইবে, তাহা অগ্নি দ্বারাই হইবে, আর চৈতন্য কোন উপাধিতে উপহিত থাকুক বা পৃথক্‌ই থাকুক, যাহা কিছু জ্ঞাত ও অনুভূত হইবে, তাহা চৈতন্য দ্বারাই হইবে। যদি কেহ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া বিকৃত হইয়া বন্ধুকে শত্রুরূপে আর শত্রুকে বন্ধুরূপে বিপরীত দর্শন করে, তবে সেই উপাধি যে মাদক দ্রব্য, তাহাকে যেমন বিপরীতদর্শী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু সেই মদোন্মত্ত ব্যক্তিকেই বিপরীতদর্শী বলি; তদ্রূপ জড় উপাধিকে ভ্রমের বিজ্ঞাতা বলা যুক্তি যুক্ত হয় না; কিন্তু অদ্বৈতবাদি-দিগের যুক্তি অনুযায়ী তাহাতে উপহিত যে ব্রহ্মচৈতন্য, তাহাকেই ভ্রমের বিজ্ঞাতা এবং তাহাকেই সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা বলিতে হয়। দেখ, তাঁহাদিগের (অদ্বৈতবাদিদিগের) মিথ্যা যুক্তি অবলম্বন করিলে কত অনর্থ উপস্থিত হয়; নির্ব্বিকার নিরবয়বকে বিকৃত মানিতে হয়, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎকে ভ্রান্ত বলিতে হয়, পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, অমৃত স্বরূপকে সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা করিতে হয়।

সৃষ্টি নিরাস করিবার মানসে যে সকল অদ্বৈতবাদিরা জড় উপাধির কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহাদিগের এই জড় উপাধি নিত্য বস্তু না সৃষ্ট বস্তু? যদি তাঁহারা ইহাকে নিত্য বস্তু বলেন, তবে তাঁহারা এই জগতে কেবল এক মাত্র বস্তু স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে উপাধি কল্পনা করেন, তাহা একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়; আর যদি তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলেন, তবে মিথ্যা এক উপাধি শব্দ কল্পনা করিয়া তাহাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া মানিবার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সৃষ্টি মানিয়া সত্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

পরমাত্মা যিনি, তিনি বিকার বিহীন ; তিনি স্ব স্বরূপেতই নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন ; তিনি আপনি অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই ; তিনি এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সংকল্প করিলেন, আর এই অপূর্ব্ব জগৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইল ; তাঁহারই (ঈশ্বরের) ইচ্ছামতে অদ্যাপি এই জগৎ প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে ; এবং তিনি (ঈশ্বর) যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই ইহা অদৃশ্য হইবে, কণামাত্র ইহার চিহ্ন থাকিবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভিন্নতা বলিলে কি বুঝায় ?

সত্যস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, বিচিত্র শক্তিমান, একমাত্র ঈশ্বর নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন ; তিনি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাত্মা নিত্য বস্তু এবং জীবাত্মা সকল তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু। পরমাত্মা পরিপূর্ণ, জীবাত্মা অপূর্ণ, পরমাত্মাতে কোন বিকার নাই, জীবাত্মা বিকার্য্য ; জীবাত্মা কখন অজ্ঞ, কখন বিজ্ঞ, কখন শুদ্ধ, কখন অশুদ্ধ, কিন্তু পরমাত্মা যিনি, তিনি, সর্ব্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব , জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে এত ভিন্ন; তথাপি অনেকে বিশেষ প্রণিধান না করিয়া বলেন, যে পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) এবং জীবাত্মাতে কোন ভেদ নাই। তাঁহারা মনে করেন, যে পৃথিবী হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তাহারা যেমন পৃথিবী স্বরূপ, পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ পরমাত্মা (ঈশ্বর) হইতে এই যে সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও পরমাত্মাস্বরূপ, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বৃথা দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কদাপি পরমাত্মা আর জীবাত্মার স্বরূপের ঐক্য করিতে পারেন না। পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়া আর পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট হওয়া অনেক বিশেষ। পৃথিবী অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ ; পরমাত্মা একমাত্র অংশবিহীন ; পৃথিবী হইতে তাহার অংশ অণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে, সুতরাং বৃক্ষের পরমাণুতে আর পৃথিবীর পরমাণুতে কোন বিশেষ

নাই ; অতএব বৃক্ষকে পৃথিবীর স্বরূপ বলা যায়, এবং তাহার এক অংশও বলা যায় ; কিন্তু পরমাত্মা (ঈশ্বর) পৃথিবীর ন্যায় পরমাণুপুঞ্জ নহেন, অংশ-যুক্ত নহেন, খণ্ডনশীল নহেন, কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) অংশবিহীন এবং অখণ্ডনীয় ; তাঁহার কোন অংশ তাঁহা হইতে পরিচ্যুত হইয়া অন্য কোন বস্তু হয় নাই যে সেই বস্তুকে তাঁহার স্বরূপ বা অংশ বলা যাইতে পারে। পৃথিবী হইতে যে সকল বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরমাণু সকল যেমন পৃথিবীর অংশ ছিল, সেই প্রকারে জীবাত্মা সকল যদি পরমাত্মার অংশ হইত—যেমন পার্থিব পরমাণু সকলের সমষ্টিকে পৃথিবী বলা যায় তদ্রূপ যদি জীবাত্মা সকলের সমষ্টিকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারিত, তবে যেমন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ সকলকে পৃথিবীর স্বরূপ করিয়া বলা যায় ; তদ্রূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীবাত্মা সকলকেও সেই পরমাত্মার স্বরূপ করিয়া বলা যাইত। কিন্তু পরমাত্মা কদাপি জীবাত্মা সকলের সমষ্টি নহেন ; যদি পরমাত্মাকে কেবল জীবাত্মা সকলের সমষ্টি করিয়া বলা যায়, তবে জীবাত্মা সকল ভিন্ন আর পরমাত্মা নাই এই বলা হয়। যেমন পার্থিব পরমাণুপুঞ্জকে পৃথিবী বলা যায়, তেমনি যদি জীবাত্মাপুঞ্জকেই কেবল পরমাত্মারূপে স্বীকার করা যায়, তবে পার্থিব পরমাণু ভিন্ন যেমন পৃথিবীর পৃথক সত্তা নাই তদ্রূপ জীবাত্মা সকল ভিন্ন যে আর পরমাত্মার পৃথক সত্তা নাই, এই বলা হয়। এই সত্য সর্ব্বদা মনে প্রদীপ্ত রাখা কর্ত্তব্য, যে অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তুও কখন অনেক হইতে পারে না।' অনেক বস্তুকে আমরা এক করিয়া মনেতে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এই কল্পনার জন্য অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না। অনেক বৃক্ষকে আমরা এক বন বলিয়া কল্পনা করি, অনেক যোদ্ধাকে আমরা সেনা বলিয়া কল্পনা করি, কিন্তু এ জন্য সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা কখন এক হয় না, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ই থাকে। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রাণী প্রভৃতিকে আমরা এক জগৎ বলিয়া কল্পনা করি, তজ্জন্য তাহারা কখন এক হয় না কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ই থাকে। অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এই পৃথিবীকে একমাত্র [বস্তুরূপে

ভাবিয়া এবং তাহা হইতে নানাবিধ বৃক্ষাদি সকল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া মনে করি, যে এক বস্তু সেই নানা হইতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী এক বস্তু নহে ; সে অনেক পরমাণুর সমষ্টি এবং সেই পরমাণুসকল নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা আকারে অবস্থিতি করিতেছে। যদি পৃথিবী অংশবিহীন অখণ্ডনীয় এক বস্তু হইত, তবে তাহা আর কখন দুই হইতে পারিত না এবং অন্য সকল বস্তুরূপেও পরিণত হইতে পারিত না। পরমাত্মা স্বরূপতঃ একমাত্র, অংশবিহীন সুতরাং তিনি কখন দুই হয়েন না, তবে এই অসংখ্য জীবাত্মা সকলকে তাঁহার অংশ বলা এবং জীবাত্মা সকলের সহিত তাঁহার কোন ভেদ নাই বলা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই সকল জীব কি জড় কদাপি তাঁহার (ঈশ্বরের) অংশ নহে, কদাপি তাঁহার স্বরূপ নহে ; তিনি আপনি জড়রূপে পরিণত হইয়া আপনাকে ধ্বংসও করেন নাই এবং জীবরূপে বিকৃত হইয়া শোক মোহ পাপ তাপে বদ্ধও হয়েন নাই, তিনি নিত্য স্বস্বরূপেতেই অবস্থিতি করিয়া এই অচিন্ত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। হীরকখণ্ড সম্মুখে দেখিয়াও যদি তাহা ছাড়িয়া একটি কাচখণ্ড লইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, তবে তাহা যেমন হীরকের দোষ নহে, তদ্রূপ যাহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভিন্নতা অস্বীকার করে তাহা তাহাদের মনেরই মোহ বা ভ্রান্তির ফল।

প্রকৃতিবাদ খণ্ডন।

যাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ-মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এক শ্রেণীর দার্শনিকের নিকট শুনিয়াছেন এবং শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন যে লোকে যাহাকে জড় বলে তাহা ছাড়াও এক জড়বস্তু আছে যাহা প্রত্যক্ষ গোচর নহে, অথচ নিশ্চয়ই আছে। যে জড়বস্তু যখন প্রত্যক্ষ গোচর নহে, তখন প্রত্যক্ষ গোচর জড়বস্তুর জ্ঞানাধীনতা দেখাইবার জন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হয়, সে সকল যুক্তি সেই বস্তু সম্বন্ধে খাটে না, সে

সকল যুক্তি সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত জড়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারে না। এই পুস্তকের যে সকল পাঠক এই দার্শনিক মতে সায় দেন, তাঁহাদের অনুরোধে আমরা এই দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে, যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বটে, কিন্তু তাহাদের আঁধার ও কারণরূপী একটি অচেতন বস্তু আছে যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত। এই মতকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) বলা হয়। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন যে জড়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে ইহার প্রকৃতত্বই স্বীকার করা হইল না। ইঁহারা জড়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন এবং এই অর্থে জড়ের প্রকৃতত্ব স্বীকার করেন বলিয়া আপনাদিগকে প্রকৃতবাদী (Realists) বলেন। জড় এবং আত্মাকে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করেন বলিয়া এই মতাবলম্বীদিগকে জড়াত্মবাদী (Natural Dualists) ও বলা হয়। লৌকিক প্রকৃতিবাদ,—যাহা ইন্দ্রিয় গোচর গুণসমূহকে আত্মা নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করে;—তাহা হইতে এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদ অতিশয় ভিন্ন। যাহা হউক, আমরা এই দার্শনিক প্রকৃতিবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আমাদের লক্ষ্য অধ্যাত্মবাদের পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রকৃতিবাদের অনুমিত জড়বস্তুর আধারত্ব সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জড়ীয় গুণসমূহকে যখন বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন কোন অচেতন বস্তুকে ইহাদের আধার বলা একান্তই অসঙ্গত। বিজ্ঞানের আধার কেবল জ্ঞানই হইতে পারে। জড় অচেতন, জ্ঞানশূন্য; এরূপ বস্তু কখনও বিজ্ঞানের আধার হইতে পারে না,—কখনও জ্ঞানসাপেক্ষ বিষয়ের ধারয়িতা হইতে পারেন না।

এখন দেখা যাক্ এই প্রকৃতিরূপী জড়বস্তুকে অনুভবের কারণরূপে স্বীকার করা যায় কি না। আমরা আরো একটু বিশেষভাবে প্রকৃতিবাদের ব্যাখ্যা করিয়া তৎপরে ইহার সমালোচনা করিব। সম্মুখস্থিত

টেবল্‌টিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। টেবল্‌টি বিস্তৃতি, বর্ণ, মসৃণতা, কঠিনতা প্রকৃতি গুণাক্রান্ত। আমরা দেখিয়াছি যে এই সমস্তই বিজ্ঞান; জ্ঞানময় আত্মার উপর এই সমুদায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আধুনিক প্রকৃতিবাদী দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু স্বীকার করিয়াও বলেন এই সমুদয় প্রত্যক্ষ গোচর বিজ্ঞানের এক একটি অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে, সেই কারণগুলিই প্রকৃত জড়ীয়গুণ বা উপকরণ এবং সেই সকল গুণ বা উপকরণের সমষ্টিই প্রকৃত জড়বস্তু; অর্থাৎ যে বিস্তৃতি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয়, দর্শন বা স্পর্শ করিতে গিয়া আমরা যে বিস্তৃতিকে জানি, তাহা আবির্ভাব মাত্র বটে, তাহার অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এই আবির্ভাব উৎপাদনের কারণ একটি অপ্রত্যক্ষ বিস্তৃতি গুণ আছে। তেমনি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর বর্ণের কারণরূপী একটি অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অদৃশ্যবর্ণ আছে। আমাদের অনুভূত কঠিনতার কারণরূপী একটি অননুভূয় কঠিনতা আছে; এবং এই সমুদয় গুণের সমষ্টি একটি ইন্দ্রিয়াতীত জড় বস্তু আছে। প্রকৃতিবাদ যে কি অসঙ্গত মত, এখান হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। অপ্রত্যক্ষ বিস্তৃতি, অদৃশ্যবর্ণ, অননুভূয় কঠিনতা,—পাঠক এই সমস্ত অসঙ্গত অর্থহীন বিষয়ের কি কোন ধারণা করিতে পারিতেছেন? আর জিজ্ঞাস্য এই, এই সকল জড়ীয় গুণ যদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতীতই হইল, তবে এই সমুদয়ের পার্থক্য কোথায়? এই সমুদায়কে পৃথক্ পৃথক্ বল কেন? প্রত্যক্ষগোচর বিষয় সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বর্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আঘ্রাত হয় না। কঠিনতা অনুভূত হয়, কিন্তু দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বর্ণ ও কঠিনতা স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু যে বর্ণ দেখা যায় না এবং যে কঠিনতা অনুভব করা যায় না, সে বর্ণ আর সে কঠিনতায় পার্থক্য কোথায়? এবং সে বর্ণ এবং কঠিনতাকে "বর্ণ" এবং "কঠিনতা" এই দুইটা পৃথক্ নাম দিবারই বা প্রয়োজন কি? পার্থক্য কেবল কার্য্যে দেখিতে পাই, কারণে পার্থক্য কোথায়? কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন

হইলেই কি কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে? এক ব্যক্তিই যখন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে, তখন একটি জড়বস্তু কেন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে পারিবে না? সুতরাং প্রকৃতিবাদের পক্ষে সমস্ত অনুভবের একটিমাত্র জড়ীয় কারণ স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়; এবং এই জড়ীয় কারণকে কেবল এই অর্থেই বহুগুণশালী বলা যায় যে ইহা ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ। এই কারণকে জড় বলাতে পাঠক এরূপ বুঝিবেন না যে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর জড়ে যেরূপ বর্ণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি বৈচিত্র্য আছে, ইহাতেও তেমনি বৈচিত্র্য আছে। আমরা এই মাত্র দেখাইলাম যে যাহা অপ্রত্যক্ষ, অদৃশ্য, অননুভূয়, তাহাতে এই বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। এই কারণকে কেবল এই অর্থেই জড় বলা হয় যে ইহা চৈতন্যহীন, অজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতিবাদী এই জড়ীয় কারণের বিষয় এই পর্যান্ত জানেন যে ইহা একদিকে অচেতন, জ্ঞানবিহীন, অপরদিকে শক্তিশালী অর্থাৎ বিজ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম। এই দুইটী লক্ষণ ব্যতীত ইহার বিষয় আর কিছুই জানা নাই, এবং জানা যায় না; অন্যান্য বিষয়ে ইহা অজ্ঞেয়। জড়ীয় কারণের এই অজ্ঞেয়তা দেখিয়াই অনেক প্রকৃতিবাদী "অজ্ঞেয়তাবাদী" (Agnostics) নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে আমরা উপরে জড়ীয় কারণের যে বর্ণনা দিলাম তাহা আমাদের মনঃকল্পিত নহে। উক্ত বর্ণনা উচ্চতর প্রকৃতিবাদীদিগের অনুমোদিত। (See Spencer's Principles of Psychology, Part VII, (Vol II) and Green's criticism of this part in the first Volume of his works.)

(১) যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, যাহা প্রত্যক্ষরূপে জানা যায় কেবল তাহাই বা তদনুরূপ বস্তুই পরোক্ষ জ্ঞান বা অনুমানের বিষয় হইতে পারে। যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অনুভব করিয়াছি বা আত্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বা তদনুরূপ বস্তু এক সময় সাক্ষাৎ ভাবে না জানিলেও অন্যের সাক্ষ্যে বা অনুমান দ্বারা তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারি। আত্মজ্যোতিতে যখন আপনাকে জানিয়াছি, তখন অন্য আত্মার

সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইলেও অন্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি বা অনুমান দ্বারা জানিতে পারি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ যখন একবার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তখন ইহারা এক সময় প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও নিজের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের বিষয়রূপে বা অন্য আত্মার বিষয়রূপে ইহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি। দৃষ্টি বা দৃষ্ট বস্তুর আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন বৈজ্ঞানিকেরা এমন সূক্ষ্ম বস্তুর (ইথারের) আন্দোলন কল্পনা বা অনুমান করেন যাহা আমাদের পক্ষে দৃশ্যও নহে, স্পৃশ্যও নহে, তখনও তাঁহারা যুক্তির বাহিরে যান না, কেননা এই অনুমিত আন্দোলন দৃশ্য বা স্পৃশ্য আন্দোলনের আদর্শেই কল্পিত; উহা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় গোচর না হইলেও কোন সূক্ষ্মতর অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞাতার পক্ষে অনুভবনীয়। কিন্তু যাহা আদৌ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই, এবং হইতে পারে না, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, যাহা জ্ঞাতা নয়, জানাও নয়, বিষয়ী নয়, বিষয়ও নয়, তাহা কখনও পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহা কখনও অনুমানের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতি-বাদের কল্পিত অজ্ঞেয় জড়বস্তু এই শ্রেণীর বস্তু, সুতরাং ইহার অস্তিত্ব কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইবার নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেব, দানব, যক্ষ, শয়তান, প্রভৃতি বিষয়, যাহাদের অস্তিত্ব অভাবনীয় নহে, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেই সকল বস্তুর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও, এমন কি পরমাত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াও, লোকে অবশেষে এই দার্শনিক শয়তানে বিশ্বাস করে। অজ্ঞানী লোকের নিতান্ত অমূলক কুসংস্কার অপেক্ষা জ্ঞানাভিমানীদিগের এই সংস্কার অধিকতর নিন্দনীয়।

(২) প্রকৃতিবাদীরা যদি এই অজ্ঞেয় জড়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তবে ইহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মান কঠিন হইত, হয়ত অসম্ভব হইত; কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া এক মুখেই

ইহাকে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় দুইই বলেন। ইহা অজ্ঞেয় অথচ বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ। যাহা বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ তাহার অন্ততঃ একটি গুণ স্পষ্টই জানা যাইতেছে, সুতরাং সে আর অজ্ঞেয় হইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ নিতান্তই চাই। কার্য্য মাত্রেরই কারণ চাই; বিজ্ঞানোৎপত্তির যখন একটা কার্য্য, একটা ঘটনা, তখন ইহার কারণ চাই, সন্দেহ নাই। আর কারণটা স্থায়ী বস্তু হওয়া চাই। অস্থায়ী ঘটনার স্থায়ী কারণ না পাইলে জ্ঞান তৃপ্ত হয় না। এই কারণেই যখন প্রকৃতি-বাদী বলেন যে বিজ্ঞানের কারণরূপী একটা জ্ঞানাতীত অচেতন স্থায়ী বস্তু আছে, তখন লোকে তাঁহাকে সহজেই বিশ্বাস করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হাতের কাছে কারণ থাকিতে দূরে যাও কেন? আত্মা স্বয়ংই বিজ্ঞানোৎ-পত্তির যথেষ্ট কারণ নয় কি? আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভব করিতেছে, ব্যাপারটাত এই; ইহার জন্য একটা অজ্ঞেয় অভাবনীয় অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কি প্রয়োজন? বিজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে কি কি আবশ্যক? বিজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে জ্ঞানরূপী আত্মার একান্তই প্রয়োজন, এই আত্মা ত আছেই। একটি স্থায়ী বস্তুর প্রয়োজন, যাহা পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকে, যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই বস্তুও আছে; আত্মাই সেই স্থায়ী বস্তু যাহা সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকে, এবং যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ঘটে। আর কি কিছুর প্রয়োজন আছে? পাঠক হয়ত বলিবেন বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপী একটি কর্তৃত্বশালী বস্তুর প্রয়োজন? আমরা তাহা স্বীকার করি কিন্তু আমরা বলি, আত্মা স্বয়ংই ত সেই কর্তৃত্বশালী বস্তু, আবার আর একটা কর্তৃত্বশালী বস্তু কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আত্মা নিজের কর্তৃত্বে নিজে বিজ্ঞান উৎপাদন করিতেছে, নিজে বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিলেই ত হয়, আবার একটা অতিরিক্ত কর্ত্তা ভাবিবার প্রয়োজন কি? এ স্থলে হয়ত প্রতিপক্ষ বলিবেন যে আমরা তো আর ইচ্ছাপূর্ব্বক বিজ্ঞান উৎপাদন করি না, আমাদিগকে কিরূপে

বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিব ? তবে কি প্রতিপক্ষ স্বীকার করিতেছেন যে কারণ হইতে গেলে, কর্ত্তা হইতে গেলে, ইচ্ছাশালী হওয়া চাই ? যদি তাহা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ গেল, প্রকৃতিবাদ গেল, বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ যদি ইচ্ছাশালী হইলেন তবে তিনি অজ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞান প্রকৃতিও নহেন,—তিনি জ্ঞেয় জ্ঞানবান পুরুষ। যদি বলেন কারণ হইতে গেলে ইচ্ছার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা ব্যতীতও কর্তৃত্ব থাকিতে পারে ; তবে সেই কর্তৃত্ব আত্মাতে আরোপ করিলেই হয়, একটা অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় অনাত্ম বস্তুতে আরোপ করিবার প্রয়োজন কি ? আমরা কিছু এই কথা বলিতেছি না যে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা স্পষ্টতঃই বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ নহে। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাতেই কিছু আত্মার আত্মত্ব পর্য্যবসিত হইতেছে না। আত্মাতে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে। আমাদের জীবনের সারভূত যে জ্ঞানবস্তু, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে; এই জ্ঞানবস্তু আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ইন্দ্রিয়বোধ, স্মৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের জীবন লীলা রচনা করিতেছে ; আমরা এখন পাঠককে কেবল এই কথাটি বুঝাইতে চাই যে বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ঘটনা উৎপাদনের জন্য আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তু কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিবাদী তাঁহার কল্পিত কারণে যে যে লক্ষণ চান, সে সমস্তই আমাদের জীবনের সাররূপী জ্ঞানবস্তুতে আছে। তিনি চান যে বিজ্ঞানের কারণ স্থায়ী বস্তু হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হইবে। আমাদের জীবনের সারভূত জ্ঞানবস্তুর এই উভয় গুণই আছে; সুতরাং বিজ্ঞানোৎপত্তির কর্তৃত্ব বা কারণত্ব ইহাতে আরোপ না করিয়া একটা অজ্ঞেয়, অভাবনীয়, অচেতন বস্তুতে আরোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

(৩) এই জড়শক্তির কল্পনা যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, ইহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই কল্পিত শক্তিতে বিজ্ঞানোৎপত্তির কোন

ব্যাখ্যাই হয় না। যদ্দ্বারা কার্য্যের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়, তাহাই কার্য্যের প্রকৃত কারণ। যাহা কার্য্যকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহাকে কারণ বলা যাইতে পারে না। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে প্রকৃতিবাদের কল্পিত এই জড়ীয় কারণ বিজ্ঞানোৎপত্তির কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে না। প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানকে আত্মাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়াও ইহাকে প্রকারান্তরে আত্মা হইতে পৃথক্ বিষয় বলিয়া কল্পনা করে। তাহাতেই ইহা আত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞানোৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আত্মা এবং বিজ্ঞানকে পৃথক্ মনে করাতেই, বিজ্ঞানকে একটা আত্ম-নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়া কল্পনা করাতেই, ইহা বিশ্বাস করে যে একটা অচেতন অনাত্ম বস্তু দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আত্মাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান কিছুই নহে। বিজ্ঞান—আমি জানি; "আমি"কে ছাড়িয়া "বিজ্ঞান" অর্থহীন কিছুই নহে; "কেবল বিজ্ঞান" বলিয়া কোন বিষয় নাই; সুতরাং "কেবল বিজ্ঞানের" কারণ কোন বস্তু থাকিতে পারে না,—এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা কেবল বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করে। কেবল সেই বস্তুই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম যাহা আত্মাকে ব্যাখ্যা করিতে পারে। প্রকৃতিবাদের কল্পিত জড়শক্তি প্রকৃতিবাদীর মতেই আত্মার ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, সুতরাং ইহা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতেও অক্ষম; অতএব উহা কখনও বিজ্ঞানের কারণ নহে।

(৪) বিজ্ঞানের কারণ কেবল তাহাই হইতে পারে যাহা আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আত্মার ভিতরে বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে কেবল সেই যে আত্মার ভিতরে আছে অথবা যাহার ভিতরে আত্মা আছে,—আত্মা যাহার আয়ত্তাধীন। কিন্তু প্রকৃতিবাদের কল্পিত জড়শক্তি প্রকৃতিবাদীদের মতেই আত্মার বাহিরের বস্তু। আত্মার ভিতরকার বস্তু হইতে গেলেই ইহাকে হয় জ্ঞাতা অথবা জ্ঞাতার আশ্রিত কোন বিষয় হইতে হইবে; সুতরাং প্রকৃতিবাদীরা ইহাকে সাবধানে আত্মার বাহিরে

রাখেন। কিন্তু আত্মার বাহিরে থাকাই যাহার প্রকৃতি, সে বাহিরে থাকিয়াও আবার আত্মার ভিতরে বিজ্ঞান জন্মায়, আত্মাকে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-যুক্ত করে, ইহার অপেক্ষা অধিকতর অসঙ্গত কথা আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা বাহিরের বস্তু তাহা ভিতরে কার্য্য করিতে পারে না, আর যাহা ভিতরে কার্য্য করে তাহা বাহিরের বস্তু হইতে পারে না। যাহা সম্পূর্ণরূপে বাহিরের বস্তু তাহাই আবার ভিতরে কার্য্য করে এই কথা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী। এরূপ স্ববিরোধী অসঙ্গত কথা দার্শনিক সত্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উচ্চ গভীর জ্ঞানের কথা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভাবিলে সময়ে সময়ে কিছু ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,—অন্ধের নেতা অন্ধ জ্ঞানাভিমানীদিগকে কিছু কটূক্তি করিতে ইচ্ছা হয়।

(৫) প্রকৃতিবাদী "কারণ" কথাটার অর্থ একবারেই ভুলিয়া যান, তাহাতেই একটা অজ্ঞেয় বস্তুতে কারণত্ব আরোপ করিতে যান। জ্ঞেয় বস্তু-দিগের পরস্পরের একটা সম্বন্ধকে আমরা কারণত্ব বলি। কারণত্বের জ্ঞান জ্ঞান রাজ্যেই হয়। কিন্তু প্রকৃতিবাদী "কারণ" কথাটা জ্ঞান-জগতে শিক্ষা করিয়া ক্রমে ইহার অর্থ ভুলিয়া যান; ভুলিয়া গিয়া জ্ঞেয় বস্তু ও অজ্ঞেয় বস্তুর একটা কল্পিত সম্বন্ধকে এই নামে অভিহিত করেন। আমরা এই কথাটা একটু বিশেষভাবে বুঝাইতেছি। "কারণের" বৈজ্ঞানিক অর্থ—"যাহার পর কার্য্যটা নিয়ত ঘটে," অথবা সংক্ষেপে (এই সংক্ষিপ্ত নামে কিছু ভুল আছে)—"নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী"। অগ্নি সংস্পর্শে দহন কার্য্য নিয়ত ঘটে, সেইজন্য অগ্নি-সংস্পর্শ দহন কার্য্যের বৈজ্ঞানিক কারণ। দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোক সংস্পর্শ হইলে বর্ণবোধ নিয়তই ঘটে, সেইজন্য আলোক বর্ণবোধের কারণ। স্পর্শেন্দ্রিয়ে উত্তাপ নামক ঐথারিক আন্দোলন সংস্পর্শে উষ্ণতাবোধ নিয়তই ঘটে, সেইজন্য উত্তাপ উষ্ণতা-বোধের কারণ। পুষ্পাদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর রেণু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সংস্পৃষ্ট হইলে ঘ্রাণবোধ নিয়তই ঘটে, সেইজন্য এই সকল রেণু ঘ্রাণের কারণ।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে নিয়তই জল উৎপন্ন হয়, এইজন্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ জলের কারণ। "কারণের" এই এক অর্থ। এই বৈজ্ঞানিক কারণবাদ অনুসারে কার্য্যের কারণ যাহা তাহাও কার্য্য। এক কার্য্য বা কতিপয় কার্য্য অপর কার্য্যের কারণ; এই সমুদয় কার্য্যই বিজ্ঞান-নিচয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন কার্য্য আমরা জানি না, কল্পনা করিতেও পারি না। কোন জানা কার্য্যের কারণরূপী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-নিচয় আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইতে পারে, কিন্তু ইহার বা ইহাদের প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে ইহা বা ইহারা কোন লোকাতীত জ্ঞানের বিষয়ীভূত। যে সকল ঐথারিক আন্দোলন বর্ণ ও উষ্ণতা বোধের কারণ, সে সমুদয় এক একটি বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র। সেই সকল বিজ্ঞান-প্রবাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাদের আধাররূপী কোন লোকাতীত জ্ঞানে বিশ্বাস করিতে হইবে। ঘ্রাণের কারণ যে পুষ্পরেণু প্রভৃতি ইহারা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইলেও দৃশ্য বা স্পৃশ্য বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাদের আধাররূপী কোন লোকাতীত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। তেমনি আস্বাদের কারণরূপী যে ভক্ষ্য বস্তুর সূক্ষ্মাংশ সমূহ, এবং শব্দের কারণরূপী যে বায়ুর আন্দোলন, এই সমুদায় আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ইহারা দৃশ্য বা স্পৃশ্য বিষয়, সুতরাং কোন লোকাতীত জ্ঞানের আশ্রিত। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে, এই বৈজ্ঞানিক কারণবাদ আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে লইয়া যায় না। ইহা বিজ্ঞানের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করে, সে সমুদায়ও বিজ্ঞানমাত্র, সুতরাং জ্ঞানেরই বিষয়। বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণত্ব এমন একটা সম্বন্ধ যাহা কেবল জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিজ্ঞান সমূহের পরস্পরের মধ্যেই থাটে। এই সম্বন্ধ একটা নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও পরবর্ত্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন ঘটনা বা ঘটনাবলীর পরে নিয়তই যে ঘটনা ঘটে, তাহাই উক্ত ঘটনা

বা ঘটনাবলীর কার্য্য; আর কার্য্যটি যে ঘটনা বা ঘটনাবলীর পরে নিয়তই ঘটে, সেই ঘটনা বা ঘটনাবলীই কার্য্যটির কারণ। "কারণের" এই অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টতঃই কোন জ্ঞানাতীত অজ্ঞেয় অভাবনীয় বস্তু বিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। জ্ঞান-জগতে আমরা আর এক প্রকার কারণত্ব দেখিতে পাই, উহাকে দার্শনিক কারণত্ব বলা যায়। সে কারণত্বও আমাদিগকে জ্ঞান-জগতের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না; সে কারণত্বও এমন একটা সম্বন্ধ যাহা কেবল জ্ঞাত বস্তুসমূহের মধ্যেই থাকে। আমরা দেখিতেছি আত্মা স্থায়ীভাবে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, নিজের সংযোগকারী শক্তিতে এই সমুদায় বিজ্ঞানকে সমষ্টিভূত করিয়া বিবিধ তত্ত্ব গঠন করিতেছে, এবং বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এ স্থলে আত্মা ও এই সমুদায় কার্য্যের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আত্মা এই সমুদায় কার্য্যের কারণ; কারণ এই অর্থে যে এই সমুদয় কার্য্য উৎপন্ন হইবার পক্ষে আত্মার অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। কিন্তু এ স্থলেও কার্য্যকারণত্বের সম্বন্ধ জ্ঞেয় বস্তু সমূহের মধ্যেই বর্ত্তমান; কার্য্য-গুলি জ্ঞেয়, কারণও জ্ঞেয়। এ স্থলেও কারণত্ব আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইতেছে না, কোন জ্ঞান-নিরপেক্ষ অজ্ঞেয় বস্তুর সংবাদ আনিতেছে না। বরং এখানে কারণ যে, সে স্বয়ং জ্ঞানবস্তু—সমুদায় জ্ঞানের মূল তাহাকে না জানিয়া আর কিছুই জানা যায় না, আর তাহার সমস্ত কার্য্যই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আত্মা রূপরসাদি বিজ্ঞান অনুভবই করুক, কোন তত্ত্ব মীমাংসাই করুক, আর কোন কার্য্যই করুক, সমস্তই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া করে, এবং জ্ঞানবান বলিয়াই করে; জ্ঞানবান না হইলে এই সমুদায় কিছুই করিতে পারিত না; ইহার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে। "কর্ত্তৃত্ব" ব্যাপারটা বুঝিতে গেলেই দেখি ইহা অপরি-হার্য্যরূপে জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে; জ্ঞাতৃত্ব ছাড়িয়া কর্ত্তৃত্ব অর্থহীন, অসম্ভব; সুতরাং যাহার জ্ঞাতৃত্ব নাই, যাহা জ্ঞানবান্ নয়, তাহা কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতিবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের ভ্রম আমরা

পরিষ্কাররূপেই দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানের কারণরূপে যে এক অজ্ঞেয় অচেতন বস্তু কল্পনা করে তাহার কারণত্ব কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহা "নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীর" অর্থে কারণ হইতে পারে না, কেননা সেরূপ কারণ জ্ঞানের ভিতর, এবং তাহার আবার কারণ চাই। আত্মা যে অর্থে মানসিক অবস্থা নিচয়ের কারণ বা কর্ত্তা, সে অর্থেও তাহা কারণ হইতে পারে না, কেননা সেরূপ কারণত্ব জ্ঞাতৃত্বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রকৃতিবাদের কল্পিত অজ্ঞেয় কারণের কোন কারণত্বই নাই, উহা একটা কারণত্বহীন কারণ, অজ্ঞেয় জানা বস্তু, একটা সোণার পাথরের বাটী, একটা স্ববিরোধী কথার কথা মাত্র, উহা কিছুই নহে। আমরা আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত যতটুকু আলোচনা করিলাম তাহার সিদ্ধান্ত কি, পাঠক তাহা বুঝিয়া থাকিবেন। জ্ঞান—যাহা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের পরিচালক,--তাহা কিসের সাক্ষ্য দেয়? জ্ঞান কোন অজ্ঞান অজ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষ্য দেয় না, জ্ঞান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য দেয় —জ্ঞানরূপী আত্মবস্তুর—জ্ঞানবস্তুরই—সাক্ষ্য দেয়। এই জ্ঞানবস্তুর দুই দিক্, একদিক্ জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতারূপে জ্ঞাত, আর এক দিক কেবলই জানা। প্রথম দিক্‌কে বিষয়ী, দ্বিতীয় দিক্‌কে বিষয় বলা যায়। এই দুই দিক্‌কে ভেদ করা যায়, কিন্তু পৃথক করা যায় না। বিষয়কে লোকে বিষয়ী হইতে পৃথক্ করিতে যায়, কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বিষয়ী বিষয়ের অপরিহার্য্য আশ্রয়; বিষয়ী হইতে বিষয়কে পৃথক করিলে বিষয়ের কিছুই থাকে না। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা জ্ঞানের আশ্রিত বিষয়, জ্ঞানের আশ্রয় ভিন্ন ইহা থাকিতে পারে না। এই যে জ্ঞানের দুই দিক্, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুই দিকের এক দিক্‌কে আত্মা, অপর দিক্‌কে অনাত্মা বলিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আত্মা ও অনাত্মা একই অখণ্ড জ্ঞান বস্তুর দুইটি অচ্ছেদ্য দিক মাত্র; আসল খাঁটি বস্তু জ্ঞান,—আমরা ইহাকে অনেক স্থলে কেবল আত্মাই বলিয়াছি। ইহাকে আত্মা বলিলেই যথেষ্ট

হয়, কেননা আত্মা বলিলে বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উভয়ই বুঝায়। জ্ঞান এই আত্মবস্তুর—এই জ্ঞানবস্তুরই—পরিচয় দেয়, আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জানি তাহা এই জ্ঞান বস্তুরই অন্তর্গত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জানি না অথচ অনুমান দ্বারা বিশ্বাস করি, তাহাও জ্ঞানের অন্তর্গত, জ্ঞানবস্তুর বিষয়ীভূত বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে। পাঠক যদি বিশ্বাস করেন যে অনন্ত দেশে অনন্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, যদি বিশ্বাস করেন যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়াও জগৎ বিদ্যমান থাকে, তবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগতের আধাররূপী এক লোকাতীত জ্ঞান আছে। একই জ্ঞানবস্তু, একই পরমাত্মা, যে অনন্ত দেশ কালের আধাররূপে, এই বিচিত্র জগতের যাবতীয় বস্তুর আধাররূপে, বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং আমাদের প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি ও নিদ্রার সময়েও যে জগৎ এক নিত্য অনন্ত চিরজাগ্রত আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে, এই সকল কথা আমরা ক্রমে দর্শনের দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই পর্য্যন্ত আমরা এই মীমাংসায় উপনীত হইলাম যে জ্ঞানই জগতের আধার, জ্ঞানই জগতের কারণ, জ্ঞানকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে পারে না। আমরা এস্থলে প্রকৃতিবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত যে পাঁচটী কারণ দেখাইলাম তাহাতে পাঠকের পক্ষে প্রচুর সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কি ?

উপরি-উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে একটি সন্দেহ হয়ত কোন কোন পাঠকের থাকিয়া যাইতেছে ; এই স্তবকে আমরা এই সন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পাঠক বলিতে পারেন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সমুদায় বস্তুই জ্ঞানের আশ্রিত, ইহা যেন বুঝিলাম—বর্ণ, ঘ্রাণ, উষ্ণতা, কঠিনতা এই সমুদায় বিজ্ঞান মাত্র, ইহা যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই সকল বিজ্ঞান অনুভব করি, সে সকল

ইন্দ্রিয় কি জ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে? ইন্দ্রিয় থাকিলে ত ইন্দ্রিয় বোধ হইবে? ইহাতেই ত বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বিজ্ঞানের অন্যতর কারণরূপে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানসাপেক্ষ নহে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানাশ্রিত বস্তু নহে। আমরা এই কথার উত্তর দিতেছি। ইন্দ্রিয় বস্তুটা কি তাহা বুঝা আবশ্যক, বুঝিলে আর কোন গোল থাকে না। ইন্দ্রিয়ের দুই অর্থ হইতে পারে, আমরা দেখাইতেছি যে, এই দুই অর্থের যে অর্থই গ্রহণ করা যাক, উভয় অর্থেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানাধীন বিষয়। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞাতা নহে, আত্মাই জ্ঞাতা। চিন্তাহীন লোকে ভাবে চক্ষুই দেখে, কর্ণই শুনে, জিহ্বাই আস্বাদন করে, হস্তই স্পর্শ করে। এই সকল কথা যে ভুল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আত্মাবিহীন দেহ চক্ষু সত্ত্বেও দেখে না, কর্ণ সত্ত্বেও শুনে না, জিহ্বা সত্ত্বেও আস্বাদন করে না, হস্ত সত্ত্বেও স্পর্শ করে না। আত্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই আস্বাদক, আত্মাই স্পর্শকারী। আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়। দেখা যাক, এই "দ্বারা" কথাটা কাহাকে বুঝাইতেছে। আত্মা দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, এই সমস্ত আত্মারই জ্ঞান, আত্মারই কার্য্য। আত্মা যে দেখিতে পারে, এই যে আত্মার দেখিবার ক্ষমতা, ইহাকে আত্মার দর্শনশক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই শক্তি বা ইন্দ্রিয় স্পষ্টতঃই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা আত্মার সহিত একীভূত। এইরূপে আত্মার শ্রবণশক্তি বা শ্রবণেন্দ্রিয়, আত্মার স্পর্শশক্তি বা স্পর্শেন্দ্রিয়, এই সমুদয় আত্মার সহিত একীভূত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞান-শক্তি দুই নহে, একই বস্তু। ইন্দ্রিয়ের অর্থ যদি ইহাই হয় তবে আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানে, আত্মা নিজের জ্ঞানশক্তিতে জানে, এই কথা বলাতে আত্মার অতিরিক্ত জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোন বস্তুর কথা বলা হইল না; আত্মা যে জ্ঞাতা, কেবল এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলা হইল। এই যে আত্মার সহিত একীভূত জ্ঞানশক্তি বা

জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহা কিছুর উপর নির্ভর করে না, বরং অন্য সমুদয় বস্তুই ইহার উপর নির্ভর করে। আত্মজ্ঞান সমুদয় জ্ঞানের আশ্রয়, অবলম্বন। জ্ঞানবস্তু যে আত্মা, সে অন্য সমুদয় বস্তুর আশ্রয়, অবলম্বন। ইন্দ্রিয়ের আর এক অর্থ চক্ষু কর্ণাদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আভ্যন্তরিক গঠনই দেখা যাক আর বাহ্যিক গঠনই দেখা যাক্, ইহারা সর্ব্বাংশেই ভৌতিক বস্তু—ইহারা বিষয়-জগতের অংশ,—ইহারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু। জ্ঞান অন্যান্য জড় বস্তুকে যেমন প্রকাশিত করে, ইহাদিগকেও তেমনি প্রকাশিত করে; অন্যান্য বস্তু যেমন জ্ঞানে আশ্রয় লাভ করিয়া সত্তাবান হয়, ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা ঠিক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, স্নায়ুযন্ত্র, মাংশপেশী, এই সমুদায় দৃষ্ট বা দৃশ্য বস্তু, স্পৃষ্ট বা স্পৃশ্য বস্তু। সুতরাং দৃষ্টি ও স্পর্শ-গোচর বস্তু সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই এই সকল বস্তু সম্বন্ধে খাটে। জ্ঞানের আশ্রয়ে ভিন্ন এই সকল বস্তু থাকিতে পারে না। তাহাই যদি হইল, এই সকল বস্তু যদি জ্ঞানরূপী আত্মার আশ্রিত বস্তুই হইল, তবে আর কিরূপে বলিব যে আত্মা এই সকল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবান্ হয়, এই সকল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান অনুভব করে? যে জ্ঞানের আশ্রয়ে ভিন্ন ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, সেই জ্ঞান কিরূপে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ হইবে? আমরা কিছু এই কথা বলিতেছি না যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন—আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন নহে, আমাদের জ্ঞান বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই যে ইহারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান-নিরপেক্ষ বলিয়াই যে ইহারা সমুদায় জ্ঞান-নিরপেক্ষ এবং জ্ঞানমাত্রেরই অপরিহার্য্য অবলম্বন, তাহা নহে। কেবল ইন্দ্রিয় কেন, আমাদের জানা কোন বস্তুই আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন নহে, সমুদায়ই আমাদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল।

কিন্তু অন্যান্য বস্তু যেমন আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অধীন না হইয়াও কোন লোকাতীত জ্ঞানের অধীন, আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহও তেমনি কোন লোকাতীত জ্ঞানের অধীন। ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে যখন জড়ের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান, তখন যে যুক্তিতে অন্যান্য জড়বস্তু জ্ঞানের আশ্রিত, সেই যুক্তিতেই ইহারাও জ্ঞানের আশ্রিত। যে লোকাতীত জ্ঞানে অন্যান্য বস্তু আশ্রয় লাভ করিয়া সত্তাবান্ হইয়াছে, সেই লোকাতীত জ্ঞানে ইন্দ্রিয়সমূহও আশ্রয়লাভ করিয়া সত্তাবান্ হইয়াছে। সেই জ্ঞানের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের কোন বিশেষত্ব নাই। সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিজ্ঞান লাভ করে, এই কথা নিতান্তই অসঙ্গত। ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের পক্ষে অগ্রে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, জ্ঞান আবার কিরূপে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-সাপেক্ষ হইবে? যদি কেহ বলেন যে লোকাতীত জ্ঞানের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, তবে আমরা আপাততঃ কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে চক্ষুরাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইলে যে ইহারা বর্ত্তমান থাকে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য সমুদায় জড়বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানেই প্রথমতঃ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; এই প্রকাশকে ভিত্তি করিয়াই বিজ্ঞানশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করে যে এই সমুদায় বস্তু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিকাশের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। বৈজ্ঞানিক মীমাংসার আর কোন ভিত্তি নাই। এই প্রকাশই যদি এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয়, তবে এই প্রকাশ এই সিদ্ধান্তেরও প্রমাণ যে, যে জ্ঞানের আশ্রয়ে এই সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানের ব্যক্তিগত সসীম আকারটাই নূতন, জ্ঞান বস্তুটা নূতন নহে, এই ব্যক্তিগত আকার ধারণের পূর্ব্বেও বস্তুটা বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখন কেবল এই পর্য্যন্ত দেখাইলাম যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞান

প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়সমূহ বর্ত্তমান ছিল এই সত্যের যে প্রমাণ, এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে যে এক জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান ছিল এই সত্যেরও সেই একই প্রমাণ। ইন্দ্রিয় যখন সেই জ্ঞানের আশ্রিত বস্তু, তখন সেই জ্ঞান মূলে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ হইতে পারে না, সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানে, অর্থাৎ ইহার আশ্রিত বিষয়ের সাহায্যে জানে, এই কথা নিতান্তই অসঙ্গত।

কিন্তু জ্ঞান মূলে ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ না হইলেও আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানের যে প্রকাশ, তাহা যে এক অর্থে ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য না হইলে যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বর্ণ স্পর্শাদি বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় না, এই বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যে ইন্দ্রিয় বোধের বৈজ্ঞানিক কারণ, ইন্দ্রিয় বোধের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু কার্য্যের বৈজ্ঞানিক কারণ কার্য্যের যথেষ্ট কারণ নহে, জ্ঞানের পক্ষে তৃপ্তিকর কারণ নহে। বৈজ্ঞানিক কারণগুলিও কার্য্যমাত্র, ইহারা আবার কারণান্তর সাপেক্ষ। সমুদায় কার্য্যের মূল কারণ—দার্শনিক কারণ—জ্ঞানবস্তু। যে সকল ইন্দ্রিয় আমাদের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান সমূহের বৈজ্ঞানিক কারণ, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও যে স্বতন্ত্র স্বাধীন নহে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু, ইহা বোধ হয় এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন। (১)

দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব কি? *

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অসংখ্য জীবজন্তু উদ্ভিদাদি পূর্ণ এই জড় জগৎ কি, কোথা হইতে কোন সময়ে কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্ন

(১) পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয় কৃত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক প্রমাণ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিবাদ খণ্ডন, তাঁহারই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অঙ্গীকৃত ঋণ আমি স্বীকার করিয়াছি মাত্র. তাঁহার মতের সহিত এস্থলে আমার কোন বিরোধ ঘটে নাই।

সকল মানবের হৃদয়ে স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বিভিন্ন সময়ের শাস্ত্র প্রণেতাগণ বিভিন্নরূপ কল্পনানিচয় শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মতবাদ বিষম বৈষম্যপূর্ণ শাস্ত্রাধ্যায়ী মাত্রেই তাহা সুন্দররূপে অবগত আছেন। যাঁহার কল্পনা প্রবাহ যে ভাবে যে দিকে ধাবিত হইয়াছে তিনি সেইরূপই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে রাজকন্যা এবং রাক্ষসের কাহিনীর ন্যায় নিতান্ত অলীক, অসংলগ্ন, বিজ্ঞান, ও যুক্তিবিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষম-বৈষম্যময় মতবাদের মীমাংসা দ্বারা সত্যার্থ স্থাপন করা যায় না এবং আমি কোন পাঠককে তৎসম্বন্ধে ক্লিষ্ট করিতে চাই না সুতরাং যাহা বিজ্ঞান, সত্য, ধর্ম্ম ও যুক্তি সম্মত তাহাই সংক্ষেপে এস্থলে বিবৃত করিতেছি। বেদে ও পুরাণে এক প্রকার সৃষ্টির কথা শুনা যায়। পরমেশ্বর যেরূপে, যে উপাদানে, যে অভিপ্রায়ে, যে প্রক্রিয়া দ্বারা--সাধারণ লোকে যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে – তাহার উৎপাদন করিলেন, বেদে পুরাণে এই সৃষ্টি রহস্য অতীত বার্ত্তার আলোচনা দেখা যায়। তাহাকে "সৃষ্টি" বলে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সহিত সেই প্রকার সৃষ্টির কোন সংশ্রব নাই। তবে দার্শনিক সৃষ্টি কেমন ?

সৃজ্ (বা সর্জ) ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞান রাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয় তাহার নাম

* খ্রীষ্টীয় দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর ব্যাখ্যা মৎ-প্রণীত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন এবং পাঠক ইচ্ছা করিলে W. R. Matthews M. A, B. D. মহোদয় কৃত Studies in Christian philosophy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ লেকচার—"The idea of Creation" এই ব্যাখ্যা পাঠ করিতে পারেন।

দার্শনিক সৃষ্টি। শিশুর "তন্মাত্র" যে প্রক্রিয়া দ্বারা তরুণের পঞ্চবিধ স্থূল ভূতে পরিণত হয়, তাহার নাম "সৃষ্টি"। যেমন গুটি পোকাতে রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ প্রত্যেক নরনারী যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্ত জগৎ বা স্থূলভূত সংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে—দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি। সাংখ্যেরা যে সৃষ্টির কথা বলেন তাহা আদৌ বৈদিক সৃষ্টি নহে, তাহা দার্শনিক সৃষ্টি—তাহা স্থূলভূতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা।

যাঁহারা আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা সৃষ্টি বিষয়ে বড়ই ভ্রম করেন। তাঁহারা হয় সৃষ্টি কোনও অনাত্মশক্তিতে আরোপ করেন অথবা সৃষ্টিকে মিথ্যা, মায়িক বলেন। মায়াবাদী বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী হইয়াও সাংখ্যের প্রভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত "মায়া" শক্তিতে সৃষ্টি আরোপ করেন। কিন্তু উপনিষদে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির প্রকৃতত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আত্মা ক্রিয়াবান্, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আত্মা স্বয়ংই ব্যষ্টি আকারে আপনাকে প্রকাশ করেন। ব্যষ্টি জীবনে সর্ব্বদাই আমরা আত্মার ক্রিয়াবত্তার প্রমাণ পাই। জীবন ক্রিয়াময়। ক্রিয়া বলিতেই এমন কিছু বুঝায় যাহা ছিল না, কিন্তু হইল। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে। এই অর্থে সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আমাদের যে সৃষ্টিশক্তি আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার যো নাই। বস্তুতঃ আমাদের সৃষ্টিশক্তি আছে বলিয়াই আমরা সৃষ্টি বুঝিতে পারি এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা কি সৃষ্টি করি? বস্তু সৃষ্টি করি না কার্য্য সৃষ্টি করি? উপাদান সৃষ্টি করি না আকৃতি সৃষ্টি করি? আমরা দেখিয়াছি যে মূল বস্তু একটিই—এক অখণ্ড দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত সসীম-অসীম-ভেদা-ভেদবিশিষ্ট পরমাত্মা। আমাদের সমুদায় জ্ঞানে সেই অখণ্ড বস্তুই প্রকাশিত হন। আমাদের কোন জ্ঞান সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তুকে

অতিক্রম করিতে পারে না। আমাদের কোনও কার্য্য তাহা পারে কি? না, আমরা যাহা কিছু করি তাহাতে মূলবস্তুর আকৃতি, মূলবস্তুর প্রকাশক্রম মাত্র, পরিবর্ত্তিত হয়, বস্তুর মূল স্বরূপ অপরিবর্ত্তিতই থাকে। সমুদায় আকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে বস্তুস্বরূপ যে অপরিবর্ত্তিত থাকে, জড় বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই বলে "Conservation of Energy"—শক্তির অক্ষয়ত্ব। যাহা হউক, আমরা যাহা করিতে পারি না—বস্তুর স্বরূপ পরিবর্ত্তন—ঈশ্বর তাহা করিতে পারেন কি না? কিরূপে করিবেন? তিনিই তো মূলবস্তু এবং তাঁহার স্বরূপ বা স্বভাব এবং তিনিই তো একই? তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তিনি তাহা কিরূপে করিবেন? তিনি জগৎ ও জীবের উপাদান। উপাদানের পরিবর্ত্তন অন্য দ্বারা দূরে থাক্ তাঁহা দ্বারাও সম্ভব নহে। কিন্তু প্রকারের, আকৃতির, সংস্থানের, অবান্তর রূপের, প্রকাশক্রমের পরিবর্ত্তন, আমরাই করিতেছি, তিনি করিতে পারিবেন না কেন? সুতরাং এই আকার-পরিবর্ত্তনই সৃষ্টি। আকার-পরিবর্ত্তনেও পূর্ব্বে যাহা ছিল না পরে তাহা ঘটে। সুতরাং সৃষ্টি যে ভাবে, যে অর্থে সম্ভব, সেই ভাবে, সেই অর্থে সর্ব্বদাই হইতেছে। আমাদের দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে, ঈশ্বর দ্বারা অচিন্তনীয় বিশাল পরিমাণে হইতেছে। সৃষ্টির প্রকৃতত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। যাহারা বলেন প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় বলিয়া বোধ হয় মাত্র, তাঁহারাও প্রকারান্তরে সৃষ্টি স্বীকার করেন; কারণ এই বোধ হওয়াটাও সৃষ্টি।

অনন্ত অখণ্ড আত্মা অনন্ত এবং অখণ্ড থাকিয়াও কিরূপে আপনাকে খণ্ডাকারে ব্যক্ত করেন এই রহস্য মানব-চিন্তা এখনও ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সত্যকে মায়াবাদী "পারমার্থিক" না বলিয়া "ব্যাবহারিক" বা মায়িক

বলিতে চান। এরূপ নামকরণে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে, কিন্তু সম্প্রতি আপত্তির কারণ-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত বলি যে এরূপ নামকরণ সত্ত্বেও মায়াবাদী এই ব্যাপারকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যা হউক জীবসৃষ্টিরূপ ব্যাপারটীর প্রকৃতি আরো কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নূতন কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, ইহা নিশ্চয়। নূতন বস্তু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সকলই ব্রহ্মের। কিন্তু ইহাতে যে একটি নূতন কার্য্য হইল, ঘটনা হইল, তাহা নিশ্চিত। ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি এই বিশেষ আকারে পূর্ব্বে কখনও ব্যক্ত হয় নাই। এই বিশেষ আকারের সহিত অন্য সকল আকারের সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে। অনন্ত অখণ্ডের সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্বেই জীবের ব্যক্তিত্ব (Personality)। এই ব্যক্তিত্বের উপরেই পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন, অন্তর্জাতীয় জীবন, বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, যোগ, ভক্তি, মোক্ষ, সমস্ত নির্ভর করে। ইহাকে লঘু করা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মহিমাকে লঘু করা একই। মানবের ব্যক্তিত্ব যে স্রষ্টার প্রিয় তাহা প্রত্যেক মানবের আত্মপ্রেম ও পরপ্রেম এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে জগতের অনুকূলতা সপ্রমাণ করে। ইহা যে সুষুপ্তির সময়েও প্রকারান্তরে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাও নিশ্চিত। ঐ সময়ে যদি সকল জীবাত্মা অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাইত তবে পুনর্জাগরণে আমরা আপন আপন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ শক্তি,—বিশেষ ব্যক্তিত্ব,—পুনঃপ্রাপ্ত হইতাম না। জাগরণে যেমন ব্রহ্ম জানেন আমার সন্তানেরা আমা হইতে এবং পরস্পর হইতে ভিন্ন তেমনি নিদ্রাতেও জানেন তাহারা ভিন্ন। ভিন্ন বলিয়া না জানিলে ভিন্নরূপে জাগ্রত করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান যেমন ভেদাভেদযুক্ত ব্রহ্মের জীবজ্ঞানও তেমনি ভেদাভেদযুক্ত। যাহা হউক, ব্রহ্মের মানব সৃষ্টি

আমাদের নিকট সুপরিচিত বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। অন্য জীব এবং অন্য বস্তুর সৃষ্টি আমাদের নিকট অল্পাধিক পরিমাণে অস্পষ্ট। অন্য জীব বা বস্তু আমাদের হইতে যে পরিমাণে ভিন্ন তাহার সৃষ্টি আমাদের নিকট সেই পরিমাণে অস্পষ্ট। কিন্তু মানবই স্রষ্টার একমাত্র সৃষ্ট বস্তু নহে। স্রষ্টা তাহার নিত্য বিজ্ঞানকে অসংখ্য আকার ও পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। মানবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার জীব। মানবের উপরেও অসংখ্য প্রকার জীব থাকা কিছুই বিচিত্র নহে, যদিও আমরা তাহাদের অস্তিত্বের কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। জীবের নিম্নে অসংখ্য প্রকার বস্তু আছে, যাহাদিগকে আমরা অচেতন বলি।

আমরা তাহাদিগকে অচেতন বলি এইজন্য যে তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সুখ-দুঃখ অনুভবের প্রকাশ দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিক প্রবর জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কৃত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধাতুখণ্ডের মধ্যেও প্রাণের প্রকাশ ধরা পড়িয়াছে। উচ্চ দর্শনশাস্ত্র বরাবরই বলিতেছে কোন বস্তুই অচেতন নহে; যে সকল বস্তুকে আমরা অচেতন বলি তাহারাও আমাদের মধ্যে রূপ রস প্রভৃতি বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া তাহাদের মৌলিক চেতনত্বের পরিচয় দেয়। জগদবিকাশের সমস্তক্রম বিরাট পুরুষেরই বিজ্ঞান পরম্পরা। এই চিন্তা আমাদের ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই বর্ত্তমান আছে। উপনিষদে এই বিরাট পুরুষ তেজ, অগ্নি, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রতীচ্য দর্শনে ইনি Logos, Word, Cosmic Soul প্রভৃতি নামে পরিচিত। উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ এরূপ একজন বিরাট্ পুরুষ,—সমস্ত বিশ্ব—যাঁহার দেহ,—তাঁহাকেই প্রথম-সৃষ্ট-বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও বলেন সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টি যে অনাদি নহে তাহা পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রমাণীকৃত হইবে; এস্থলে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদে সৃষ্টি আরম্ভের কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ কল্পারম্ভের কথা।

প্রতি কল্পারম্ভে ব্রহ্মা জাগ্রত এবং কল্পান্তে নিদ্রিত হন। পুরাণকারগণ বলেন জগৎ অসংখ্য, ব্রহ্মাও অসংখ্য। জগতের অসংখ্যত্ব বা একই জগতের অসংখ্য বিভাগ বা বিচিত্র ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত। কালের প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় কাল অনাদি অনন্ত, এবং কাল যখন ঘটনা প্রবাহের ক্রমমাত্র তথন ঘটনা প্রবাহও অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, পরে কোন সময়ে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এরূপ চিন্তা দর্শন সম্মত নহে। ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল তাঁহার পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব।

জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বিচার।*

প্রাণহীন পদার্থ হইতে প্রাণের সৃষ্টি হইতে পারে কি না, এ কূট-তর্ক লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক সময় অনেক মসীযুদ্ধ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধিও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা জড় হইতে প্রাণের সৃষ্টি করিবার জন্য পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষ প্রকার আয়োজন করিতেছেন। মানুষে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে। অম্লজান, যবক্ষারজান, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে কিন্তু অদ্যাবধি তাহারা কোন পদার্থে প্রাণ দান করিতে পারে না। এমন কি মৃত শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাহাও বোধ হয় এক প্রকার সর্ব্ববাদী-সম্মত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অনেক লেখক তর্কের দ্বারা বুঝা-ইতে পারেন, যে প্রাণী সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের পক্ষে দুরাশা নহে। কিন্তু তাঁহাদের থিওরি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস তাহা হইবেও

* ইহা গ্রন্থকারের লেখা নহে, পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত। জীবের স্বতঃ উৎপত্তি অলীক কি না, এই পরিচ্ছেদে পাঠক তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে ইহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

না। জগদীশ্বর মানব জাতিকে সকল শক্তি দিয়া জীবন সৃষ্টির রহস্যটী আপনার নিয়মাধীন করিয়া রাখিয়াছেন।

অপ্রাণী হইতে প্রাণীর উদ্ভব হয় কি না, জগতে "স্বয়ম্ভূ" জীবের অস্তিত্ব আছে কি না, স্বতঃ-উৎপত্তি (Spontaneous generation) সম্ভবপর কি না, এ প্রশ্ন লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এক সময় বড় একটা যুদ্ধ বাধিয়াছিল। প্রথমে ধারণা ছিল স্বতঃ-উৎপত্তি সম্ভবপর। শেষে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে প্রাণী ব্যতীত প্রাণীর জন্ম হইতে পারে না, জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবশ্য মানবসমাজে কোন সন্দেহের কারণ হয় • মানুষ, গরু, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, টিকটিকি, গিরগিটি, টিয়া, শালিক শকুনি, গৃধিনী, সকলে একই উপায়ে জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বে ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরের উপর কিম্বা নির্জ্জন দ্বীপের এক প্রান্তে অশ্বথ বা বটপাদপের আবির্ভাব দেখিয়া অনেকের মনে স্বতঃউৎপত্তির সন্দেহ হইত। পরে বুঝিতে পারা গেল, পাখীরা ফল খাইয়া অনেক বীজ পরিপাক করিতে পারে না। তাহাদের পুরীষের সহিত বীজ বাহির হইয়া নিরস্ত-পাদপ-প্রদেশে সুবৃহৎ মহীরুহের সৃষ্টি করে। কতকগুলা অতি নিম্নশ্রেণীর পোকার জন্মের কোনও বিশেষ কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া, কতকগুলি পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বা মাংস পচিলে তাহাদের ভিতর হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ অপ্রাণী জড়ের ভিতর হইতে চৈতন্যময় প্রাণের সৃষ্টি হয়। এক টুকরা মাংস রৌদ্রতাপে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে অসংখ্য কীটের সৃষ্টি হয় ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। দুই চারিদিন অপরিষ্কৃত ভাবে রাখিয়া দিলে কলসীর জলে পোকা জন্মাইয়া উঠে। জলের মধ্যে টুকরা খড় ফেলিয়া রাখিতে পারিলে তো কথাই নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা ভাবি, পচা মাংস হইতে প্রাণী জন্মিতে পারে, অপরিষ্কার জলে কীটের স্বতঃ-প্রভাব সম্ভবপর।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত হার্ভি (Harvey) রক্ত প্রবাহের গতি (Circulation of blood) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিতও কিন্তু সাধারণ ভ্রমে পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, গলিত মাংস হইতে কীটের জন্ম হইতে পারে। রেডি (Redi) নামক একজন ইটালীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকিয়া একখণ্ড মাংসকে রৌদ্র দগ্ধ করিয়া দেখিলেন তাহাতে পোকা জন্মে না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আসিয়া মাংসের উপর ডিম পাড়িয়া যায়, সূর্য্যতাপ ডিমে তা দিয়া ডিমগুলি ফুটাইয়া দেয় মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রাণী হইতেই স্বাভাবিক ভাবে প্রাণীর উৎপত্তি হয়। এ গবেষণার কিন্তু এস্থলে নিবৃত্তি হইল না। জলে খড় পচাইলে লক্ষ লক্ষ কীটাণুর সৃষ্টি হয়। অনুবীক্ষণ-সাহায্যে তাহাদের সন্তরণ দেখিয়া ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিডহাম্ (Needham) এবং ফরাসী পণ্ডিত বাফোঁ (Buffon) এ রহস্যে তাঁহাদের মেধাশক্তি নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একেবারে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না বটে, তবে এক প্রকারের প্রাণীর অংশ-বিশেষ হইতে অপর শ্রেণীর প্রাণী জন্মিতে পারে। খড় প্রাণহীণ বোধ হইলেও তাহার শরীরের অংশে অংশে প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। জলে পড়িয়া থাকিলে সেই সকল অংশ সজীব হয় এবং তাহা ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রাণে পরিণত হয়। মৃত-প্রায় উদ্ভিদের সেই লুক্কায়িত সজীবতা হইতে জলের পোকার সৃষ্টি হয়। ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলী এরূপ উৎকট থিওরি গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। স্পালানজনী (Spallanzoni) নামক একজন ইটালীয় বৈজ্ঞানিক দেখাইয়া দিলেন যে, খড়-মজ্জিত জল ফুটাইয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে আর তাহাতে কীটের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং খড় হইতে জীব জন্মাইতে পারে না। তাঁহার বিপক্ষদল মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"উঁহু"! তাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করি? জল ফুটাইয়া তুমি পাত্রের মুখের বায়ুর, জীবের আহার জুটাইবার ক্ষমতা নষ্ট করিলে'।

লোকে কিন্তু স্পালানজনীর মতে আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল এবং তাঁহার মতের সপক্ষে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, যে খড়-পচানো জলে কীটাণু জন্মায় তাহা ২১২ ডিগ্রি অবধি উষ্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাতে আর কীটাণু জন্মিতে পারে না। অথচ কিছুদিন পরে সেই পাত্রেরই মুখ খুলিয়া দিয়া সেই জলে বাহিরের বাতাস লাগিতে দিলে অমনি তাহাতেই কীটাণুর উৎপত্তি হইতে থাকে। আরও দেখা গেল ঐরূপ জলপূর্ণ পাত্রের মুখে একটা তপ্ত নল লাগাইয়া রাখিলে সে জলে আর পোকা জন্মে না। এমন কি দুইটি পাত্রে একই জল ভরিয়া একটির মুখ অনাবৃত রাখিয়া অপরটির মুখে এসিড সিক্ত তুলার (Gum Cotton) গুলি রাখিলে প্রথম পাত্রে কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্পাসাবৃত পাত্রে কোনও প্রাণী-চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন এ সকল পরীক্ষা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, বায়ুর সহিত ঐ প্রকারের কীটাণু সৃষ্টির একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দরজা বন্ধ করিয়া একটু ফাঁক রাখিয়া দিলে, সূর্য্যালোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বায়ুর সহিত অম্লযান, যবক্ষারযান, কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ ব্যতীত নানা প্রকার ধূলিকণা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সেই ধূলিকণার মত পদার্থে অপরাপর পদার্থের সহিতকীটাণুর ডিম্ব ঘুরিয়া বেড়ায়। ময়লা জল পাইলেই সেই ডিম্বগুলি তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ফুটিয়া কীটাণুতে পরিণত হয়। বায়ু গরম করিলে ডিম্বগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের আর ফুটিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং জড় হইতে জীবের সৃষ্টি হয়, এ কথাটা অলীক। জীব হইতেই জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ সহজে একটা পরীক্ষা ফলকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহে না। আজ যে থিওরি সপ্রমাণ হইল, অপর এক বৈজ্ঞানিকের হস্তে পড়িয়া পরদিন তাহাতে ভ্রম প্রতিপন্ন হওয়া বৈজ্ঞানিক জগতে অতি সাধারণ ব্যাপার। ঐ সিদ্ধান্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে মুস্রোস্বন নামক একজন বৈজ্ঞানিক এক নূতন সমস্যায় পড়িলেন।

তখন ঐ সিদ্ধান্তটি আবার প্রায় ভ্রমমূলাত্মক বলিয়া বোধ হইল। তিনি একটি পাত্রে ঐরূপ খড়-পচানো জল লইয়া তাহা উত্তমরূপে উষ্ণ করিয়া পাত্রটি একটি পারদের পাত্রের উপর উল্টাইয়া ধরিলেন। কতকটা পারদ সেই পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত সেই পাত্রস্থ জলের একেবারে সম্পর্ক রহিত করিয়া দিল। তখন তিনি দুইটি নল দিয়া সেই পাত্রে অম্লযান ও যবক্ষারযান প্রবেশ করাইলেন। বায়ু প্রধানতঃ অম্লযান ও যবক্ষারযানের মিশ্রণ মাত্র। সুতরাং সেই পাত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইল। সে বায়ুতে কীটাণুর ডিম থাকা অসম্ভব। ফলে দেখা গেল, সেই পাত্রে কীটাণু জন্মিয়াছে, তাহারা অবলীলাক্রমে তথায় সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা-ফল আবার প্রাণিতত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে তুমুল ঝড় তুলিল। আবার মসীযুদ্ধ চলিল, পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জলে খড় পচাইয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া লইয়া কার্পাসের গুলি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিলে সে জলে কীটাণুর আবির্ভাব হয় না। কিন্তু দেখা গেল, দুধে খড় পচাইয়া তাহা ফুটাইয়া লইয়া পাত্রের মুখে কার্পাসের গুলি রাখিয়া দিলে সে দুগ্ধে কীটাণুর সৃষ্টি হয়। অথচ জলে হয় না। বৈজ্ঞানিক জগতে আবার সৃষ্টি-রহস্য গভীর হইয়া উঠিল। পণ্ডিতের দল যুগপৎ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞানলিপ্সা অতীব প্রশংসনীয়। সুতরাং জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি সম্বন্ধে আবার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এবার যুদ্ধটা ফরাসী দেশেই অধিক সমারোহের সহিত আরম্ভ হইল। মুসোপুসে (M. Poachet) নামক একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক অনেক নূতন নূতন পরীক্ষা দ্বারা স্বতঃ-উৎপত্তি মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু মুসো পাষ্টুর (M. Pasteur) নামক একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তাঁহার হস্তে স্বতঃ-উৎপত্তি মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ হাক্‌স্‌লে (Huxley) সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। তিনি দুগ্ধ লইয়া পরীক্ষাটি নিজে করিয়া দেখিলেন যে, ২১২ ডিগ্রি অবধি উত্তপ্ত করিয়া লইলেও দুগ্ধে পোকা জন্মে; কিন্তু ঐরূপ উত্তাপে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া বায়ুর সহিত সম্পর্ক বন্ধ করিয়া দিলে জলে পোকা দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, টাট্‌কা দুধে একটু ক্ষার (Alkali) থাকে। তবে কি সেই ক্ষারের সাহায্যে কীটাণুর ডিমগুলা বাঁচিয়া থাকে? তিনি ২১২ ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উষ্ণ অগ্নিতে দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলেন। এ অগ্নি-পরীক্ষায় দুগ্ধ আর ডিমগুলিকে বাঁচাইতে পারিল না। ২২২ ডিগ্রি উত্তাপের পর আর দুগ্ধে কীটাণু জন্মিল না। তখন পাষ্টর মহামতি বিজয়গর্ব্বে বলিলেন—স্বতঃ-উৎপত্তি অলীক কথা। জলে কিম্বা দুগ্ধে বায়ু হইতে কীটাণুর ডিমগুলি পতিত হইয়া ফুটিয়া উঠে। দুগ্ধ পরীক্ষার ভ্রম দেখাইয়া তিনি তখন উপরোক্ত পারদ-পরীক্ষার সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইতে ব্রতী হইলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, যে পারদ দিয়া উল্টানো পাত্রের মুখ বন্ধ করা হয়, সেই পারদই কীটাণু ডিম্বের একটা বিশ্রাম স্থল। বায়ু হইতে রাশি রাশি ডিম পারায় পড়িতেছে। পারদে তাহারা ফুটিতে না পারিলেও নষ্ট হয় না। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষায় পচানো জলে যে ডিম ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেগুলি পারদে অবস্থান করিতেছিল। অনুবীক্ষণ সাহায্যে পারার মধ্যে ভাসমান ভূরি ভূরি যন্ত্রীকৃত পদার্থ (Organic matter) দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মুসোস্বন সাহেবের পরীক্ষা-ফল ভাসিয়া গেল। তাঁহার স্বতঃ- উৎপত্তি সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়া পাষ্টুর সাহেব ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার বাসনা হইল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিবেন যে বায়ুর মধ্যে রাশি রাশি কীটাণুর ডিম্ব বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল ডিম্ব-রেণু ধরিবার জন্য তিনি এক বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি

একটা কাচের নলের মধ্যে কতকটা এসিড-সিক্ত তুলা বা Cotton wool রক্ষা করিলেন। একটা জানালার ভিতর দিয়া সেই নলের এক মুখ বাহিরে রক্ষা করিলেন। অপর মুখে এক প্রকার যন্ত্র বসাইয়া বায়ু টানিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি বায়ুর মধ্যে, ভাসমান ধূলিকণার মধ্যে কীটাণুর ডিম থাকে তাহা হইলে সেগুলি নিশ্চয় ঐ তুলায় লাগিয়া থাকিবে। কয়েক ঘণ্টাকাল সেই নলটার ভিতর দিয়া ঐরূপে বাহিরের বাতাস টানিয়া শেষে তিনি সেই তুলা বাহির করিলেন। এলকহল (Alcohol) বা ইথার (Ether)-এ ফেলিলে সেই তুলা দ্রবীভূত হইয়া যায়। তিনি ভাবিলেন ঐরূপে তুলাকে গলাইলে বায়ু হইতে সংগৃহীত পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে। তখন সে পদার্থ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে তাহার মধ্যে কোনও প্রাণীর ডিম্ব আছে কি না।

সেই তূলা লইয়া ইথারের মধ্যে ফেলিলে তুলা গলিয়া গেল। তখন সেই ইথারের পাত্রের নিম্নে একটা ধূলার পলি পড়িল। পাষ্টুর সাহেব সেই গুঁড়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার অধিকাংশ Starch, (শ্বেত সার) কিন্তু ষ্টার্চ্চ ব্যতীত অপর পদার্থও অনুবীক্ষণে দেখা গেল। পরীক্ষার দ্বারা বুঝা গেল তাহা ডিম, তাহা হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক জগতে এ পরীক্ষা ফল দেখাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, অনুবীক্ষণ সাহায্যে পদার্থ পরীক্ষা অভ্রান্ত নহে। যদি ঐ তুলায় বাস্তবিকই ডিম্বরেণু দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই তূলা হইতে কীট উৎপন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খুব উষ্ণ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত সম্পর্ক রহিত করিতে পারিলে জলে পোকা জন্মিতে পারে না। সেইরূপ জলে তিনি ঐ তূলা ফেলিয়া দেখিলেন যে তাহাতে কীটাণু জন্মিয়া থাকে। তখন তিনি খুব জোর করিয়া জগতে ঘোষণা করিলেন যে জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি বা অপ্রাণী হইতে প্রাণের সম্ভাবনা অলীক।

এবার মুসেঁ। পাষ্টুর আরও সরল উপায়ে তাঁহার সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি. একটা শিশিতে প্রস্রাব ভরিয়া

দেখিলেন তাহা অতি শীঘ্র পচিয়া যায় এবং তাহাতে অসংখ্য কীটাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি তখন সেই প্রস্রাব-পূর্ণ শিশিটি খুব গরম করিয়া তাহার মুখে একটা ইংরাজি S অক্ষরের মত বক্র নল সংযোগ করিয়া দিলেন। দেখা গেল শিশির ভিতর প্রস্রাব পচিল বটে, কিন্তু তাহাতে কীটাণুর জন্ম হইল না। শিশিতে বায়ু ঢুকিবার সময় ডিম্বরেণু-গুলা সমস্ত সেই বক্রনলের তলদেশে পড়িয়া রহিল, তাহারা পাত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। সুতরাং তাহার ভিতর তিনি কোনও প্রকারের কীটাণু দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সেই বক্র নলটী কাটিয়া লইলেন। তাহাতে দেখা গেল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহু জীব সেই শিশির মধ্যে সন্তরণ করিতেছে। কাজেই সপ্রমাণ হইল, জীব হইতে জীবের উদ্ভব। অপ্রাণী হইতে প্রাণী সৃষ্ট হয় না। বাতাসের সঙ্গে কীটের ডিম উড়িয়া বেড়ায়। স্বতঃ-উৎপত্তি অলীক। ইংলণ্ডের বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ এ মতের পোষকতা করেন।

সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ খণ্ডন।

লৌকিক চিন্তা এই ভেদাভেদযুক্ত অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তুর ধারণায় উঠিতে পারে না। ইহা বিশ্বকে অসংখ্য স্বতন্ত্র জড়বস্তু ও অসংখ্য স্বতন্ত্র আত্মাতে বিভক্ত করে। দেশীয় চার্ব্বাক দর্শন ও বিদেশীয় জড়বাদ দর্শন আত্মাকে সূক্ষ্ম জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই চিন্তার চালক অভেদ-ন্যায়, দেশীয়ন্যায় ও বৈদেশিক দর্শন লৌকিক বহুত্ববাদকে কিঞ্চিৎ দার্শনিক সাজে সজ্জিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের ভান করে। এই শ্রেণীর চিন্তায় ভেদন্যায় প্রবল। দেশীয় সাংখ্যদর্শন এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত দ্বৈতবাদ এই ভেদন্যায় অবলম্বন করিয়াই কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয়। শেষোক্ত মত বিশেষ আলোচনার যোগ্য। ইহার ভ্রম বুঝিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনের মৌলিক ভ্রমও বোঝা যায়। এই মত বলে যে রূপ (বর্ণ), রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং সুখ, দুঃখাদি অনুভব

(Sensations or feelings and emotions) বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভাষায়—"বিজ্ঞান," এই সমুদায়ই আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। এই সমুদায়ই আত্মা বা মনের অবস্থা পরম্পরা (States of Consciousness)। আত্মা বা মন ইহাদের আধার। কিন্তু আত্মা ইহাদিগকে নিষ্ক্রিয়ভাবে (Passively) গ্রহণ করে, স্বয়ং উৎপাদন করে না। সুতরাং ইহাদের উৎপাদনের কারণরূপিণী শক্তি অনুমান করা আবশ্যক। এই অতীন্দ্রিয় শক্তিই জড়। ইহাই সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের কারণ এবং কারণ অর্থেই আধার। দার্শনিক দ্বৈতবাদ এইরূপে লৌকিক স্থূল দ্বৈতবাদকে সমর্থন করে। উপনিষদুক্ত ভেদাভেদবিশিষ্ট অখণ্ড অদ্বিতীয় আত্মবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা প্রকারান্তরে এই বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদের ভ্রম দেখাইয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এই দ্বৈতবাদ ভেদন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃ আত্মাকে প্রকারান্তরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া কল্পনা করে, ইহাদের একত্ব অস্বীকার করে বা ভুলিয়া যায়। এই ভ্রমই ইহার মূল ভ্রম। একটি রূপ দৃষ্ট হইল বা একটি শব্দ শ্রুত হইল ইহার অর্থ কি? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে রূপযুক্ত বা শব্দযুক্ত সগুণ আত্মা আত্মপ্রকাশ করিল। রূপ এবং রূপদর্শককের মধ্যে, শব্দ এবং শব্দশ্রোতার মধ্যে, ভেদ আছে, কিন্তু বিভাগ নাই। এক অখণ্ড বস্তুই আত্মপ্রকাশ করিল। এই ব্যাপারে আত্মা এবং আত্মাতিরিক্ত কোন শক্তির স্বতন্ত্রতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। স্বতন্ত্রতা কল্পনার যখন অবসর নাই—তখন একটি নিষ্ক্রিয় অপরটি ক্রিয়াবান এরূপ বিভাগেরও অবসর নাই। এই আত্ম-প্রকাশকে ক্রিয়া বলিতে চাও বল। কিন্তু এই ক্রিয়া আত্মারই, আর কাহারো নহে। এই আত্মপ্রকাশরূপ কার্য্য আত্মা সর্ব্বদাই করিতেছে, সুতরাং আত্মার স্বরূপ কখনও নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। ক্রিয়াবান ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্য পূর্ব্বে করে নাই, এখন করিল, ইহাতে তাহাকে স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। এই বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে সে পূর্ব্বে

নিষ্ক্রিয় ছিল; এখন ক্রিয়াবান্ হইয়াছে, এই কথা বলিতে চাও বলিতে পার। কার্য্যের লক্ষণই এই যে তাহা অকৃত অবস্থা হইতে কৃত অবস্থায় আসে। ইহাতে কর্ত্তার নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞাতৃ আত্মার আত্মপ্রকাশে তাহার সক্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। সে নিজেই যখন নিজ কার্য্যে কারণ তখন বিজ্ঞান প্রকাশরূপ কার্য্যের কারণরূপে বৈজ্ঞানিকের জড় শক্তি বা সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। এরূপ অনুমান সম্পূর্ণই অমূলক। বিজ্ঞানাধার বা বিজ্ঞানরূপী আত্মা অনুমানের বিষয় নহে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ,—বিজ্ঞাতৃহীন বিজ্ঞান অর্থশূন্য শব্দ মাত্র। বৈজ্ঞানিক বা সাংখ্য দ্বৈতবাদী কেন যে আত্মাকে নিষ্ক্রিয় ভাবেন এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণরূপে একটি অনাত্মবস্তু কল্পনা করেন তাহা বোঝা কঠিন নহে, তিনি দেখিয়াছেন মৃত্তিকা বা গালা নিষ্ক্রিয় ভাবে ক্রিয়াবান্ শিল্পীর হস্তস্থিত ছাঁচ বা শীল-মোহরের মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করে। তিনি বিজ্ঞানোৎপত্তিকে এই ব্যাপারের অনুরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞান বা Sensationকে Impressions (মুদ্রাঙ্কন) বা Mental states (মানসিক অবস্থা) বলেন ইহাতে এরূপ ভাবনার স্পষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানোৎপত্তি আদৌ ঐ প্রকার ব্যাপার নহে। কোন বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাতৃ আত্মার আত্মপ্রকাশ। ইহা সর্ব্বতোভাবেই সচেতন; ব্যাপার ইহাতে আত্মা-অনাত্মা, চেতন-অচেতন, নিষ্ক্রিয়-সক্রিয়, এরূপ দুই প্রকার বস্তুর সহযোগিতা কল্পনা করিবার কোন অবসর নাই। ইহাতে যে একটা জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ আছে অথচ বিভাগ নাই, তাহা আমরা দেখাইয়াছি; ইহাতে যে একটা সসীম অসীমের ভেদও আছে, অথচ বিভাগ নাই, তাহা যথাস্থানে দেখাইব। তাহাতে সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদীর স্বতন্ত্র বহু আত্মবাদ খণ্ডিত হইবে, যেমন বিজ্ঞানোৎপত্তির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা জড় ও আত্মার, প্রকৃতি ও পুরুষের, দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইল।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রূপরসাদি বিজ্ঞানতো ক্রমাগতই উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। জগৎ কি তবে এরূপ ক্ষণিকবিজ্ঞান পরম্পরামাত্র? ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদার্শনিক এবং পাশ্চাত্য Sensationalist ইহাই বলেন বটে। কিন্তু তাঁহাদের মতও ভেদন্যায়দ্বারাই নিয়মিত। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতৃর মধ্যে, কর্ত্তা ও কার্য্যের মধ্যে, কাল ও কালাতীতের মধ্যে যে ভেদাভেদ আছে তাহা তাঁহারা বুঝেন না। অনিত্য কার্য্য বা ঘটনা যে নিজেকে জানিতে পারে না তাহাও তাঁহারা বুঝেন না। ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া জানিতে পারে কেবল সেই যে নিজে ঘটনা নহে। যে বলে—"ঘটনা চলিয়া গিয়াছে" সে ঘটনা নহে। এক, দুই, তিন এই পরম্পরাগত ঘটনাগুলিকে যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলিয়া জানে তাহার স্মৃতিতে অতীত ঘটনাগুলির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নচেৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, এই শব্দগুলির কোন অর্থই থাকে না। এই জ্ঞানকে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী ভুল করিয়া ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতিকে সেই ঘটনা সমূহের পুনর্জ্জীবন বা প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যাহা চলিয়া গিয়াছে, অতীত হইয়াছে, তাহার পুনর্জ্জীবন হইতে পারে না এবং তাহার বিনাশ বশতঃ বর্ত্তমান কোন বিজ্ঞানকে তাহার প্রতিরূপও বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহা নূতন, তাহা অতীত নহে। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যে যোগ আছে তাহাও ঠিক, তাহা না হইলে আমরা বর্ত্তমানে অতীতের কথা বলিতে পারিতাম না। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের এই যোগসূত্র ঘটনা নহে, কার্য্য নহে, ক্ষণিক বিজ্ঞান নহে। এই যোগসূত্র কালাতীত স্থায়ী বিজ্ঞান বা বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞাতা ঘটনা জানে, কিন্তু সে নিজে ঘটনা নহে। সে কার্য্য উৎপাদন করে, কিন্তু নিজে কার্য্য নহে। ভেদন্যায় দ্বারা এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের একটা দিক ছাড়িয়া দিলেই ক্ষণিক বিজ্ঞান-

বাদের ভ্রমে পড়িতে হয়। এই বিষয়ে পাঠক "ব্রহ্মসূত্রের" শাঙ্করভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়পাদে বৌদ্ধ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন দেখিতে পারেন। যাহা হউক, এখন উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। আমাদের প্রবাহময় জীবনে, আমাদের প্রবাহময় জীবনরূপ, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিষয়ে মূল বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাতার অস্থায়িত্ব প্রমাণ হয় না। মূল বিজ্ঞাতা তাঁহার অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞান লইয়া নিত্যই বর্ত্তমান আছেন। স্থায়ীবিজ্ঞান তাঁহার স্বরূপগত। সেই স্বরূপে কোন পরিবর্ত্তন নাই। তাহাতে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের প্রবাহ নাই, অথবা তাহা চিরবর্ত্তমান, তাহাতে ভূত ভবিষ্যতের প্রবাহ নাই। কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎও মিথ্যা নহে, ইহারাও চিরবর্ত্তমানের সহিত ভেদাভেদভাবে নিত্যসম্বন্ধ হইয়া আছে। অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিত্যের কোন অর্থ নাই। ভেদাভেদন্যায় অনুসারে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই সত্য। কর্ত্তা নিত্য, কর্ম্ম অনিত্য কিন্তু কর্ত্তা ও কর্ম্ম ভেদাভেদরূপে সম্বন্ধ। সুতরাং উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে আমরা যে স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি সেই বিশ্বাস অমূলক নহে। কিন্তু চিন্তাবিহীন লোক যে জগৎকে জ্ঞাননিরপেক্ষ ও অচেতন মনে করে তাহাই ভুল। জগৎকে বুঝিতে গেলেই দেখা যায় জগৎ ব্রহ্মাশ্রিত (অর্থাৎ ঈশ্বরের আশ্চর্য্য পরাক্রম ও শক্তির বিকাশ) এবং সেই অর্থেই ব্রহ্মের সহিত এক (এস্থলে তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে)।

বৈজ্ঞানিক যে গতিশীল (Kinetic) ও স্থিতিশীল (Static) জড়শক্তির কল্পনা করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মহিমা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিব্যাদি যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি সে সমস্তই তাঁহারই প্রকাশ। ব্রহ্ম যে এত নিকট, এত সুলভ, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, বিশ্বাস করিতেও পারে না। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি সর্ব্বত্রই পরমতত্ত্বসম্বন্ধে নিদ্রিত। অধ্যবসায়যুক্ত সাধনদ্বারা ক্রমশঃ ইহাকে পরমার্থতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এখন কেবল এইমাত্র বোঝা আবশ্যক যে বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞেয় জড়শক্তি অপেক্ষা সর্ব্বগত ও সর্ব্বময় ব্রহ্ম

অধিকতর অবোধ্য হওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ অনেকগুণে অধিকতর সুবোধ্য। (কোন পাঠক যেন এস্থলে ভুলক্রমে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই অর্থ না করেন তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পড়িবেন)। এই পরিচ্ছেদে যে মত খণ্ডিত' হইয়াছে তাহার সহিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের" কোন সম্বন্ধ নাই।

বৈজ্ঞানিক জানেন যে জগতের বস্তুসমূহ আমাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা তাহাদের স্থায়ী রূপ নহে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এই সমস্ত আকার ধারণ করিয়া বস্তুসমূহ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সমস্তই অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র, আমাদের মনোবিকার মাত্র। এই সমুদায়ের কারণ যে স্থায়ী জড়বস্তু তাহাতে এই সমস্ত মনোবিকার থাকা অসম্ভব। মনোনিরপেক্ষ স্থায়ী জড়বস্তুকে আমরা ভাবিবার সময় এই সকল বিকার সংযুক্ত বলিয়াই ভাবি কিন্তু এই ভাবনা বিজ্ঞানের চক্ষে ভুল। মনোনিরপেক্ষ জড়শক্তিকে আমরা এই সমুদয় মনোবিকারের অজ্ঞেয় অচিন্ত্য কারণ বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি, আর কোন প্রকারে পারি না। সুতরাং বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকের মতে, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃক্ষলতা, ঘর, বাড়ী চেয়ার, টেবিল, খাদ্য পাণীয়, সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অচিন্ত্য। বস্তু অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অথচ স্থায়ী ও নিত্য, এরূপ বস্তুবাদ (Realism) অপেক্ষা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অনেকগুণে ভাল এবং বাইবেলের ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ লইয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে এরূপ পবিত্র ও স্পষ্ট শিক্ষার সম্বন্ধে জগতের সকল জাতিকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। এবং বাইবেলের ঈশ্বরবাদ অধিকতর বোধগম্য নহে কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মদর্শনে, ঈশ্বর খৃষ্টে স্বপ্রকশিত হইয়াছেন, এই উচ্চাঙ্গের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়। (১)

আমাদের ব্যষ্টি জীবনে রূপরসাদি যে সমস্ত বিজ্ঞান অস্থায়ীভাবে

---

(১) পাঠক সাধু মথি ১১ : ২৭ ও যোহন সুসমাচার ১৪ ; ৯, যোহন, ১, ১৮। ইব্রীয় ১ ; ৩। ২ কর ৪ ; ৪। কলসীয় ১ ; ১৫। এই স্থলের বাক্যগুলি পাঠ করিবেন।

প্রকাশিত হয় সে সমস্তই পরব্রহ্মে স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার নিত্যক্রিয়াশীলা শক্তিই জগতের অসংখ্য বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানসমূহ আপাততঃ অনিত্য অস্থায়ী বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ যে সমুদায়ই স্থায়ী ও নিত্য, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপের আশ্রিত, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ বিশদরূপে দেখাইতেছি। আমাদের ব্যষ্টি জীবনে বিজ্ঞানসমূহ ক্রমাগত আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থায়ী জগতে বিশ্বাস করি কেন? বিশ্বাস করি এই জন্য যে আমরা দেখি যে, যে সকল বিজ্ঞান তিরোহিত হয় সেই সকলই পুনরায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে অনাবির্ভূত অনেক নূতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরাতন বিজ্ঞানও আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান যদি ক্ষণিক হইত, বিনাশশীল হইত, তবে তিরোহিত বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইত। বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবেই প্রমাণ হয় যে তাহা ক্ষণিক নহে, তাহা স্থায়ী বিজ্ঞাতৃতে স্থায়ীভাবে বর্ত্তমান, ব্যষ্টিজীবনে তাহার প্রকাশমাত্রই ক্ষণিক। "যাহা পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ পুরাতন নহে, পুরাতনের সদৃশ মাত্রই" এই কথা বলিবার যো নাই। পুরাতন বিজ্ঞান পুনরাবির্ভূত হইয়া নূতন বিজ্ঞানের পার্শ্বে না দাঁড়াইলে, তাহার সহিত নূতন বিজ্ঞানের তুলনা করিতে না পারিলে, নূতন পুরাতনের সাদৃশ্য বোধ সম্ভব নহে। অতএব সাদৃশ্য স্থলেও পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব একান্ত আবশ্যক। সুতরাং পুরাতন বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাবে তাহার পুরাতনত্বের পরিচয় পাইয়াই আমরা তাহাকে স্থায়ী বলি। লৌকিক চিন্তা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে না, বিজ্ঞান বলিয়া জানে না; জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বস্তুকে বিজ্ঞানই বলি আর বস্তুই বলি; তার স্থায়িত্বে বিশ্বাস এক ভাবেই উৎপন্ন হয়। পুরাতনের পরিচয় পাইয়াই তাহাকে স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়। বস্তু যখন প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞাতৃর আশ্রয়েই আবির্ভূত হয়, তখন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব অর্থই বিজ্ঞাতৃর স্থায়িত্ব। বিজ্ঞানসমষ্টিরূপী জগৎ স্থায়ী, ইহার অর্থ বিজ্ঞান সমষ্টির আশ্রয়ভূত বিজ্ঞাতৃ পরমাত্মার স্থায়িত্ব

এবং পরমাত্মার স্থায়িত্বের অর্থ নিত্যত্ব। কাল কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কাল কার্য্য বা ঘটনার ক্রমমাত্র। কার্য্য কর্ত্তৃসাপেক্ষ, কর্ত্তার অধীন, সুতরাং কর্ত্তা কাল প্রবাহের অতীত, অর্থাৎ নিত্য। দেশও কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, দেশ রূপরসাদি বিজ্ঞান সংস্থানের প্রকার মাত্র। বিজ্ঞান যখন আত্মার অধীন, তখন দেশও আত্মার অধীন, আত্মা দেশের অধীন নহেন। যিনি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানকে জানেন, "এখান"কে জানেন "ওখান"কেও জানেন, "দূর"কেও জানেন "নিকটকে"ও জানেন, তিনি "এখানে" আবদ্ধ নহেন "ওখানে"ও আবদ্ধ নহেন, "দূরে"ও আবদ্ধ নহেন, তাঁহার কাছে দূর নিকটের প্রভেদ নাই। তিনি দেশরূপ সীমার অতীত।"

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বলিলে কি বুঝায় ?

"আমরা এক্ষণে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে চেষ্টা করিব। এখন ব্যষ্টি বা সসীম আত্মার সহিত সমষ্টি বা অসীম আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে উপনিষদের মত ব্যাখ্যা করা যাক্। আমরা দেখিয়াছি যে রূপ-রসাদি বিষয়ের সহিত আত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আমরা বলিয়াছি যে জ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধেও এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ভেদাভেদ মূলক। ব্রহ্মের জীব সম্বন্ধীয় জ্ঞানও ভেদাভেদ মূলক। আমাদের ব্যষ্টি জীবনে বিজ্ঞানোৎপত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমি উপনিষদের জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিজ্ঞানোৎপত্তি অবলম্বন করিয়াই এক্ষণে জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধও বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উপনিষদের নানা স্থানে নানাভাবে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে এই সকল নানা বর্ণনার সার মর্ম্ম এই মাত্র যে ব্রহ্ম জগতের কারণ ও আশ্রয়। ফলতঃ সুদূর অতীতে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস বা বিজ্ঞানই বলিতে পারে। দর্শন তাহার কি বলিবে ? জ্ঞানের সমক্ষে যাহা ঘটিতেছে এবং তাহার সঙ্গে পরোক্ষ বা দূরের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, দর্শন তাহারই কথা বলিতে

পারে। জীবের জীবনে কোন্ সময়ে জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ হইল তাহা কেহই বলিতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান কিরূপ বিকাশক্রমের ভিতর দিয়া আসিয়াছে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞানের একটা মৌলিক লক্ষণ আছে যাহা না থাকিলে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। * বিষয়-বিষয়ীর ভেদাভেদ বোধই সেই মৌলিক লক্ষণ, ইহা আমরা দেখাইয়াছি। এই মৌলিক লক্ষণযুক্ত জ্ঞানের ব্যষ্টি আকারে প্রথম প্রকাশের আভাস আমরা পাই সুষুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্নশূন্য নিদ্রা হইতে জাগরণের অবস্থায়। সুষুপ্তিতে আমাদের আত্মজ্ঞানও থাকে না, বিষয়-জ্ঞানও থাকে না। যাহারা বলেন "আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছি, সুষুপ্তিতে এরূপ বোধ হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুষুপ্তির পূর্ব্ব ও পরের জাগ্রতাবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা মধ্যবর্ত্তী সুষুপ্তির বিজ্ঞানশূন্যতা ও ক্লেশশূন্যতা উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে এরূপ কিছুই বোধ হয় না। "ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায় একাদশ খণ্ডে সুষুপ্তি সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রজাপতিকে সত্যই বলিয়াছেন, "ন হি খল্বয়ং ভগব এবং সংপ্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি,"—অর্থাৎ "হে ভগবন্, এই অবস্থাতে নিশ্চয়ই এই পুরুষ নিজেকে "এই আমি" এই ভাবে জানে না এবং এই সকল বস্তুকেও জানে না"। সুষুপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার ব্যষ্টিগত জ্ঞান বিলুপ্ত থাকে। ব্যষ্টি জীবনের এই শূন্যময় ভাব হইতে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহাতে আমরা সৃষ্টির আভাস পাই। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়ই তখন সম্বন্ধভাবে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বুঝিতে পারি যে সেই জ্ঞান অবিনষ্ট অব্যাহতই ছিল। তাহা বিনষ্ট ও ব্যাহত হইলে আর পুনঃ প্রকাশিত হইত না এবং পূর্ব্বের জ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেও

* দর্শন শাস্ত্রের সাহায্যে "বিষয় ও বিষয়ী" এই বিষয়টী বিশদরূপে দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে ভেদাভেদের কথা উল্লিখিত হওয়ায় ঐ বিষয়ের কথা আসিয়াছে মাত্র।

পারিত না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তাহা কি আকারে ছিল? ইহা নিশ্চয় যে জ্ঞান কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান হইয়া পুনরায় জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় এই কথা অসঙ্গত, স্ববিরুদ্ধ। কেহ যদি বলে যে একখানা রুটি রাত্রিতে ভাঁড়ারে বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহা মাখম হইয়া যায়, প্রভাতে ভাঁড়ার হইতে খুলিলে তাহা আবার রুটির রূপ ধারণ করে, তবে এই কথা যেমন অসঙ্গত, পূর্ব্বোক্ত কথা তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অসঙ্গত। জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান অর্থাৎ "আমি জানি" এই তত্ত্বদ্বারা জড়িত। আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের সুষুপ্তির পূর্ব্বকার জ্ঞান সুষুপ্তির সময়ে অব্যাহত ছিল ইহা যদি সত্য হয় তবে তাহা জ্ঞানাকারেই ছিল। আত্মজ্ঞান দ্বারা জড়িত হইয়াই ছিল, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু সুষুপ্তির সময়ে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান যে বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহাও নিশ্চয়। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের ব্যষ্টি আত্মজ্ঞান সমষ্টি আত্মজ্ঞানের আশ্রিত হইয়াছিল,—এমন এক আত্ম-জ্ঞানের আশ্রিত হইয়াছিল যাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না, নিদ্রিত হয় না, যাহা কোন প্রকারে কাল বা অবস্থার অধীন নহে। এই সত্যটিই অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে আত্মজ্ঞানের দুটি দিক্ আছে,—একটি ব্যষ্টি, আর একটি সমষ্টি। ব্যষ্টি দিক্‌টি কাল ও অবস্থার অধীন। এমন এক সময় আসে যখন শরীরস্থ স্নায়ুযন্ত্রের ক্লান্তি ও অবসাদবশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমষ্টি দিক্‌টী এরূপ কাল ও অবস্থার অধীন নহে। ইহা কোনও কালে, কোনও অবস্থায় বিলুপ্ত হয় না। ইহা কাল ও অবস্থার অধীন নহে। কাল ও অবস্থাই ইহার অধীন। এই সত্য আমরা পূর্ব্বে বিচার সহ বুঝাইয়াছি। আত্মজ্ঞানের এই সমষ্টি দিক্ বা প্রকারই ব্যষ্টির সুষুপ্তিকালে জাগ্রত থাকে এবং ব্যষ্টিকে নিজ আশ্রয়ে রক্ষা করে। "য এস সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ (কঠ ৫।৮) (অর্থাৎ যখন সমুদয় প্রাণী নিদ্রিত থাকে, তখন যে

পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্যবস্তু পরম্পরা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন)। আত্মজ্ঞানের এই দুই রূপের ভেদ ও অভেদ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি সেই পূর্ব্বকার পুরাতন আমি বলিয়াই নিজেকে জানি, আমি আর এক জন বলিয়া জানি না। বিষয়জগতের যে অংশকে জানি তাহাকেও এই এক "আমি" দ্বারা জড়িত বলিয়াই জানি। বিশ্বাত্মাকে আমার আত্মা বলিয়াই জানি। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি।"

খ্রীষ্টীয় দর্শনে জীব ব্রহ্মের ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদ কথিত হইয়াছে।

আমরা উপনিষদের দিক্ হইতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ দেখিলাম, কিন্তু খ্রীষ্টীয় দর্শন এই কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, তাহাতে ভেদেরই ব্যাখ্যাত বর্ণিত হইয়াছে। কেন যে খ্রীষ্টীয় দর্শন স্বীকার করে নাই তাহার কারণ এই :—

"খ্রীষ্টীয় দর্শন বলেন ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদও তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ব্যষ্টি নিদ্রিত হয়, সমষ্টি কখনও নিদ্রিত হয় না ব্যষ্টি সকল সময়ে জগৎকে তো জানেই না, যখন জানে তখনও অতি অল্পই জানে, এবং যতটুকু জানে তাহা ক্রমে ক্রমে জানে। তাহার বিষয়জ্ঞান দেশকালের সীমার অধীন। সে যেমন জ্ঞানী তেমনই অজ্ঞানী। কিন্তু সমষ্টি আত্মা সমুদয় জানেন এবং সকল সময়েই জানেন। তাঁহার জ্ঞান দেশ-কাল-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ব্যষ্টি আত্মা জাগ্রত অবস্থায়ও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত নহে। সে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া বলে তাহাও সকল সময়ে তাহার নিজায়ত্ত থাকে না। আমরা যখন যে বিষয়ে মন দিই তাহা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাই, অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয় আমাদের জ্ঞান হইতে চলিয়া যায়,—ব্যষ্টি আত্মজ্ঞানের বেষ্টন ছাড়িয়া যায়। সুষুপ্তির সময় যেমন আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বিস্মৃতির সময় তেমনই বিষয়জ্ঞানের

অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত জ্ঞান ক্রমশঃ খণ্ডাকারে আসিয়া আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্ভব করে। আমরা সকলেই এই বিস্মৃতির অধীন। এই বিষয়ে পণ্ডিত ও মূর্খে কোনও প্রভেদ নাই। এমন মহাজ্ঞানী কেহই নাই যিনি তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান এককালে একত্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সমষ্টি আত্মাতে বিস্মৃতি নাই। সমস্ত বিষয়, সমগ্র দেশ, সমগ্র কাল তাঁহার জ্ঞানে চিরবর্ত্তমান; তাঁহার জ্ঞানে সমস্ত বিবৃত থাকে বলিয়াই পুনরায় আমাদের স্মরণ হয়। আমাদের ভোলার সঙ্গে তিনি ভুলিলে কিছুই আমাদের স্মরণ হইত না। জ্ঞান যে কেবল জ্ঞানাকারেই থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিবার অবকাশ নাই"। পুনশ্চ নীতির দিক হইতেও বিচার করিলে এই ভেদের স্পষ্ট তারতম্য বুঝা যায়। খ্রীষ্টীয় দর্শনে ও ধর্ম্মতত্ত্বে চরিত্র নীতির স্থান যে অতি উচ্চ ও পবিত্র তাহা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ. মহোদয়, রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে দর্শন-শাখা সভাপতির অভিভাষণে সাধারণ সমীপে প্রমাণ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার অবকাশ নাই। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩১ দ্রষ্টব্য)। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে যত প্রকার তীব্র আলোচনা করিতে চাহেন করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, ভারতের আশা একমাত্র বাইবেলের উপর নির্ভর করে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বলিয়াছেন "ইহা আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে বাইবেল শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা যতই বলি বা যাহাই করি খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাইবেল শাস্ত্র শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক ভারতবর্ষের পুনর্জ্জন্ম সাধন করিবে," মহারাজা দেখিতে পাইতেছেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ভারতের একমাত্র ভরসা ও ত্রাণকর্ত্তা। সুসমাচার শাস্ত্র জগতে সম্রাট, লোকের পক্ষে গুরুর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুর ন্যায় হিতোপদেষ্টা, প্রিয়তমের ন্যায় প্রীতিপ্রদ, উৎকৃষ্ট শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য মণিকাঞ্চন যোগে সম্পাদন করিয়াছে। "পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা" নামক গ্রন্থের লেখক

শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার (Provincial civil service—Retired) তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন যথা—"বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ম্মজগতে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে তাহার মূল বাইবেল নামক ধর্ম্মগ্রন্থ।" পূর্ব্বোক্ত কথা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এইমাত্র বলি যে আমাদের হিতাহিত বিবেক আছে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী তাহা আমাদের সমক্ষে প্রেম-পুণ্যের যে পূর্ণ আদর্শ (যীশু খ্রীষ্ট) প্রকাশিত করেন, আমরা সেই আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যতই কলঙ্কিত হই না কেন সেই আদর্শ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না এবং আমাদের পাপের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে কখনই নিরস্ত হয় না। আমাদের জীবনে পাপ-পুণ্যের সংগ্রাম দ্বারা নিশ্চিত রূপেই সিদ্ধান্ত হয় যে জীব অপূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ এইখানেই খ্রীষ্টই দর্শন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এইখানেই ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদ।"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের বিচার।

(ক) পরিচ্ছেদ।

"গীতা দ্বারা কৃষ্ণ একজন সাধক ছাড়া আর কিছু প্রমাণিত হন না। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এক বাক্যে একই কথা বলিতেছে। সুতরাং গীতা ভগবদুক্তি, ইহার উপর বিচার চলে না বলিয়া যাঁহারা তর্ক তোলেন, তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। আর্য্য মিশন হইতে সেকালে যে গীতা বাহির হইয়াছিল—তাঁহারাই বাস্তবিক গীতা পপুলার অর্থাৎ লোক প্রিয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক কথাতেই সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন, যে কুরুক্ষেত্র মানুষের জীবনক্ষেত্র, উপদেষ্টা কূটস্থ ব্রহ্ম আর শ্রোতা জীবাত্মা। গীতার শত শত টীকা ও ভাষ্য আছে। সকলে একমত নহে। উপনিষদ সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত আছে, তখন গীতা সম্বন্ধেও থাকিবে। আমাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত আছে। যে কোন তত্ত্ব বিষয়েই ধরা যাক—গীতাকারের

কি মত ? এই সকল ঔপনিষদিক নানা মতের কোন একটা কি গীতাকারের মত ? না, গীতাকারের মত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই ? গীতাকারের নিজের মত একটা ছিলই। টীকাভাষ্যের সবগুলিই তাঁহার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। কেহ কেহ বলেন যে, সকল টীকা ভাষ্যই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া গীতার মত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা জ্ঞানী ও সাধক, তাঁহাদের একজন সত্য অন্তেরা মিথ্যা, ইহা কেমন করিয়া বলা যায় ? এই তর্কের কোন মূল্য নাই। ভাষ্য ও টীকাকারেরা প্রতিপক্ষের মতকে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন, "অহোঽনুমান—কৌশলং দর্শিতম-পুচ্ছ শৃঙ্গৈ স্তার্কিক বলীবর্দ্দৈঃ"। আবার ব্যাস সূত্রের মায়াবাদী ভাষ্য শুনিতে শুনিতে চৈতন্য বলিয়াছেন—"জীব নিস্তারের তরে সূত্র কৈল ব্যাস, মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"। "মায়াবাদম্ সচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" ইহা তো প্রাচীন কথা। সুতরাং আচার্য্যেরা যেখানে সমন্বয় দেখেন নাই অথবা সেখানে সমন্বয় দেখিতে গেলে, যে দোষ পরিহার করিবার জন্য এই তর্ক তাহা দ্বিগুণ মাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং এ তর্কের উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় নহে, সত্য-নির্ণয়ে বাধা প্রদান। ইংরাজিতে ইহাকেই বলে Obscurantism. বিশেষতঃ, এইরূপ অন্ধভাবে উপদেষ্টাকে অনুসরণ করা বাংলার শিক্ষা ও সভ্যতার বিরোধী। গীতায় প্রক্ষিপ্ত নাই, তাহা কেমন করিয়া বলা যায় ? "৭০টী মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুনশ্চ পণ্ডিতবর গার্ব্বে (Garbe) ঐ ৯ম হইতে ১৮শ পর্য্যন্ত ১০টি শ্লোকেই প্রক্ষিপ্ত বলেন। তাহাতে এই বাহিরের প্রভাবের মতটা দৃঢ়ই হয়।" *

* গীতার লেখক ও কাল্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়, এদেশের পাঠকবৃন্দ পাশ্চাত্যের প্রমাণে সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। Dr. J E. Scott ১৯০২ সালে Krishna & Christ (Papers for thoughtful men এবং Krishna and the Puranas গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন

পুনশ্চ বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, প্রণীত "পাগলা-ঝোরা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ "গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ" (৯৩ পৃষ্ঠা) নিবন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে গীতা গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত। লেখক বলেন—"কথায়-কথায় "গীতার" কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, আমি যতই ভাল করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে "গীতা" প্রক্ষিপ্ত শ্লোককে বোঝাই। শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অর্জ্জুনও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমজাইলে আপনারাও ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন, উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ দান, এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়েঃ পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং "গীতা" প্রথমে তত্ত্বোপদেশের আকারে লিখিত হয়। পরে যখন ভাস—সৌমিল্ল—কবিপুত্র—কালিদাস—ভবভূতি—হনুমান্ প্রভৃতি কবিগণ নাটক লেখা সুরু করিলেন, তখন তদৃষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি "গীতা"খানির এক-ঘেয়ে ধরণ দূর করিবার মানসে প্রশ্নোত্তরের (Catechism) আকারে উহা পুনর্লিখিত করিলেন। অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপ-স্তব আদিম ও অকৃত্রিম, কিন্তু উহা গ্রন্থকারকৃত স্তব-আকারে গ্রন্থারম্ভেই ছিল, অর্জ্জুনের নামগন্ধও ছিল না। বিশ্বরূপ দর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা জমকালো দৃশ্য দেখাইবার জন্য, (Scenic effect এর জন্য), বিশ্বরূপ দর্শন প্রক্ষিপ্ত হয়। ··· কলা-কৌশলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের কথাবার্ত্তা, পরে বহু লোকের কথাবার্ত্তা, ইত্যাদি ক্রমবিকাশে নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। গ্রীসে এইরূপ হইয়াছিল ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এদেশেও এইরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে এই থিয়েটারী ভাব প্রবেশ করিলে "গীতার" প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ

তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ উহাতে সমুদয় ভ্রান্ত মত ও পুরাণের অসংলগ্ন মিথ্যা মত দৃঢ়রূপে খণ্ডিত হইয়াছে। পাঠক ইচ্ছা করিলে ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে পারেন।

· মহাভারত মধ্যে অনেক স্থলে গ্রীকদের সহিত পরিচয়ের ইঙ্গিত আছে, যুধিষ্ঠিরের কথায় গ্রীকধর্ম্মের বা গ্রীকদর্শনের যে কোন রূপ ইঙ্গিত নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই কথা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

হইল। ইহাই গীতার 'ক্রমবিকাশের ইতিহাস।" আবার অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন যথা—"শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, তাই গীতাতে কৃষ্ণের উক্তি ভগবদুক্তি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে—এই যে সাধারণ বিশ্বাস তাহা বেদ-বিরুদ্ধ।"

শ্রীকৃষ্ণের অবতারবাদ সম্বন্ধে—মৃত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি।

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রচিত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৪২২ পৃষ্ঠায় এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম অথবা পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণ কোন স্থানে কি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণব্রহ্মের অবতার? একথার উত্তরে, কৃষ্ণোপাসক সহজেই বলিবেন, "কেন, গীতায় তিনি আপনাকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মরূপে ব্যক্ত করিতেছেন।" এ কথার উত্তরে প্রথমতঃ এই বলি যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং অর্জ্জুন শ্রোতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিতে-ছেন, ইহাও সত্য। কিন্তু বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ ঐ রূপে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, অথবা গীতাকার তাঁহাকে বক্তা এবং অর্জ্জুনকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়াছেন, ইহা কে মীমাংসা করিবে? দেশ ও কাল ঐ প্রকার উপদেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। একদিকে পাণ্ডব সৈন্য, অন্যদিকে কুরু-সৈন্য। এই উভয়ের মধ্যে অর্জ্জুনের রথ। সকলেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। এমন সময়ে অর্জ্জুনের সংশয় নিরাকরণ জন্য, তাঁহার প্রশ্নোত্তরে, তিনি তাঁহাকে এত উপদেশ দিলেন যে, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হইয়া গেল। ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? যদি বল, মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব, ঐশীশক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে; তাহা হইলে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না, ইহাই প্রশ্ন। সুতরাং উহা প্রতিপন্ন

করিবার পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইলে চলিবে কেন? বক্তা ও শ্রোতা কল্পনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। মহাভারত আদি প্রধান প্রধান গ্রন্থ ঐ প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র সকলে মহাদেব বক্তা, পার্ব্বতী শ্রোতা। বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেক স্থলে উক্ত প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি, প্রতি বৎসর যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা প্রকাশ হইয়া থাকে, উহার বক্তা মহাদেব এবং শ্রোতা পার্ব্বতী। যথা,—

"হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী,
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হইল রাজা কেবা মন্ত্রীবর,
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ,
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ"।

এস্থলে জিজ্ঞাসা করি যে, শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাকে কি শিবোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দুমাত্রই বলিবেন, উহা কল্পনা মাত্র। এস্থলে যেরূপ কল্পনা হইল, সেইরূপ জিজ্ঞাসা করি, গীতাতে যে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা ও অর্জ্জুন শ্রোতা, উহা যে কল্পনা নয়, কে বলিল? তিনি আরও বলেন,—গীতার উপদেশ সকল যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বা তাঁহার অবতার বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। সত্য, তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু উহার প্রকৃত ভাব লোকে বুঝে না। তিনি অদ্বৈতভাবে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে, আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি বাস্তবিক পূর্ণব্রহ্ম অথবা পূর্ণব্রহ্মের অবতার একপ বুঝা কখনই সম্ভব নহে। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বিচার গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কপিলাদি ঋষিগণও ব্রহ্মদৃষ্টিতে অদ্বৈতভাবে আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

যখন সাধু, ব্রহ্মসত্তায় তন্ময় হইয়া যান, তখন তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না! অন্তরে, বাহিরে ব্রহ্ম। বাহিরে জড় জগৎ, ভিতরে মানবাত্মা, সেই অন্তরের প্রকাশ। এই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় সাধুর পক্ষে অদ্বৈতভাবে পূর্ণ হইয়া, সেইরূপে কথা বলা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এদেশে বৈদান্তিকদিগের মধ্যে "সোঽহং" শব্দ অতিশয় প্রচলিত। যে দেশের, যে সে লোক "সোঽহং" বলিয়া থাকে,—কত ছকড়া নকড়ার পরমহংস সোঽহং বলিয়া থাকেন, সে দেশে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একজন পুরুষ যে ব্রহ্মদৃষ্টিতে, অদ্বৈতভাবে কথা বলিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?" এস্থলে আমরা গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ লইয়া কথা উত্থাপন করিলাম, কিন্তু এই প্রক্ষিপ্তবাদ কি বাইবেলের কোন স্থানে নাই? হাঁ—অবশ্যই আছে। * অনূদিত অংশে প্রক্ষিপ্তবাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রদেশের পণ্ডিতগণ বাইবেলের প্রক্ষিপ্তবাদের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেগুলি মিথ্যা নহে; অজ্ঞ লোকেরা প্রক্ষিপ্তবাদের কথা শুনিলে যেরূপ তর্ক তোলেন তাহা কেবল শুষ্কতর্কমাত্র—সে তর্কের কোন মূল্য নাই। বাইবেলের মূল বস্তুগুলি অকৃত্রিম অবস্থায় আজও রহিয়াছে। গণ্ডগোল হয় কেবল শব্দার্থে ও মতবাদে; কার্য্য সৌকর্য্যার্থে শব্দবিন্যাস ও বিভিন্ন স্থলে পদবিন্যাস দৃষ্ট হয় তাহা কেবল পাঠকদিগের বোধগম্যের জন্য প্রক্ষিপ্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে সময়, স্থান, বিষয়নির্ণয়, ভাষা ও লেখকদিগের সম্বন্ধে অনেকস্থলে পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা মূল বস্তুর গৌরবের হানি বা ক্ষয় হয় নাই। এবং তাহাতে

---

* ইহার প্রমাণ স্বরূপে 'পাঠক—আচার্য' J. Paterson Smyth B. D. L. L. D. মহোদয় কৃত "The old Documents and the New Bible" (চতুর্থ সংস্করণ) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়। বাইবেলের মধ্যে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত পদ আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রক্ষিপ্ত বিষয়গুলি প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে। অনেক অজ্ঞ পাঠক ভাল করিয়া না বুঝিয়া ইহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

এরূপ বুঝিতে হইবে না যে বাইবেলখানি প্রক্ষিপ্ত স্তরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। বাইবেলের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আমরা প্রত্যাদেশ বলিয়া অভিহিত করি না, প্রত্যাদেশ ও প্রক্ষিপ্ত এই দুইটি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে অমান্য করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যাদেশ আদৌ অগ্রাহ্য করিতে পারি না—যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা ভুল বুঝেন। আমি মৎ প্রণীত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "প্রত্যাদেশ" সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা ও ইহার সহিত খ্রীষ্টীয়দর্শনের ঐক্য ও দাবী কতদূর সত্য তাহা পৃথক ভাবে দেখাইয়াছি। তবে একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে উহার সকল পদাবলি ও শব্দ যে প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। অনূদিত স্থলে শব্দের মধ্যে অনেক ভুল আছে। হাইয়ার ক্রিটিসিজ্‌ম্ Higher Criticism প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রদাম করিয়া থাকেন তাহা মিথ্যা নহে। লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না বলিয়া গোলযোগ করেন।

উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ উল্লেখ আছে ?

"উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ উল্লেখ আছে ? ইহা একটী প্রশ্ন বটে, এ প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বাহির করিতে হইবে, পূর্ব্বেও স্থল বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে, তবে এস্থলে উপনিষদের মধ্য হইতে কি সাক্ষ্যবাণী পাওয়া যায়, আমরা এস্থলে কেবল তাহাই দেখিব। বেদের শিরোভূষণ উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের অবতার, সে কথা উহাতে কিছুই বলা হয় নাই। সামান্য মনুষ্যের ন্যায় তিনি গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অন্য বিদ্যা বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে, "তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্ত্বোবাচাপি, পাস এব স বভূব সোহন্তবেলায়াং মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি। অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে

একজন ঋষি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে পুরুষযজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ দিয়া কহিয়াছেন যে ব্যক্তি পুরুষযজ্ঞকে জানেন, তিনি মৃত্যুসময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন। পরে কৃষ্ণ, ঋষির নিকটে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা বিষয়ে নিস্পৃহ হইলেন। পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ উল্লেখ হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ কি নিজেই ব্রহ্মোপাসক ছিলেন? এ কথার প্রমাণ ও শাস্ত্রবাণী কোথায়?

"এ প্রশ্ন গুরুতর বটে, কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক গভীর ভাবে চিন্তা করিলে মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায়" মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। "তিনি বলেন কৃষ্ণ পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, এ কথা ভাগবতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ অবস্থায় দেখিলেন, তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে;—

"ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্মবাগযতং।
তথা ধ্যায়ন্ত মেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতে পরং ॥"
ভাগবতে। ১০ম স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়।

"কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথায় বা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন।" এইরূপে কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। কৃষ্ণ যদি নিজেই পূর্ণব্রহ্ম, তবে তিনি কোন্ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন? পাঠক এ বিষয়টী চিন্তা ও বিচার করিয়া লইবেন এরূপ আশা করি।

"ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মদৃষ্টিতে অদ্বৈতভাবে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম অথবা পূর্ণব্রহ্মের অবতার নহেন, ইহার অন্যরূপ অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। যেমন তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিতেছেন, সেইরূপ তিনি জগতের সকল পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিতেছেন। যে ভাবে তিনি নিজে ব্রহ্ম, সেই ভাবে, জগতের ক্ষুদ্র বা

বৃহৎ সকল পদার্থই ব্রহ্ম। ভাগবতের উক্তি এই যথা—"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং"। হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! আমি, তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসী সমুদয় লোক এ সকলকে ব্রহ্ম বলিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, এমত নহে, স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগতকে ব্রহ্ম বলিয়া জান।" গীতার সাক্ষ্য কিরূপ—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ।" হে অর্জ্জুন! হে শত্রুতাপজনক! আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যা মায়াদ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে, এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি; আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে, এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না।" পুনশ্চ মুণ্ডকশ্রুতির সাক্ষ্য কি তাহাও এস্থলে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে ভাল—"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং।" "সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে, অধ ঊর্দ্ধে, তোমার অবিদ্যাদোষের দ্বারা যাহা যাহা নামরূপে প্রকাশ্যমান দেখিতেছ, সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্মমাত্র; অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়া কার্য্য; ব্রহ্মই কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপক।" পাঠক এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মোপাসক ছিলেন কি না? আমরা তৎসঙ্গে শাস্ত্রবাণী উল্লেখ করিয়াছি যেন পাঠক সেগুলি দেখিয়া বিচার করেন। আমরা এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে মহাভারতের সাক্ষ্যবাণী উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের অবতারবাদ শেষ করিব।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে মহাভারতে কি পাওয়া যায়?

"মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ১৬ অধ্যায়েরসাক্ষ্য—বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া, বাসুদেবের সহিত সেই সভাতে বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা

একদা সজ্জনগণ সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় সেই সভার কোন এক প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে সেই সভার শোভা সন্দর্শন করিয়া, বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমারে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এইক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি অচিরাৎ দ্বারকায় গমন করিবে; অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

"অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্য লোকসমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি যারপর নাই দুঃখিত হইতেছি। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; অতএব আমি আর কোন ক্রমেই তোমারে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্ম্মোপদেশ প্রভাবে ব্রহ্মপদ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়; এক্ষণে পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহা হউক এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর"। (আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ষোড়শাধ্যায়, অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায়। মৃত কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনূদিত মহাভারত)। মহাভারতের অন্তর্গত ঐ অংশ পাঠ করিলে, সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া কখনই মনে করিতেন না। তিনি স্পষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

"পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না"। যিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তিনি আপনার কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন,—আর উহা "স্মৃতিপথে উদিত হইবে না" ইহা বড় চমৎকার কথা! তারপর আবার বলিতেছেন;— "এক্ষণে আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্ত্তন করিতে পারি না, আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম"।

অনুগীতা। ১৬ অঃ। ১২—১৩। স্থলে যে প্রমাণ নিহিত আছে তাহা এই :—

"শ্রাবিতস্ত্বং ময়া গুহ্যং জ্ঞাপিতশ্চ সনাতনং
ধর্ম্মং স্বরূপিনং পার্থ সর্ব্বলোকাংশ্চ শাশ্বতান্
অবুদ্ধ্যা মা গ্রহীর্য্যস্ত্বং তন্মে সুমহদপ্রিয়ং
ন চ সাস্ত পুনর্ভূয়ো স্মৃতিস্তে সংভবিষ্যতি।
ন চ শক্যং পুনর্ব্বক্তুং অশেষণ ধনঞ্জয়
ন শক্যং তন্ময়াভূয় তথাবক্তুং অশেষতঃ
পরংহি ব্রহ্মকথিতং যোগযুক্তের তন্ময়া।"

কোন ব্রহ্মজ্ঞানী বা খ্রীষ্টপন্থী যে মহাভারতের মনগড়া অনুবাদ করিয়াছে, এ কথা বলিলে চলিবে না। আমরা মূল সংস্কৃত মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখুন, অনুবাদের সঙ্গে মিলিতেছে কি না"।

কোন হৃদয়বান্ পাঠক যেন মনে না করেন, যে আমরা এই অংশ বিদ্রূপাত্মক ভাবে, কি হিংসাপরবশ হইয়া লিখিলাম, বস্তুত তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, পূর্ব্ব গ্রন্থকারদিগের ব্যাখ্যার মধ্যে যাহা পাইয়াছি ঠিক্ তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি—ইহার দোষগুণের ভাগী পূর্ব্ব লেখকগণ; ফলতঃ নীচ প্রকৃতির পরিচয় দিয়া পাঠকদিগের বিরাগভাজন হওয়া আমাদের লক্ষ্য নহে; আমরা বেশ জানি যে মসী ও কলমে আক্রমণ করিলে, কিম্বা অন্যায় সঙ্গত কথা বলিলে নানা প্রকার দোষের ভাগী

হইতে হয় এবং তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই ঘটে। পাঠকবর্গ কেবল এস্থলে ন্যায়ানুযায়ী বিচার করিয়া লইবেন—একথা বলিতে অধিকার আছে। এবং তৎসঙ্গে শাস্ত্রবাণী প্রমাণসহ উদ্ধৃত করিয়াছি, তবে যদি কোন ধীমান্ পাঠক আমাদের এই প্রমাণগুলি ভ্রম প্রমাদ বলিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইব; ধর্ম্মগ্লানি করা আমাদের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা নহে এবং এইরূপ কার্য্য আমরা খুবই ঘৃণা করি; আমাদের লক্ষ্য সত্য প্রচার করা ও তাহা সুযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া, আশা করি এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ আমাদের উপর কুপিত বা অশ্রদ্ধার ভাব মনে মনে পোষণ করিবেন না। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা অতীব আবশ্যক হইতেছে, ঈশ্বরচরণে প্রার্থনাদ্বারা মনুষ্যের হৃদয়-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, মানুষের প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়া উঠে; সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মে, ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সত্যকে দৃঢ়রূপে জানিবার ও ধরিবার একটা আগ্রহ স্বভাবতই মনোমধ্যে উদয় হয়, এবং সেই খাঁটী সত্য ধরিলে মনে যথার্থ সুখ ও আনন্দ জন্মে। ফলতঃ বাহ্যিক অনুষ্ঠান ঠিক্ ভাবে আচরণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ভিতরের সত্যটা ফুটিয়া উঠে, এবং এই ভাবে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়া মানুষ শ্রেয়পথে অগ্রসর হয়। এবং আমরা অন্তর হইতে সর্ব্ববিষয়ের যে সাড়া বা উপলব্ধি পাই তাহাতে তর্ক থাকে না, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিয়া বলিয়া দিতেছে যে এ সেই "সত্য" যাঁহার বাক্য শক্তি-বিশিষ্ট, যাঁহার বাক্য পিপাসার জল, যাঁহার বাক্য চরণের প্রদীপ ও আমাদিগের আশার স্থল; এ সেই "সত্য" যাঁহার বাক্য পাপীকে অনন্ত জীবন দান ও পুণ্যবানগণিত করায়, এ সেই "সত্য" যিনি আপন সন্তান-দিগকে পবিত্র আত্মার দ্বারা দিন দিন নূতনীকৃত করেন, এ সেই "সত্য" যাহা আমাদের মন-মল সকল ধ্বংস করে, এ সেই "সত্য" যিনি পিতা ও

পবিত্র আত্মার সঙ্গে সর্ব্বদা এক ঈশ্বর হইয়া অনন্তকাল জীবিত থাকেন ও রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে ইহা পরমাশ্চর্য্য ও বিঘ্ন-রহিত বিষয়। এইখানে ইহার মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা অন্যত্র অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় না। এই অঙ্গীকার বাণী কোন পার্থিব মনুষ্যের কল্পনাপ্রসূত নহে, কিন্তু স্বর্গ হইতে আগত ঐশ্বরিক পুরুষের, যিনি সকলের একমাত্র আদর্শস্থল। খ্রীষ্টীয় দর্শন সাহস সহকারে বলিয়া দিতেছে যে ঐ "পবিত্র ও সত্য পুরুষের" অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা কর, এবং যাহা ভাল ও ন্যায্য তাহার অনুধাবন কর। ইহাতে কাহারও বিবেক কলুষিত হইবে না, ন্যায় রক্ষা পাইবে, সত্যের পথ উন্মুক্ত হইবে, এবং ভাবি জীবনের আশা পূর্ণ হইবে। মানুষ এই "সত্যকে" বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন ও আরাধনা করিলে তাহার সকল আশা পূর্ণ হয় এরূপ অঙ্গীকার ও প্রমাণ শাস্ত্রে আছে ও প্রকৃত ভক্তের জীবনে এখনও ঘটিতেছে। এখানে অবিশ্বাসের কোন কথা নাই, তর্কের কোন স্থান নাই, তুমি কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, তোমার নিজ জীবনে তাহা পাও কি না। খ্রীষ্টীয় দর্শনের মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব এইখানে। অনেকে এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন বটে, এবং এই প্রমাণ তুচ্ছ বোধ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে খ্রীষ্টীয়দর্শনের ক্ষতি নাই, ইহা যে ভিত্তিমূলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সেই ভিত্তিমূল আজও ঠিক আছে;—সে ভিত্তির কিছুই ক্ষয় হয় নাই এবং হইবেও না। মহাসভার সভ্য ও পণ্ডিত গমলীয়েল ঠিক বুঝিয়াছিলেন কোন ভিত্তির মূলে ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাই তিনি সর্ব্বসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"তোমরা এই লোকদের হইতে ক্ষান্ত হও, তাঁহাদিগকে থাকিতে দেও, কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে; কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে তবে তাহাদিগকে লোপকরা তোমাদের সাধ্য নয়"...এই ব্যাখ্যা আজও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দর্শন সর্ব্ব প্রকারে

জগতের ক্রোড়ে ঢালিয়া দিতেছেন, এবং এই মহৎ ও সত্যবাণীর এক সাধারণ সংজ্ঞা বা নাম হইতেছে "খ্রীষ্টের অনুকরণ"। এই কথা বলিলে অনেকে নানাদিক হইতে নানাপ্রকার তর্ক তুলেন ও কোলাহল করেন তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু সে তর্ক শুষ্ক তর্ক মাত্র, তাহাতে সত্যের কোন বীজ নিহিত থাকে না। * তার্ষ নগর-নিবাসী পৌল পারমার্থিক সূক্ষ্মজ্ঞানে সে তর্ক বহু বৎসর পূর্ব্বে খণ্ডন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের স্থান নির্ণয় ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

(খ) পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্ব্বে ভক্তি, প্রেম, এবং দার্শনিক সাধু পৌলের এই বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছি (২০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মের ও হিন্দুধর্ম্মের দিক দিয়া উহার সারাংশ দেখাইয়া শেষ করিতে চাই। ভক্তির কথা বলিতে হইলে, প্রকৃত ভক্তের ন্যায় ভূষিত হইয়া বলিতে হইবে; যীশুর ভক্ত কি বাঙ্গালায় নাই? সাহিত্যের ভিতর দিয়া, যীশু প্রেমে মগ্ন হইয়া কেহ'ত তাঁহার কথা বড় বেশী বলেন না। আবার আমাদিগের আচার্য্যেরা উপাসনালয়ে বসিয়া ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাও বড় বেশী করেন না। মনে হয় যেন ভক্তিতত্ত্ব আমাদের ধর্ম্মমন্দির হইতে অপসারিত হইয়াছে। আমাদের অনেক গুরু, কিন্তু শিক্ষার্থী

* রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়ে কিলিকিয়ার তার্ষ নগর তৎকালে এক অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তথায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার বিভিন্ন স্রোতের এক বিচিত্র সম্মিলন পরিদৃষ্ট হইত; এই স্থানে যিহুদী রক্ষণশীলতা (conservatism) ও রোমীয় উদার নীতির (liberalism) একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়া যিহুদী পণ্ডিতগণের দার্শনিক মতও এস্থানে অপরিজ্ঞাত ছিল না, আবার স্তোয়িকীয় (Stoic) সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তার্ষ নগরেই সংস্থাপিত ছিল: সুতরাং যেখানে রোমীয়, গ্রীক, যিহুদী ও পারসিক প্রভৃতি যাবতীয় জাতির সমাগম হইত, সেই তার্ষ নগরে শিক্ষিত যুবক পৌল যে লাটিন্, গ্রীক, হিব্রু ও অরামিয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কম, তবে সে সব গুরুদের যে ভক্তিমাখা জীবন আছে, এমন কথা বলিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করি। মোটকথা ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে ভক্তি-অনুরাগ খ্রীষ্টমন্দির হইতে পাশ্চাত্যের বায়ু সংস্পর্শে যে কতকটা চলিয়া গিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভক্তির দিক দিয়া আমরা এই ব্যাখ্যা জগতের ক্রোড়ে দিতে পারি যে তাহা "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে প্রতিজ্ঞাযুক্ত ও সুফলদায়িকা"। ইহার মধ্যে দুইটি হৃদয়স্পর্শী মনোহর বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, তাহার একটীর নাম হইতেছে "ঐশ্বর্য্যমূলক ভক্তি" এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে "মাধুর্য্যমূলক ভক্তি"। তাই খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তি বর্ত্তমান ও আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে সুফলদায়ক বলিয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। বস্তুত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে পৌল ঐ ভাষাই তীমথীয়ের নিকট প্রয়োগ করিয়াছেন। ভক্তি মহালাভের উপায় স্বরূপ হয়, কখন? না—যখন খোসার টানাটানি ছাড়িয়া দিয়া আমরা সার পদার্থ সঞ্চয় করিতে যত্নবান্ হই। সেই সার পদার্থ আর কিছুই নয়—কেবল বিশুদ্ধ প্রেম। সুতরাং ভক্তির প্রস্রবণ একটী সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কল্যাণজনক, প্রত্যাশাযুক্ত পবিত্র বিষয় হইয়াছে, এবং সেইজন্যই ভক্তির স্থান খুব উচ্চে অবস্থিত; এবং কোনস্থানে ভক্তিকে অবহেলা করিতে বলা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ভক্তির ব্যাখ্যা দিবার সময় আমি উপযুক্ত ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছি এবং তাহা সম্পূর্ণ সত্য, ও তাহাতে বিরোধ ঘটিবে না; তবে মতান্তর ঘটে কোথায়? না—যখন অদ্বৈতবাদীর কথা আসে। অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও ঈশতত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিলে ভক্তি সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেই পারে না। পাশ্চাত্য সাধুগণের মধ্যে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ যেরূপ প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এরূপ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, তিনি কি ভাবে প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহা তাঁহার অঙ্কিত পরিব্রাজকের ছবি দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে। পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণরবি, সূর্য্যাংশুস্নাত—বসুন্ধরা, মহাসাগরের

অম্বুরাশি, সুবর্ণ কিরণ রঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া গেলেন, ব্রহ্মসম্ভোগে তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রাণ এইরূপে প্রকৃতিদর্শন করিতে করিতে ভগবানে ডুবিয়া থাকিত। শাস্ত্রের দিক হইতে একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—সাধু পৌল প্রেমের উৎকৃষ্টতার বিষয় ধ্যান করিতে করিতে আকুল প্রাণে আত্মহারা হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্দ্ধস্থান, কি গভীরস্থান, কি অন্য কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।" প্রকৃত ভক্তের ইহাই প্রাণের কথা। ইহাতে কোন ভয় নাই, কোন বিরোধ নাই। যিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া মহাপ্রেমে মজিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে কি কখন পাপের বংশীধ্বনি আকৃষ্ট করিতে পারে? ভক্তি শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ প্রীতি বা অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় যে প্রীতি (প্রেম) তাহাকেই আমরা ভক্তি বলি। যতদিন কোন পার্থিব কামনা লইয়া ভগবানকে ভজনা করিবে, সে ভজনা কাম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেননা তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহাকে ভজনা করার নাম প্রেম। দার্শনিক পৌল করিন্থীয় খৃষ্টপন্থীদিগকে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ১ কর, ১৩ অধ্যায়ে ইহার মধুর ব্যাখ্যাত প্রদত্ত হইয়াছে)। যিহুদীজাতি এই মধুর বিষয়টী শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইহা ভারতের হৃদয়ের একটা পরমধন। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিই মূলবস্তু, একপক্ষে বলিতে গেলে ভক্তিই ভগবৎলাভের প্রকৃষ্ট পথ; সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর জীবের জীবত্ব নির্ভর করিতেছে; এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ, যে নীতিবলে তাহাদের এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় সেই সকল নীতিই তাহাদের

সেই জীবত্ব ধারণ করে। অহাই তাহাদের জীবধর্ম্ম। সুতরাং যে সকল শারীরিক মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর জীবের এই জীবত্ব নির্ভর করে তাহাদের চরিতার্থতা ও স্ফুরণই প্রকৃত ভগবৎভাব। ভক্তি সেই ভাব স্ফুরণের সাহায্যকারী। বস্তুতঃ ভক্তি হইতে নির্ভরতা জন্মে এবং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা জন্মিলেই ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও প্রেম হৃদয়ে জন্মে; যিনি মনের বিশুদ্ধ সত্ত্বার সরল ভাবের অধিকারী হইয়াছেন তিনিই প্রেম ও ভক্তির আবেগে ভগবানকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই প্রীতি যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা হইতে নিজের বৈলক্ষণ্যজ্ঞান বা ভেদানুভূতি না থাকিলে ইহা হইতেই পারে না। প্রীতির বিষয় বা প্রীতির আধার কথনই এক হইতে পারে না, অদ্বৈতবাদীর মতে জীবে ও ঈশ্বরে কোন প্রকার ভেদ না থাকায় জীবের ঈশ্বরে প্রীতি হওয়া কথনও সম্ভবপর নহে। ভক্তের নিকট ভগবান সুখময়,—উদাহরণ স্বরূপ পরজাতীয় কর্ণলিয়ের জীবনে তাহা দেখা যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এ সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে সুখ হয় তাহা নহে। ইহা নিত্য-সুখ। এ সুখে চৈতন্য আছে। এ সুখ নিরাকার নহে, ইহার অনন্ত আকার আছে, এই চিন্ময়, আনন্দময়, অনন্ত আকার সম্পন্ন ঈশতত্ত্বই ভক্তের প্রীতি বা ভক্তির একমাত্র অবলম্বন। ভক্তি—অহৈতুকী, ভক্তিতে সকলের সমান অধিকার, ভক্তি বাহ্যমুখী হইলে আসক্তিতে পরিণত হয়, আর অন্তর্ম্মুখী বা ভগবন্মুখী হইলেই ভক্তি। ভক্তিযোগ জাতিকুল বয়সের কোন অপেক্ষা রাখে না, ভক্তিরাজ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদ স্থান পায় না, ভক্তিতে ধনী দরিদ্র বিভেদও নাই। পরিণত বয়সে ভক্তিসাধন করিবে, বাল্যে কি যৌবনে করিবে না, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক, ভক্তিসাধন বাল্যবয়সেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন "ভক্তিবীজ বপন করিবে ত হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতে কর।" এ পৃথিবীতে যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া খ্যাত তাহাদের প্রায় সকলেরই

বাল্যজীবনেই ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাল্যবস্থায় ভক্তি উপার্জ্জন না করিলে, পরে যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইতে হয়, সুতরাং কোন বালক যেন, ভক্তি সাধন বৃদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া না থাকেন। হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে হইলে, নিজের জীবন দীপ্তিময় করিতে হইবে; যাহারা প্রকৃত ভক্ত, যাহারা সেই যোগময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর কোন বিবাদ দেখা যায় না।

ভক্তি আমাদের একটা স্বাভাবিক সম্পত্তি বিশেষ, ভক্তি (বিশ্বাস) না থাকিলে ঈশ্বর প্রসাদে বঞ্চিত হইতে হয়, কোন প্রকার ভক্তিবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই আরাধ্য মূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধের কথা আসিয়া পড়ে। পরে উপাসনা পদ্ধতির মহিমা বুঝিয়া লইতে হয়, পরিশেষে ভক্তের প্রাণে কেমন করিয়া সাড়া পায়, তাহা জানিতে পারিলে শ্রম সার্থক হয়। সকল সময়েই ইচ্ছা করে, স্বদেশীয় ভক্তিবাদের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লই, অথচ মনে মনে বেশ জানি, প্রকৃত ধর্ম্ম মানুষের প্রাণ-স্বরূপ, এবং প্রাণের সঙ্গে প্রাণের তুলনা হয় না, তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামান্য বিচারে তারতম্য থাকিয়াই যায়। তাহাও গোপন করিয়া মিথ্যা আত্ম-গরিমার ভাণ বা সৃষ্টি করিতে চাহি না, যাহা কিছু নিজের মনে বুঝিয়াছি, অল্পের মধ্যে বলিবার চেষ্টা করিব। ভাবুক সত্যের সমাদর ও বিচার করিয়া লইবেন। ভক্তের অন্তরতম ধন পরমেশ্বর যে কেমনতর, তাহা একমুখে বলা যায় না। তাঁর রূপের অবধি নাই। মানুষের ভাষায় তাঁর নাম অফুরন্ত। প্রেমে গদগদ হইয়া ভক্ত বলেন, তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াময়। ভগবান ভক্তকে যে কতখানি ভালবাসেন, এমন কি পাষণ্ডের জন্যও তাঁর কিরূপ ব্যাকুলতা, ভারতবর্ষের ও অন্যান্য স্থানের ভক্তমণ্ডলী যুগে যুগে তাহার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যান। আমাদের মনে হয়, মানুষের প্রতি ভগবানের টান ভারতবর্ষীয় ভক্তিবাদের মূল কথা। কিন্তু ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, সকল দুঃখ শোক

উষ দেশীয় ইয়োবের * ন্যায় বহন করিব—অথচ যাঁকে ভালবাসি, সেই করুণাময় ঈশ্বরকে চিরকাল ন্যায়বান বলিয়া, প্রভু বলিয়া, জীবন মরণের অধিপতি জানিয়া, তাঁর শাসন বাক্যের অধীনে থাকিয়া জীবন কাটাইব—এইরূপ ভক্তি, ভয়, প্রেম, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের অদ্ভুত সমন্বয় খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আজও সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহা থাকা সত্বেও কেন যে খ্রীষ্ট মন্দির হইতে ভক্তিবাদ উড়িয়া গিয়াছে তাহা জানিনা। বৈরাগ্যের অবস্থা ভারতবাসী দেখাইয়াছে, পাশ্চাত্য জগতে এ ভাব স্থান পায় না, কারণ জড়বাদ বৈরাগ্যের প্রতি বড় বিমুখ। উদাহরণ স্বরূপে শাস্ত্রের অন্তর্গত ভক্তিবাদের স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি, পাঠক সেই সেইস্থানগুলি পাঠ করিবেন, (১ম তীমথিয় ৫ অঃ ৮ পদ। ৬ অঃ ৪—৬পদ। ও ২১ পদ) তথাকার বাক্যগুলির সাধারণ তাৎপর্য্যই ঐশ্বর্য্য মূলক এবং মাধুর্য্যমূলক। ভক্তের মনোবাসনা ঐ বীজেই সঞ্চিত ও লক্ষিত হইয়া আছে। ভক্তকে, ভক্তিতত্বের জন্য আর অন্য স্থানে অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তবে ইচ্ছা করিলে পাঠক এগুলিও দেখিতে পারেন†। দার্শনিক সাধু পৌল ভক্তির যে রস তীমথিয়ের পত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন, ভক্ত মাত্রেই তাহাতে প্রাণের আশা মিটাইতে পারিবেন। সাধারণ লোক খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের মূল অবস্থা ও সূত্রের দিকে

---

* ইনি একজন সিদ্ধ ও সরল. ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

† নারদ সূত্র—১ অনুবাক, ২য় সূত্র। ঐ অনুবাক ৭ম সূত্র। ৪র্থ অধ্যায় ২৫ ও ৩০ সূত্র। অনাবশ্যক বোধে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না, মোটের উপর উহাতে কোন হানিকর বস্তু, কিম্বা আমাদের বিশ্বাস নষ্ট বা ম্লান হইতে পারে, এমন বিঘ্নজনক বিষয় তন্মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আত্ম সমর্পণ দ্বারা হয় এবং তাহা সরল ভাবে করা কর্ত্তব্য ও আত্ম দমন দ্বারা প্রকাশ পায়। শাণ্ডিল্য সূত্রেও ভক্তি সম্বন্ধে পরম কল্যাণজনক উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা অবহেলা করা কোন পক্ষে বিধেয় নহে।

তত দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়া দার্শনিক পৌলের ঐ সংজ্ঞা বুঝিয়া উঠিতে অপারগ হন। যাঁহারা খ্রীষ্টভক্ত ও প্রকৃত সাধকবৃন্দ—ঈশ্বরভক্তের উপযোগী আচরণ করেন, তাঁহারা ভক্তির ব্যাখ্যা দিয়া বলেন যে, এ সেই ভক্তি যাহা ধর্ম্মজগতে, ধর্ম্মাচরণের পক্ষে ফলোদায়ক ও বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করে, এ সেই ভক্তি যাহার মাধুর্য্য যীশু খ্রীষ্টের সহিত সংযোগের শুভফল প্রদান করে, এবং যীশুর মহিমা ও তাঁহার সাধিত পরিত্রাণ-বার্ত্তা জীবন দ্বারা ঘোষণা করেন। এ সেই খ্রীষ্টীয় ভক্তি যাহা প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে সুখ ও আনন্দ প্রদান করে, এবং এই ভক্তিই ভক্তের উপযোগী আচরণ করিতে অভ্যাস করায়—কারণ ইহাই বর্ত্তমান ও আমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যথার্থই মধুর মঙ্গলজনক ও শান্তিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা। অতএব দার্শনিক পৌলের এই সংজ্ঞাকে অবহেলা বা নিন্দা করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে, যিনি যতই এই ভক্তিরস পান করিবেন, তিনি ততই এই মধুর রসে আপ্লুত হইবেন, যাঁহারা মনে করেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে ভক্তিতত্ত্বের স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহারা একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন। ভক্তি যে প্রকারেই (অবশ্য কপট ভাবের কথা এস্থলে নাই) হউক না কেন পরমেশ্বরের উপর নিরতিশয় ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়া স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পরিণত করা, ভক্তির এই যে সাধারণ কাজ তাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে ব্যক্তিগত জীবনে নিজের মন ও ব্যবহারের দ্বারাই সাধন করিতে হইবে ইহা সুস্পষ্ট। যিনি ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত তিনি কি কখনও তাঁহার হস্তস্থিত ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিতে পারেন? ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত কবি প্রকৃতই বলিয়াছেন, "তোমার হস্তস্থিত আকাশ মণ্ডল, চন্দ্র সূর্য্য, ও তারকারাজি যদি এত সুন্দর না জানি তাহা হইলে তুমি আরও কত সুন্দর"। সুতরাং সে "সুন্দরের" উপর বিশ্বাস (ভক্তি) স্থাপন করা কি ঐশ্বর্য্যমূলক ও মাধুর্য্যমূলক বিষয় নয়? সাধু আগষ্টিন তাঁহার নিজ ধর্ম্মজীবন কর্ষণ করিতে করিতে এই কথা বলিয়া গেলেন—"Thou Lord, hast

created us for Thee, and our heart is restless till it finds rest in Thee."

ভক্ত আপন হৃদয়ে বেশ অনুভব করেন যে সরলতা প্রেমের সার এবং প্রেম পবিত্রতার জীবন এবং পবিত্রতা সিদ্ধ ধর্ম্মের গৌরব। ঈশ্বর ন্যায়বান, নির্জ্জনে তাঁহাকে আত্মার সমস্ত অভাব জানাইতে হইবে, স্বজনে তিনি সমস্ত আশা পূর্ণ করিবেন, কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা ভক্তের নিজস্ব অভাবের কথা হইলে চলিবে না। সমস্ত জগতের সহিত মিলিত হইয়া সকল জীবের (মনুষ্যের) সহিত একাত্ম বোধ প্রার্থনা করিতে হইবে। "আমাকে দাও" বা "আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ প্রার্থনা আমাদের ধর্ম্মের অনুমোদনীয় নহে। "আমাদের দাও," "আমাদের রক্ষা কর," ইহাই খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার প্রধান অঙ্গ। এই কারণে সকলের সহিত মিলিত হইয়া আরাধনা পদ্ধতি বা স্বজন-উপাসনা বিশ্বাসীজনবৃন্দের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, "স্বজন-উপাসনা আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত স্বরূপ। উপাসনার অঙ্গ যোগ; আমি এবং ঈশ্বর, ইহাই যোগের অবস্থা। অতএব সঙ্গে অন্য কেহ থাকিলে অসুবিধা," একাত্ম-বোধ না থাকিলে, অপরের সঙ্গ নিশ্চয়ই কষ্টদায়ক। তবে আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, ভগবানের সহিত যোগের অবস্থায় যদি সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, বা বিরোধ থাকে, তাহা হইলে সম্পূর্ণযোগ হইল না এবং এইরূপ সম্পূর্ণযোগই যখন ধর্ম্মজীবনের পরিণতি, তখন আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত মিলিত অবস্থায় সাধন-ভজন ধর্ম্ম পথের পরম সম্পদ। সুতরাং এস্থলে খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ, আপত্তিকারীদিগের ঐ আপত্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। শাস্ত্রের সাক্ষ্যবাণী এই—"বাস্তবিকই ভক্তি সন্তোষযুক্ত (প্রেম ও আনন্দ মিশ্রিত) হইলে মহালাভের উপায় হয়, কেননা আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে আনি নাই, এবং কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না,"—এই যে কথাটুকু পৌল লিখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রাণের

খাঁটি কথা, ইহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। তবে বৈরাগ্যের জীবন যে মিথ্যা তাহা কি প্রকার স্বীকার করা যায়? পাঠক এখন বিচার করিয়া দেখুন খ্রীষ্টধর্ম্মে খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের স্থান কোথায় রহিয়াছে। এই ভক্তি মাধুর্য্যমূলক, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ, যে অনুগ্রহে পরিত্রাণ নিহিত। পৌল ঠিক কথা বলিয়াছেন—"তোমারা অনুগ্রহে পরিত্রাণ পাইয়াছ"। আমরা এখন মুশার কঠোর ব্যবস্থা কিম্বা যিহুদী ক্রিয়া-কলাপ মানিয়া চলিতে বাধ্য নহি, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রসাদের নিয়মে আবদ্ধ, এই প্রসাদ তাঁহারই প্রেমতত্ত্বে নিমজ্জিত, ইহা প্রকাশিত না হইলে হীনভক্তি পাপী কোথায় মুখ দেখাইত? সুতরাং যাহা বিশুদ্ধ প্রেমে সিদ্ধ তাহা তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ণ; এবং যে বস্তু অনুগ্রহে সিদ্ধ হয় তাহা কি মহালাভের উপায় নয়? এই মহালাভই ত মাধুর্য্যমূলক ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ রূপে দার্শনিক পৌল এবং আমরা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছি। কে ইহা অস্বীকার করিতে পারে? ইহা সকল সময় সকল ভক্তদিগের প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবাসীর সকল সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভক্তিতত্ত্বে যে কোন বিরোধ ঘটিয়াছে, এরূপ মনে হয় না। যে সাধক মাধুর্য্যমূলক ভক্তিতে আপ্লুত হইয়াছেন তিনিই বিশ্বরাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ মনুষ্যের স্মৃতি পথ হইতে অপসারিত হয় না। লুথর ধর্ম্মসংস্কারকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং সে যুগে কিছু কাজও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই সংস্কার হইতে বহুল মতভেদ ও বিবাদ দেখা যায় এবং এই বিবাদে ভক্তির স্থান নাই বরং কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার সাধু এন্থনি, বর্ণাডেট, ম্যাডাম্ গেয়োঁ, ও চৈতন্য ইহাদিগের জীবন চিন্তা করিলে কে তাঁহাদিগকে ভক্তিরাজ্য হইতে অপসারিত করিতে পারে? ইঁহারা আপন জীবনে মাধুর্য্যমূলক ভক্তি দেখাইয়া আজও অমর হইয়া আছেন। অনন্ত প্রেমের মাধুর্য্যমণ্ডিত সাধনায় অনুপম সিদ্ধি ও আনন্দ এবং সাধনার মূলে কি অবিসংবাদিত গুপ্ত সত্য নিহিত হইয়া সিদ্ধির

পথ সুগম করিয়া ওতপ্রোতভাবে ভক্তসমাজে কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগকে সম্ভ্রম-বিস্ময়ে ভক্তি-শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতে হয়। সাধনায় প্রত্যক্ষফল অতুল্য আনন্দ উপভোগ করিয়া ইষ্ট-লাভে জীবন সার্থক করা, খৃষ্টপন্থীদিগকে এখন এই ক্ষেত্রে না আসিলে তাহার জয়লাভের আশা নাই। অতএব আইস, "আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি" যাহা মহাপুরস্কারযুক্ত।

পূর্ব্বে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই একটু বিশদ ভাবে বলিতেছি মাত্র; এদেশের ভক্তিবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, ভক্তিই তাহার সাক্ষাৎও একমাত্র কারণ। আমরা বিশ্বাসকে ভক্তি হইতে পৃথক করি না বা সেটাকে এই আলোচনায় দাবী হইতে নিম্ন স্থান প্রদান করি না। এদেশের একটা প্রবাদে বলে "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে পেতে বহু দূর"। একথার একটা মূল্য আছে। ইহা অর্থ শূন্য বা নিরর্থক প্রবাদ নয়।

স্বজন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা।

তবে পৃথিবীতে থাকিয়া, সংসারের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে স্বজন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। কিন্তু কেহ যেন না মনে করেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মজীবনে নির্জ্জন প্রার্থনার বা ধ্যানের সার্থকতা নাই। যীশুর জীবনে দেখিতে পাই, নির্জ্জনেই তাঁহার কত কাল কাটিয়াছে এবং সে সময়েও তিনি সৃষ্টি হইতে পৃথক ছিলেন না। অনেকের বিশ্বাস, স্বজন উপাসনা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নিজস্ব অঙ্গ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভক্তিবাদের পাশাপাশি বিশ্লেষণ করিতে গেলে, উভয়ের কয়েকটী বিশেষত্ব ভোলা যায় না। আমরা অবগত আছি, বৈষ্ণবদিগের একত্র নাম গান পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় প্রণালী হইতে ঋণ লওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ভালবাসা লাভ করিতে হইলে—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও

জীবকে ভালবাসিতে পারিলে ভগবানে পৌঁছান যায়। খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ ঈশ্বর, মানবাত্মা এবং সংসারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান নহে। খ্রীষ্ট-ভক্ত সংসারের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরে পৌঁছান। ভারতবর্ষীয় ভক্তগণ সংসারকে দূরে ঠেলিয়া বা উড়াইয়া দিয়া "আমি" এবং "ঈশ্বর" এই দুই এর অস্তিত্ব লইয়া বিভোর হন। এ অবস্থা উচ্চাঙ্গের, উচ্চ শ্রেণীর সাধকবৃন্দ ইহাতে আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাহাতে বিদ্রূপ করিতে পারি না। ফলে "তিনি আমার" "আমি তাঁর" এই ভাবে শান্তি লাভ করেন। ফলতঃ ভক্তিতত্ত্বের উচ্চাঙ্গের এই ভাব হৃদয়ে স্থান দান করাই শ্রেয়—আমরাও সাধকের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া বলি—"তুমি আমার, আমি তোমার, কি করিবে জগৎ আর"। ভক্ত ও ভগবানের মিলন দেখিতে পাওয়াই স্বজন-উপাসনার পরম সুবিধা। খ্রীষ্ট ও পরমেশ্বরের মিলন, বা মণ্ডলীর চিহ্নিত ভক্তদিগের ভগবানের সহিত যুক্ত ভাব নিরীক্ষণ করিতে পাওয়াই স্বজন-উপাসনার শ্রেষ্ঠ লাভ। এস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের খানিকটা ঐক্য দেখিতে পাই। কিন্তু স্বজন-উপাসনা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অন্তস্তল বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। কারণ খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ এইরূপ উপাসনা পদ্ধতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

ভক্তির অনুশাসন।

যীশুর ভক্তির অনুসাশনগুলির মধ্যে তিনটী প্রধান বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) বিশ্বাস। (২) আশা, এবং (৩) প্রেম।

আমরা ইহাদের যোগাযোগ বুঝিয়া লইতে চাই। বিশ্বাসই ধর্ম্ম জীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস কোন্ অবস্থায় জন্মায়? যখন মন আশায় পরিপূর্ণ হয়। ভবিষ্যতের জন্য যাঁহার আশা নাই, বর্ত্তমানে তাঁহার মন বিশ্বাসী হইতে পারে না। ভবিষ্যতের

জন্য আশা কাহার প্রাণে উদয় হইবে? যাঁহার অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ। এইখানেই খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়, নারদ তদীয় ভক্তিসূত্রে বলিয়াছেন, "ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি"।* এ কথায় কোন বিরোধ নাই। প্রেমের মধ্যে দ্বিবিধ বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে অর্থাৎ ভগবৎ প্রেম এবং মনুষ্যের প্রতি ভালবাসা। ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে Hope (আশা) এবং Faith (বিশ্বাস) আসিবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার প্রেম নাই, তাহার জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া যীশুর মর্ম্মপীড়ার অন্ত নাই। কিন্তু তিনি আশার বাণী শুনাইতে আসিয়াছেন। সেইজন্য যাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নাই, তাহাদের কাছে যীশুর সত্যধর্ম্ম আরও সুন্দরভাবে প্রকট হইবে। এইখানেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অসীম মহিমা প্রকটিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ভালবাসা বিস্তীর্ণ। "তুমি আপন প্রতিবাসীকে আত্ম তুল্য প্রেম কর" প্রতিবাসীরও বাদ বিচার নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব, প্রভৃতির মধ্যে যে কোন ভাবে তন্ময় হইয়া উন্নতি লাভ হয় এবং ক্রমশঃ নিষ্কামভাবে ভগবানকে প্রেম করা যায়। খৃষ্ট-

---

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবৎ কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয় "Bhakt Cult" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে "নারদ ভক্তিসূত্রের" যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা কোন অংশে পরিত্যাজ্য নহে। ভারতের ভক্তি তত্ত্বের যে সকল ব্যাখ্যাত তন্মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। উহাতে অনেক রস পাওয়া যায়, এবং যাঁহারা বাস্তবিক প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদের উন্নতি বই অবনতি ঘটে না। খৃষ্টপন্থী শিক্ষকদিগের উচিত ভারতের ঐ সকল সৌন্দর্য্যপূর্ণ শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া খৃষ্টপন্থী ভারতের সত্ত্বগুলি ভাবিবার অবসর পান না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার কৃত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন, গ্রন্থখানির বিশেষ গুণ এই যে ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে সংকীর্ণতা নাই। ভক্তির যে সকল লোমহর্ষক ও অশ্রুনিঃসারণকারী গল্প আছে তাহা চমৎকার।

পন্থীগণ সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই বলিয়া জগৎ জয় করিতে বাহির হইয়াছেন। অবশ্য জড়বাদ (Materialism) খুব বেশী মাত্রায় খৃষ্ট সমাজে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় ভক্তেরা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দে ডুবিয়া থাকিতে বড়ই ব্যাকুল। কিন্তু যাহা কিছু জাগতিক, সে সমস্তই আত্ম-অধিকার-চ্যুত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য হৃদয়ের প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ—আমরা সচরাচর উহা যত সোজা মনে করি, উহা বাস্তবিক তত সোজা নহে। শুধু ধর্ম্ম কথা শুনিলে ও ধর্ম্ম পুস্তক পড়িলেই যে বাস্তবিক হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তাহা প্রমাণ হয় না। উহা সাধনার বিষয়—সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। ভারত-বর্ষীয় সাধকগণ এ বিষয় ভাল কবিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে খৃষ্টপন্থী অনেক দূর পিছাইয়া পড়িয়াছেন। খৃষ্টপন্থী মনে রাখুক যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগরিত না হয ও আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ না করিতে পারি ততদিন সদাসর্ব্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু এক দিনের কর্ম্ম নয়, এই সংগ্রাম অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতে পারে। সিদ্ধিলাভ কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যে ঘটিতে পারে, কাহারও পক্ষে দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তবে ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যে খৃষ্টপন্থী বা শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায় সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে কোন তর্ক বা অবিশ্বাসের ঢেউ লাগে না। পাঠকবর্গ এস্থলে চিন্তা করিয়া দেখুন যে বস্তু "মহা লাভের" উপায় স্বরূপ, যাহা সর্ব্ব বিষয়ে সুফলদায়িকা, যাহা ঐশ্বর্য্যমূলক ও মাধুর্য্যমূলক সেই বস্তুকে (ভক্তিকে) কি অগ্রাহ্য করা চলে? ইহা অগ্রাহ্য করিলে পতন অনিবার্য্য আর তাহাই বর্ত্তমানে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মধ্যে এখন দেখা দিয়াছে। প্রেরেতিক যুগে শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে এ অভাব ঘটে নাই। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি দার্শনিক

পৌল এসেনী, ষ্টোয়িক, কিম্বা ইপিকিউরীয় ব্যক্তিদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া খ্রীষ্টীয় ভক্তি তত্ত্বের যে স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন জগৎ তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, প্রার্থনা, বিশ্বাস ও ভক্তিতত্ত্ব * গভীরভাবে চিন্তা করিলে জীবনের সকল প্রকার শুষ্কতা, অবিশ্বাস, অহঙ্কার, কুসংস্কার প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, এবং মানব মাত্রেই ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্তরে উত্থিত হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। আমরা আশা করি ধর্ম্ম জীবনে শিথিল, অনুন্নতমনা, সংকীর্ণহৃদয়, কুসংস্কারাপন্ন, বাহ্যধর্ম্মাভিমানী, অন্তসারশূন্য, আত্মপ্রত্যয়ী, শুষ্কবিশ্বাসী এবং স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত নরনারী আমাদিগের এই ভক্তিতত্ত্ব চিন্তা করুন। খ্রীষ্টীয় ভক্তি-তত্ত্ব হইতেছে বিশ্বস্ত আত্মার সহিত মধুর আলাপ; যে নিজ অন্তঃকরণে প্রভুর কথা শুনিতে পায় এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সান্ত্বনার বাক্য গ্রহণ করে, সেই আত্মাই ধন্য। যে কর্ণ আনন্দসহকারে স্বর্গীয় মৃদু মধুর রব শ্রবণ করে এবং এই জগতের নানাবিধ রবে কর্ণ রুদ্ধ করে, সেই কর্ণই ধন্য। যে চক্ষু বাহিরের বিষয়ে মুদ্রিত থাকিয়া নিত্যস্থায়ী বিষয়ে উন্মুক্ত থাকে, সেই চক্ষুই ধন্য। যাঁহারা আন্তরিক বিষয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং প্রাত্যহিক সাধনা দ্বারা স্বর্গীয় গুপ্ত বচন গ্রহণ করিবার জন্য আপনাদিগকে অধিকতর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা যত্ন করেন তাঁহারাই ধন্য। আশা করি পাঠক খ্রীষ্টীয়ভক্তিতত্ত্বে মগ্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদের ফল ভোগ করিবেন। ঐ শুন এ দেশের একজন ভক্ত কবি কি গাহিয়াছেন—

"এনেছি ভক্তি কুসুম
পূজিতে চরণ
যদিও সামান্য তাহা

* Evelyn Underhill কৃত "Mysticism" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় "The purification of the self" নামক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। যাঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্মকে ভক্তির সহিত পালন ও আলিঙ্গন করিতে চাহেন তাঁহারা উহাতে প্রচুর সাহায্য ও শান্তি পাইবেন।

করিয়া গ্রহণ
দাসের কামনা প্রভু!
কর সম্পূরণ।
বড়ই অধম আমি
ভক্তি-হীন জন।"

ঐ শুন আর একজন কবি কি গাহিতেছেন—

"ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে
যেন এ রসনা করে হে ঘোষণা
সত্যের মহিমা জীবনে মরণে"

কিন্তু একটি কথা বিশেষরূপে এস্থলে প্রণিধান যোগ্য। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই, সত্য ভিন্নও মুক্তি নাই। অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে? মুক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, অপ্রেম, অবিশ্বাস, অপবিত্রতা, ও অসত্য এগুলিকে দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পৌত্তলিকতা লইয়া, মনুষ্য কেমন করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে? পাপাসক্তির শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেইরূপ, সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলেও মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য মুক্তি বা পরিত্রাণ আনয়ন করে। জগৎ এই মুক্তিতত্ত্বকে হেয়জ্ঞান করে করুন, পণ্ডিত অগ্রাহ্য করে করুন; তার্কিক তর্কশাস্ত্র সাহায্যে উড়াইয়া দিতে চাহেন দিউন, নাস্তিক ইহার সকল অবস্থাকে পদতলে দলিত করে করুন; সংশয়বাদী, প্রকৃতিবাদী কিম্বা জড়বাদী ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহে করুন; খ্রীষ্টীয় দর্শন কিন্তু উঁহাদিগের সকল অবস্থা ভাল করিয়া জ্ঞাত আছেন। ঐ শুন, ধর্ম্ম

বিজ্ঞানের খাঁটি উক্তি—"আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান নষ্ট করিব; বিবেচক লোকদের বিবেচনা ব্যর্থ করিব।" জ্ঞানবান্ কোথায়? অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই? কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের (সুসমাচারের উৎকৃষ্টতা) মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।" ইহাই ঈশ-সাধিত খাঁটি মুক্তিতত্ত্ব, ইহাই তাঁহার পবিত্র রক্তে মুদ্রাঙ্কিত, ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমে পূর্ণ, ইহার জন্যই ঈশ-মনুষ্য হইয়াছিলেন। এবং খ্রীষ্টীয়দর্শন মুক্তিতত্ত্বের এই অবস্থাকেই খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

পণ্ডিত লিকির সাক্ষ্য কি?

"Incarnation of God (ঈশ মানুষ) হইতেছে খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিমূল এবং যীশুখ্রীষ্টই জগতের একমাত্র পরিত্রাতা ও আদর্শ। লিকি নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, আগস্ত কৈসরের সময় হইতে সারলিমেনের সময় পর্য্যন্ত নীতিতত্ত্বের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম্মকে ঈশ-প্রকাশিত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। অতএব খ্রীষ্টের জীবন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেহই পক্ষপাতিত্বের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহস করিবেন না। এই ইতিহাস লেখক একস্থানে এইভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"জগতের সম্মুখে একটী আদর্শ চরিত্র সংস্থাপনের ভার কেবল খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিনা আর কোন ধর্ম্মই জগতের সম্মুখে এমন আদর্শ চরিত্র স্থাপন করিতে পারে নাই। এই আদর্শ চরিত্রের এমনই মোহিনী শক্তি যে অষ্টাদশশত বৎসরের রাজ্যবিপ্লব, জাতি-বিপ্লব, সমাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতি নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মনুষ্যের মনকে বিশুদ্ধপ্রেমে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আবার এই আদর্শ

চরিত্র যে কেবল এক জাতি বা এক দেশস্থ লোকের উপর আপন শক্তি চালনা করিতেছে এমন নয়; সর্ব্ব কালের এবং সর্ব্ব জাতীয় লোকের পক্ষে উপযুক্ত আদর্শ। এটী যে কেবল সত্তার আদর্শ মাত্র তাহাও নয়; কিন্তু মনুষ্যকে কার্য্যতঃ সৎ করিবার একটী প্রধান উপায়। এই আদর্শ চরিত্র মানবজাতির উপর এমন শক্তি চালনা করিয়াছে যে এক ব্যক্তির তিন বৎসরের জীবনে যে ফল উৎপন্ন করিয়াছে, সমগ্র পৃথিবীর দর্শন, বিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্র তাহা করিতে পারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহার মূল্যই এই জীবন। যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাস করে না, তাহারাও স্বীকার করিবে যে, লিকি যথার্থ কথা বলিয়াছেন। খ্রীষ্টের জীবন যে মানবজাতির উপর এক অদ্ভুত শক্তি চালনা করিয়াছে, কেবল তাঁহার জীবনই যে মানবজাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কেবল তাঁহার জীবনই যে নীতি এবং ধর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যের আদর্শ হইয়াছে, লিকির ন্যায় সকলেই স্বীকার করিবে। আর কাহারও জীবন দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয় নাই, কেবল খ্রীষ্টের জীবন দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এ কি মনুষ্যের আভ্যন্তরীণ শক্তির কার্য্য? যীশুর জীবন দ্বারা যখন সম্পূর্ণ পৃথক এবং অপ্রাকৃতিক ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার কোন অপ্রাকৃতিক কারণ ছিল; যাহা আর কোন মনুষ্যের দ্বারা সাধিত হয় নাই, কেবল যীশুর জীবন দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কে অস্বীকার করিতে পারে যে, তাঁহাতে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব শক্তি ছিল না? প্রকৃতিতে, বাহ্য এবং অন্তর্জগতে যে সকল শক্তি আছে তদ্দ্বারা যদি যীশুর জীবন উৎপন্ন না হয়, তবে ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন আর কি সে হইবে? ইতিহাসে যখন যীশুর ন্যায় আর একজন লোক পাওয়া যায় না, তখন তাঁহাতে যে অলৌকিক শক্তি ছিল ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। ধর্ম্ম এবং নীতি বিষয়ে যীশুর জীবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাঁহার জীবন যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, তাঁহার জীবনে যে কলঙ্কের লেশমাত্র ছিল না, ইহা অতি গণ্যমান্য এবং জ্ঞানী অবিশ্বাসীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন উপরে একজন

অতি বিজ্ঞ লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ; তিনি ইহা স্বীকার করেন আমরা তাহা দেখিয়াছি। এই বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ও তাঁহার এক মত। মিলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এই বর্ত্তমান কালের নাস্তিক প্রভৃতির পক্ষে যীশুর জীবনের অনুকরণ করা এবং তাঁহার অভিমত জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করা ভাল। যীশুর জীবন যে নিষ্কলঙ্ক, অতি তীব্র সমালোচনার দ্বারাও তাহা অপ্রমাণিত হয় না।

মানব সন্তানের মধ্যে আর কাহার জীবনের দ্বারা এই ফল উৎপন্ন হইয়াছে ?

সক্রেটিস্, প্লেটো, অরিষ্টটল, জোরোয়াষ্টর, কন্‌ফিউস্, শাক্যমুনি, কৃষ্ণ, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তিগণ নিজ নিজ শিক্ষার গুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের নিজ নিজ জীবনের দ্বারা ত' ওরূপ ফল উৎপন্ন হয় নাই ! কৈ, ইঁহাদের জীবন ত সমগ্র মানব জাতির আদর্শ-স্থল হয় নাই ? আবার ইঁহাদের শিক্ষাতেও ত' এমন একটী আদর্শ চরিত্র চিত্রিত হয় নাই ? কেবল যীশুর জীবনেই সেই আদর্শ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি ? আমি ত স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না যে, তাঁহাতে ঐশ্বরিক শক্তি ছিল। কেবল এক জাতি বা এক কালের লোকের মধ্যে যে এই ফল ফলিয়াছে এমন নয় ; ভূমণ্ডলবাসী সভ্য অসভ্য সমস্ত লোকে যীশুখ্রীষ্টের জীবনের এই শক্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত অনেক সুপ্রসিদ্ধ রাজা, বীর, দেশহিতৈষী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও নীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কাহার জীবন মনুষ্যকে এইরূপ নিস্বার্থ প্রেমে পূর্ণ করিয়াছে ? আগষ্ট কৈসর, সেকেন্দর, সারলিমন, নেপোলিয়ন বাহুবলে বহু বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পশ্চিমে সক্রেটিস্, প্লেটো, অরিষ্টল এ দেশে ষড়্দর্শন কর্ত্তারা দর্শনশাস্ত্রে আপনাদিগের আশ্চর্য্য প্রভাব, শক্তি, চিন্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন। পশ্চিমে সেক্সপিয়ার, এ দেশে মহাকবি কালিদাস কবিত্বের

আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই মহামহোপাধ্যায় লোকদিগের নিজ নিজ জীবনের দ্বারা যীশুখ্রীষ্টের জীবনের ন্যায় কি কার্য্য সাধিত হইয়াছে? জগদ্বিখ্যাত কবিদের মধ্যে কেহ কি কল্পনাতে যীশুর জীবন উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন? ইহার কারণ কি? যীশুখ্রীষ্টেতে অলৌকিক অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তি ছিল, তাই তাঁহার জীবনের দ্বারা এই অপ্রাকৃতিক ফল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই একমাত্র কারণ।"

জিওভানি প্যাপাইনির অবস্থা।

"জিওভানি প্যাপাইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় গ্রন্থকার ছিলেন, মৌলিক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবান্ তেজস্বী সাহিত্যিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নাস্তিক ও রাজদ্রোহী ছিলেন। তিনি প্রগাঢ় চিন্তাশীল সাহিত্যিক হইলেও কখনও মনোযোগের সহিত বাইবেল পাঠ করেন নাই, এবং খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। এত বড় দেশ-বিখ্যাত সাহিত্যিক মহারথী হইয়াও তাঁহার হৃদয় শান্তি-বর্জ্জিত ছিল,—তাঁহার হৃদয় অশান্তি ও উদ্বেগময় ছিল। ক্রমে খ্রীষ্টতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। তিনি বিদ্বেষ ও কুসংস্কার-বর্জ্জিত অন্তরে বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাইবেলালোচনার ফলে তিনি খ্রীষ্ট যীশুর নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন; তিনি খ্রীষ্টকে তাঁহার মুক্তিদাতা রূপে বরণ করিলেন। তিনি ইটালীয় ভাষায় "The Life of Christ" খ্রীষ্টের জীবন চরিত রচনা করেন। ভাষায় সজীবতা, সাহিত্যিক উৎকর্ষ, নৈতিক সাহস ও অদম্য উত্তেজনাপ্রযুক্ত গ্রন্থখানি বহুমূল্য হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে ইহার বহুতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, শেষ সংস্করণে ১,০০,০০০ এক লক্ষ খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা ইহাই অধিক বিক্রীত হইয়াছে, জগতের শিক্ষিত সমাজে এই পুস্তক অতি সমাদৃত

হইয়াছে,—এবং এই গ্রন্থের দ্বারা শিক্ষিত জনবৃন্দের মধ্যে প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে গ্রন্থকারের রাষ্ট্রবিপ্লব সংক্রান্ত চির-পোষিত বহু আশা-ভরসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু খ্রীষ্টের "স্বরূপ" পরিজ্ঞাত হইয়া, এবং তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, খ্রীষ্টই জগতের একমাত্র আশা ও ভরসা। খ্রীষ্ট-নির্ভর ব্যতিরেকে মানবের প্রকৃত উন্নতির আর কোন উপায় নাই, কি ব্যক্তিগত ভাবে, আর কি জাতিরূপে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে খ্রীষ্ট-নির্ভরই মানুষের কেবল মাত্র সহায়।

জিওভানি বিরচিত এই "খ্রীষ্ট-চরিত" সমালোচনা করিয়া জনৈক খ্যাত-নামা সমালোচক বলিয়াছেন ;—"খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-বৈরী সমালোচকদিগের অসার তীব্র সমালোচনাপূর্ণ গ্রন্থরাজি আবর্জ্জনা-স্তূপে নিক্ষিপ্ত হউক, আর জিও-ভানি কৃত অপূর্ব্ব খ্রীষ্ট-চরিত ঘরে ঘরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পঠিত হউক; তাহার ফলে মানব-হৃদয়-বেদীতে বিশ্বাস ও প্রেমের আগুন নিত্য প্রজ্জলিত হইবে, এবং খ্রীষ্ট যীশু মানব-সমাজে প্রভু ও মুক্তিদাতা রূপে অপ্রতিহত প্রভাবে অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন। নাস্তিকতা ও সংশয় চিরবিলুপ্ত হইবে ;—আর দীনাত্মা মানব-প্রাণ যীশুর চরণ তলে পড়িয়া না বলিয়া থাকিতে পারিবে না,—"আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর।"

যাঁহারা খ্রীষ্টীয় দর্শন কিম্বা খ্রীষ্টোক্তি অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়া চলেন, তাঁহারা জিওভানি প্যাপিনির সাক্ষ্যকে কি বলিতে চাহেন ? যাঁহারা আজ-কাল আমাদিগকে বলেন—"The Life of Jesus is not historical but only a compilation from the O. T. and other ancient and contemporary religious literature," তাঁহারা কেবল নারিকেলের শাঁস পরিত্যাগ করিয়া খোসা ভক্ষণ করেন মাত্র। উহা যদি কেবল জনশ্রুতি বাক্যে প্রতিধ্বনিত হইত কিংবা কোন অবৈধ নামে জগৎ সমীপে প্রকাশিত হইত তাহা হইলে কি আজও টিঁকিত ? না—কদাচ নহে।

উহা অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হইত যেমন গ্রীসে হইয়াছিল। "গ্রীসে দেবগণ পরিপূর্ণ মানবীয় আকার ধারণ করিয়াছিলেন এই জন্যই গ্রীকধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা পরাজিত হইয়া বিলয় পাইয়াছিল।" খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে এক জীবন্ত আশ্চর্য্য শক্তিকার্য্য করিতেছে ইহাই তাহার এক বৈশিষ্ট্য। আত্ম প্রবঞ্চিত মোহমুগ্ধ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্যের অন্বেষণ না করিলে কোথা হইতে তাহা বুঝিবে? যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁহারা যদি G. Bertrin. John Oxenham. Robert Hugh Benson. প্রভৃতির পুস্তক পাঠন করেন তাহা হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অভক্তি, সকল সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদূরিত হইবে। পাশ্চাত্যের কতিপয় অবিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ (যেমন ফ্রান্সের M. Couchound, জর্ম্মাণের Dr. Arthur Drews, ডচের Van Eysinga, ডেনীসের Dr. Georg Brandes, Joseph Mc Cabe) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বমত স্থাপনের জন্য, যীশু ও সুসমাচারকে অবৈধ নামে অভিহিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা যীশুর সুসমাচার মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন? উত্তরে বলিব না। অধিক কি খ্রীষ্টীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সুসমাচারের বিরুদ্ধে কত জন কত কথা লিখিয়াছে ও এখনও লিখিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের প্রমাণগুলি সত্য-নিক্তির কাছে টিঁকে কৈ? এই সকল বুধমণ্ডলী বিদ্বেষ ও কুসংস্কারে পূর্ণ, ইঁহাদিগের হৃদয়ে খ্রীষ্টতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং যীশুর নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে কখন যত্ন করেন নাই, কাজে কাজে ইঁহাদিগের ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না, আবার তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের কতিপয় ন-খৃষ্টান পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চাহেন যে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার কেবল কাল্পনিক আখ্যায় পূর্ণ, ও যীশুর সম্বন্ধে কোন সত্যমূলক ইতিহাস পৃথিবীতে নাই; এরূপ ব্যক্তিগণ অন্ধবিশ্বাসের চশমা চক্ষে পরিয়া যে ঐরূপ পাশ্চাত্য অবিশ্বাসীদের ন্যায় কথা বলিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাঁহারা খ্রীষ্টীয়দর্শন, ইতিহাস ও শাস্ত্রবাণী দেখিলেন না—কেবল পরের মুখে ঝাল

খাইয়া তাঁহারা ঋণের অবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন—এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি বলিবার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই সকল ধীমান ব্যক্তিগণ যীশু খ্রীষ্টের "স্বরূপ" আদৌ পরিজ্ঞাত নহে এবং বুঝিবার জন্য কোন চেষ্টা যত্ন করেন না। যাঁহারা ইহাদিগের রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যীশুকে খুঁজিতে চাহেন, তাঁহারা স্ব স্ব লেখনীকে অপবিত্র করেন মাত্র। সার কথা এই যীশুকে খুঁজিতে গেলে যীশুতে ডুবিতে হইবে—নচেৎ তাঁহাকে মস্তিষ্কের সাহায্যে পাইবে না; ইহা বড় কঠিন কথা। প্রেরিতবৃন্দ, সাক্ষ্যমরগণ ও খৃষ্টে গতাসু ভক্তগণ যীশুতে ডুবিতে পারিয়াছিল, তাই, তাঁহারা যীশুকে চিনিতে পারিয়াছিল। তুমি, তাঁহাতে না ডুবিলে আর চিনিতে পারিবে না। ভক্ত রাম প্রসাদ ঠিক কথা বলেছেন—"ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।" যিনি খ্রীষ্টকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে ক্ষণিক ভাবুকতার ফল তাহা নহে, আবার তাহা ভ্রান্তি বিজৃম্ভণ নহে, অলীক কবি কল্পনা নয়, তাহা নির্ম্মল জ্ঞানের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নাস্তিক এ পথে হাঁটিতে ভয় করেন। ঐ শুন দার্শনিক পণ্ডিত Galloway তাঁহার কৃত The philosophy of Religion গ্রন্থে—"Religious knowledge and Empirical knowledge" নিবন্ধে দার্শনিক পৌলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া কি হৃদয়স্পর্শী বাক্য বলিতেছেন—"I know in whom I have trusted"—"যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহাকে জানি"। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে যাঁহারা অকারণে নাস্তিকদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে যীশুর কোন ইতিহাস নাই, সুসমাচার কেবল জনশ্রুতি বাক্যে পূর্ণ, তাহাদের ভ্রম পদে পদে দেখা যায়। নাস্তিকগণ শাস্ত্র জানে না ও মানে না, তাঁহারা নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া যে সকল অর্থশূন্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসী খৃষ্টপন্থী তাঁহাদিগের সকল মতামত ভাল করিয়া দেখিয়াছে, তাহাতে ভয় পাইবার বা ধর্ম্মচ্যুত হইবার কোন কারণ নাই। যীশু খ্রীষ্ট জগতে অবস্থিতিকালে প্রকাশ্যে বলিয়াছেন—"যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন

করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি।" যীশুকে অন্বেষণ করিতে হইলে যীশুর কাছে তোমাকে আসিতে হইবে—তখন বুঝিতে পারিবে যীশু "The Historical and the Eternal Christ" কিনা? পাঠকবর্গকে অধীর করিতে চাহি না একটী প্রসিদ্ধ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব :—

লেখক মহাশয় বলেন "We find the great Rajah Ram Mohon Roy, whose memory ought to be especially cherished in this hall,—associated as it is with the name of one of the closest of his European friends—we find him calling Jesus the "Founder of truth and of true religion." "A being in which dwelt all truth." "Our spiritual Lord and King." Nearer our own times, Keshub Chunder Sen speaks of his "profound reverence for the lofty ideal of moral truth which Christ taught and lived," of Christ illuminating by His wisdom a dark and ruined world;" and his enthusiasm for the message of Christ reaches its climax in the cry, "None but Jesus, none but Jesus, ever deserved this bright, this precious diadem of India," P.P.8-7 লেখক আর একস্থানে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যথা "It is here that my own faith centres, for Christ is to me not only a teacher but the greatest fact that the history of the world has ever known. This fact has eternal significance, not simply because it is a symbol of eternal truth but because as a fact, it is eternal truth."—P. 20. (the Historical and

the Eternal Christ—by Rev. Dr. W. S. Urquhart, D. Phil.)

পুনশ্চ, উক্ত গ্রন্থের লেখক মহাশয়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি,

"Christ is the end, for Christ was the beginning."

"Christ the beginning for the end is Christ."

খ্রীষ্টের অবতার তত্ত্বের আলোচনা কেবল একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নয় কিন্তু ধর্ম্ম-নৈতিক দার্শনিক প্রশ্ন বটে, যাহার সম্বন্ধে দ্বিতীয়খণ্ডে সকল উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহারা বলেন "খ্রীষ্ট মানুষ নন, সুতরাং ইতিহাসটা নিছক কল্পনা, ও রূপককে বাস্তব রূপ দিয়া খ্রীষ্টকে যীশু নামক এক প্রাচীন দেবতার সঙ্গে এক করিয়া ঐতিহাসিক পুরুষ রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে" তাঁহাদিগের সকল সমস্যা, সন্দেহ, তর্ক, দ্বিতীয় ভাগে "Logos Doctrine" অধ্যায়ে খণ্ডিত হইয়াছে। ধর্ম্মকে বিশ্বধর্ম্ম (World Religion) করিতে হইলে যাহা করিতে হয়, খৃষ্ট ধর্ম্ম আদিতে তাহা করিয়াই বিশ্ব ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। সত্য বটে আদি কালে কোন কোন স্থলে খৃষ্টানদের মধ্যে আচার ব্যবহার ও অনেক রীতিনীতি জঘন্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্থান বিশেষে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল ও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল এ কথা আমরা স্বীকার করি, এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টিয়ান ঐতিহাসিক বিশপ Milman তাঁহার "History of Latin Christianity" নামক গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ অবস্থাগুলি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মন্দছিল, এখনও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই বলিয়া কি যীশু খ্রীষ্টকে ও তাঁহার সুসমাচারকে শক্তিহীন বলিতে হইবে নাকি? যাঁহারা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলেন যে "খ্রীষ্টধর্ম্ম নৈতিক বলে প্রচারিত হয় নাই" তাঁহারা লিকির ও প্যাপাইনির সাক্ষ্য কলাপ চিন্তা করিলে তাঁহাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল ঘটিবে না।

সকলেই জানেন যে সুসমাচারের ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই, যদি কেহ ভগবান দর্শন ও মুক্তি পাইয়া থাকেন কিম্বা মুক্তি চান তাহা হইলে সুসমাচারের ধর্ম্ম হইতেই অতি সহজে পাইয়াছেন ও পাইবেন। সুসমাচার সত্য, সুতরাং তাহা অবিনশ্বর এবং যাহা অবিনশ্বর তাহাই মানবের গ্রহনীয়। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের আর একটু কথা বলিতে বাধ্য হইলাম Lectures in India, vol. II. P. 89—"All India must believe that Christ is the Son of God. Nay, more than this. I will make myself bold enough to prophesy, all India will one day acknowledge Jesus Christ as the atonement, the Universal Atonement for all mankind." Again,

"Christ is my food and drink, and Christ is the water that cleanses me" (see the Indian Messenger, September 20, 1925)

CONSULTATION AND BOOKS.

Dr. Adolf Harnack—Christianity & History. Personality & History, নিবন্ধ দ্রষ্টব্য (52-68 P. P)

Dr. W. S. Urquhart—History & Elernal Christ.

Dr. Charles Gore (Bishop of Oxford) Belief in Christ. (Chapter ii The Belief of the first Disciples And chapter 6th Is the Doctrine of the Incarnation True ?)

T. R. Glover—The Jesus of History. (The Choice of the Cross. Chapter. VIII and The Christian Church in the Roman Empire. Chapter 9th)

Rev. C. F. Andrew—The Historical character of the Gospel. The Gospel of Jesus Christ according to Jews & Pagans (P. 28)

ভারতীয় দর্শনে যোগের সংক্ষিপ্ত অবস্থা ও স্থান নির্ণয়।

যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই যোগের উপদেষ্টা হইতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যোগী নহি। আমার বাক্য উপদেশরূপে গৃহীত না হয় ইহা প্রার্থনীয়।

মহামান্য পাতঞ্জল ঋষি "যোগ-দর্শনের" প্রণেতা। সংসারকে দুঃখ নিদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া পতঞ্জলি দুঃখ নিবৃত্তির যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই দর্শনে বা যোগশাস্ত্রে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যোগ-দর্শন একটী দর্শন স্বরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য নহে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখ্যর্শনের একটী শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও কঠোরাচারী হিন্দুর নিকট ইহা যে অতিশয় প্রীতিকর সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পরম পুরুষের সত্বা স্বীকার করে না, যোগদর্শন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী পরম পুরুষের সত্বা স্বীকার করে, সে হিসাবে সুতরাং সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা যোগদর্শনে হিন্দুয়ানির কঠোরতা কিছু বেশী। পাতঞ্জল বলেন, প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগ আবশ্যক। যোগ ভিন্ন তত্বজ্ঞান লাভ হয় না—কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ সম্ভবপর নহে। পদার্থ তত্ব নিরূপণ সম্বন্ধেও সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জলের সামান্য পার্থক্য আছে। সাংখ্যের ২৫ তত্ব বা পদার্থের উপর পাতঞ্জল দর্শন অতিরিক্ত এক পুরুষ বা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, জীবাত্মা যে উপায়ে পরমাত্মায় যাইয়া সম্পূর্ণরূপে মিলিতে পারে সেই উপায় শিক্ষা দেওয়াই যোগদর্শনের উদ্দেশ্য। অন্য পদার্থের সহিত সংযোগে বর্ণ বিশিষ্ট না হইলে স্ফটিক যেরূপ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখায়, মনকে সেইরূপ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ রাখিতে পারিলে এবং ইন্দ্রিয় সমূহের রীতিমত সংযম দ্বারা

বৈরাগ্যলাভ করিতে পারিলে, শরীরেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ঘটিতে পারে। পরম পুরুষের চিন্তাতেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারা যায়। সেই পরম পুরুষ কর্ম্ম দ্বারা ব্যাহত নহেন। তাঁহার একটী অভিজ্ঞা "ওঁ"। এই গূঢ়ার্থ এক বর্ণাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেই পরম পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং যোগের যে কিছু অন্তরায় সমস্ত বিনষ্ট হয়। যোগসূত্রের নাম—"যোগশ্চিত্ত বৃত্ত নিরোধ :"—অর্থাৎ যদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে পারা যায় তাহারই নাম যোগ। সংজ্ঞাটী কঠিন বলিয়া লোকে তত মনোযোগ করে না—কিন্তু ইহার মধ্যে এক গভীর অবস্থা বা তত্ত্ব নিহিত আছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। পাতঞ্জল ঋষি যে ভাবে সূত্রটী প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহার সেই ভাবরাশির মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিতে না পারিলে আর সম্যক উপলব্ধি ঘটিবে না। কিন্তু এখন যে কাল পড়িয়াছে তাহাতে বৈরাগ্যের অবস্থা বজায় করিয়া চলা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কাজেই তাঁহার ভাবে কে মগ্ন হইবে? যোগের নামে ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। সংক্ষেপে যোগের মর্ম্ম এই যে চিত্তকে একাগ্র করিবে, ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করিবে।

যোগের আট অঙ্গ।

চিত্তের একাগ্রতা সাধনের পক্ষে আটটি উপায় বা অঙ্গ আছে। যথা—* যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

---

* (১) যম (সংযম) (২) নিয়ম (ধর্ম্ম ব্যাপার সমূহের প্রতিপালন) (৩) আসন (উপবেশনের প্রণালী) (৪) প্রাণায়াম (শ্বাসরোধ অথবা বিশেষ কোন প্রণালী অনুযায়ী শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন) (৫) প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয় বৃত্তির সঙ্কোচ) (৬) ধারণা (মনকে স্থিরীকরণ) (৭) ধ্যান (চিন্তা) (৮) সমাধি (গভীর চিন্তা) "আর্য্য-দর্পণ" একখানি হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, উহাতে যোগতত্ত্বের

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি বহিরাঙ্গ। এবং শেষোক্ত তিনটী অন্তরঙ্গ। যেহেতু যম নিয়মাদির সহিত শরীরের এবং ধ্যান ধারণাদির সহিত চিত্তের সম্বন্ধ। যোগ প্রক্রিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্ত করা অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি চিত্তের একান্ত একাগ্রতা বিধানের কৌশল মাত্র। সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তুগত্যা কিছুই নহে। সাধারণতঃ বুঝিতে হইলে উহা এক প্রকার ব্যায়াম অভ্যাস বলিয়া বুঝিতে হয়—যাহাতে অস্বাভাবিকরূপ ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিতে হয়, অতিশয় কষ্টকর ভাবে উপবেশনাদি করিতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিতে হয় এবং শ্বাস রোধ করিতে হয়—উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, মনের সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থা সম্পাদন করা মাত্র। ভগবদ্গীতার প্রথম খণ্ডে যোগধর্ম্মের উপকারিতা প্রধানতঃ কথিত হইয়াছে। যোগের অঙ্গ কঠোরতা। উহাতে আত্মনিগ্রহের অভ্যাসের

ও আসনের প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে রোগারোগ্য নির্ণয়ের অবস্থা জানিতে পারা যায়। (ভাদ্র, সন ১৩২১ সাল ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

§ আসনের নাম—এই (১) সিদ্ধাসন—সর্ব্বব্যাধিনাশক। এই আসন দ্বারা বায়ুর পথ সরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের তাড়িৎ-শক্তি চলাচলের সুবিধা হয়। (২) পদ্মাসন—পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র ধারণ করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয়। (৩) ভদ্রাসন, (৪) সিংহাসন, (৫) শবাসন, (৬) ভুজঙ্গাসন, (৭) ময়ূরাসন, (৮) উগ্রাসন (৯) স্বস্তিকাসন, (১০) মৎস্যাসন, (১১) মকরাসন, (১২) বজ্রাসন, (১৩) মূলবন্ধ, (১৪) খেচরীমুদ্রা, (১৫) বিপরীত করণী মুদ্রা, (১৬) শক্তিচালনী মুদ্রা।

যোগশাস্ত্রে নানাপ্রকার আসনের বিষয় কথিত আছে। ভূমণ্ডলে প্রাণীগণ যেমন অসংখ্য, আসনও তেমন অসংখ্য। আমরা এস্থলে আসনগুলির নামোল্লেখ করিলাম—উহার সকল গুলিই রোগারোগ্যের ব্যাখ্যায় পূর্ণ। যোগীর এ আসনে বসিয়া যে কত খানি ঈশ্বর যোগতত্ত্ব সিদ্ধ হয় লেখক মহাশয় "আর্য্য দর্পণে" তাহার কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত প্রদান করেন নাই। প্রাগুক্ত আসনের মধ্যে যিনি যেরূপ আসন মনোনীত করিয়া যোগ আরম্ভ করিলে নিখিল রোগ বিনষ্ট হয়।

সঙ্গে যে কর্ম্মের (action) যোগ এবং স্বধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রয়োজন এ কথা বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ আত্মপরজ্ঞান বিরহিত হইয়া সকলেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেই সকল দেখিতে পাইবে, সেই একান্ত প্রার্থনীয় অবস্থার লাভই যে আত্ম সংযমের উদ্দেশ্য তাহা বুঝান হইয়াছে।

যোগশাস্ত্রে চারিটি পর্ব্ব।

যোগ শাস্ত্রে চারিটি পর্ব্ব বলিলে যাহা বুঝায়, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম। হেয়, হেয়-হেতু, হান, এবং হানোপায়। পাতঞ্জলির মতে সংসার হেয়, কেননা দুঃখময়। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই দুঃখের হেতু, কেননা তাহাতেই যত কিছু অবিদ্যার উৎপত্তি। প্রকৃতি-পুরুষের, সেই সংযোগ বিচ্ছিত্তিই হান; কেননা তদ্দ্বারা অবিদ্যা হনন হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হানোপায়, কেননা তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। যোগদ্বারাই পুরুষ এই হানোপায় স্থির করিতে পারেন।

চিত্তের অবস্থা এবং বৃত্তি।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। চিত্তে নিতান্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে চিত্ত ক্ষিপ্ত অর্থাৎ রজোগুণাধিক্যযুক্ত, চিত্তমোহাচ্ছন্ন হইলে, চিত্তমূঢ়—অর্থাৎ তমোভাবাপন্ন, চিত্তে কখনও স্থৈর্য্য কখনও অস্থৈর্য্য ভাবের সমাবেশে চিত্তবিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বরজাদির দ্বন্দ্বভাবপূর্ণ, চিত্ত অবিচলিতভাবে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট থাকিলে চিত্ত একাগ্র এবং সকল বস্তুর নিরোধ হইলে চিত্ত নিরুদ্ধ। বৃত্তিও পাঁচ প্রকার প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। বিপর্য্যয়—বৈপরীত্য অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। বিকল্প—ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা বিশেষ ইত্যাদি। যোগ প্রভাবে এই সকল চিত্ত-বৃত্তির রোধ হইতে পারে অর্থাৎ পুরুষে কোনরূপ

বিকৃতি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্‌গীতার ২য় ও ৬ষ্ট এই দুই অধ্যায়ে যোগের কথা অতি তেজস্বী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, যে যোগে প্রথমে চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্রতার আবশ্যক হয় এবং যাহার পরিণাম ফল মনের সম্পূর্ণ চিন্তাপরিশূন্যতা সম্পূর্ণ শান্ত-ভাব এবং শেষে পরম পুরুষে বিলয়। এতৎসম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে সাধু পুরুষ মন্দিরের চূড়ার উপর অবস্থিত বস্তুর ন্যায় অচল ও অটল, যিনি আপন সমগ্রই ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে জয় করিতে পারিয়াছেন, কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার জ্ঞানে যিনি পরিপূর্ণ, যাঁহার নিকট মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণ, তিনই সমান, যিনি শত্রু মিত্র, বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, সকলকেই সমান জ্ঞান করেন, ভাল, মন্দ, দুইই যাঁহার নিকট সমান, তিনি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত বলিয়া অভিহিত হন। ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত হইতে যিনি অভিলাষ করেন, তাঁহাকে আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল কার্য্যেই সংযম হইতে হইবে; তদনন্তর তিনি তাঁহার সমস্ত সাংসারিক স্বার্থত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া আশ্রয় করিবেন। এবং একমাত্র ঈশ্বরেই আপন মন ও চিন্তা সমর্পণ করিবেন। সেখানে নাত্যুচ্চ নাতিনিম্ন একটু স্থান স্থির করিয়া বস্ত্র বা পশুচর্ম্ম দ্বারা আপন শরীর আবরণ করতঃ কুশতৃণের উপর সুদৃঢ় ও সরল ভাবে উপবেশন করিবেন। শরীর, মস্তক ও কণ্ঠদেশ নিশ্চল ও সোজাভাবে থাকিবে, চক্ষু কোন একটী বস্তুর অগ্রভাগের উপর নিক্ষিপ্ত থাকিবে। ইতস্ততঃ কোনদিকে অবলোকন করিবেন না, কোনরূপ রাগদ্বেষাদি যেন শরীরকে আসিয়া আশ্রয় না করে, মনে যেন কোনরূপ উদ্বেগ উপস্থিত না হয়। মন সম্পূর্ণরূপে সংযত এবং গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। কচ্ছপ যেরূপ আপন খোলার মধ্যে স্বীয় পাদ ও মস্তকের সঙ্কোচন করে, সেইরূপ তিনিও তাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহকে উহাদিগের বিষয়সমূহ হইতে সঙ্কোচ করিয়া লইবেন; ইন্দ্রিয় সমূহ যাঁহার আয়ত্তাধীন তিনিই পবিত্র জ্ঞানলাভের

অধিকারী হন এবং তাহার ফলে মনে শান্তি লাভ করেন। মনে শান্তি না থাকিলে সুখলাভ হয় না। ঝটিকা হেতু উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের মধ্যে জাহাজ পড়িলে জাহাজ যেমন টলমল করে, সেইরূপ যে জন আপন ইন্দ্রিয় সমূহকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই তাহারও চিত্তের অবস্থা সেইরূপ—অশান্ত ও চঞ্চল। বায়ুর ন্যায় তাহাকে উড়াইয়া লইয়া চলিবে। বস্তুতঃ চিত্তের শান্তাবস্থাই পরমপুরুষের অবস্থা। যিনি চিত্তৈকাগ্রতাগুণে সেই পরমপুরুষের সহিত আত্মার সংযোগ করিতে সমর্থ, তিনি নির্ব্বাত স্থানে স্থিত দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত। ইহাই ভারতীয় যোগ দর্শনের চরম অবস্থা ও স্থান। অনেক হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী বিশেষতঃ যাঁহারা শৈব সম্প্রদায় সম্ভুক্ত, তাঁহারা শিবকেই সেই পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ "যোগী" বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদের কঠোরাচারের উদ্দেশ্য শিবের সহিত সম্মিলিত হওয়া।

BOOKS FOR STUDY OR CONSULTATION.

S. N. Das Gupta, M. A., Ph. D. কৃত History of Indian Philosophy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় Jaina Yoga, ৭ম অধ্যায় Samkhya and Yoga Literature, Yoga and Patanjaly. Yoga Purificatory Practices (Parikarma). The Yoga Meditation, এই নিবন্ধগুলি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন দাস গুপ্ত মহাশয়ের কৃত Yoga Study of Patanjali গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। Published by the Calcutta University.

Max Muller কৃত The Six Systems of Indian Philosophy 7th chapter.

Sir Monier Williams কৃত Hinduism.

ফেলোশিপের লেক্চার (হিন্দু দর্শন) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত, নবম লেক্চার।

খ্রীষ্টধর্ম্মের যোগতত্ত্বের যথার্থ অবস্থা।

(গ) পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যত্ব লাভ করাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় বৃত্তিনিচয়ের যথাবিধি পরিস্ফুরণের নাম হইতেছে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের পরিণাম সুখ। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও তাহার পরিণতি অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। সাধনাই সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়—এই কথায় কোন বিরোধ নাই এবং কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগকে সাধনক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে, কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ভারতবাসী খৃষ্টপন্থীর যেন এদিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে। কি ঐহিক কি পারত্রিক, কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সমুদয় বিষয়ই সাধনা সাপেক্ষ। ব্যবসায়ী সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বিদ্যার্থী কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে সফল কাম হইতে পারে না। তদ্রূপ সিদ্ধ পুরুষের পবিত্র জীবনও বহু সাধনার ফল। "মনুষ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট" (যাঁহারা এই বাক্যে বিদ্রূপ করেন তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই) সুতরাং প্রত্যেক মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ। ঈশ্বর আমাদের প্রাণের প্রাণ; আত্মার নিত্য আশ্রয় ও অবলম্বন। যাঁহারা প্রকাশ্যে ধর্ম্মমন্দিরে দাঁড়াইয়া Darwinism মত প্রচার করেন (যেমন বার্ম্মিংহামের বিশপ Dr. Barnes করিয়াছেন) তাঁহারা এ যোগতত্ত্বের কোন খবরই রাখেন না। তাঁহাদিগের মূলে কোন বিশ্বাস নাই—তাঁহাদিগের সবই মৌখিক, প্রমাণ স্বরূপে R. J. Campbell কৃত "The New Theology" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলেই সব বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদিগের বিশ্বাস পদার্থের দৌড় কতদূর। সুখের বিষয় ভারতের খৃষ্টপন্থীর দল এখনও ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতে ঠিক্ থাকিবে। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাতে

অবস্থিতি করিতেছি। In Him we live, move and have our being. তাঁহা হইতে আমাদের জীবন স্রোত—আমাদের জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি, পবিত্রতা ও যাবতীয় শক্তি—নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। দার্শনিক পৌল বলেন "তোমাদের জীবন ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে" শাখা যে প্রকার দ্রাক্ষালতায় সংলগ্ন থাকিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহা হইতে জীবনী শক্তি লাভ করে' ও প্রচুর ফলে ফলবান হয়, আমরাও তদ্রূপ ঈশ্বরে অবস্থিতি করিয়া জীবনের আতিশয্য লাভ ও আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকি। প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি, সে ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না। ইহাতেই পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও।" যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাহাতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যাহা মানবকে গৌরবান্বিত করে, তাহাই ঈশ্বরের মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত করে। জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা যেমন মানবের মানবত্ব, তেমনই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। কেননা "আমরা তাঁহারই রচনা, বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট।" সুতরাং মানুষ যতই মহৎ হয়, ততই তাহার মধ্যে ঈশ্বর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—ইহা ধ্রুব সত্য।

ঈশ্বরের সহিত মানবের এই পরমাশ্চর্য্য নিগূঢ় সম্বন্ধ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভিত্তি-মূল। পাশ্চাত্যের জড়বাদ এই নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠিতে পারে না; ইহা ভারতবাসীর পক্ষে বড় মধুর বিষয় এবং যে প্রক্রিয়াতে এই রস মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে—তাহার রসাস্বাদন ভারতবাসী যেমন উপলব্ধি করিয়াছে তেমন যে আর কোন জাতি করিতে পারিয়াছে এমন মনে হয় না। আসল কথা এই মানবের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত মিলনের ভাবী প্রত্যাশাই সকল ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। মানব হৃদয়ে যে ভগবানের নিমিত্ত এক অতৃপ্ত চিরপোষিত বাসনানল বিরাজিত, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ঈশ্বর ভক্ত সাধু-

পুরুষদিগের জীবনী হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়, পক্ষান্তরে মানবের নিমিত্ত ভগবানের প্রেমের এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা সাধু যোহন লিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায় ষোড়শপদে প্রাপ্ত হই—এই প্রমাণ পৃথিবীর আর অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় কি ? অনুসন্ধান করিয়া দেখ সুসমাচার ব্যতীত আর কোথায় এই সাক্ষ্য আছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দর্শন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে এই সাক্ষ্যবাণী এবং প্রমাণ অগ্রাহ্য করা কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে, কারণ স্বয়ং ভগবান ইহা জগৎসমীপে প্রকাশ করিয়াছেন ; এই প্রমাণ বাক্যের অপরাজেয় প্রভাব এবং বিশ্বজয়ীশক্তিতে পূর্ণ ; ইহা কল্পনা জল্পনার বিষয় নয় ; কিম্বা কোন ভৌতিক কাণ্ড নয়। ইহা ওয়ালেস্, ক্রুকস্, কিম্বা ষ্টেড প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের উক্তি নয়। কিন্তু স্বর্গের বাণী—যেন পৃথিবীর তাবৎ নর নারী এই পবিত্র বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিমল সুখের অধিকারী হয়। পতিত মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে বহুমূল্য দানের অপেক্ষা করিতেছিল, ঈশ্বর সেই দানটী প্রকাশ্যে প্রদান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দর্শন বহুযুগ হইতে পৃথিবীর সকল ভাষাবিদজাতির মধ্যে ঈশ্বরের ঐ প্রেমতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বলিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর মানবকে চাহিতেছেন, মানুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিতেছেন আর ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার নিকটে আসিতেছেন—ইহাই খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের প্রমাণ মূলক প্রসিদ্ধ ইতিহাস এবং শাস্ত্রবাণীও সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছে,—"ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদি-গণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া শেষকালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়া-ছেন।" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম দর্শন এই বাক্যে দাবী করিয়া বলিতেছে যে মানুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনই ইহার ভিত্তি। সুতরাং আমরা বলিতে পারি ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। অবিশ্বাসীগণ এই প্রসিদ্ধনিয়মকে কীলকাকার ভাবেন বলিয়া তত মনযোগ করেন না ইহা তাহাদিগের দুর্ব্বলতা মাত্র। তাহারা স্মরণে রাখুন যে এই

নিয়ম কখনও পরিম্লান্ হইবে না, এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে "অধিকার খ্রীষ্ট পাইয়াছেন, সেই অধিকার তাঁহা হইতে আর কেহ হরণ করিতে পারিবে না।" খ্রীষ্টীয় দর্শনের এবং গ্রীক্ "অর্পসটেসীয়স্" শব্দের ইহাই বৈশিষ্ট্য। অবিশ্বাসীগণ যুগযুগান্তরব্যাপী খ্রীষ্টের এই অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ বা কোন প্রকার প্রতিযোগীতা করিলেও নিষ্ফল হইয়া যাইবে এবং তাহা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দর্শন ইব্রীয় পত্রের ঐ সংস্কার সম্বন্ধে বলেন যে উহা সর্ব্বলোক কল্যাণকর বাক্য এবং উহাতে দুর্ব্বোধ্য ও কোন প্রকার অসরল ভাব নাই।

যোগ শব্দের অর্থ হইতেছে মিলন। মানবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। ধর্ম্মজগতে যোগ শব্দের অন্য অর্থ নাই। ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার যে ঘনিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু যোগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে যোগ বলা যায় না। তাহা শারীরিক প্রক্রিয়া বিশেষ মাত্র। কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, আমরা এ কথা বিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। আমি (১৬ পৃষ্ঠায়) যোগের যৎকিঞ্চিৎ কথা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এবং সেখানে একথাও বলিয়াছি যে প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা জীবাত্মাকে শরীর হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, ইহা মিথ্যা নয়। প্রাণায়ামাদি * ক্রিয়াকে চিত্ত সমাধানের উপায়

---

* হরিদাসের যোগ সমাধি—ডাক্তর ম্যাকগ্রীগার আপনার "শিখ ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের উদ্যানে এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়, লাহোরে এক ফকির আসিয়াছিলেন ফকীর বলেন তাঁহাকে বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে তিনি বিনা পানাহারে ও যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, মহারাজা রণজিৎ সিংহ সে কথা বিশ্বাস করেন না, তিনি প্রমাণ দেখিতে চাহেন, সুতরাং সাধুকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া চাবি বন্ধ করা হয় এবং সেই অবস্থায় উদ্যান মধ্যস্থিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাক্সসহ সাধু মৃত্তিকা প্রোথিত হন; অতঃপর উদ্যান বাটীর দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া চারিদিকে প্রহরীর বন্দোবস্ত হয় ...... এই ভাবে ৪০ দিন ও ৪০ রাত্রি সাধুকে মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখা হয়

বলিয়া স্বীকার করিলেও ঐ সকল প্রক্রিয়াকে ঈশ্বরের সহিত যোগ বা মিলন বলা যাইতে পারে না। উহাকে যোগ বলাও যাহা, আর উপায়কে উদ্দেশ্য বলা, পথকে গন্তব্য স্থান বলাও তাহাই। আমি সচেতন থাকিয়া আমার প্রাণের প্রভুকে প্রাণের মধ্যে দেখিতে চাই; তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চাই; সমস্ত শক্তির সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাই। আমি সজ্ঞানে আমার সমস্ত চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিতে চাই। ইহাকেই বলি যোগ।

যোগ শব্দের অর্থ ক্রিয়াহীন বিশ্রামের অবস্থা নহে, কিম্বা হঠযোগ দ্বারা

...... অবশেষে মহারাজ স্বয়ং তাঁহার পৌত্র, কয়েকজন প্রধান সর্দার, জেনারেল্ ভেণ্টন্ (Velton) Captain Wedd (ওয়েড) এবং ডাক্তার ম্যাকগ্রীগার (ইতিহাস লেখক স্বয়ং) প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সাধুকে কবর হইতে উত্তোলন করেন। (পৃথিবীর ইতিহাস পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 'কন্‌টেম্‌পোরারি রিভিউতে' ডাক্তার কার্পেণ্টারের সাইকোলজি অব্ বিলিব্ নামক প্রবন্ধ দেখুন। অমৃত সহরে হানিগ্‌বার্জ্জারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থেও এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে, দার্জ্জিলিং পাহাড়ে কতকগুলি ইংরাজের সমক্ষে একজন তিব্বত দেশীয় লামা এই আশ্চর্য্য যোগ ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন"। এ সকল কেবল দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসের ফল মাত্র, ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে আমার ইষ্ট দেবতা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন। পুনশ্চ "বুদ্ধদেব-চরিত" গ্রন্থের লেখক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ১৭২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও প্রণিধান যোগ্য। প্রাণায়াম অস্বীকার করা যায় না, উহা কঠোর প্রক্রিয়া বিশেষ, এবং অনেক দিন হইতে অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কষ্ট সাধ্য ব্যাপার বলিয়া উহাতে প্রায় কেহই অগ্রসর হয়েন না "যোগিগণ এই আশ্চর্য্য কাণ্ড কি প্রকারে সম্পাদন করেন তাহা হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধি হইবে। লেক টেনাণ্ট বইলো ও বেয়ার্ড সাহেবও প্রাণায়ামের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন।" তবে প্রাণায়ামের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পুনরুত্থানের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাণায়াম নিজের কৃতঅভ্যাসের ফল এবং পুনরুত্থান ঈশ্বরের সাধিত পরাক্রম ও কার্য্য।

মনুষ্য যে সমাধি প্রাপ্ত [illegible] সমাধির অবস্থা নহে। যে অবস্থায় আমার চৈতন্যই র[illegible] বুঝিতেই পারিলাম না আমার প্রভু আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন কি না, তাহাকে যোগ বলি কিরূপে? সহস্র কার্য্যের মধ্যে তন্ময় চিত্তে ঈশ্বরের সহিত আত্মাকে নিয়োজিত রাখার নামই প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগ। কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যবাসী না হইলে, জগতের সকল বিষয়ে উদাসীন না হইলে ধর্ম্ম লাভ করা যায় না, খ্রীষ্টধর্ম্ম একথা স্বীকার করে না। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে পরমেশ্বরের হস্ত দেখিতে হইবে; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য তাঁহারই গৌরবার্থে পালন করিতে হইবে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা চিন্তাশক্তির বিলোপ হয় এবং মন অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সাধনার সোপান বলিব কিরূপে? আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে, আত্মার উন্নতি সাধনের পক্ষে, চিন্তাই প্রধান উপায়। আমরা দেখিয়াছি এবং পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন যে চিন্তা হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় এবং ভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি। আমাদিগের যাবতীয় বাক্য ও কার্য্য চিন্তারই পরিণতি মাত্র। চিন্তাই মানব জীবনের নিগূঢ় প্রস্রবণ। কারণ আমাদিগের হৃদয় যাবতীয় বাসনার উৎপত্তিস্থল। আমাদিগের কোন ইচ্ছা হৃদয়ে উদ্রেক হইলে চিত্ত তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিযুক্ত হয়। চিন্তা ও কল্পনা ঘনীভূত এবং পরিপক্ক হইলে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্যের পরিণাম কর্ম্ম-ফল। কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য। কর্ম্মের পরিণাম (Kàrma) হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই। কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্ম-ভোগ অখণ্ডনীয়। "What so ever a man soweth, that must he reap." "তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না, কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশ্যে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে যে

বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত [illegible] পাইবে। আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে যথা সময়ে শস্য পাইব”। কথা বাহুল্য যিনি পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। পাপের ক্ষমা আছে, কিন্তু পাপের ভোগের কোন ক্ষমা নাই। পাপ-জনিত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। পাপ কি ভয়ানক ব্যাধি! ব্রহ্মবাদী বলেন, এ ব্যাধির কোন প্রতীকার নাই। সুতরাং পাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেও “কর্ম্মের” হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। আমরা পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয় হইতে অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছি এখন আর তাহা না করিয়া পূর্ব্ব বিষয় উল্লেখ করা যাউক। উপদেশ শ্রবণে বা পাঠে যে উপকার হয়, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অপরের প্রদত্ত উপদেশ আমাদের চিন্তা শক্তির সাহায্য করে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে কার্য্যকারী হয়। যে উপদেশ আমাদের চিন্তাকে জাগ্রত করিয়া না দেয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে কোন কাজেই আসে না। নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, * চিন্তার প্রগাঢ়তম অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উন্নতি সাধনের যে কিছু উপায় আছে, চিন্তাই তাহার মূলমন্ত্র। চিন্তার উন্নতি সাধনের এই অবস্থা আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভারতবাসী দার্শনিকগণ

---

* কতিপয় শব্দের অর্থ—(১) দর্শন—পরমাত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ এই বিশ্বে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্থানে প্রাণরূপে প্রতীয়মান করিবে।

(২) শ্রবণ—পরব্রহ্ম বিষয়ক কথা অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া তাহা মনোমধ্যে ধারণ করা।

(৩) মনন—মনোমধ্যে নিশ্চয়রূপে ধারণ করা এবং সত্য ও অসত্যের বিচার দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠা স্থাপন করা।

(৪) নিদিধ্যাসন—ব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া অবিশ্রামে ও অনন্তচিত্তে তাঁহার ধ্যান। ইহাই হইতেছে হিন্দুধর্ম্ম দর্শনের ঐ শব্দগুলির অর্থ।

যে অর্থে উহা প্রয়োগ করেন তাহা নিন্দনীয় নহে, খৃষ্টপন্থী উহা অবহেলা করিতে পারেন না। আমাদিগের অভ্যাস ও শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত এই দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছে।

যাঁহারা চিন্তার এই উন্নত অবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। আপন আপন হৃদয় পরীক্ষা করিলেই সব বুঝা যায়। যে অবস্থায় আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হয়, যে অবস্থায় আমাদের আত্মা পাপের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়, যে অবস্থায় আমরা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি—"প্রভু আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," তাহাই যথার্থ যোগের অবস্থা।

পুনশ্চ, আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে যোগ মানিয়া লইতে আমরা প্রস্তুত আছি। খ্রীষ্ট স্বয়ং এক অসাধারণ পবিত্র যোগী পুরুষ ছিলেন—ইহা অস্বীকার করা চলে না। তিনি মানব জাতির আদর্শ ও প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষা প্রণালীর গুরুত্বের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত যোগের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা যোহন রচিত সুসমাচারের পঞ্চদশ অধ্যায় গভীর ভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে উহাই প্রকৃত স্বর্গস্থ পিতার সহিত আত্মার অখণ্ডনীয় যোগাবস্থা। এই যোগ জাগতিক শক্তির দ্বারা স্থাপিত বা সমাধান করিবার বস্তু নহে, ইহা ঐশ্বরিক অনুগ্রহের দ্বারা স্থাপিত এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিজয় লাভ করিবার অমোঘ উপায় এই শক্তিকে অবহেলা করা চলে না। খ্রীষ্ট সমাজের মধ্য হইতে এই সকল পবিত্র শিক্ষা অন্তর্হিত হওয়ায় এবং শিক্ষকগণ মনোযোগ না করায় সমাজ শুষ্ক ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এখন আমাদিগকে আবার এই সকল শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে ও যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনে উহা লাভ করা যায় তাহার উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। এ সকল জড়বাদী দিতে পারে না, আত্মাই দিতে পারে, আত্মাই আত্মাকে চিনে ও

পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করে। তাহা না ঘটিলে যোগের কোন মূল্যই থাকে না। খৃষ্টপন্থী এই পথে উঠিলেই তিনি অসাধ্য সাধন করিবেন। এবং জয়শ্রী তাঁহার সকল দিকেই ঘোষিত হইবে। এমন এক যুগ ছিল, যে সময় খৃষ্টপন্থীদিগের এই উন্নত অবস্থা ছিল, পরে জড়তত্ত্বের ধাক্কায় ও পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। খ্রীষ্ট সমাজ মনে রাখুন আমাদিগকে আবার সেই পূর্ব্ব অবস্থার পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ অন্য উপায় নাই। পাশ্চাত্যের অবলম্বিত পদ্ধতিগুলি মন হইত সরাইয়া ফেলিতে হইবে। উহা আমাদিগের দেশের জল, বায়ু ও ধাতুতে আর সহ্য হইতেছে না। আমরা যে ধাতুতে গঠিত আমাদের বস্তুগুলিও সেই ধাতুতে গ্রহণ করিলে ফল যে ভাল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আমার বস্তু, আমার রুচি ও ব্যাখ্যা আমার জন্মগত ভাব, ইচ্ছা, অবস্থা, পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে রুচি নাই, আস্থা নাই, তাহা জোর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ফল শুভ হইবে না এবং পরিপাকও হইবে না। আমরা এতাবৎকাল তাহাই করিয়া আসিলাম কিন্তু এখনও সব নিরস ও ফলশূন্য অবস্থায় সমাজ নিদ্রিত আছে।

ঈশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ঈশ্বরের পিতৃত্বের আরোপ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের একটী বিশেষ লক্ষণ। ঈশ্বরকে "পিতা" বলিয়া ডাকিতে যীশুই আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। পরমেশ্বরের এই অভিনব আখ্যার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের এক অতি বহুমূল্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে ঈশ্বরের সহিত আমাদের স্বভাবগত গভীর সম্বন্ধই অনুসূচিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত মানবের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ খ্রীষ্টীয় দর্শন ও ধর্ম্মের এক মৌলিক সত্য। এবং এই পবিত্র গৌরব স্বরূপ ধর্ম্ম ও অবস্থাকে কেহই পরিম্লান করিতে পারিবে

না। ইহা এক ও সার্ব্বভৌমিক। ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিতে ও বিশাল বিশ্ব বিধানে এই সম্বন্ধের উপলব্ধি ও অধিকারই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরমেশ্বরই যাবতীয় জীবনের আকর এবং "তিনিই সমস্ত জঙ্গমকে জীবাত্মা দেন"। যখন মানুষের চিন্তা ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার সঙ্কল্প ও বাসনা সমূহ ঈশ্বরের বাসনানুযায়ী হয়, যখন তাহার যাবতীয় কার্য্য ঐশী শক্তিতে সম্পাদিত হয়, তখনই মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহাতে মনুষ্যত্বের যথার্থ সার্থকতা সম্পন্ন হয়। তখন মানুষ ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হয়। তখন সে আপনার সমুদয় কার্য্য ও কৃতকার্য্যতার মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রভাব অনুভব ও স্বীকার করে। তাহার জীবন যে ঈশ্বরে নিহিত, এবং তিনিই যে তাহার জীবনের নিগূঢ় প্রস্রবণ ও পরিচালক শক্তি ইহা সে প্রাণের অভ্যন্তরে বুঝিতে পারে। এই আদর্শ জীবন লাভ করিয়া ব্যক্তিগত চরিতার্থতা সম্পাদন ও পূর্ণ পরিতোষ উপভোগার্থে ঈশ্বর লাভই মানবের চরম লক্ষ্য। বিশ্ব বিধানেও সেই নিয়ম। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চরাচরে শক্তি, গতি, নিয়ম, জীবন, জড়, অজড় প্রভৃতির ক্রিয়া ও বিকাশের ব্যাখ্যা করে, অথচ উহার মূল ও উৎপত্তি নিরূপণে সমর্থ নহে। খ্রীষ্ট পন্থী কিন্তু এই সমুদয়ে সেই একই পরমেশ্বরের অসীম বিশ্ব-লীলার প্রকাশ দেখিতে পায়। সুতরাং অভিনব প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও নব নব নিয়মের আবিষ্কার সে আনন্দের সহিত গ্রহণ করে। যেহেতু মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যে ঐশী শক্তি ক্রিয়াবান, বিশ্বমণ্ডলেও সেই শক্তিরই পরিচালনা। এতদুভয়ের মধ্যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান নাই। উভয়েতে একই শক্তি কার্য্য করিতেছে। সুতরাং ইহা পরাৎপর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সহিত বিশ্বের এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের ও মানবের এই অতি নিগূঢ় সম্বন্ধরূপ সত্য যাবতীয় ধর্ম্মেরই সুদৃঢ় ভিত্তিমূল। এই সুখময় সম্বন্ধের কল্পনা ও স্বতঃসিদ্ধের উপরেই বিশ্ব-ধর্ম্মসমূহ সংস্থাপিত।

সুতরাং মানবের সহিত ঈশ্বরের অনন্ত-মিলনের ভাবী প্রত্যাশাই সকল ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম ও ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভগবানের যেরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই সকল দেশেই ঈশ্বরের সহিত সৃষ্ট-জীবের সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মিশর দেশের দেব কল্পনায় জন্তু-মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপ (Therianthropism) এবং গ্রীস ও রোমে মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপ বা ঈশ্বরের মানবরূপ কল্পনা (Anthropomorphism) পরিদৃষ্ট হয়। আবার ভারতের অবতারবাদে ইতর জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রূপ কল্পনায় এক ক্রমঃবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ মৎস্য (জলচর জন্তু) হইতে কূর্ম্ম (উভচর সরীসৃপ), বরাহ (স্থলচর পশু), নৃসিংহ (জন্তু-মানব) পর্য্যন্ত ও তৎপরে বামন (ক্ষুদ্রকায় মানব) পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী, আপল্লো, মিথ্, পর্য্যন্ত অবতারবাদের এক আশ্চর্য্য ক্রমোন্নত সোপান কল্পনা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। ঈশ্বরের এই সমুদয় রূপ কল্পনা ও অবতারবাদ হইতে ক্রমশঃ ভারতের দেব সিদ্ধান্ত সর্ব্বেশ্বরবাদে (Pantheism) পর্য্যবসিত হইয়াছে। বেদান্তের প্রসিদ্ধ শ্রুতি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইতেই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের (Monism) উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সমুদয় অবতারবাদ, জন্তু-মানব দেববাদ বা সর্ব্বেশ্বরবাদ কেবল বহু দেববাদেরই (Polytheism) অবান্তর মাত্র। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে মিশরের জন্তু-মানববাদই হউক, কিম্বা গ্রীসের মানব-দেববাদই হউক, সর্ব্বত্রই ঈশ্বরকে মানবের নিকটে আনিবার নিমিত্ত—মানবের সহিত ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই সমুদয় কল্পনা কি অসার আকাশ-কুসুম বা বিকৃত মস্তিষ্কের অলীক বিজৃম্ভণা মাত্র? অথবা ইহাতে কি সৃষ্টিকর্ত্তার নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরের এক অব্যক্ত আর্ত্তস্বর (রোমীয় ৮ অঃ

২২ পদ) ও ঐকান্তিক মিলনাকাঙ্ক্ষা, অথবা পরমেশ্বরের নিমিত্ত মানব-হৃদয়ের গভীর অতৃপ্ত বাসনারই স্ফুট বিকাশের আধ আধ স্বরই প্রকাশার্থ প্রয়াস পাইতেছে? বস্তুতঃ মানব-হৃদয়ে যে ভগবানের নিমিত্ত এক অতৃপ্ত চির-পোষিত বাসনানল বিরাজিত, সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্ত মণ্ডলীর আবেগ-পূর্ণ প্রাণের ভাষা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ঐ যে আরবের মরু-প্রান্তর হইতে সকরুণ স্বরে একজন বলিতেছেন; "আহা, যদি আমি তাঁহার সন্ধান পাইতাম, তবে তাঁহার সিংহাসনেরই নিকট উপনীত হইতাম"। ইয়োব ২৩; ৩।

আবার সুরীয়ার পর্ব্বতরাজির পর পার হইতে আর একজন গাহিতেছেন :—"মৃগ যথা জল স্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে।

তেমনি আমার প্রাণ তৃষিত নাথের তরে"। গীত, ৪২ ; ১।

পুনঃ শ্যামল শস্য শোভিত জাহ্নবী তীর হইতে একজন গাহিতেছেন :—"চঞ্চল অতি ধাওল মতি নাথ তরে ভব ভবনে"।

পুনরপি বীণা ঝঙ্কার সহকারে কবি গাহিতেছেন :—

"আমার মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে।

সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আসে পাশে"।

এই যে বিশ্বময় ধর্ম্ম মন্দির, অসংখ্য যজ্ঞবেদী, গগনস্পর্শী ধূপধূম ও অগণন হোমবলি এবং পূজারাধনার বহ্বাড়ম্বর, এই সকল কি ভগবানের নিমিত্ত মানব হৃদয়ের আবেগরই পরিচয় প্রদান করে না? আবার পথের ভিন্নতা ও মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল ধর্ম্মেরই পরিণাম সেই ভগবানের সহিত সম্মিলন প্রত্যাশা, ইহা হইতেও কি সেই একই বিষয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে না? সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযোজ্য ইহার যে কোনও বিধ মুক্তির বিষয়ই আলোচনা করা যায়, উহার কল্পনা ভগবানের সহিত সম্মিলন প্রত্যাশা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই সমুদয় বিষয় দ্বারা ভগবানের সহিত মানবের মিলনাশা ও নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

এই তো গেল এ পক্ষের কথা,—ভগবানের নিমিত্ত মানবের প্রাণের আবেগ ও সম্মিলনের কামনার কথা। কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য যে তিনি মানুষের নিকটে আসিতে চান ও মানুষের সহিত মিশিতে চান? অন্ততঃ বাইবেল শাস্ত্রে ঈশ্বর এইভাবেই প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বর মানবকে চাহিতেছেন,—মানুষের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে চাহিতেছেন। আর তাহার নিকটে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন—এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বাইবেলের ইতিহাস। আদমের অনুসন্ধানার্থে এদোনোত্থানে ঈশ্বরের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষ পরম্পরায় ঈশ্বর কেবল মানুষের কাছেই আসিতেছেন। কখনও বা রাত্রি দর্শনে, কখনও বা দৈববাণীতে কখনও বা অলৌকিক দীপ্তি প্রকাশে, কখনও বা দিব্যদূতরূপে মানবের নিকটে ঈশ্বরের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। এইরূপে পিতৃগণের নিকটে বহুভাবে ও বহুরূপে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্রী ১; ১।

কিন্তু এই সমুদয় আবির্ভাব যে তাঁহার স্থায়ী প্রকাশ নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাই প্রাণের আবেগে ভক্ত গাহিয়াছেন :—

"ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে,
তোমারে যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা ভয় হয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।"

অধিকন্তু অনেক স্থলে এইরূপ ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাব ঈশ্বরেরই প্রকৃত প্রকাশ কিম্বা ভক্তের আবেগোচ্ছাসের মানসিক প্রতিবিম্ব বা প্রবল কল্পনার প্রক্ষিপ্ত প্রতিরূপ কি না তাহাও যথাযথ অপরের নিকটে প্রমাণীকৃত হওয়া সহজ সাধ্য নহে। সুতরাং এই ক্ষণিক আবির্ভাবে ভক্তের প্রাণের গভীর বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। ইহাতে মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল বা চরম লক্ষ্যও উপলব্ধ হয় না। অতএব এই সকল অপেক্ষাও স্পষ্টতর ও স্থায়ী আবির্ভাবের প্রয়োজন। তাহা হইলে, ঈশ্বরকে সত্য সত্যই

মানুষের অতি নিকটে আসিতে হইবে, তাহার পরিবারে ও সমাজে, প্রকাশ্যে ও নিভৃত জীবনে, ক্ষুদ্র ও মহৎ যাবতীয় ব্যাপারের অভ্যন্তরে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে; তাহার সকল দুঃখের মধ্যে সহানুভূতি করিতে, সকল মর্ম্ম বেদনায় অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে, তাহার যাবতীয় আনন্দ পবিত্র করিতে, যাবতীয় শোক ভুলাইয়া দিতে, পতনের সময় ধরিয়া রাখিতে, পতিত হইলে উত্থান করিতে, যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিতে, তাহার যাবতীয় পরীক্ষায় অভয় দিতে, যাবতীয় অভাব মোচন করিতে, তাহার নিকটে, অতি নিকটে আসিতে হইবে। এক্ষণে সমস্যা এই, তিনি কোন্‌রূপ লইয়া আমার কাছে, আসিবেন। তিনি কি আমার প্রাণের মাঝে অরূপ রূপ মাধুরী প্রকাশ করিয়া সুধু আধ্যাত্মিক ভাবে আমার অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া (Subjective) ভাবে প্রকাশিত হইবেন ? না,—আমার বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া (Objective) ভাবে সাধারণ দৃষ্টির প্রত্যক্ষীভূত হইবেন ? প্রাগুক্ত প্রকারে আবির্ভাব যে আপামর সাধারণ জনগনের প্রাণের অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তি প্রদানে সম্যক সমর্থ নহে, তাহা উপরি উল্লিখিত ক্ষণিক প্রকাশের প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত প্রত্যক্ষই একমাত্র সন্তোষজনক আবির্ভাব ইহাই স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু কোন্‌রূপে তিনি মানবের নিকটে প্রকাশিত হইবেন ? পশু পক্ষী সরসৃপাদি ইতর জীবের রূপ ধারণ করিয়া কি তিনি প্রত্যক্ষ হইবেন ? কিন্তু ইতর জীবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে ঈশ্বরাবির্ভাবের পূর্ব্ব কথিত উদ্দেশ্য সমূহ সফল হইতে পারে না। যেহেতু ইতর জীবের সহিত মানব স্বভাবের সম্মিলন ও সহভাগিতার সম্ভাবনা অতিশয় সীমাবদ্ধ। মানব ঈশ্বরকে যেমন ভাবে পাইতে চায়, ইতর জীবের প্রকাশে তেমনটী কদাপি পাইবে না। তাহার প্রাণের অভাব ও মিটিবে না। যদিও ইতর জীব অনেক সময় জন-মানবহীন বিজন প্রান্তরে মানবের সান্ত্বনা প্রদান ও অব্যক্ত ভালবাসা দেখাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছে, তথাপি উহাতে যে সান্ত্বনা ও প্রেমের প্রকৃত প্রকাশ হইতে পারে না ইহাও

মানব অনুভব করিয়াছে। অধিকন্তু ইতর জীব মানবের ভক্তি ও পূজার আস্পদ হইতে পারে না। উপাস্য হওয়া দূরে থাকুক, সমকক্ষ ও সহভাগীও হইতে পারে না। শরীরী জীবের মধ্যে মানবই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ মানবে জড় ও সংজ্ঞার সাম্যাবস্থা বিদ্যমান থাকাতে এক পক্ষে যেমন সে দৃশ্য জগতের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, পক্ষান্তরে অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতেরও যেন নিম্নতর সোপানের সংস্পর্শে আসিয়াছে। মানবে নর ও অমর এতদুভয়েরই এক আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঈশ্বরের পক্ষে রূপ পরিগ্রহণ আবশ্যক হইলে, মানবরূপ ধারণই অধিকতর সম্ভবপর। অধিকন্তু বাইবেল শাস্ত্রানুসারে (আদি) মানব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতেই সৃষ্ট হইয়াছিল। আদি ১ : ২৭। সুতরাং ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানবেই ঈশ্বরের আবির্ভাব ও প্রকাশ ন্যায় সঙ্গত ও সমীচীন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

শুদ্ধি-পত্র

"ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তাহার ভ্রান্তিহীনতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঙ্গালার মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা তাহা হইতে বহু দূরে। নির্ভুল করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই শুদ্ধিপত্র বাঙ্গালা পুস্তকের অপরিচ্ছেদ্য গৌণ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৯	পণ্ডিত্যের	পাণ্ডিত্যের
১৩	৪	পালঞ্জন	পাতঞ্জল
১৬	১৬	সমালোনচা	সমালোচনা
৫০	১০	স্বীকার করেন	স্বীকার করেন না
১২০	৬	কি	কে
১৩৯	৪	বিউরয়	বিউরস্
১৩৯	৮	ষ্টোবিকীয়	ষ্টোয়িকীয়
১৪০	৩১	ষ্টোকীয়	ষ্টোয়িকীয়
১৫১	১১	প্রচান	প্রদান
১৫৯	২৪	theolosy	Theology.
১৬০	৪	Taitt, Breh	Tait, Brh.
১৬৭	২১	পূর্ব্বগ্নো	পূর্ব্বজ
১৭০	২	আদেবী	অদেবী
১৭১	২৩	গোগন	গোপন
১৮৫	২০	দেবাবতাকে	দেবাবতারকে
ঐ	১৪	scholary	scholarly.
২১১	১২	মায়ামাত্মক	মায়াত্মক
৩০৬	১১	২১০	গীতসংহিতা ১১০

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৩	২৬	পৌরা[illegible]ক গেযু	পৌরাণিক যুগে
৩১৪	১৭	প্যাশ্চত	পাশ্চাত্য
৩৩৫	৭	deplomatic	diplomatic.
৩৪০	২৬	Flolow	Follow.
৩৬৪	১০	জেনর	জনের
৩৭২	৬	জাবত্মা	জীবাত্মা
৩৭৪	২২	শস্তকে	শস্যকে
৪০২	১১	প্রভে	প্রভেদ
৪৪২	৭	ধারা	দ্বারা
৪৪৭	১৬	Bhakt	Bhakti.
৪৫৩	২১	অরিষ্টন	অরিষ্টটল

———

হিন্দু-দর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন সম্বন্ধে অভিমত।

আমি শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত মহাশয়ের "হিন্দু-দর্শন ও খ্রীষ্টীয়-দর্শন" নামক পুস্তকখানির কয়েকটী অংশ পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকখানি দত্ত মহাশয়ের কঠিন পরিশ্রমের ফল। তিনি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, আমাদের সমাজে পুস্তকখানি আদরে গৃহীত হইলে তাঁহার সেই শ্রম সফল হইবে। ইংরাজী ভাষায় হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় দর্শনের তুলনা-মূলক পুস্তক অনেক আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই প্রকার পুস্তকের অভাব ছিল, দত্ত মহাশয় আজ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আশা করি, বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ানের ঘরে ঘরে এই পুস্তকখানি স্থান পাইবে।

শ্রীসত্যপ্রিয় বিশ্বাস, এম, এ,

কলিকাতা স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক।

জুলাই ২৩; ১৯২৭।

T. XAVIER'S COLLEGE.

25th Nov., 1927. Calcutta.

Mr. P. N. Dutt tries in this book to point out a common ground where Hindu and Christian Philosophy can meet. We can only congratulate him on his successful attempt, and recommend his book to all those who have at heart the progress of Indian Philosophy. His exposition is simple and lucid, and can be understood even by beginners. He tries to bring in common-sense in these abstruse questions and thus to simplify certain points which appear like tight knots to the uninitiated.

Revd. P. Johanns, S. J.
Prof. of Philosophy,
St. Xavier's College.

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পরমানন্দ দত্ত মহাশয়ের "হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন" বিষয়ক হস্তলিপি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকের বিষয়, ভাব ও ভাষা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। ধর্ম্ম-মীমাংসা অনেক স্থলেই গম্ভীর অর্থদ্যোতক। দর্শনশাস্ত্র গবেষণা সহ অধ্যয়ন করিয়া পরমবাবু স্বীয় গ্রন্থে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে এরূপ পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল, দত্ত মহাশয় সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। প্রেম-অবতার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বপ্রেমিক জীবন ও শিক্ষার কথা দর্শন শাস্ত্রের সার শিক্ষার সহিত তুলনা করিয়া যিনি মানব সমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী, তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্হ। এই প্রকার উপাদেয় এবং গভীর তত্ত্ব প্রকাশক পুস্তক-প্রচারে উৎসাহ না দিলেই নয়। গ্রন্থখানি খ্রীষ্টপন্থী ও ঐহিক সকল লোকের পক্ষেই উপযোগী পাঠ্য হইবে এবং এতদ্দ্বারা অনেকেরই আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের কামনা করি। ঈশ্বর গ্রন্থকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি—

আচার্য্য শ্রীরাখালচন্দ্র বিশ্বাস,
হোলি ট্রিণিটী চার্চ্চ,
কাশীপুরস্থ সি, এম, এস, ডিভিনিটি স্কুলের
ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ,
এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস প্রণেতা।

Calcutta, 8th April 1926.

HINDU PHILOSOPHY AND CHRISTIAN PHILOSOPHY (in Bengali) is a work written by a thoughtful and learned man. I cannot help praising Mr. Paramananda Dutt's research and reasoning. The work is good indeed.

J. R. Banerjea, M. A., B. L.,
Principal, Vidyasagar College,
Fellow, etc, Calcutta University.

I have read some portions of Mr. P. N. Dutt's Hindu and Christian Philosophy in Bengali. It is an able treatise on the subject written in an attractive style. The six systems of Indian Philosophy have been fully dealt with. He has attempted a comparative study of Hindu and Christian Philosophy which is of real value. As an introduction to the subject this book will, I assure, prove to be of great use to the Missionaries and the Indian Church in Bengal.

S. C. Mukerji, Esq., M.A., B.L., M.L.C.,
6, Mullen Street.

5th April, 1926.

Mr. Paramananda Dutt deserves the gratitude of the Bengali public for his book entitled "*HINDU-DARSAN O CHRISTIYA DARSAN*" in which he has dealt with the relative merits of Hinduism and Christianity. There are very few books on the subject in the Bengali language, and I hope Mr. Dutt's work will supply a true need of the country.

C. L. Mukerji, M.A.,
General Editor of Vernacular
Christian Literature for
S. P. C. K. in Bengal.